ঋত্বিক ঘটকের
গল্প

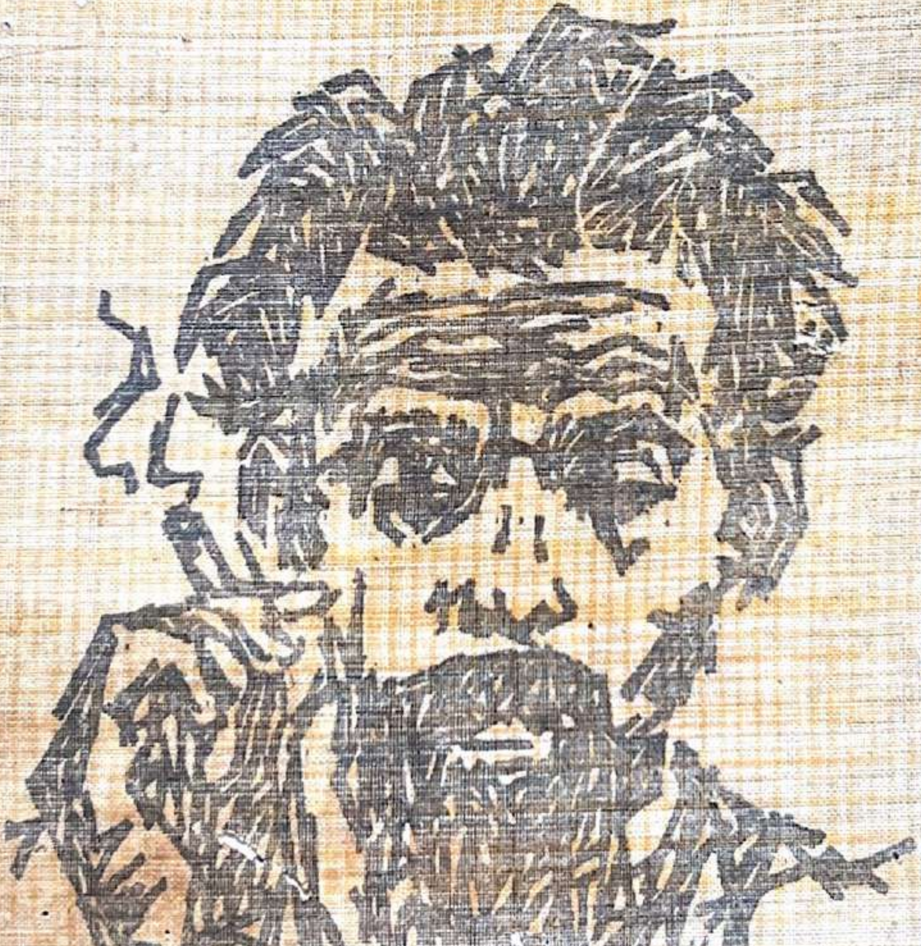

শহীদ সাবের রচনাবলী

সেলিনা হোসেন
সম্পাদিত

4461
গ্রন্থাগার 9.4.83
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ
ঢাকা।

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৮
নভেম্বর ১৯৮১

বা/এ ১১৮৩

পাণ্ডুলিপি
সংকলন বিভাগ

প্রকাশনায়
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশনা বিক্রয় বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

মূল্য ঃ মাত্র ষাট টাকা

SHAHID SABER RACHANABALI ; Works of Late Shahid Saber compiled and edited by Selina Hossain, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh, 1st Edition, November 1981. Price : Tk. 60·00 only.

সূচী

প্রথম ভাগ

জীবনে জীবন সৃষ্টি -- -- ৫

স্মৃতি রোমন্থন

শহীদ সাবের একটি অসমাপ্ত শিল্পী -- ২৯
জীবনের কথা -- -- -- ৩১
শহীদ সাবেরের স্মৃতি -- -- ৩৫
শহীদ সাবেরকে দেখে -- -- ৩৯

চিঠিপত্র ঃ প্রিয় উদ্ধৃতি

পিতাকে লেখা শহীদ সাবেরের চিঠি -- ৪৩
বন্ধু মাহবুব-উল-আলমকে লেখা চিঠি -- ৪৫
প্রিয় উদ্ধৃতি -- -- -- ৪৬

সাহিত্যকর্ম

আরেক দুনিয়া থেকে -- -- ৪৯
এক টুকরো মেঘ -- -- ৫৪
ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান -- -- ৬০
কবিতা -- -- -- ৬৪

দ্বিতীয় ভাগ

স্বরচিত রচনা -- -- ৬৭
আরেক দুনিয়া থেকে -- -- ৬৯

এক টুকরো মেঘ

এক টুকরো মেঘ -- -- ৯৭
বিষকন্যা -- -- -- ১০৩
প্রাণের চেয়ে প্রিয় -- -- ১০৮
জস্নু ভাবীর জন্য -- -- ১১৯
দেয়াল -- -- -- ১৩৫

যে গল্প কেউ বলেনি ১৩৯
যৌবন ১৪৫
চালচুলো ১৫৩
ছেলেটা ১৫৯
শেষ সংবাদ ১৬২

ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

দুষ্টু ছেলে ১৬৯
বাবা ১৭২
সমান ভাগ ১৭৬
ছেলে ধরা ১৭৯
বুদ্ধি যদি থাকে ১৮৫
বন্ধু ১৯০
ছবি দেখতে গিয়ে ১৯৬
ওরা আছে ২০০
ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান ২১০

অনুবাদ

পুশকিনের ইসকাপনের বিবি ২২১
গোগলের পাগলের ডায়রী ২৫০
ক্যাথারিন ওয়েন্‌স্‌ পিয়ার-এর কালো মেয়ের স্বপ্ন ২৭১

কবিতা

শোকার্ত মায়ের প্রতি ৩৫৫
গল্পের বই নয় পড়ার বই ৩৬০
বেশ ভালো জীবন ৩৬১
স্কুল জীবনের পর ৩৬২
মনে মনে ৩৬৩
বিগত বসন্তে ৩৬৪
আশা করি অনেক কিছু ৩৬৫
সমিল স্বচ্ছন্দ কবিতার খ্যাতির প্রশংসায় ৩৬৬
আমরা কথা বলছি ৩৬৭
খুব বেড়িয়ে ফিরি ৩৬৮
কয়েকটি করে গান শুনা ৩৬৯
যদিও সন্ধ্যা মেঘে ৩৭০

সুমহান কথাগুলি -- -- -- ৩৭১
ফিরে চাই -- -- -- ৩৭২
গল্প বলার আসর -- -- -- ৩৭৩
শীতের সময়ের জন্য -- -- ৩৭৪
প্রথম কথা -- -- -- ৩৭৫
সামনের দিকে -- -- -- ৩৭৬
কাছেই কোনখানে -- -- -- ৩৭৮
কি আশ্চর্য -- -- -- ৩৮০
জনান্তিকে নয়ারূপে -- -- -- ৩৮১
লিখছি হাঁ কতদিন হলো ইতিমধ্যে -- -- ৩৮২
আমি চাই স্তিমিত হয়ে গিয়ে -- -- ৩৮৪

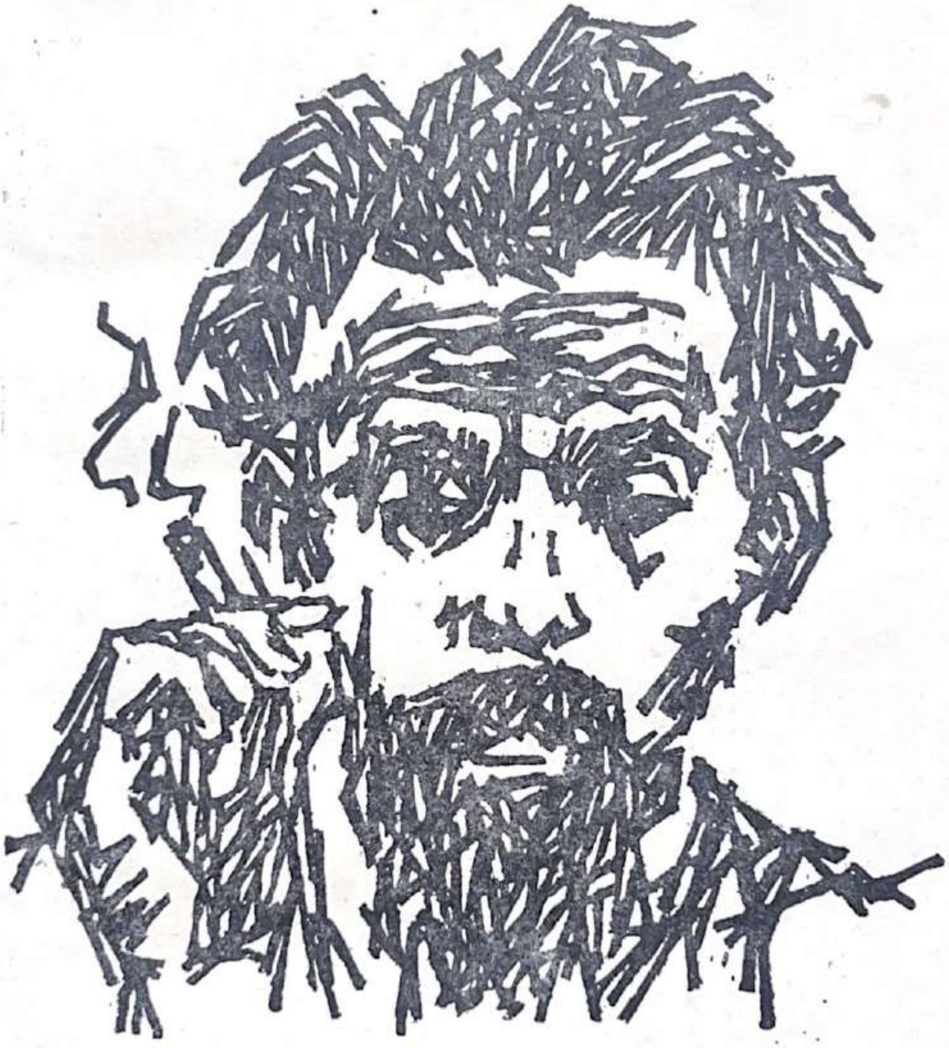

শহীদ সাবের

জন্ম : ১৮-১২-১৯৩০ মৃত্যু : ৩১-৩-১৯৭১

জীবনে জীবন সৃষ্টি

প্রথম ভাগ

১৯৩০ সাল।

আগুনঝরা চট্টগ্রাম।

সূর্যসেনের শাণিত দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করে স্বাধীনতার সূর্য।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্লাবনে তখন সারা ভারতের মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছে। অন্যদিকে সমুদ্রের উত্তাল আবেগ বুকে নিয়ে সমুদ্রকন্যা চট্টলার বিপ্লবী সন্তানরা গোপনে আয়োজন করছিল সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের। দু'টো ঘটনার মধ্যে অদ্ভুত যোগসাজস ছিল। ছিল প্রচণ্ড প্রাণাবেগ। লক্ষ্য ছিল এক—বন্দী ভারতের স্বাধীনতা।

অবশ্য "...প্রধান বিপ্লবী নেতারা কখনও ভাবেননি যে, নিজেদের শক্তি বলে চট্টগ্রামকে বৃটিশ কবল মুক্ত করার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার কঠোর সংগ্রামে বিরাট এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্যই সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এই আয়োজন করেছিল।"[১]

বিপ্লবীদের এই চিন্তাকে কেন্দ্র করে ঘটনার ডামাডোলে জ্বলছিল চট্টগ্রাম। জ্বলছিল দাউ দাউ করে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের বুকে সূর্যসেনের নেতৃত্বে ইতিহাসের মহাযজ্ঞের এক ছোট অধ্যায় রচিত হয়।

ঘটনা এগিয়ে যায়।

চট্টগ্রামের বাতাসে মিশে থাকে বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ। আর সেই স্ফুলিঙ্গের ছোট একটি কণা বুকে নিয়ে জন্মেছিল এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ্। সংক্ষেপে শহীদ সাবের। কক্সবাজারের অখ্যাত গ্রাম ঈদগাঁর ১৮ই ডিসেম্বরের এক শীতার্ত দিন তার সাক্ষী। ১৯৩০ সালের সেই বিস্ফোরণের আগুন শহীদ সাবেরকে স্পর্শ করেনি ঠিক কিন্তু সময়ের গতি তাকে চিহ্নিত করেছিল এক ব্যতিক্রমী প্রতীক হিসেবে। ঈদগাঁর শান্ত অনাবিল গ্রামীণ জীবনের নারকেলী-হাওয়ার সন্ধ্যায় সূর্যসেন তখন কিংবদন্তীর নায়ক। মা'র ঘুম-পাড়ানিয়া গানের কণ্ঠে ভেসে আসে বুলেটের শব্দ। বারুদের গন্ধ। তিরিশের ঘটনা ও শহীদ সাবেরের জন্মলগ্ন এ সময়টা তার জীবনের দিকদর্শন ইশারা। নইলে শহীদ সাবের আরো দশজন সাধারণ মানুষের মত বৃহৎ জনারণ্যে হারিয়ে যেতো।

---

[১] স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম: পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃঃ ১০৩।

সময় বয়ে যায়।

বাবা সালামতউল্লাহ্ চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন জায়গায়। কখনো দার্জিলিং। কখনো কোলকাতা। শহীদ সাবের নানার বাড়ীতে মা'র স্নেহছায়ায় বড় হতে লাগলো। নানা ছিল জমিদার। মা শফিকা খাতুন তার একমাত্র কন্যা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারী রক্তের বাহক শফিকা খাতুন এবং সাধারণ পরিবারের সন্তান সালামতউল্লাহ্র মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র গড়ে উঠল না। একটা কাল্পনিক অহমিকবোধ শফিকা খাতুনকে সরিয়ে দিল সালামতউল্লাহ্'র কাছথেকে। চাকরীর খাতিরে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরতে লাগলেন সালামতউল্লাহ্। শফিকা খাতুন রয়ে গেলেন ঈদগাঁর জমিদার বাড়ীর নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সালামতউল্লাহ্র সঙ্গে দেশ দেশান্তরে ঘুরতে রাজী ছিলেন না তিনি। বাবার বাড়ীর মোহ তাকে যাদু করেছিল। শহীদ সাবেরের নিজের রচনাতেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাই : "সরকারী দফতরে চাকরী করতেন বাবা। ছুটি হলেই চলে আসতেন সোনাপুকুর গ্রামে, মায়ের কাছে। মায়ের নিজস্ব একটা বাড়ী ছিল মামাদের লাগালাগি। তাতেই আমরা থাকতাম। মাঝে মাঝে তিনি যখন আসতেন সঙ্গে নিয়ে আসতেন সওদার পাহাড়। মা তাঁর জন্মস্থান ছেড়ে শহরে যেতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে বাবা জোর করতেন। কিন্তু মায়ের করুণ চোখ ছলছলিয়ে উঠতো, বাবা নিরস্ত হতেন।" সুতরাং নানার বাড়ীতে মা'র আশ্রয়েই শহীদ সাবেরের নিজস্ব জগত গড়ে উঠতে লাগলো।

ঈদগাঁর প্রাইমারী স্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু। বাড়ীর আরো অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে গড়িয়ে যেতে লাগলো শহীদ সাবেরের দিন। কোনদিন ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারতোনা সাবের। একজন মাস্টার ছিল বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য। সাবেরকে তাড়াতাড়ি উঠাবার জন্য তিনি নানারকম ফন্দী করতেন। বলতেন, আজ ভোরবেলা যে সবার আগে উঠতে পারবে সে একটা মজার জিনিস পাবে? লজেন্স, বিস্কিট, মিষ্টি এমনি ধরনের ছোটখাটো জিনিস তিনি ওদের দিতেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এ প্রলোভনের লোভে কোনদিন পা দেয়নি সাবের। যা ছিল তার চরিত্রের মজ্জাগত সে ধাতুকে সে লালন করেছে সযত্নে। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েও ঘুম থেকে সকালে উঠতে সে পারতো না। আর এ জন্য তার কোন ক্ষোভ বা লজ্জা ছিল না।

বাচ্চাদের সামনে সাবের বলতো, ঘুম থেকে আগে উঠলে কি হবে পড়ার সময় তোরা কেউ আমার সঙ্গে পারবি না।

শৈশবের এ দিনগুলোকে স্মরণ করে শহীদ সাবের তার রচনায় লিখেছেন, "আমার জীবনের দশটা বছর কেটেছে এই গ্রামে। জীবনের দশটা বছর কেটেছে বড় কম কথা নয়। আর সেই দশ বছর যদি হয় শৈশব ও কৈশরের সব চাইতে মনোরম দিনগুলির সমষ্টি তবে ভুলবার নয় তা। কত ঘটনা, কত ছবি আমার

কৈশোর মনের কোমল পর্দায় সেই যে আঁকা হয়ে আছে, তা আর মুছে যায়নি। ছবিগুলো এক এক করে এখন হয়তো আলাদা করতে পারি না। কিন্তু সবটা মিলিয়ে যে অখণ্ড স্মৃতি-চিত্র আমার স্মরণে খচিত হয়ে আছে তা দিয়ে রচনা করা চলে একটি বৃহৎ জীবনকাব্য।"

ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব শান্ত ছিল সাবের। দামাল ছেলের দুরন্ততা তার মধ্যে ছিল না। ঘুড়ি, লাটাই, গুলতি আর ডাঙ্গুলি খেলার দিনেও তাই তার সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। এই চঞ্চলতার বাইরেও অন্য কিছু খুঁজে পেতে চাইছিলো সাবের। ঈদগাঁর শান্ত স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির মত একটা স্থিরতা ছিল তার মজ্জাগত। আর স্বাভাবিক কারণেই আবেগের বাহুল্য এবং ভাবপ্রবণতাই ছিল তার চরিত্রের মূল। এবং পরবর্তী জীবনে এ ধাতুগুলো তার মানসিক ভারসাম্যকে যে টলিয়ে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ঈদগাঁর প্রাইমারী স্কুলে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়ে কুন্দুস মামার সঙ্গে সাবের কোলকাতা এলো। আজমীর যাবার পথে মামা তাকে কোলকাতা নামিয়ে দিয়ে যায়।

শফিকা খাতুনের নিস্পৃহতা অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক সালামত-উল্লাহ্ সাহেব আবার বিয়ে করেন। বাবা ও মা'র পারিবারিক জীবনের উত্তাপ তার ভাগ্যে ছিল না। ১৯৩৭ সালে সালামতউল্লাহ্ সাহেব আবার বিয়ে করেন। তখন তিনি কোলকাতায় ২৬, ব্রাইট স্ট্রীট, পার্কসার্কাসে থাকতেন। মা শফিকা খাতুন রয়ে গেলেন ঈদগাঁয়ে। শহীদ সাবেরের বয়স তখন সাত। তার পাঁচ বছরের ছোটভাই সাইফুল্লাহ্‌র বয়স তখন দুই।

বাবার দ্বিতীয় বিয়ে শহীদ সাবেরের জীবনের রঙ বদলিয়ে দিল। পারিবারিক দিক থেকে যে জীবনটা গড়ে উঠতে পারতো প্রশস্ত রাজপথের মত সোজা সহজ সেটা হোল আঁকা বাঁকা। ইচ্ছে করে কে যেন পথ থেকে মেঠো পথে নামিয়ে দিল। সাত বছরের শহীদ সাবেরের জীবনের বাস্তব রূঢ়তা এক দীর্ঘসূত্রী বেপথু মানসিকতার জন্ম দেয়। মাতৃহৃদয়ের ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে দুর্বল করে তোলে। সমগ্র জীবনব্যাপী ভালবাসার এ শব্দময় ইচ্ছে তাকে বারবার বহুবার কাঙাল করেছে।

কোলকাতার ২৬, ব্রাইট স্ট্রীট, পার্কসার্কাসে শহীদ সাবেরের দিনগুলো ঝড়ো দিনের মত বয়ে যেতে লাগলো। কোলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হোল সাবের। সেখানে সে ছিল সেকেণ্ড বয়। স্কুল জীবন থেকেই সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সংগঠনের দিকে ঝোঁক ছিল অপরিসীম। 'ছোটদের আসর' ও 'কিশোর সংঘ' নামে ছেলেদের দু'টো সংস্থা ছিল পার্কসার্কাসের বালুহক্কাক লেনে। 'ছোটদের আসরে'র লাইব্রেরী ছিল কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস রোডে। শহীদ সাবের ছিল লাইব্রেরীয়ান। ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি প্রভৃতি বইও তখন সে লাইব্রেরীতে ছিল। সময় ছিল ১৯৪০-এর পরবর্তীকাল। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের ধাক্কা এসে লেগেছে কোলকাতাতেও। আর তারই মধ্য দিয়ে কিশোর সাবেরের মানসিকতা দানা বেঁধে উঠছে। তার রাজনৈতিক সচেতনতা নির্দিষ্ট খাতে বইতে শুরু করেছে। 'কিশোর সংঘ' ছিল পার্কসার্কাসের কিশোর ছেলেদের প্রাণ। ছেলেরা প্রায়ই বিতর্ক অনুষ্ঠান করতো। আলোচনা সভায় বসতো। এ সংঘ 'ছন্দশিখা' নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের করতো। সম্পাদনা করতো শহীদ সাবের। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আতাহার আহমদ ছিল এ সংঘের একজন। ঔপনিবেসিক রশীদ করীম এ সংঘের উপদেষ্টা ছিলেন। আর এ পরিবেশের মধ্যেই কিশোর সাহিত্যিক শহীদ সাবেরের জন্ম। 'ছন্দশিখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন। সাবেরের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের প্রথম ধাপের প্রথম সিঁড়ি হিসেবে 'ছন্দশিখা' পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কাউকে সামনে পেলে বিশেষ করে বন্ধুবান্ধবদের সামনে পেলে তাকে ধরে কবিতা শোনাবার প্রবণতা ছিল প্রবল। ফুটবল খেলার ঘোর উত্তেজনার মুহূর্তেও সে পকেট থেকে লম্বা কবিতা বের করে বন্ধুদের শোনাতে চাইত। অনেক সময় বন্ধুরা কাগজটা টেনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় শহীদ সাবেরের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। সে সময় 'দৈনিক ইত্তেহাদ' সম্পাদনা করতেন আবুল মনসুর আহমদ। সাহিত্য বিভাগ দেখতেন আহসান হাবীব। উক্ত পত্রিকা অফিসেই হাবীব সাহেবের সঙ্গে শহীদ সাবেরের প্রথম পরিচয়। সাবের তখন স্কুলের ছাত্র। দৈনিক ইত্তেহাদে তার একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। হাবীব সাহেব বলেন, 'অমন সম্প্রতিভ ছেলে আমার চোখে পড়েনি। বয়সের তুলনায় তার মানসিক পরিপক্কতা ছিল অনেক বেশী।'

শহীদ সাবেরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন ফউজুল করিম। দশ বছর বয়স থেকে তাদের বন্ধুত্ব। স্কুল জীবনে তা আরো নিবিড় হয়। করিম সাহেবের সঙ্গে যখন সাবেরের প্রথম পরিচয় তখন তিনি মনে করেছিলেন সে বুঝি ঐ বাড়ীর চাকর। নোংরা ময়লা কাপড়চোপড়, উসকুখুসকো চুল, আল হলদে দাঁতের সারি সম্বলিত চেহারায় তিনি তাকে এর বেশী কিছু ভাবতে পারেননি। নোংরা থাকার প্রবণতা ছিল তার মজ্জাগত। এর মাঝেও মাঝে মাঝে অদ্ভুত আচার আচরণ করতো। করিম সাহেব স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বলেন, "কখনো কখনো হঠাৎ ওর মনে হোত ও আজ একটু আনন্দ করবে। ব্যাস যেই কথা সেই কাজ। নিজেকে সুন্দর করে তোলার প্রবল আগ্রহে বাক্সের তল থেকে বহুদিনের পুরনো হলুদ রঙের কোট টেনে বের করে পরতো। ইস্ত্রিবিহীন কুঁচকে যাওয়া সে কোটের চেহারা দেখলে যে কেউই হাসতো। মাথায় তেল দিতো চুপচুপে করে। অন্য কেউ যে এ পোশাকে ওকে দেখে হাসছে তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বরং নিজে নিজে ভেবে আনন্দ পেতো যে আজ একটু ভালো কাপড় পরেছে। আমাদের হাসি-ঠাট্টার মাঝে ও ছিল নির্বিকার। তারপর চারআনার টিকেট কেটে চলে

যেতো পার্কলো হাউসে অথবা নূরমহল সিনেমা হলে। একদম সামনের সারিতে বসতো। আসলে আমার মনে হয় নিজের সম্পর্কে একটা অযত্ন অনীহা ওকে বীতশ্রদ্ধ করে রাখতো।"

পাড়ার রকে বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই ক্যারাম খেলতে বসতো। সব সময় ছোট বোন একটা কোলে কোলে রাখতে হোত। আর মজার ব্যাপার এই যে খেলা আরম্ভ হলেই বোনটি কাঁদতে আরম্ভ করতো। তখনই উঠে যেতে হোত খেলা ছেড়ে। ভালভাবে খেলতেও পারতো না। যে বয়সটা থাকে অবাধ মুক্ত স্বাধীনতায় ভরা নিজস্ব জগতের জন্য সে বয়সটা শহীদ সাবেরের জন্য বয়ে এনেছিল একটা গুমোট বদ্ধতা। এজন্যই খোলামেলা মুক্ত জীবনের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড।

বাবা সালামতউল্লাহ্ সম্পর্কে শহীদ সাবেরের বিশেষ কোন সুস্থ কোমল অনুভূতি ছিল না। নিজের মা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও বাবার আর একটি বিবাহ তাকে পারিবারিক জীবনের সুস্থতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। সব সময় মনে করতো সে বুঝি অবহেলিত হচ্ছে। তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। কোন স্নেহব্যাকুল দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে না। তারজন্য ভালবাসার উত্তাপ কারো হৃদয়ে সঞ্চিত নেই। ফাউজুল করিম সাহেবের কাছে প্রায়ই ফেলে আসা শৈশবের কথা বলতো। নিজের মা সম্পর্কে দুঃখ করতো। আর নিজের মনে ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকতো। কোনদিন পিতার কাছে আব্দার করে কোন জিনিস চাইতে পারেনি। সৎ-মার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সৎ-মা সম্পর্কে তার কোন অভিযোগ ছিল না। তবুও শহীদ সাবের বিষণ্ন হয়ে যেতো। নোংরা ময়লা পোশাকে নিজের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা পোষণ করতো এবং পারিপার্শ্বিক জগৎটাকে উপেক্ষা করার প্রবল বাসনায় ছটফট করতো। জীবনের স্বাভাবিক সঙ্গতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না। একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য যে normal natural healthy growth আমরা বুঝি শহীদ সাবেরের তা হয়নি। পঙ্গু বিকলাঙ্গ মানসিকতা ভিন্নখাতে প্রবাহিত জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বামপন্থী রাজনীতির স্বপ্ন তাকে আন্দোলিত করেছিলো। জীবনের ভিন্নক্ষেত্র আবিষ্কারে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সাবের চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয় এবং সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে। ঐ একই সময় সে মুকুল-ফৌজ আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে একটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর হিসেবে সাবের চট্টগ্রামে দ্রুত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার লেখার ক্ষমতা, অনায়াস বক্তৃতার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা জনপ্রিয়তার প্রথম সোপান ছিল। মুকুল মহফিলের নামকরা লেখক ছিল শহীদ সাবের। স্বাস্থ্য খারাপ থাকার দরুণ লেখাধুলার প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল না। বরং বিমুখ ছিল বলতে হবে। আর স্বভাবত কারণেই রাজনীতি আর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল তার বিচরণের প্রধান ক্ষেত্র। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে মুকুলফৌজ থেকে বেরিয়ে আসে সাবের।

ঐ সময় সে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের প্রথম বর্ষ আই, এ-র ছাত্র। রাজনীতির যে সংগঠনে সাবের যোগদান করে তার নাম ছিল ছাত্র ফেডারেশন। এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলে আমরা শহীদ সাবেরের মানসিকতা অনুধাবন করতে পারব।

"পূর্ব বাঙলার একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিলো 'ছাত্র ফেডারেশন।' কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে কমিউনিস্ট পার্টীর ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে মুসলমান ছাত্ররা সাধারণভাবে তার সাথে জড়িত হওয়ার বিরোধী ছিলো।"২

"ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্র অসম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও একমাত্র ছাত্র ফেডারেশন ছাড়া এই পর্যায়ে অন্য কোন অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও নানা গনতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশন এই সময়ে অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলেও সুবিধাবাদী ছাত্র নেতৃত্ব এবং ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারের জন্য তার সাফল্য ছিল খুবই সীমিত।"৩

পরবর্তীকালে ঢাকা, সিলেট প্রভৃতি স্থানে প্রতিক্রিয়াশীলরা গুণ্ডা লেলিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের সভা পণ্ড করে দেয়। কেননা "ছাত্র ফেডারেশন খুব সক্রিয় না হলেও সেই জাতীয় একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার এবং সহ্য করতে প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রস্তুত ছিল না। এজন্য তাদের ওপর সে সময় প্রায়ই নানা প্রকার হামলা হতে দেখা যেতো।"৪

রাজনৈতিক দিক থেকে শহীদ সাবের যে চিন্তার বাহক ছিলো ছাত্র ফেডারেশনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মনের সে ধর্ম উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে অসাম্প্রদায়িকতা অন্যদিকে প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ মানুষ শহীদ সাবেরকে চিহ্নিত করে। তার চরিত্র ও মননের স্বচ্ছতা মুক্তবুদ্ধির পরিচয়বাহী।

অন্যদিকে এই একই সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। মুসলীম লীগ সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে শুরু করেছে। ১৯৪৮-এ শুরু হলেও ১৯৫০ সাল থেকে কমুনিস্ট পার্টীর কর্মীদের মারধোর ব্যাপকতা লাভ করে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ সরকার তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে শুরু হয়েছে পঞ্চাশের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর তারই ফলে বাস্তুত্যাগের হিড়িক। মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির বদৌলতে বন্দী হোল প্রগতিশীল চিন্তার বাহক শহীদ সাবের। সেটা ছিল ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। সাবের তখন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে প্রথম বর্ষ আই, এ-র ছাত্র। চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল জেলে শহীদ সাবের বুকে বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষার পাখি

২, ৩, ৪. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর
পৃ: ১৯০, ১৯২, ১৯৩

পুষে বন্দী দিন কাটাতে লাগলো। কয়েকমাস পর তাকে চট্টগ্রাম থেকে বদলী করে দেয়া হয় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে।

সময়ের গতি প্রবাহিত হয়ে যায়।

"একদিকে যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যুদয় পূর্ব বাঙলার মুসলিম লীগ রাজনীতির ভারসাম্যকে টলিয়ে দিল, অন্যদিকে তেমনি ১৯৫১ সালের মধ্যে মুসলিম ছাত্র লীগের একচেটিয়া প্রভুত্বকে খর্ব করে ঢাকাসহ পূর্ব বাঙলার প্রায় সকল জেলায় সংগঠিত হোল নতুন গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র ও যুব সংগঠন।...মুসলিম লীগ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই নবগঠিত ছাত্র ও যুব সংগঠন রুখে দাঁড়াল। ...সমগ্র পূর্ব বাঙলা তখন সত্যিই এক বিস্ফোরণের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দিকে দারুণ খাদ্য-সংকট।...লবণের সের ষোল টাকা। এই লবণ সংকট এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, সমগ্র পূর্ব বাঙলায় অসংখ্য সভা সমিতি মিছিলে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। লবণ সংকট অবসানের দাবী পূর্ব বাংলার জাতীয় দাবী হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব সমাজের সকল স্তরের মানুষ একটা অর্থনৈতিক সংকটকে ভিত্তি করে এই বোধহয় সর্বপ্রথম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ...এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের মৌলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকার জনসভায় পুনর্বার ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অর্থনৈতিক সংকটের মুখে আত্মিক সংকটের এই ঘোষণায় জ্বলে উঠলো সমগ্র পূর্ব বাঙলা। 'সর্বদলীয় ভাষা কমিটি'র নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সভা-সমিতি-ধর্মঘট পালিত হোল সারা দেশ জুড়ে। তারপর এলো সেই ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন রক্তের অক্ষরে ঢাকা তথা পূর্ব বাঙলার শহর-নগর-গঞ্জ আর গ্রামে লেখা হোল এক নতুন ইতিহাস।"[৫]

শহীদ সাবের তখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। কারা প্রাচীরের পাথুরে দেয়াল ভেদ করে প্রাণের গতিবেগ ঢেউ জাগায় বন্দী শিবিরে শিবিরে।

'৪৭ থেকে '৫২-র চার বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্থা সব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা চলছিল। অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টিকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হোল না। কেননা মুসলিম লীগ সরকার জানতো বিরোধী দল গড়ে উঠতে দিলে তাদের একতরফা শাসন-শোষণ ব্যাহত হবে এবং গণপ্রতিনিধির সাহায্যে দেশ চালাবার জন্য তারা জোর দাবী জানাবে। লিয়াকত আলী খান সরবে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানে তিনি কোনো বিরোধীদল সহ্য করবেন না। মানুষের আশাভরসা সব জলাঞ্জলি দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি পত্তন করা হোল

---

৫. আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ—ধনঞ্জয় দাস, পৃঃ ৩৬-৩৭

এ কয় বছরে। ৯৫৫৪-তে এলো সাধারণ নির্বাচন। অথচ এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল ১৯৫১ সালে।

"The general election due in 1951 was postponed to 1952 by a clever interpretation of law arising out of independence. In 1952 Nurul Amin again got the general election postponed until 1953 by an act of parliament. Thousands of young political workers and students were put in jail under the security Act before the general election."[৬]

কিন্তু এতো ষড়যন্ত্রের মাঝ দিয়েও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোল। এবং স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমলীগ সরকার বিরোধী দলগুলোর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখে ধ্বসে পড়লো।

ঐ একই বৎসরে নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালে শহীদ সাবের ছাড়া পেলো জেল থেকে। চার বৎসর বিনা বিচারে তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছিল। ছেড়েও দেয়া হোল কোন রকম বিচার না কর। দেশের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন তাঁকে আলোড়িত করেছিল প্রবলভাবে। ১৯৫১ সালে সাবের রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে আই, এ পাশ করে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সাবের উৎসাহিত হচ্ছিল যতটুকু, তার চেয়েও বেশি হচ্ছিল হতাশ। হচ্ছিল নিরাশ।

দেশ বিভাগের পর তার মনে স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। ভেবেছিল, এ স্বাধীনতা শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতায় নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এ স্বাধীনতা বয়ে আনবে জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ। কিন্তু হিসেবের চালে ভুল করলো সাবের। দেখল শুধু ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে মাত্র। অনুভব করলো এ শুধু রেকর্ডের এপিঠ ওপিঠ। পরিবর্তন নেই কোথাও। মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও নির্যাতন নিপীড়ন তার স্বপ্ন ভঙ্গের আয়োজন করলো। ফউজুল করিম সাহেব বলেন, "একটা সুস্পষ্ট ছবি ছিল সাবেরের মনে। ও ভাবতো, সমগ্র দেশ জুড়ে একটা সুখী হাওয়া বইবে। ব্যক্তিগত মালিকানার ঊর্ধ্বে দেশ শিল্পায়িত হবে। বাচ্চাদের জন্য পার্ক থাকবে। ছেলেদের জন্য চমৎকার স্কুল থাকবে। সাধারণ মানুষ পাবে ন্যায্য অধিকার। পূর্ণ মর্যাদা। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্ল্যান করে নতুনন বাড়ি করার মত দেশ সম্পর্কে তারও একটা প্ল্যান ছিলো। ছিল অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল স্বপ্ন সম্ভাবনা।"

কিন্তু ১৯৫০ সালে জেলে যাবার পর থেকে তার মানসিকতায় ভাঙন ধরে। এ ধরনের অবিচার অত্যাচার তাকে পীড়িত করে। সাবেরের দৃষ্টি সংকুচিত হতে থাকে। অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ মনটি ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া করতে থাকে। অস্থির যন্ত্রণা তাকে ভাবিয়ে তোলে। জীবনের কোথাও কোন সঙ্গতি খুঁজে পায়না

---

[৬] The Social History of East Pakistan : Kamoruddin Ahmad

শহীদ সাবের। অথচ এ পরিবেশেই সাহিত্যিক শহীদ সাবেরের প্রতিভার স্ফুলিঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে। চট্টগ্রাম জেলে বসে রচনা করে তাঁর বিখ্যাত রচনা "আরেক দুনিয়া থেকে।" তার বন্দী জীবনের ওপর রচিত হয়েছিল যে লেখা। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় এ লেখা ছাপা হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন 'নতুন সাহিত্য' সম্পাদককে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ প্রতিভাময় তরুণ সাহিত্যিকের সাহিত্য জগতে শুভ আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এরপর থেকেই কবি এবং গাল্পিক শহীদ সাবেরের বলিষ্ঠ যাত্রা শুরু।

জেল থেকে বেরিয়ে জগন্নাথ কলেজের নৈশ বিভাগে বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হয় সাবের। ১৯৫৫ সালে বি, এ, পাশ করে।

শহীদ সাবেরের রাজনৈতিক সচেতনতা যে পথ পরিক্রমায় তৎপর হয়ে উঠেছিল সে আদর্শকে সে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। কেননা পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক হতাশা তাকে আক্রান্ত করছিলো বড় নিষ্ঠুরভাবে। চার বৎসরের বিনা বিচারের জেল জীবন তার স্নায়ুকে শোষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। উপরন্তু, জেল জীবনের বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগতো ছিলই। ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে ৪৩ জন রাজবন্দীর আমরণ অনশনের ওপর এক ইস্তেহার প্রকাশ করেছিল ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা। পরবর্তীকালে এ একই ব্যাপার শহীদ সাবেরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছিল।

"আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাহারা জীবনের সর্বস্ব পণ করিয়া অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত জনতার ন্যায্য সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাহাদের অপরাধ (?)। তাহারা সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার দালাল জতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, জমিদার, জোতদার, চোরাকারবারীর স্বৈরাচার, মুনাফা লুণ্ঠন ও দুর্নীতি হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন এবং সুখী জীবন গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই জন্যই বছরের পর বছর তাঁহার বিনা বিচারে কয়েদখানায় পচিতেছেন। জেলখানার মধ্যে বৃটিশ শাসকগণও রাজবন্দীদের যে সুযোগ সুবিধা দিয়াছিল ফ্যাসিস্ট পাকিস্তান সরকার তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।"

এ হেন দমন নীতির প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে সাবেরের আদর্শগত গুণাবলীর ভিত্তি। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যে হলাহল উঠেছিল তা পান করে নীলকণ্ঠ হতে পারেনি শহীদ সাবের। স্বাধীন এবং সুখীজীবন গড়ার স্বপ্ন সাবেরের মন থেকে ধোঁয়ার মত উড়ে উড়ে যাচ্ছিল।

ফ্রাসট্রেশন। হতাশা। নৈরাশ্য।

এ বোধগুলো ধীরে ধীরে শহীদ সাবেরের মগজের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। কর্মময় জীবনের শ্লোগানে শ্লোগানে যে জীবনটা হতে পারতো কর্মবহুল আস্তে আস্তে তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। একটা আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করতে গিয়ে দুর্বলতা ক্রমে

তাকে গ্রাস করে। মনে হয় ব্যাপককে ধারণ করার ক্ষমতা তার ছিলনা। নইলে যে সচেতনতা তাকে কৈশোরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগাচ্ছিল তার মধ্যে ভাঙন এলো কোন পথে ? একি তার চরিত্রগত দুর্বলতা ? নাকি পারিপার্শ্বিক জীবনের চাপ ? কার কাছে সে নতি স্বীকার করলো ? মনে হয় দু'টোই। সব মিলিয়ে তার মনে এক সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের জন্ম হয়।

অথচ জেলে আটক থাকাকালে বাবার অজস্র অনুরোধেও বন্ড সই করে বেরিয়ে আসতে রাজী হয়নি সাবের। নিজের বৃদ্ধ বয়সের দোহাই দিয়ে, ছেলেমেয়েদের দোহাই দিয়, সাংসারিক অভব অনটনের নাকি কান্না কেঁদেও সালামতউল্লাহ্ সাহেব তাকে টলাতে পারেনি। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেনি শহীদ সাবের। নির্ধারিত ছকে হিসেব করেই পা ফেলছিল।

কিন্তু ছাড়া পাবার পর থেকেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলো সাবের। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন টালমাটাল। ইচ্ছেমত কাজ করতে গেলে করা যায়না। সামাজিক বেড়াগুলো পায়ে এসে জড়িয়ে পড়ে। শাসক গোষ্ঠীর রক্তচক্ষু মাথার ওপর খড়্গ হয়ে ঝোলে। অথচ সামান্যতম সমস্যা সমাধানে অক্ষম এ সরকার। বুলেট, লাঠি আর ক্ষুধা ছাড়া জনগণকে বিন্দুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য দিতেও অপারগ তারা। তাই সঙ্গত করণেই নিজের সঙ্গে আপোষ করতে হোল তাকে। আপোষ করতে হোল নীতি বোধগুলোর টুটি চেপে ধরে। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলো সাবের। বাবা তখন রিটায়ার করেছে। সাংসারিক দায়িত্ব অনেক।

কিছুদিন ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরী করার পর দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক হয়ে যোগদান করে সাবের। এ সময় প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'এক টুকরো মেঘ।' সাবের সংবাদের সাহিত্য বিভাগও দেখতো। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শাণিত মননের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সম্পাদকীয় লেখার মধ্যে উপস্থাপনার কৌশল এবং প্রকাশভঙ্গীর মুন্সীয়ানা ছিল মনোরম। ফউজুল করীম সাহেব বলেন, 'ওর লেখা সম্পাদকীয় পড়লে মনে হোত ও যে বিষয়ে লিখছে সে বিষয়ের ওপরই ও মাস্টার। ঐ বিষয়ে ওর দক্ষতার দখল হৃদয়কে চমৎকৃত করতো।'

অথচ কর্মময় জীবন শহীদ সাবেরের খুব বেশী নয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮। মাত্র চার বৎসর। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় তার ছোটদের জন্য লেখা গ্রন্থ "ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান।"

শহীদ সাবেরের রাজনৈতিক এবং পারিবারিক জীবনের টানা-পোড়েনের মধ্যে নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়-প্রেম। এ সময় সাবের জনৈক মহিলার প্রেমে পড়ে। প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে তার মধ্যে দ্বিধা ছিল যথেষ্ট। একটা হীনমন্যতাবোধ তাকে আড়ষ্ট করে রাখতো। যে কারণে কখনো সহজ হতে পারতো না। অবশ্য এ আড়ষ্টতা তার কেবল হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি প্রকাশের ক্ষেত্রেই ছিল। অন্যত্র নয়। কেননা রাজনৈতিক চেতনায়, সাহিত্যিক প্রকাশে কিংবা বক্তৃতা করার সময় তার

সহজাত প্রবণতায় স্বয়ঃস্ফূর্ততা ছিল। নিজের সম্পর্কে ভাবতো নিজে বুঝি দেখতে সুন্দর নয়। ফলে স্বভাবতঃই তার মনে হোত মেয়েরা তাকে খুব একটা পছন্দ করছেনা। ফউজুল করীম সাহেব বলেন, 'মনের মধ্যে বিবিধ ধরনের কমপ্লেক্সের ফলে তার ব্যবহারে অনেক সময় ব্যালান্স থাকতনা। ও নিজেই বুঝে উঠতে পারতনা ও কি করবে।'

ভালবাসার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখী হলেই গুটিয়ে যেতো নিজের মধ্যে। প্রকাশের অক্ষমতা বেড়াজাল হয়ে সব আবেগের পথ রোধ করে দাঁড়াত। আর তখনই হতাশা হৃদয় সমুদ্রে ডিপ্রেস্সনের সৃষ্টি করতো। দমে যেতো সাবের। তীব্র যন্ত্রণা মনকে অস্থির করে তুলতো।

চরিত্রগত দিক থেকে ভীষণ খাপছাড়া লোক ছিল সাবের। সাধারণ লোকের আইন কানুনের বাইরে ছিল তার আচার আচরণ। দাঁত মাজা, গোসল করা, ঠিকমত খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি প্রাত্যাহিকের ছোটখাটো নিয়মকানুনের কোন ধরাবাঁধা গন্ডী ছিল না শহীদ সাবেরের। ভেতরে ভেতরে সব সময় কিসের যেন একটা অভাব বোধ হোত। বুঝতো পারিবারিক জীবনের সংস্পর্শে না থাকলে তার চরিত্রের সংশোধন হবেনা। এই খাপছাড়া ভাবটা যাবেনা। এজন্য 'সংবাদ'-এ চাকুরী পাবার পর বাবা-মা-ভাইবোনকে নিয়ে এলো ঢাকায়। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতো, 'ইচ্ছে ছিল নিজের মাকে কাছে এনে রাখবার। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলনা।' পারিবারিক গন্ডীর চৌহদ্দীতে থেকে জীবনের যে সমতা আনতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাও তার জীবনে ফলপ্রসূ হয়নি।

রাজনীতি করাটা পরিবারের কেউই পছন্দ করতে পারেনি। বাবাতো এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে সব সময় একটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে তাকে। সাবেরের বন্ধুবান্ধবদের কাছে সালামতউল্লাহ্ সাহেব সব সময় বলতেন, সাবের আমাদেরকে এখানে ডেকে নিয়ে এসে এখন ঠিকমত খরচপত্র দেয়না। ইত্যাকার আরো নানা রকমের অভিযোগ। উপরন্ত ঐ একই কারণে মা'র সঙ্গেও খুব একটা ভাল সম্পর্ক যাচ্ছিলনা। তার ধারণা হচ্ছিল যে, মা বাবাকে তার সম্পর্কে বিষিয়ে তুলছে। এ সমস্ত নানা কারণে পারিবারিক জীবনের প্রতি তার একটা বিরূপ ধারণা জন্মে। যে স্নেহের কাঙাল হয়ে এক পারিবারিক পরিবেশে থাকতে চেয়েছিলো বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে মোহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হতাশা, নৈরাশ্যের এক সমুদ্র অন্ধকার গ্রাস করে তাকে। কোথায় সঙ্গতি? কোথায় স্বস্তি? নৈরাশ্যের প্রবল তাড়নে বিপর্যস্ত হয়ে যায় সাহিত্যিক শহীদ সাবেরের অনুভূতিপ্রবণ মন।

সংবাদ অফিসের টেলিফোনে নারী কন্ঠের সুরেলা শব্দ ভেসে আসে। উচ্ছ্বসিত হাসি কাঁপতে থাকে রহস্যের তরঙ্গ তুলে। শহীদ সাবেরের বন্ধু যারা সে কন্ঠ শুনেছেন তারা বলেন, 'অপূর্ব সে কন্ঠ। সে কন্ঠ শুনে কেউ প্রেমে

না পড়ে থাকতে পারে না।' সাবেরের জন্য আসতো নীল আঁখরের চিঠি। কিন্তু সে সমস্ত উপাদান কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বস্তি ও সুখের কারণ না হয়ে হয়েছিল যাতনার কারণ। কিছুদিন পরই মহিলার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে সাবের ফেডারেল ইনফরমেশন সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রথম স্থানও অধিকার করে। কিন্তু হলে কবে কি সমাজ বড় নির্মম। রাজনৈতিক বন্দী ছিলো বলে নিয়োগপত্র দেবার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত কেবল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। লালফিতার অন্তরালে হারিয়ে যায় শহীদ সাবেরের স্বপ্ন। কেননা তার বড় অপরাধ এই যে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। তার কাছে আবেদন জানানো হলে তিনি বললেন, আগামীকাল আপনার ব্যাপারে over rule করে নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশ প্রদান করবো।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই মার্শাল-ল জারী হয়।

হতাশ-নৈরাশ্য প্রভৃতি শব্দগুলো তখন বুকের তলে স্থায়ী পাখির বাসার মত গুটিয়ে থাকে। এর বাইরে আর কোন স্বস্তি নেই। সামরিক শাসন জারীর পর থেকেই শহীদ সাবেরের সামগ্রিক জীবনের ওপর ছায়া বিস্তার করে ঘনতমসা। যে কথা বলা যেতো মৃদু স্বরে এক বলিষ্ঠ থাবা এসে সে কণ্ঠের টুটি চেপে ধরলো।

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে সাবেরের মানসিক বৈকল্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ভেতরের এই প্রকৃতিগত পরিবর্তন নিজেও বোধহয় অনুধাবন করতে পারছিলো। "একদিন তিনি প্রথম অনুভব করলেন, তাঁর যেন কিছু গোলমাল ঠেকছে। একদিন গুলিস্তানের মোড়ে তাঁর বন্ধু শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীরকে প্রার জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তোমরা আমার কিছু করো। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।"৭

অস্থির চিত্ত তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকের কথা। সাবেরের মামাতো বোন থাকতেন তখন ময়মনসিংহে। দুলাভাই আবদুল হালিম ছিলেন ময়মনসিংহের এস. ডি. ও। নানার বাড়ি থাকার সময় ছোটবেলায় তারা একসঙ্গে বড় হয়েছেন।

তখন ছিল রোজার মাস। ভোররাতে সেহেরী খেতে উঠেছেন তারা। ঠিক সে সময় ভোর চারটায় ছোট্ট ব্যাগহাতে সাবের গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই বললো, 'জানো আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমার মাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মাকে খুব মনে পড়ছে। আমি মার কাছে যাব।'

কথাগুলো তাদের কাছে অনেকটা প্রলাপের মত মনে হয়েছিল। কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছিল শহীদ সাবেরের চেহারা।

---

৭. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : দৈনিক বাংলা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বোন তখন বললেন, ঠিক আছে মার কাছে তুমি যেও। এখন হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হও। রোজা রাখবে নাকি?

—না।

শহীদ সাবের বসে বসে সিগারেট খেলো। তারপর সামান্য খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সকালবেলা ব্যাগটা হাতে করে বোনকে বললো, আমি চলে যাচ্ছি।

বোন থাকার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করলো। কিন্তু কোন কথা শুনলনা। চলে গেলো। আর ফেরেনি। যে ঘরে শহীদ সাবের ছিলো সে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বোন দেখলেন ঘরের মেঝে পোড়া কাগজের ছাইয়ে ভর্তি হয়ে আছে। সেগুলো উলটিয়ে পালটিয়ে উনি দেখলেন অসংখ্য মেয়েলী হাতের লেখা চিঠি পুড়িয়েছে সাবের। আবদুল হালিম সাহেবের ডায়রী লেখার অভ্যাস ছিল। এ ঘটনাকে তিনি ডায়রীতে লিখে রেখেছিলেন। সেখান থেকে উঠিয়ে দিচ্ছি।

“২০শে মার্চ, ১৯৫৯।
১০ই রমজান

আজকে সেহরীর সময় কোন কথাবার্তা ছাড়াই হঠাৎ সাবের মিঞার ঢাকা থেকে আগমন। জানাল,—মায়ের কথা ভীষণ মনে পড়ছিল তাই বোনের কাছে ছুটে এসেছে। তবে মনে হয় সাবেরের কিছু একটা হয়েছে। সকাল থেকেই দরজা বন্ধ করে পড়ে ছিল। দরজা খুললে দেখা গেলো ঘরে প্রচুর ছাই। জিজ্ঞেস করলে জানাল, বাজে জিনিস পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। আধা পোড়ানো কয়েক টুকরা সেলিমের মা এনে দেখালে মনে হলো কাগজগুলো কোন চিঠি ছিল।

২২শে মার্চ, ১৯৫৯
১২ই রমজান

আজ অফিস থেকে এসে জানলাম, সাবের মিঞা চলে গেছে। সেলিমের মা জানাল, মায়ের গল্প করতে করতেই তাঁর ঈদগা যাওয়ার খেয়াল চাপলো, এবং তক্ষুণি সে বেরিয়ে গেছে" হঠাৎ এসে সাবের মিঞা হঠাৎ চলে গেলো, তাকে খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো না।”

মাঝে মাঝে কবি আহসান হাবীবের কাছে যেতো সাবের। অজস্র কথা বলতো। একই কথার পুনরাবৃত্তি করতো বেশি। আর বলতো, ‘আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো। আমার অস্থির লাগছে খুব।’

কবি আহসান হাবীব তখন ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স-এ চাকরী করতেন। একদিন তার কাছে এসে বললো, ‘আমাকে কিছু কাজ দিন। আমি কাজ করতে চাই।’

হাবীব সাহেব একটি ইংরেজী বিষয় অনুবাদ করতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ ও পেন্সিল দিয়ে তাকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। ঘন্টাখানেক পর খাতা পেন্সিল হাতে শহীদ সাবের এসে বললো, 'আমি পারছিনা। আমি কিছু লিখতে পারছি না।' হাবীব সাহেব দেখলেন খাতার শূন্য বুকে কেবল আঁকিবুঁকি কাটা। শহীদ সাবের চলে গেলো। ঘটনায় মনে হয় কাজ করার অসম্ভব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু করতে পারছেনা। প্রচন্ড আগ্রহ ও তাগিদ নিয়েও মনকে স্থির করতে পারছেনা। এটা তার অসুস্থতার লক্ষণ ছিল বললে ভুল করা হবে না।

প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে আমল দেয়নি। কেননা কিছুদিন আগেই তার প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থতা এসেছে। যে মহিলার সঙ্গে পরিচয় ছিল তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। বন্ধুরা তার মানসিক অস্থিরতাকে প্রেমের নিস্ফল পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু সবার সব চিন্তাভাবনাকে উপেক্ষা করে তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়তেই থাকে।

ফউজুল করীম সাহেব একদিন সংবাদ-এ কাজ করছিলেন। হঠাৎ শহীদ সাবের এসে বললো, জানিস ওরা আমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছে। ঐ দেখ আপিসের সামনে মিলিটারী ট্রাক এসে থামল। সংবাদ-এ আমি ঐদিন যে সম্পাদকীয়টা লিখেছিলাম তার জন্য আমাকে এ্যারেস্ট করবে।' আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়।

ফউজুল করীম সাহেব একদিন শুনলেন তার ঘরের জানালায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ হচ্ছে। রাত তখন অনেক। জানালা খুলে দেখলেন শহীদ সাবের। সাবের বললো, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে শোন ?

ফউজুল করীম সাহেব বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু শহীদ সাবের কিছুই বলতে পারলো না। কেবল আবোল তাবোল বকতে লাগলো। কোন কথাই পরিষ্কার নয়। বললো, তারা তুই রুবীকে দেখেছিস ? (রুবি তার সৎ-বোন) জানিস তারা (করিম সাহেবের ডাক নাম) মা না লোকের সঙ্গে রিক্সায় করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। এ ধরণের অসংলগ্ন কথাবার্তা তার অসুস্থতার লক্ষণকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয়।

আস্তে আস্তে পারিপার্শ্বিকের জাগ্রত পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলো শহীদ সাবের। জনারণ্যের মাঝে থেকেও এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসী হয়ে গেলো শহীদ সাবের। সুখী সমৃদ্ধ কল্পলোকের ভুবন গড়ে তোলা ছিল যার আদর্শ— সমাজের বেহিসেবী টালমাটাল স্রোতে হারিয়ে গেলো সে আদর্শের বাস্তব রূপায়ন।

সাংবাদিক ইউনিয়ন এগিয়ে এলো শহীদ সাবেরের চিকিৎসার জন্যে। পাবনা মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর সব রকম ব্যবস্থা হোল। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাবেরকে হাসপাতালে পাঠানোর সব দায়িত্ব পালন করলেন রোকনুজ্জামান খান

(দাদাভাই)। শহীদ সাবেরকে পাবনা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন বন্ধু ফউজুল করীম ও মন্টু খান। এর আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি সব পরীক্ষা করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন দাদাভাই। দাদাভাই বলেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে বসিয়ে রাখাই ছিল এক মহাসমস্যা। বেশি লোক দেখলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। কিছুতেই বসে থাকতে চাইতো না। তখন নানা মিথ্যা কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখতে হোত। পাবনা যাবার দিন অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে ট্রেনে তোলা হয়েছিল। পাবনায় পেঁছে করীম সাহেব ও শহীদ সাবের এক রিকসায় হাসপাতালে গেলো।

করিম সাহেব বললেন, দেখতো কি সুন্দর বিল্ডিং। তুই এখানে থাকবি।
শহীদ সাবের মুখ টিপে টিপে হাসে।
ভঙ্গীটা এই যেন প্রহসনেরও সীমা আছে।
মুখে বললো, খুব বলি এখানে আরামে থাকব না ?
তারপর হো হো করে হেসে উঠলো।
ভীষণ একটা বিদ্রুপাত্মক হাসি।

এর থেকে বোঝা যায় যে, নিজের চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে সে সচেতন। তাঁর এ বোধ পাগল অবস্থায় আগাগোড়া বজায় ছিল।

মানসিক হাসপাতালে তার চিকিৎসা ছিল Electric Shock 110 volt প্রতি সেকেন্ডে। মাসে একবার করে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা বেশ ভালো হয়েছিল এবং সাবের বেশ সুস্থ হচ্ছিল। হাসপাতালের এক হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনাও করতো। তিনমাস থাকার পর চলে এলো। সে সময়ে ডাক্তার বলেছিলো, "তাকে সব সময় কাজের মধ্যে রাখবেন। কোন কাজে নিয়োজিত না রাখলে অবস্থা আবার খারাপ হতে পারে।"

হাসপাতাল থেকে এসে বলতো, 'আমি ভালো হয়ে গেছি আমাকে কাজ করতে দাও। লিখতে দাও।'

এ অবস্থায়ও সাবের 'সংবাদ-এর জন্য বেশ কতগুলো সম্পাদকীয় লিখেছিলো। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেলো তার রচনায় কোন সঙ্গীত থাকছে না। শিথিল হয়ে যায় ভাবনার গ্রন্থিগুলো। ফলে এ সমস্ত কারণে কেউ তাকে আর কোন কাজ দিতে চাইত না। ডাক্তারের উপদেশ সত্ত্বেও তার জন্য সময় নষ্ট করার সময় কারো ছিল না। চেনা পৃথিবীর ব্যস্ত কোলাহলে হারিয়ে গেলো শহীদ সাবের। আবার সে পাগল বলে পরিচিত হয়ে উঠলো।

শহীদ সাবের এক ব্যতিক্রম। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মানসিক অসুস্থতা তার ছিল। কিন্তু বদ্ধ পাগলের পাগলামী ছিল না। এ অবস্থাতেও সাবের লিখছে। অসংখ্য কবিতা লিখেছে। চৈত্রের সূর্যের মত প্রখর দীপ্তি ঝলসে উঠেছে সে সমস্ত কবিতার অনেক লাইনে। চেনা মুখ চিনতে ভুল করেনি কখনো। অথচ পাশাপাশিভাবে চলাফেরা আচার আচরণে কি অদ্ভুত ব্যতিক্রম। একদিন দেখা গেলো

বঙ্গবন্ধু এভেন্যুর ডাস্টবিন্ থেকে নির্বিবাদে ময়লা খাবার তুলে খাচ্ছে। রাস্তা থেকে আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে টানছে। কখনো দেখা গেলো পেটিকোট পরিহিত অবস্থায়। কখনো শুধুমাত্র আন্ডারওয়ার। কি বলবেন আপনি শহীদ সাবেরকে ? কিভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন তাকে ?

তার বরাবরের একটা ক্ষোভ ছিল যে, কেউ তাকে ভালোবাসল না। কেউ তাকে পছন্দ করে কাছে টানল না। নিজেও সারাজীবন কোথাও আপোষ করেনি। আপোষহীন সেই অদ্ভূত কাঠিন্যময় চরিত্রের অন্তরালে কি যে আকাঙ্ক্ষা গুমরে মরছে ! পারিপার্শ্বিক জীবনকে উপেক্ষা করার এক প্রচণ্ড শক্তি তাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই শহীদ সাবের সুস্থ মানুষ। সংবাদ অফিসে যায়, দৈনিক বাংলা অফিসে যায়, প্রেস ক্লাবে যায়, সিনেমা দেখে, সিগারেট খায়, কবিতা লেখে। অথচ এর মাঝেও শহীদ সাবের আবার নেই। শহীদ সাবেরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকে পাওয়া যায় সে নিরাসক্ত। উদাসীন। সে সমাজ সংসার মানুষ কাউকে পরোয়া করেনা। সে সব কিছু উপেক্ষা করে নির্জন একাকীত্বে এক বৃত্ত রচনা করে রাখে। কেন এমন হয় ? আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতে কি আগুন জ্বলে উঠেছিল ? সে আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরেছে শহীদ সাবের। সে আগুন বুকে পুষে বারোটা বছর এ সমাজকে উপেক্ষা করেছে শহীদ সাবের। নীরব বিদ্রোহের এ স্ফুলিঙ্গ দগ্ধ করে মেরেছে শহীদ সাবেরকে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সূর্যসেনকে অস্থির যন্ত্রণার তীব্রতায় ডুবিয়েছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিল সূর্যসেন। জীবনকে প্রতারণা করে আপোষের কলঙ্কে নিজেকে ছোট করেনি। গৌরবের মৃত্যু ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। শহীদ সাবের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেনি। মানুষের হৃদয়ের বারুদে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল। সমাজের অসামঞ্জস্য অসঙ্গতি তাকে তীব্র যন্ত্রণায় ব্যথিত করছিল। কিন্তু তবুও নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে সে কলঙ্ককে মাথায় তুলে নেয়নি। একক বিদ্রোহে জ্বলে মরেছে সারাটা কাল। নইলে কত লক্ষ লক্ষ শহীদ সাবের বাংলাদেশে রয়েছে তারা কেন পাগল হয় না ? কত লক্ষ লক্ষ সূর্যসেন রয়েছে তারা কেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে জীবন পণ করে না ?

এই অসম্ভব ব্যতিক্রমগুলো আছে বলেই মহাকালের ইতিহাসের পাতা রঙীন হয়ে ওঠে।

পারিবারিক জীবনের উত্তাপ পেলে সাবের হয়তো ভালো হতে পারে এ বিশ্বাসে বেগম সুফিয়া কামাল, জনাব ওয়াহিদুল হক তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। নতুন পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় দিয়ে ভদ্র করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই সহ্য হয়নি সাবেরের। পালিয়ে এসেছে সবখান থেকে। পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনের পদ্ধতি এবং স্নেহের মৃদু অনুশাসন তার সয়নি। বেশিরভাগ সময়ই থাকতো সংবাদ অফিসে।

"শহীদ সাবের ফিরে আসতেন সংবাদ-এরই গণ্ডীতে। সংবাদ-এর জন্য কি এক তাঁর আকর্ষণ ছিল। ঘুরেফিরে সংবাদেই চলে আসতেন। এই আছেন

সংবাদে এই নেই। কি আকর্ষণ ছিল তাঁর সংবাদের জন্য তা কেউ জানেনা। ভাবলেও বোঝা যাবেনা। সংবাদ-এর বার্তা বিভাগে তিঁনি বসে থাকতেন। ভারী প্রিয় ছিল তার সংবাদ-এর গণ্ডী। ঘুমুতেন মেঝেতে, বারান্দায়, নিউজ বা সম্পাদকীয় বিভাগের টেবিলে।"৮

'সংবাদ' থেকে তাকে দু'টাকা করে দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রেস ক্লাবে তার খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোনদিন নিয়মিতভাবে শহীদ সাবেরকে প্রেস ক্লাবে পাওয়া যায়নি। একদিন খেলে পরবর্তী তিনদিন যে কোথায় উধাও হোত পাত্তা পাওয়া যেতনা। ধরাবাঁধা ছককাটা নিয়মের বেড়ী ভাঙ্গাটাই ছিল শহীদ সাবেরের চরিত্রের অবধারিত সত্য। কোথাও নিয়মিত হয়ে ওঠাই ছিল তার আওতা বহির্ভূত।

ব্যবহারে ব্যবহারে শতচ্ছিন্ন কাপড়। নোংরা, ময়লা চুলের গুচ্ছ-দাঁতের সারি-হাতের নখ। কখনো বিষন্ন। কখনো প্রগলভ্। শহীদ সাবেরকে দেখা যেতো সর্বত্র। চারপাশের সমস্ত ঘটনা প্রবাহ অনুধাবন করতে পারা সত্ত্বেও নিজের মধ্যে এই যে একাকী মগ্ন হয়ে থাকার ক্ষমতা বুঝি কেবল শহীদ সাবেরের ক্ষেত্রেই সম্ভব।

"প্রেসক্লাবের সেই জমজমাট পরিবেশ, মুখর আড্ডায়, সেই গরম চায়ের পেয়ালায় প্রবল ঝড়ের মধ্যে এই ভীষণ নীরব, অস্বাভাবিক বিষণ্ণ ও প্রায় বিপর্যস্ত লোকটি যেনো একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। কারো চোখে বেমানান ও বেখাপ্পাও ঠেকতে পারে। যতোবারই এখানে গেছি দেখেছি এই লোকটি তার সেই অস্বাভাবিক দূরত্বে সবার কাছ থেকে যেনো একটা আলাদা জগতে বিচরণ করছেন। তার মনের সমস্ত উত্তাপ নিয়ে সমস্ত প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে আছেন। একটির পর একটি সিগারেট খাচ্ছেন, পয়সা না থাকলে চেয়ে চিন্তে যোগাড় করছেন। তারপর আবার সেই ধুয়োয় উঁড়িয়ে দিচ্ছেন দামী পয়সাকড়ি। প্রায় অনেকটা হাতের ময়লার মত। কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে এ যেনো তার এক রকমের প্রতিবাদ। যে পয়সা নিয়ে তোমরা এতো কাড়াকাড়ি মারামারি করছো দেখো আমি তাকে কেমন হাসতে হাসতে ধুঁয়োয় উড়িয়ে দিচ্ছি।"৯

পরিচিত বন্ধু দেখলেই শহীদ সাবের পয়সা চাইত। কখনো এক টাকা চাইত। কখনো বা চারআনা। আশ্চর্যের বিষয় ব্যক্তি বিশেষে সে হিসেব করে চাইতো। কারো কাছে এক টাকা। কারো কাছে চারআনা। সবার কাছে এক নয়।

একদিন এক বন্ধুর কাছে চারআনা পয়সা চাইল। বন্ধুর কাছে চারআনা না থাকাতে উনি একটা টাকা দেন। শহীদ সাবের টাকাটা গ্রহণ না করেই বললো, টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আপনি বারো আনা রেখে আমাকে চারআনা দিন। আমিতো চারআনা চেয়েছি।

---

৮. আবুল হাসনাত : সংবাদ, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭২

৯. মহাদেব সাহা, পূর্বদেশ, ৩রা অক্টোবর, ১৯৭২

'দৈনিক বাংলা' অফিসে একদিন এক বন্ধু ধরলেন যে কবিতা লিখে দিতে হবে।

সাবের বললো, লিখবো কিন্তু টাকা দিতে হবে। বন্ধু বললেন, ঠিক আছে আপনাকে পাঁচটা টাকা দেবো আপনি এখুনি একটি কবিতা লিখে দিন।

বসে বসে বেশ কয়েক লাইন লিখার পর সাবের বললো, আরতো লিখতে পারছিনা।

বন্ধু বললেন, এতো কমপ্লিট হলোনা ?

সাবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, ঠিক আছে তাহলে আপনি পাঁচ টাকা থেকে কিছু টাকা কেটে রেখে দিন।

মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তার কথাবার্তায় কোন অসঙ্গতি ছিলনা। সবসময় সম্পূর্ণ কথা বলেছে। বলেছে সুস্থ মানুষের মত স্বাভাবিক কথা। আবার যখন নিজের মধ্যে হারিয়ে যায় তখন এমন সব কথা বলে যার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়না। একদিন দৈনিক বাংলা অফিসে কবি শামসুর রাহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ঢাকায় কটি পুকুর আছে জানেন ?' শামসুর রাহমান হয়তো কি জবাব দেবেন ভাবছিলেন। কিন্তু তার আগেই শহীদ সাবের জবাব দিলেন, 'ফুল বাড়িয়া' রেল স্টেশন দিয়ে যে রাস্তা গেছে তার মাথায় একটি পুকুর আছে। জানেন পুকুর হোল, ওয়ান কাপ অফ ক্রুয়েল টিয়ারস হুইচ আই কুড নেভার সিপ (এক পেয়ালা নিঠুর অশ্রুজল যা আমি কখনো চুমুক দিতে পারলাম না।)

আবার বললেন, "আপনাকে কিন্তু এক বোতল মদের মত লাগছে। বেশ তাজা। খুব ফেনা আছে তাইনা ? আমি ভাবছিলাম ওয়ান সুড নট বী দি হাসব্যান্ড অফ রিস্কি হুইস্কি।"[১০]

কিন্তু তার এসব কথার মধ্যে কি ঠিক পাগলের প্রলাপ বা ছেলেমানুষী অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে? এ যেন অনেকটা স্মৃতি রোমন্থনের মত। নিজেই নিজের কাছে বলা। অন্যদিকে শহীদ সাবেরের বাচনভঙ্গীর মধ্যে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য রয়েছে তাকে কি কেবল একজন অসুস্থ লোকের উক্তি বলে উড়িয়ে দেয়া যায়? বিশেষ করে ইংরেজী বাক্য দুটির প্রকাশ চমৎকার। এমন করে বলা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। হতে পারে বাক্যে কোন পূর্বাপর সূত্র নেই কিন্তু শহীদ সাবেরের মননশীল মানসটির রূপ তাতে চাপা পড়ে থাকেনি। সুন্দর একটি কবি মনও আলোর ঝলকানির মত উঁকি দিয়ে যায়। ব্যক্তি শহীদ সাবের হাজারের মধ্যে একক হয়ে ওঠে।

উনিশশো সত্তরের একুশে ডিসেম্বর তারিখের 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত 'লোক-লোকালয়'-এর প্রথম চরিত্র হিসেবে শহীদ সাবেরের কথা লিখেছিলেন হেদায়েত হোসাইন মোর্শেদ। সেদিন সকালে "তিনি এসে আমাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন,

---

[১০] হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, বিচিত্রা, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭২

এ্যাম আই এ কমোডিটি ? তারপর আবার বাংলায় বললেন, আমি কি পণ্য নাকি ? আমার কথা পত্রিকায় লিখেছেন কেন ?”

কি করে আপনারা বুঝবেন যে এ লোক পাগল ? এটা ছিল সত্তর সালের কথা। আর শহীদ সাবের মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ’৫৮-র শেষ দিক থেকে।

সত্তরের অক্টোবরে মহাদেব সাহা ‘পূর্বদেশ’-এ শহীদ সাবেরের ওপর এক ফিচার করেছিলেন। একদিন প্রেসক্লাবে দেখা। মহাদেব সাহা জিজ্ঞেস করলেন, পড়েছেন লেখাটা ? সাবের জবাব ছিলো, লেখা দিয়ে কি হবে পয়সা দেন। এককালের জীবনবাদী লেখক শহীদ সাবের লেখার কথা আর শুনতে চায়না। অথচ তার লেখারও বিরাম নেই। এ অবস্থাতেও অনেক কবিতা তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। অথচ নিজের সম্পর্কে যে লেখা তার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। আছে অনীহা। আছে চরম বিতৃষ্ণা। লেখা ছাপা হলে নিজেকে পণ্য বলে মনে হয় তার। আর দশজনের মত নিজের সম্পর্কের লেখার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েনা। এ আত্মসচেতনতা কোথা থেকে এলো ? কোথায় লুকিয়ে থাকে এ সম্মানবোধ ? নিজের সম্পর্কে যার এত সচেতনতা সে এতো নোংরা থাকে কি করে ? সারা শরীরে দুর্গন্ধের আস্তাবল পুষে রেখে দিনের পর দিন লোক সমাজে ঘুরে বেড়ায় কি করে ? তাহলে কি শহীদ সাবের ভান করে চলতো ? নিশ্চয়ই নয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর নিজের ওপর এ ধরনের অত্যাচার করে ভান করে থাকা যায় না। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় শহীদ সাবের মাঝে মাঝে নিজেকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর এরই ফলে কখনো কখনো মানসিক সচেতনতা দেখা গেলেও পরক্ষণে আবার ডুবে যায় বিশ্বসংসার উপেক্ষা করে। মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।

আরো দেখা গেছে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার দরুণ যখন কথা বলতো গল্‌গল্‌ করে বলে যেতো। থামাথামির নাম ছিলনা। কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বললে আঘাত পেতো। মুখটা চুপসে যেতো। কেউ তাকে রিফিউজ করলে বিমর্ষ হয়ে যেতো। উনসত্তর সালের দিকে মনে হচ্ছিল যে, তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এ সময়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরতো। কিছুটা স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। আটান্ন থেকে একাত্তর—এই তেরো বছর শহীদ সাবের পথে পথে ঘুরেছে—দৈনিক পত্রিকার অফিসে ঘুরেছে—প্রেসক্লাবে বসেছে। পরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা বলেছে, আড্ডা দিয়েছে, পয়সা চেয়েছে, সিগারেট খেয়েছে। বন্ধুদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল তার উপস্থিতি। প্রতিদিনের সাধারণ নিয়মের মত হয়ে গিয়েছিল শহীদ সাবের। নইলে একজন হৃদয়বান ব্যক্তিও কি অনুভব করেনি তার পূর্ণ এবং সুষ্ঠু চিকিৎসার প্রয়োজনের কথা।

সত্যি কথা বলতে কি শহীদ সাবেরের কোন ভাল চিকিৎসা হয়নি। কেননা অসুস্থতার মধ্যেও সুস্থ মানুষের গুণসম্পন্ন যে লক্ষণগুলো ছিল তাতে মনে

হয় ঠিকমত চিকিৎসা হলে শহীদ সাবের আবার ভাল হয়ে উঠতো। শহীদ সাবের প্রাণবন্ত হতে পারতো। জীবনবাদী লেখক শহীদ সাবেরের বলিষ্ঠ লেখনী নির্ঝরিণীর মত বেগবান হোত। কিন্তু হয়নি। ফউজুল করীম সাহেব বলেছেন, 'সাংবাদিক ইউনিয়ন যে সাবেরের চিকিৎসার কথা কয়েকবার চিন্তা না করেছে তা নয়। ইউনিয়ন বলেছে, সুস্থ লোকদের বাঁচাবো না পাগল সাবেরকে বাঁচাবো? ইউনিয়নতো সাবেরের বাবা ছেলে মা বউ নয় যে সারাক্ষণ পিছে লেগে থাকবে। তার আরো দায়িত্ব আছে।'

যে সমাজ-ব্যবস্থা মানবিক শক্তিকে পঙ্গু করে রাখার জন্য অহরহ ষড়যন্ত্র করে, সে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে এর চেয়ে মহৎ কোন কথা বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সামাজিক দিক থেকে কেউ কারো জন্য কোন দায়িত্ব অনুভব করেন। দায়িত্ব অনুভব করলেও তার গুরুত্বের উপলব্ধি হয় না। কেননা প্রাদেশিক পরিষদে তার চিকিৎসার জন্য একবার প্রস্তাবও পাশ হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর লালফিতার অন্তরালে হারিয়ে গেছে মানবিক দায়িত্ববোধ। শহীদ সাবেরের চিকিৎসা আর হয়ে ওঠেনি। কত লক্ষ লক্ষ শহীদ সাবের এভাবে হারিয়ে যায় কে কার খোঁজ রাখে।

পারিবারিক দিক থেকে উপেক্ষাটা এসেছিল আরো প্রচন্ডভাবে। শুনেছি মা আর ছোট ভাইরা চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কেউই ধরে রাখতে পারেনি তাঁকে। বাঁধন কেটে বেরিয়ে এসেছে সব সময়। কেন এ হোল? তাকে বেঁধে রাখার মত হৃদয়ের উত্তাপ কি কারো ছিলনা? আসলে তা নয়। বরাবরই দেখে এসেছি পারিবারিক দিক থেকে তার জন্য সকলেরই আগ্রহ ছিল কম। এবং একটা সদিচ্ছার অভাব তাঁকে ভালো করে তুলবার পথ খুঁজে পায়নি। উপেক্ষিত শহীদ সাবের উপেক্ষাকেই জীবনের সম্বল করেছে।

সালামতউল্লাহ্ সাহেব মারা যান ১৯৬৮ সালে। আশ্চর্যের ব্যাপার অসুস্থ অবস্থায় শহীদ সাবের আপন মাকে একদম সহ্য করতে পারত না। কোনদিন মার কাছে যাবার তাগিদ অনুভব করেনি। ঈদগাঁ থেকে মা একবার ঢাকায় এলে শহীদ সাবেরকে কিছুতেই তার সামনে হাজির করানো যায়নি। ছুটে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। অসুস্থ হওয়ার প্রথম দিকে একবার মার কাছে গিয়েছিল। তিন দিন থেকে ফিরে এসেছিল। ঐ তার শেষ দেখা। ঈদগাঁর বাড়িতে মা তার এখনো বেঁচে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাও মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে।

সমাজ তাকে উপেক্ষা করেছে—প্রেম দিয়েছে ব্যর্থতা—পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছে বঞ্চনা। সবাই তাক ঠেলে দিয়েছে দূর থেকে দূরে। জীবন সমুদ্র মন্থন করে অমৃত ওঠাতে পারেনি শহীদ সাবের। উঠেছিল হলাহল। সে বিষ কন্ঠে ধারণ করে নীলকন্ঠ হবার ক্ষমতা ছিলনা তার। সে বিষের প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে পুড়ে মরেছে সারাটি জীবন।

আমরা আশ্চর্য হইনা। যে সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা বাস করি যেখানে বঞ্চনাই আমাদের জীবনের একমাত্র সত্য। উপেক্ষিত শহীদ সাবের সে সমাজ-ব্যবস্থার

কোন ব্যতিক্রমী ইতিহাস নয়। শহীদ সাবের যা হতে পারতেন তা হননি। শহীদ সাবের যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি। এবং এই না হওয়া এবং না করতে পারাতেই এ দেশ এবং সমাজ খুশী হয়। এখানে কেউ চায়না প্রতিভার দীপশিখায় কেউ কল্যাণাভিসারী আলোর জয়যাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

পরিশেষে শহীদ সাবেরের পরিণতি হোল এক বীভৎস নারকীয়তার মাঝ দিয়ে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী তাকেও রেহাই দেয়নি। 'সংবাদ' অফিসের মেঝেয় ঘুমিয়েছিল শহীদ সাবের। ৩১শে মার্চ সকালে 'সংবাদ' অফিস ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে শহীদ সাবেরের অমর আত্মা। দুমড়ে কুঁচকে কালো হয়ে পড়ে রয়েছে দেহ। সে দেহের সৎকার হয়নি। কাকে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খেয়েছে শহীদ সাবেরের পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া দেহ।

শহীদ সাবের মারা গেছে। আগুনে পুড়ে।
যে আগুন সে বুকে পুষে রাখতো সে আগুনে অঙ্গার হয়েছে তার হৃদয়।
আগুনঝরা ১৯৩০ সাল তার জন্মের সাক্ষী।
আগুনঝরা ১৯৭১ সাল তার নির্মম পরিণতি।

স্মৃতি রোমন্থন

- রণেশ দাসগুপ্ত
- সরদার ফজলুল করিম
  - কবিতা
- হুমায়ুন কবির

শহীদ সাবের একটি অসমাপ্ত শিল্পী জীবনের কথা

রণেশ দাসগুপ্ত

শহীদ সাবের ছিলেন একজন জাত-শিল্পী—বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান কথাশিল্পীদের একজন। যাঁর বড় গুণ ছিল অনুভূতিশীলতা। সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতা, যা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় অগণিত সাধারণ মানব-মানবীর মনের চাপা আগুনের ছবিগুলিকে ধরতে পারে স্পর্শপ্রবণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মতো।

স্বপ্নভাষী এই কথাশিল্পীর মনের আগুন ছিল চাপা-ধরনের। এই কারণে প্রগতিশীল রাজনীতির একটি মুখপত্রের মারফত বৃহত্তর জনতার সঙ্গে তাঁর একটা প্রকাশ্য সংযোগ থাকলেও, একজন অতি-অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী হিসেবেই তিনি তাঁর কলমটাকে ব্যবহার করায় অভ্যস্ত ছিলেন।

শিল্পীর সৃষ্টির প্রয়োজনের দিক দিয়ে এই মনোভাব বা অভ্যাস নিশ্চয় উৎসাহজনক। কিন্তু মনের আগুন চাপা রাখার বিপদ আছে একটা। স্নায়ুতন্ত্রী অনেক সময় জ্বালা সহ্য করতে পারেনা। অনর্থ ঘটে যায়। শহীদ সাবেরের বেলায় তাই ঘটেছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮—প্রথম যৌবনের এই ক'টা বছর তিনি লিখতে পেরেছিলেন। তারপর হয়তো কোন একটা অতর্কিত আঘাতে বিবাগী হয়েছিলেন। হালছাড়া নৌকার মতো যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ভেসে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য সম্বিত ফিরতো এবং তখন আশ্চর্য সূক্ষ্ম কারুকার্যময় কবিতা লিখতেন। মনে হতো, আবার ফিরে আসছেন তিনি পরিপূর্ণ সুস্থতায়—সুনির্দিষ্ট জীবনের অঙ্গীকারে। কিন্তু না। শহীদ সাবের ছিলেন বুকে খঞ্জর-বেঁধা পাখি।

শহীদ সাবেরের এই চরিত-কথা জাতশিল্পীর পক্ষে তেমন কোন ব্যতিক্রম নয়।

একজন বিদ্রোহী শিল্পী যত সমাজ-সজাগই হোন না কেন, মানসিক গড়নের দিক দিয়ে তিনি একটা জটিল বাদ্যযন্ত্র, যার রয়েছে অসংখ্য সাদামাটা তার এবং যাকে সব সময়েই রাখা দরকার সাবধানে—সংঘাতের মধ্যে বিশেষ করে।

সমস্ত সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে সত্যের জন্য সংগ্রামে এই বাদ্যযন্ত্রই ভীম নাদ হয়ে উঠতে পারে। অসহ্য দুঃখের দিনে দুখী মানুষের চাপাপড়া আশাবাদকে ঝঙ্কৃত করে তুলতে পারে। কিন্তু যে যন্ত্র এত সমৃদ্ধ, সে যন্ত্রই একবার বিগড়ে গেলে সহজে সারাবার নয়।

শহীদ সাবেরের জীবনে ঘটেছিল তাই।

শহীদ সাবেরের চরিতকথা এদিক দিয়ে একটি অসমাপ্ত চরিত-কথা।

শহীদ সাবেরের যখন মৃত্যু হলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৮/২৯ তারিখে প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তানী হানাদারদের বুলেটের ঝাঁকের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ 'সংবাদ' অফিসের দালান-চাপা পড়ে, তার আগেই প্রায় দশ বছর ধরে আমাদের সাহিত্যের পাকা খাতায় হিসেবের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। একটা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতেন তিনি তাঁর অতিচেনা ঢাকা নগরীর পথে পথে। এ যেন 'খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'।

একটামাত্র নোঙ্গর ছিল তবু জীবনে। সেটা সংবাদ অফিস, যেখানে তিনি ১৯৫৯ সালের শুরু পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর সহকারী সম্পাদক হিসেবে প্রায় প্রত্যেকদিন সম্পাদকীয় লিখতেন এবং সাহিত্য আর নিবন্ধের পাতা দেখতেন। মনে পড়ে, ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর একটা লেখা দিয়েছিলাম সংবাদে। বড় লেখা। সংবাদ অফিসে সেই প্রথম আলাপ। প্রথম কিস্তির লেখাটাতে দু'একটা ছাপার ভুল ছিল। শহীদ সাবেরকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, খবরের কাগজে এসব ছোটখাট ত্রুটি দেখবেন না। কিন্তু এই খবরের কাগজের অফিসই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেদিন সংবাদ অফিস থেকে যখন বেরিয়ে আসি, তখন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমরা রায় সাহেবের বাজারের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলাম। পাশাপাশি গোটা-কয়েক রেস্তোরাঁ—প্রত্যেকটাতে একটা করে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজছে। সূক্ষ্ম শিল্পীমনের অনুকূল পরিবেশ নয়। এখানেই আমাকে চা দিতে বলে তিনি ভাত খেলেন। বুঝলাম জীবনযাপনের ধারাটা। সস্তা হোটেলে যাওয়ার মূলে ছিল আর্থিক কষ্ট। হয়তো অবসর সময়ে সংবাদ অফিসে নিজের ঘরে টেবিলটা পরিষ্কার করে প্যাড নিয়ে বসতেন কবিতা লিখতেন। অথবা লিখতেন নিবন্ধ কিংবা গল্প—সেই সমস্ত ভাব নিয়ে লেখা যা হয়তো ব্যঞ্জন করে ফিরছে মনের মধ্যে, অপেক্ষা করেছে একটু ফুরসতের জন্যে, ঘরেতে ভ্রমর আসার মতো।

হয়তো তাঁর অধিকাংশ লেখাই সংবাদ অফিসের দোতলার ঘরে একা একা বসে লেখা। এইজন্যেই কি অসুস্থ বিবাগী হয়ে যাবার পরেও প্রত্যেকদিন রাতের বেলায় তিনি ফিরে আসতেন তাঁর সেই ঘরটিতে? বিশেষ করে ৬৯ সালের রাত্রিগুলির কথা মনে পড়ে। সংবাদ অফিসে তখন সম্পাদকীয় লিখি। প্রুফ দেখে দেবার জন্যে অপেক্ষা করি সেই ঘরটিতেই। টেবিলের অপর দিকে শহীদ সাবের এসে বসেছেন। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন—অর্থাৎ নোটিশ দিয়েছেন এখন আলো নিভিয়ে ঘুমোবেন। কোন কোন সময় ঘরে আর কেউ না থাকলে তিনচারটে হাতা ছাড়া চেয়ার বেঞ্চির মতো পাশাপাশি সাজিয়ে শুয়ে পড়েছেন দৈনিক সংবাদের একটা মাসিক ফাইলকে বালিশের মতো করে সাজিয়ে তাতে মাথা দিয়ে। এইটেই ছিল শহীদ সাবেরের শেষ জীবনের নিয়মিত শয্যা।

মৃত্যুর সময়েও কতই বা বয়স হয়েছিল তাঁর? পঁয়তাল্লিশ? মাঝে মাঝে যখন কয়েকজন সাংবাদিক একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছি সংবাদ অফিসের দোতলার ঘরে, শহীদ সাবের সেলুন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন সিগারেট টানতে টানতে। তখন মনে হতো বছর তিরিশেক বয়স হবে। লণ্ড্রি থেকে আনা সার্ট ট্রাউজার পরলে তো খুলেই যেত তাঁর সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। দেখা যেত এনেছেন নিউজ প্রিন্টের প্যাড ভর্তি লেখা কবিতা। নীচের তলায় নিউজ-টেবিলে বসে বসে লিখছেন। টেবিলে লেখাগুলি ফেলে দিয়ে বললেন, টাকা দিতে বলবেন।

আমরা তখন শহীদ সাবেরকে দিয়ে লেখাবার জন্যে বলতাম, লিখলে টাকা পাবেন। তবে একসঙ্গে নয়। অসম্ভব রকমের সিগারেট খেতে শুরু করেছিলেন তিনি। একসঙ্গে টাকা দেয়ার বিপদ ছিল। আমাদের যুক্তি মেনে নিতেন তিনি। শহীদ সাবের ছিলেন বরাবরই মৃদুভাষী। তর্ক অবশ্য করতেন মাঝে মাঝে, কিন্তু সামান্যক্ষণ।

মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে হাজির হতেন। বলতেন, আমি এখন থেকে লিখব।

সুন্দর সুস্পষ্ট হাতের লেখা। ফাঁক ফাঁক করে লেখা। যুক্তির পরম্পরায় বিষয়বস্তু বিধৃত। ত্রুটিহীন। হয়তো শুধু দৈনন্দিন রাজনীতির সঙ্গে যোগ না থাকায় দুএকটা অবান্তর কথা।

আমরা দুয়েকটা সম্পাদকীয় ঠিকঠাক করে নিয়ে ছাপিয়েছি। কিন্তু এ ধরনের বাঁধাধরা ঋজু লেখা যে তাঁর কাছে কষ্টকর, তা বুঝতে দেরী হতো না। কারণ দু-একদিনেই ক্ষান্তি দিতেন সম্পাদকীয় লেখায়। কিন্তু কবিতা লেখায় কোন ক্লান্তি ছিল না।

আর এ কবিতা যেন মুক্তার মালা। এতটুকু ছন্দপতন নেই। অনায়াস লেখা সম্পূর্ণটি। এই কবিতাই ছিল তাঁর শেষদিকের লেখার মূল রূপালি সজীব ধারা—ক্ষীণাঙ্গ হলেও অব্যাহত। প্রতীক ও রূপকের দিকে তাঁর যে একটা ঝোঁক ছিল, বরাবরই সেকথা তাঁর সমস্ত রকমের লেখাতেই প্রমাণিত। এই কারণে তাঁর কবিতা প্রায়শ সংক্ষিপ্ত। তিনি প্রধানত গীতিধর্মী কবিতাই লিখতেন; গদ্যছন্দে হলেও।

আসলে, শহীদ সাবেরকে কি কবি ও গীতিকার বলবো? যে অনবদ্য ছোটগল্প নিয়ে তিনি তাঁর লেখার কাজ শুরু করেছিলেন কিংবা লেখক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, সেগুলিও কি এই কারণই জাপানী ছবির মতো সুষম এবং ছিমছাম? হয়তো তৃতীয় একটা সত্য রয়েছে এখানে যেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ আলোক-কণাগুলিকে আয়নাতে ধরার জন্য সূক্ষ্ম কাজের লেখার পরীক্ষাকে লালন করতেন তিনি তাঁর মনে।

এর প্রমাণ, জেলখানার জীবন সম্বন্ধে তাঁর লেখা ‘আরেক দুনিয়া থেকে।’

রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে অত্যন্ত অল্প বয়সে কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি কিছুকাল। এরই ফলশ্রুতি 'আরেক দুনিয়া থেকে'।

কিন্তু তিনি জেলখানা সম্বন্ধে আর লিখলেন না কেন?

জেলখানার বাইরের জীবনটাকেও মনের আয়নাতে ধরার জন্য?

নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ প্রবণতা অনেক সময় শিল্পীকে একটি বিষয়ে স্থির থাকতে দেয়না। এটাই কি কারণ?

অন্য ধরনের লেখারও পরিকল্পনা ছিল তাঁর? একটার কথাই জানতে পেরেছিলাম একবার। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন তিনি নিজেকে ১৯৫৭ সালে। কোন সমিতিও বোধহয় গঠন করেছিলেন। কিছু প্রচার পুস্তিকাও ছাপিয়েছিলেন। একটা সাহিত্য সভায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে। যাঁরা সে সময়ে এই নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারা হয়তো বলতে পারেন, শহীদ সাহেব কোনদিন নাটক লিখেছিলেন কিনা, অথবা লিখতে চেয়েছিলেন কিনা।

শহীদ সাবেরের স্মৃতি

সরদার ফজলুল করিম

বেগম, সেলিনা

আপনি বার বার শহীদ সাবের সম্পর্কে কিছু লিখে দিতে বলেছেন। অনেকবার কথা দিয়েছি। তবু কিছু লিখতে পারিনি। আপনার তাগিদে আবার চেষ্টা করেছি কিছু লিখতে। আমার অসুবিধে এই নয় যে, শহীদ সাবের আমার স্মৃতিতে নেই। একথা ঠিক যে, শহীদ সাবেরের জন্ম তারিখ আমি জানিনে। তাঁর নিকট-আত্মীয়জনের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। হয়ত সাংবাদিক অনেক বন্ধু তাঁকে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিক নেতা তাঁকে আমার চেয়ে বেশী জানেন। তাঁদের স্মৃতিকথা অনেক বেশী ঘটনাময় হতে পারত। আমার অসুবিধে এই যে, শহীদ সাবের আমার কাছে একটিমাত্র ঘটনাতেই আটকা আছেন। এর অধিক কিছু আমি তাঁর জানিনে।

একটি সম্ভাবনাময় তরুণ। আপনারা তাঁকে তাঁর বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর শরীরের করুণ ছবি তাঁর মনের বয়সকে ঢেকে রেখে আপনাদের অনেকের সামনে আতঙ্কজনক দৃশ্য হয়ে ভেসে উঠেছে। কিন্তু আমার কাছে কৃশকায় তবু সতেজ মনের এবং তীক্ষ্ণ চোখের একটি তরুণের ছবি সব দৃশ্যকে ছাড়িয়ে স্থায়ী হয়ে রয়েছে।

আমার বাসায় একখানি ছবির ফ্রেম আছে। আজ শহীদ সাবের নেই। আমার ঘরের ছবির ফ্রেমের ছবিখানিও নেই। একদিন, সে প্রায় পনের বছর আগের কথা, শহীদ সাবের বাঁধানো ছবিখানি নিজে বয়ে এনে আমার বাসায় দিয়ে গিয়েছিল। আমাকে ভালবেসে এই ছবিখানি সে উপহার দিয়েছিল। দু'টি কিশোর কিশোরীর ছবি। দু'জনে ফুল চয়ন করছে। ছবিখানি আজ প্রতীক হয়ে আমার মনের পটে ভেসে উঠছে। শহীদ সাবেরও ছিল জীবনের বাগানে আনন্দের ফুল চয়নকারী একটি তরুণ।

শহীদ সাবের সম্পর্কে আপনারা অনেকে স্মৃতিকথা লিখেছেন। আপনাদের স্মৃতিকথা আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। আপনারা লিখেছেন ঃ শহীদ সাবের তেমন কথা বলত না। ময়লা ছিন্নপ্রায় বসন আর অযত্ন মুখাবয়ব নিয়ে শহীদ সাবের আপনাদের কাছে দু'একটি টাকা চেয়েছে। হয়তো সে টাকা দিয়ে সিগারেট খেয়েছে। আমার কাছেও এসেছে। হয়ত দু'একবার। ৬৮/৬৯ সালে। আমি দেখেছি শহীদ সাবের কথা কম বলে। আর এটাই আমাকে আশ্চর্য করেছে। ওর এই বাক্যহীনতাই বারংবার আমার স্মৃতির পটে জাগিয়ে দিয়েছে বাইশ বছর আগের রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের পাঁচ-ছ' নম্বর ওয়ার্ডের রাজবন্দীদের জীবনের দৃশ্য।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে আমাকে সিলেট জেল থেকে স্থানান্তরিত করে নেওয়া হয় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। তারও আগে ঢাকা জেলের সেই ঐতিহাসিক ৫৮ দিনের অনশন সংগ্রামের পরে আমাকে ঢাকা জেল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিলেট জেলে। আমি আর কয়েকজন বন্দী রাজশাহী জেলে যাওয়ার পরে ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর—বিভিন্ন জেল থেকে আরো রাজবন্দীদের রাজশাহী জেলে নিয়ে আসা হতে লাগল। রাজশাহী জেলের স্মৃতি তখন বন্দীমাত্রের মনেই ভয়ঙ্কর। ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের একটা বন্দী নিবাস খাপড়া বাংলোর মধ্যে পাগলা ঘন্টী বাজিয়ে সশস্ত্রবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম লীগ সরকারের জেল কর্তৃপক্ষ সাত জন রাজবন্দীকে হত্যা করেছে। আরো বহু রাজবন্দীকে আহত করেছে। এই আতঙ্কপুরীতে ইচ্ছা করেই যেন ফ্যাসিস্ট সরকার অন্যসব কারাগার থেকে বেছে বেছে রাজবন্দীদের নিয়ে আসতে লাগল তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরাও চেষ্টা করছে তখন। যে যার সঙ্গে আছে তার সঙ্গে মিলে যৌথ জীবন-যাপনে, রাজনীতিক আলাপ আলোচনায়। সম্ভবপর সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কারাগারের মধ্যেও নিজেদের মনোবল অটুট রাখার। এই সময়েই চট্টগ্রাম জেল থেকে এল এই ষোল সতের বছর বয়সের তরুণ রাজবন্দীটি। দেখতে সে বয়সের তুলনায় আরো ছোট, আরো কৃশ। হয়ত বয়সও তার এর চেয়েও কম ছিল। আমি ঠিক জানতাম না, শহীদ সাবের তখন ম্যাট্রিক পড়ছে, না আই এ পড়ছে। আসলে শহীদ সাবেরের তার রাজনীতিক সংগঠন এবং আদর্শের বাইরে যে কোন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ছিল, এটাই আমরা বুঝতে পারতাম না। মনে হত যেন, ও কোন ক্ষুদ্র পরিবার থেকে বৃহত্তর অপর কোন পরিবারের মধ্যে এসেছে এবং তার স্নেহে, ভালবাসায় নিজেকে ধন্য মনে করছে। তাই ওর মনে কোন ক্লেশ ছিল না। বাইরের কারুর জন্য যেন মনে কোন বেদনাবোধ বা টান ছিল না। আমরা যদি বাইরের স্মৃতির পিছুটানে কারাগারের গারদে শূন্য দৃষ্টি বাক্যহীন বোবা মূর্তিতে পরিণত হয়ে যেতাম, শহীদ সাবের, যে সকল রাজবন্দীর সবচেয়ে ছোট ভাই ছিল, আমাদের সেই বাক্যহীন মূর্তিতে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চারে বিরামহীন বাণীর ধারা ছিল। তখন রাজবন্দীদের মনে তাদের অনুসৃত রাজনীতিক কৌশলের ভ্রান্তি, অভ্রান্তি নিয়ে নানা প্রশ্ন। খাপড়ার ঘটনার বিশ্লেষণে নানা অভিমতের প্রকাশ। শহীদ সাবেরের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। বিপ্লবের পথ কি তা নিয়ে ওর নিজস্ব মতামত প্রকাশের আবেগে ও অস্থির হয়ে উঠত। একটা ঘরে হয়ত বিশ থেকে ত্রিশ জন বন্দী আমরা। সন্ধ্যা না হতে ঘরটায় তালা দিয়ে রাখে। সকালে তালা খুললেও আর একটা দেয়ালের চৌহদ্দীতে আমাদের আটকে দেয়। এরই মধ্যে আমরা পায়ে পায়ে ঘুরি। সকলে মিলে রান্না করি। চাপাতি বানাই। গোছলের ঘন্টা দিই। লাইন দিয়ে খেতে বসি। খবরের কাগজ এলে গেলে হয়ে বসি। একজনে জোরে জোরে পড়ি। অপর সবাই শোনে। সপ্তাহে একদিন সংবাদ পর্যালোচনা করি। সাংস্কৃতিক

বাসরে বসি। রাজনীতিক তর্ক করি। সব কিছুতেই, সবখানেই শহীদ সাবের। সব আলোচনাতেই শহীদ সাবের জীবন্ত খই-এর মতো ফুটছে। হয়ত এই সময়েই ও গোপনে জেল থেকে লিখে পাঠিয়েছিল 'আর এক দুনিয়া থেকে' রাজবন্দী কাহিনী। কোলকাতার 'নতুন সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয়ে তা সাড়া তুলেছিল সবার মনে। ওর কথার বন্যা থেকে আমরা সকৌতুকে আত্মরক্ষার কতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওর কোন পরোয়া ছিল না। ঘুম থেকে টেনে তুলে কোন সমস্যার সমাধানে ওর নিজের অভিমতকে শুনিয়ে তবে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ওকে সবচেয়ে স্নেহ দিয়েছিলেন সুকুমার চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ঢাকার রেল শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। সাহিত্যিক এবং অংকশাস্ত্রে পণ্ডিত। আমার সেদিনই মনে হয়েছিল, সুকুমারদা শহীদ সাবেরের প্রাণের মূল আকুতিটি ধরতে পেরেছিলেন। রাজনীতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞ কর্মী হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন: আদর্শের রোমাঞ্চ নিয়ে এই তরুণ নিজের পরিবার-পরিজন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আদর্শ রূপায়নের পথ তো মসৃণ নয়। সে পথে কতো খানা খন্দ, কত বাঁক, কত চড়াই উৎরাই। সে দীর্ঘ কঠিন পথে যেন না এই তরুণের মনের সুন্দর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তার জন্য তিনি পিতার স্নেহে আর প্রশ্রয়ে শহীদ সাবেরের সব আব্দার, সব উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করতেন। শহীদ সাবের ছিল স্নেহের আকাঙ্ক্ষী। বস্তুত আমার মনে হয়েছে, শহীদ সাবের ওর পারিবারিক জীবনে মমতাহীনতার কোন আঘাত পেয়েছে। ওর কাছে ওর মায়ের করুণ কাহিনী শুনেছি। মা দূরে ঈদগাঁর গ্রামে আছেন। পিতার অন্য সংসার। সেই দুঃখিনী মায়ের চিন্তা সকল বন্দীর জীবনকে আনন্দে আলোচনায় ভরে রাখার চেষ্টায় সদাব্যস্ত শহীদ সাবেরের মনেও উঁকি দিতে আমি দেখেছি। সুকুমার বাবু শহীদ সাবেরের মনের এই বেদনার দিকটি যেন অপর সবার চেয়ে বেশী টের পেয়েছিলেন। আর তাই যেন তিনি চেষ্টা করতেন সাবেরের মনের এই বেদনার কোন্‌টি নিজের স্নেহ দিয়ে পূরণ করে রাখতে। শহীদ সাবেরের কথা মনে হতে তাই সুকুমার চক্রবর্তীর কথা মনে না করে পারছিনে। তাঁর কথা মনে পড়ছে এই কারণে আরো যে, শহীদ সাবের আজ নেই। সুকুমার বাবুও নাকি আজ আর বেঁচে নেই।

* * *

'৫৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে শহীদ সাবেরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তখনি সাবের আমার জন্য সেই ফুল চয়নকারী কিশোর-কিশোরীর ছবিটি উপহার দিয়েছিল। এর পরে শহীদ সাবের ক্রমান্বয়ে উদভ্রান্ত হয়ে যায়। '৫৮ সাল থেকে '৬২ সাল পর্যন্ত আমি আবার বন্দী থাকি। '৬৩ সালের দিকে যখন সাবেরকে আবার দেখি তখন তার এক করুণ মূর্তি। এ সাবের আর কথা বলে না। উদভ্রান্ত অবস্থাতেও মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। যেন নিজের হারানো সত্তাকে আবার নিজের কবিতায় উদ্ধার করতে চায়। শহীদ সাবেরের এই উদভ্রান্তি আমাদের বন্ধ্যাসমাজের অকরুণ পরিবেশের আঘাতের ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

দেশ, দেশের মুক্তি আন্দোলনের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অগ্রসর হয়ে যায়, একথা যেমন সত্য, তেমনি আবার সে আন্দোলনের নিজস্ব আত্মসমালোচনার দিক থাকে। রাজনীতিক কর্মী যেমন একদিকে তার সাহস-ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে, আন্দোলনকে শক্তিশালী করে, তেমনি আন্দোলনেরও দায়িত্ব আছে ব্যক্তি হিসাবে রাজনীতিক কর্মীকে স্নেহে, আত্মীয়তায়, অভয়দানে, তার আকুতির পূরণে তার দুর্বলতাকে জয় করতে সাহায্য করে, তাকে সবল থেকে সবলতর করে তোলার। আমাদের দেশের করুণ কাহিনী এই যে, এখানে আন্দোলন আর আদর্শ ব্যক্তির কাছ থেকে কেবলই দাবী করেছে, গ্রহণ করেছে। কিন্তু ব্যক্তিকে মানুষ হিসাবে বিচার করে তার প্রতি মুহূর্তের দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে তাকে সাহায্য করেছে খুব কমই। এই ব্যর্থতার পরিণামে শহীদ সাবেরের মতো কতো সম্ভাবনাময় তরুণ আদর্শের রোমাঞ্চভরা স্বপ্নভঙ্গে মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করতে যে অক্ষম হয়েছে তার হিসাব এখনো কেউ করেনি। আদর্শের আকর্ষণ জীবনের বড় আকর্ষণ : ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে। আদর্শের আকর্ষণ বাদে ব্যক্তি বা জাতি যে কারুর জীবনই অর্থহীন জৈবিক পরিক্রমায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আর এই কারণেই আদর্শের স্বপ্নকে যত্ন করে রক্ষা করা কেবল ব্যক্তিরই দায়িত্ব নয়, জাতিরও। রাজনীতিক আন্দোলন এবং সংগঠনেরও।

* * *

“২৭.৪.৫১”, “রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল” সুকুমার হস্তাক্ষরে বিশ বছর আগের এই কথা ক’টি এখনো আমার সেই বন্দী জীবনের উঁইয়ে খাওয়া একটি খাতার বুকে ভাসছে। পাশে “শহীদ সাবের” বলে একটি স্বাক্ষর। আর তার উপরে আমাকে উদ্দেশ্য করে সাবেরের নিজের রচিত একটি কবিতা :

ঘন ঘন, আরো ঘন, বুকে বুকে সন্নিবদ্ধ সারি
কমরেড, আলোকের যাত্রাপথে চলো দিই পাড়ি।
মরুভূর বিস্তীর্ণতায় আর শান্তির ছায়াতে ছায়াতে
দৃঢ়প্রাণ দৃঢ়মুষ্ঠি বন্ধুত্ব হয়েছে তোমাতে আমাতে।
এ একাত্মতা হবে নাকো শেষ, অচ্ছেদ্য এ বন্ধন যেনো
শপথের কাঠিণ্য আর প্রতিশোধের আগুন মেশানো।

সাবেরের নিজের হাতে লেখা ছত্রকয়টির কালির দাগ আজো মুছেনি। আর এ ছত্রকটির তাৎপর্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অতিক্রম করে মরুভূর বিস্তীর্ণতা আর শান্তির ছায়াতে জীবনের পথে বিরামহীন চলার স্বপ্নে মুগ্ধ একটি কিশোরের চিরঞ্জীব ঘোষণা হিসাবে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। ছত্রক’টিকে সামনে রেখে আমার মনের কামনা : এমন দিন আসুক যেদিন আমাদের দেশে এমন সম্ভাবনার এই করুণ পরিণতি আর ঘটবে না। জীবনের বাগানে আনন্দের ফুল রচনা এবং আনন্দের ফুল চয়ন করার স্বপ্ন ব্যর্থতার চোরাবালিতে বিনষ্ট হয়ে যাবে না।

শহীদ সাবেরকে দেখে

হুমায়ুন কবির

কি যে এক বিমর্ষতা পান করে
                একা এই বিবিক্ত যুবক
কড়িকাঠে আলো ঝোলে, মাছিদের মত
আসা-যাওয়া করে টেলিপ্রিন্টারের ছক
কি আলো সে পেতে চায় সারাক্ষণ
চোখের গভীর যেন ফাঁদ।
সারাক্ষণ কি যে ভাবে একা এই বিমর্ষ যুবক।

অথচ শুনেছি তার রক্তে রক্তে
মিছিলের শব্দ শোনা যেত
আগুনের মত তার দুঃখ শোক
ঝরে যেত শব্দের ত্রিতালে।

মনে হয় আজো এই কলম এগিয়ে যদি দিই
বিষণ্ণ মলিন চোখে ভরে যাবে উদ্ভাসিত হাসি
বিবর্ণ কাগজ এই বিদ্যুতের দাগে ভরে যাবে।

সংবাদ
অগাস্ট-৪,
১৯৬৮

- চিঠি
- প্রিয় উদ্ধৃতি

পিতাকে লেখা শহীদ সাবেরের চিঠি

শহীদুল্লাহ্ সাবের
ডেটিনিউ
রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল
২০/১১/৫১

আব্বাজান,

আপনাকে লিখেছি অনেকদিন হোল। ইতিমধ্যে আমি সব সময়ই আশা করেছি জবাব পাব। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকদিন হয়ে গেল দেখে আমি আপনাকে আবার লিখছি। পরীক্ষার পর থেকে আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই। আর নিজেকে ব্যস্ত করে রাখার মতো কিছু যখন থাকেনা তখন বন্দী জীবন খুবই দুঃসহ হয়ে ওঠে।

আপনার পর পর অনেকগুলি চিঠি পাবার পর আমি গতবার আপনাকে যে চিঠি লিখেছি তা আপনাকে আঘাত দিয়েছে কিনা জানি না। আমার গত চিঠি পড়ে আপনি যদি দুঃখিত হয়ে থাকেন তবে এটুকু বলতে পারি যে আপনাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। আমি শুধু যা ভালো বুঝেছি তাই আপনার কাছে নিবেদন করেছি।

কিন্তু আমার সে চিঠির জবাব না পেয়ে আমি বেশ চিন্তিত। গত মাস দুই আগে আম্মার কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পাই যে তিনি খুব অসুস্থ। তাঁর সেই টেলিগ্রামের ওপর ভিত্তি করে আমি 'প্রধানমন্ত্রীর' কাছে তার করেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে আম্মার কোন খবরই আমি জানি না। ইতিমধ্যে পেয়ারুর কাছেও চিঠি লিখেছি কিন্তু সেও কোন জবাব দেয়নি। তাই ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছিনা। আশাকরি পত্রোত্তরে সব কিছু বিস্তারিত জানাবেন।

আপনি আমার পড়াশোনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই চিন্তা বোধ করছেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে নির্বাচন এগিয়ে আসলেও কিছুদিনের মধ্যে আমার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নেই। কিছু নিশ্চয়ই দেরী হবে। সুতরাং আমার মনে হয় ১৯৫৩ সালে বি. এ. দেবার অনুমতিটা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে নিয়ে রাখা ভাল হবে। ইতিমধ্যে মুক্তি পেলেও নির্দিষ্ট সময়ে Private Candidate হিসাবে বি. এ. দেওয়া যাবে। তাইমাত্র কয়েকদিন আগে আমি ইউনিভার্সিটির কাছে অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছি। আপনিও চেষ্টা করবেন যাতে অনুমতি পাওয়া যায়।

বি. এ. পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটি কি কি Combinations নিতে দেয় তাও জানা প্রয়োজন। সুতরাং আপনি যদি প্রয়োজনীয় Information সহ detailed syllabus-টা এবং catalogue of books -টা পাঠান তবে বিষয় নির্বাচন করতে আমার খুবই সুবিধে হ'বে।

... ...

আমি কয়েকদিন আগে জনাব রুহুল আমীন সাহেবের কাছে আমাকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করার জন্য দরখাস্ত করেছি। আমার স্বাস্থ্য এখানে ভেঙে পড়েছে। চট্টগ্রামে খাওয়া দাওয়া ও আবহাওয়ার দিক থেকে আমার শরীর কিছুটা ভাল থাকে। তাছাড়া যে সব অসুখে আমি ভুগছি তার চিকিৎসাও এখান থেকে ওখানে ভাল হবে।

আপনি জানেন, সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ আইনসভা East Bengal Safety Act, পাশ করেছে। Act -টা আমার নেহাত দরকার। উক্ত Act -এ প্রাদেশিক গভর্নর মহোদয় কোনদিন Assent দিয়েছেন সেটা জানা দরকার। তাছাড়া আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে Act -টা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন।

আজ আর বিশেষ কিছু লিখলাম না। Act পাঠাবার সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অগত্যা', 'মিনার' প্রভৃতি কয়েকটি মাসিক পত্রিকাও আশাকরি পাঠাবেন। পেয়ারুকে পত্র দিতে বলবেন। রুবি, বাচ্চু, ছোটু, ছবি এরা কেমন আছে। তাদের আমার স্নেহ জানাবেন। আপনি ও আম্মা আমার কদমবুসি গ্রহণ করুন।

ইতি
স্নেহাকাঙ্ক্ষী
সাবের

বন্ধু মাহবুব-উল-আলমকে লেখা চিঠি

শহীদ সাবের
রমনা রেস্ট হাউস
রুম নং ২৯,
রমনা, ঢাকা, ২১.১১.৫৭

প্রিয় মাহবুব,

তোমার পত্র ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। কিন্তু যে ভাবে পত্র লিখেছ, তাতে আর জবাব দেবার উৎসাহ পাইনি। আপাতত অভিনেত্রীর অভাব : পার্শ্ব-চরিত্রের জন্যে। এখান থেকেও নেওয়া হচ্ছে। তার জন্যে পরিপক্ক ডাক-সাইটে অভিনেত্রী হবার কিছু দরকার নেই : প্রয়োজন, টিপিক্যাল বাঙ্গালী চেহারার মুখ, গ্রাম্য, অভিব্যক্তিময়। অভিনয়ে ঝোঁক এবং উৎসাহ থাকলেই চলবে। বাচন ক্ষমতাও গৌণ। যদি সন্ধান থাকে, তবে অবিলম্বে ফটো পাঠাতে বলবে। ফটো ফেরৎ পাঠাব।

তোমাকে কিন্তু এই চিঠিখানা লিখছি এর চেয়েও একটা জরুরী ব্যাপারে। এই ছবিতে গলা দেবার জন্যে হরিপালকে আমি একান্তই জরুরী বলে ভাবছি। পত্রপাঠ হরিপালের সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করবে। তিনি রাজী আছেন কিনা, (২) প্রয়োজনমত টেলিগ্রাম করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে পারবেন কিনা (৩) কোন্ ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠালে তিনি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পাবেন—এ কটি তথ্য আমাকে অবিলম্বে একখানা পোস্ট কার্ড ফেলে জানিয়ে দিও।

হরিপালকে অবশ্যই বলবে যে, টেলিগ্রামের সঙ্গে আমরা তাঁর জন্যে একটা রিটার্ন টিকিটের ব্যবস্থাও করবো এবং যে দু'তিন দিন এখানে থাকার দরকার হবে, সে ক'দিন আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবেন।

এ ছবিতে গলা দেবার জন্য ছেলে-মেয়ে অন্য কেউ যদি আগ্রহান্বিত হয় তবে জানিও।

বিশেষ আর কি। আমার শরীর ভাল। তোমরা দু'জনে অশেষ প্রীতি জেন।

প্রীতার্থী
শহীদ সাবের
২২/১১

পুনশ্চঃ সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা)-এর সময়কার গানের দলের (চট্টগ্রাম) কে কে আছেন জানিও।

প্রিয় উদ্ধৃতি

[ঢাকা জেলে থাকাকালে শহীদ সাবের অনেকগুলো উদ্ধৃতি একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। তার প্রিয় উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি বেছে এখানে দিলাম]

(১) "এইতো জীবনের সত্যকার আনন্দ, যে উদ্দেশ্যকে তুমি নিজেই অতি মহৎ বলে জান, তার সাধনায় ব্যবহৃত হওয়া, বাতিল বলে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই, যেটুকু দেবার শক্তি তোমার মধ্যে ছিল তাকে নিঃশেষে দিয়ে যাওয়া, একটা প্রাকৃতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া। তা নইলে তো হ'তে হয় সদা অস্থির আত্মসর্বস্ব একটা ক্ষুদ্র কর্দমপিন্ড, নানা দুঃখে বেদনায় আর অভিযোগে ভরপুর—তোমাকে সুখী করবার জন্যেই তার সমস্তখানি মনোযোগকে ঢেলে দিচ্ছনা বলেই বিশ্ব-সংসারের সম্বন্ধে অভিযোগে মুখর।"

—জি. বি. এম.

(২) "অন্যলোকে যারা নির্বাসন বা কারাদন্ডে দন্ডিত হয় তারা বেঁচে থাকলেও বাঁচে হতাশায় জীবন্মৃত হয়ে ; আর বিদ্যাব্রতী ব্যক্তির পক্ষে সেই দিনগুলিই হয় জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন।"

—ডিসরেলি

(৩) "পুরোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার একটি মাত্র রীতি ইতিহাসের আছে, সে হচ্ছে কতগুলো নতুন প্রশ্ন করা।"

—মার্কস

(৪) "কর্মই হচ্ছে চিন্তার উদ্দেশ্য। যে চিন্তা কোন কর্মের দিকে প্রেরণা দেয় না, সে পন্ডশ্রম। প্রবঞ্চনা মাত্র। অতএব চিন্তার সেবক যদি আমরা হয়ে থাকি, তবে কর্মেরও সেবক আমাদের হতেই হবে।"

(৫) "কোন জাতিই স্বাধীন হতে পারে না, যতক্ষণ তার জনসংখ্যার অর্দ্ধেক লোক রান্নাঘরে দাসি-বৃত্তি করতে বাধ্য থাকে।"

—লেনিন

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল
৩.৪.৫৩

সাহিত্য কর্ম

- আরেক দুনিয়া থেকে
- এক টুকরো মেঘ
- ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান
- অনুবাদ
- কবিতা

আরেক দুনিয়া থেকে

'আরেক দুনিয়া থেকে' রচনাটিকে কেন্দ্র করেই শহীদ সাবেরের খ্যাতি জলস্রোতের মত প্লাবিত হয়। মূলত সৃজনশীল লেখক হলেও, শহীদ সাবের মানসিক দিক থেকে ছিলেন প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। এ কারণেই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার তাকে কারারুদ্ধ করেন। দৈহিক দিক থেকে কারারুদ্ধ করলেও তার সৃজনশীল শক্তিকে অবরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম লীগ সরকারের ছিল না। স্রোতের অন্তরালে চলছিল অন্তঃস্রোতের পালা। ফল্গুধারার মত প্রেরণা এসে জমাট করে গড়ে তুলল জেলজীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু নিরাপত্তা বন্দী ছিল বলে স্বনামে কিছু প্রকাশ করার অধিকার তার ছিল না। জামিল হোসেন এই নামে তখন তিনি জেলজীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা 'আরেক দুনিয়া থেকে' কোলকাতার 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। 'নতুন সাহিত্যে'র চৈত্র, ১৩৫৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। এই লেখা পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত লেখককে স্বাগত জানান।

'আরেক দুনিয়া থেকে' রোজনামচা জাতীয় রচনা। এটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রসূন। জেলজীবনের নিখুঁত বর্ণনা সমৃদ্ধ লেখাটি যেমন সরস তেমনি প্রাঞ্জল। লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর বর্ণনা রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি। মিঠেকড়ার অদ্ভূত আমেজ সকালের রৌদ্র-দীপ্তির মত মনোরম।

রচনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক জেল জীবনের বিভিন্ন ত্রুটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এখানকার জীবনধারার অব্যবস্থার মাঝ দিয়ে জাতীয় চরিত্রের কোন-রকম সংশোধনই যে হয়না লেখক তাও দেখিয়েছেন। কেবল হাজতে পুরে রেখে মানবিক সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং এখান থেকে এ সমস্যাকে আরো তীব্রতর করে তোলা হয়।

"জমাদার, তার ডাণ্ডামার্কা কাটা ইত্যাদি গুরুগম্ভীর আবহাওয়া মিলে এখানে ভীষণ ভীষণ ত্রাসের জাল বোনা আছে চারধারে। এ ভেঙ্গে প্রতিবাদ করা সোজা নয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে পেটের ক্ষিদে নিবারণ করা যায় না। তারজন্য খাদ্যই দিতে হবে। প্রথমে লোক পেটের দায়ে চুরি করে। তখনো সে চোর হয় না। চুরি তাদের স্বভাবে পরিণত হয় অনেক পরে। অপরাধীর শোধন এখানে হয়না— আরো বেশী করে অপরাধের প্রবৃত্তি জন্মে।"

এখানে একদিকে যেমন আছে আলী আহমদরা অন্যদিকে তেমনি আছে চক্রবর্তীরা। নিপীড়ন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আলী আহমদরা একক বিদ্রোহে সোচ্চার হয়। এ বিদ্রোহ নিজের অন্তর্জ্বালা উদগীরণের মাধ্যমে প্রকাশিত।

4461
গ্রন্থাগার 9.4.83
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ
ঢাকা

"আলী আহমদ বলে, ও আজ পনেরো মাস যাবত হাজত খাটছে। বিচার শেষ হয়নি। শেষ কেন, ধরাই হয়নি তার কেস। সে ঠিক জানে, হয়তো দু'বছর তাকে কাটাতে হবে বিচারাধীন জীবন। তারপর একদিন হয়তো ওর কেস শেষ হবে। শাস্তি হবে হয়তো দু'মাস কি তিন মাসের।

ও পকেটমারার কাজটা শেষ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। জেল খাটার ভয় নেই। কারণ বাইরে না খেয়ে মরার চাইতে ভেতরে খেয়ে মরা ঢের ভালো। কিন্তু দিনের পর দিন যতই যেতে থাকে, তিরিক্ষা হয়ে ওঠে মন। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। মা বাপ তুলে গাল দেয় আলি আহমদ। গাল শুনে বোঝা যাবেনা এটা কাকে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিচারক থেকে শুরু করে, সরকার, রাষ্ট্র, জেল কর্তৃপক্ষ কারো মায়ের সম্মানহানি করতে সে ছাড়বে না।"

আলী আহমদের মত কয়েদীরা যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করে মনের তিক্ততা ঝাড়ে চক্রবর্তীর মত লোকেরা তেমনি রসিকতা করে জেলজীবনের ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমী দূর করার চেষ্টা করে।

"লিয়াকত আলী মার্কিন দেশ ভ্রমণে যাবার সময় সঙ্গে কি নিয়েছিলেন জানো তো ? চক্রবর্তী ছাত্রটিকে শুধোন।

টুনু জবাব দেয়, ১৩৫টি সিগারেট লাইটার।

চক্রবর্তী ঘাড় নাড়েন। না, সঙ্গে নিয়েছিলেন একখানা লিস্ট। পাকিস্তানের সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের নামের তালিকাখানা তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে দেখিয়ে বলেছেন, এই দেখ, এত কমিউনিস্ট ধরে রেখেছি।"

এটাই শহীদ সাবেরের রচনার প্রধান গুণ। পাশাপাশিভাবে দু'টো ধারাকে বহতা রেখে তিনি রচনায় চমৎকার মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। এখানে আছে অত্যাচার উৎপীড়ন ক্ষোভ, আছে ক্লান্তি অপনয়নের প্রচেষ্টা। গান বেঁধে, বক্তৃতা করে, আসর জমিয়ে হৈ হুল্লোড় করে জীবনকে সচল এবং মুখর রাখার যত প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, বেদনার একটা অন্তর্দাহ অচেতন মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সব আয়োজনকে অতিক্রম করে বেদনার এ সানাই মনকে মথিত করে তোলে।

"বাইরের লোক, বিশেষ করে কয়েদী-হাজতীদের সঙ্গে কাটাবার পর যদি এ ওয়ার্ডে আসেন তবে অবাক হবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কত সুখেইতো আছেন।

কিন্তু বন্দীত্বের অভিশাপ তখুনি টের পাওয়া যাবেনা--যাবে বহু পরে। দিনের পর দিন যখন বিনাবিচারে কাটাতে হবে, তখন। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে আসবে না ; বই নেই পত্র নেই যে একটু পড়া যাবে, এমন একটা অবস্থা। শক্ত রোগ—চিকিৎসা নেই। দিনের পর দিন ওজন যখন কমবে, মুখটা যখন বিবর্ণ হয়ে উঠবে, তখনই কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব বন্দীত্বকে।"

এখানেই জীবনশিল্পী শহীদ সাবেরের সার্থকতা। জীবনের বহিরাভাগ দেখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। জীবন প্রদেশের অন্তঃলোকের খবরও তিনি টেনে এনেছেন।

শোলজেনিৎসিনের 'ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একদিন' জেল জীবনের ওপর রচিত উপন্যাস। এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বড় রূঢ়। বর্ণনা পৌঁছে গেছে একঘেঁয়েমীর পর্যায়ে। দৈনন্দিন কাজের রুটিন—শিবিরের হৈ চৈ—শীতে জমে যাওয়া অবস্থা— তুষার পাতের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি সমগ্র বইটিকে একটি নির্দিষ্ট ছককাটা কাঁটাতারের বেড়ায় আবদ্ধ করেছে। রাশিয়ার তুষার পাতের মত সর্বত্র একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি বিরাজমান। কিন্তু শহীদ সাবেরের 'আরেক দুনিয়া থেকে' রচনা উপন্যাস নয়। তবুও এ রচনায় প্রাণ আছে। লেখকের জীবন নিংড়ানো অনুভূতির প্রাখর্য তীব্র। এ যেন সাহিত্যিক আত্মার নির্যাস থেকে গড়ে তোলা সচল প্রতিমূর্তি। সবচেয়ে বড় কথা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে রূঢ় নয়। নীপিড়ণ অত্যাচার ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমীর মাঝেও শহীদ সাবেরের প্রসন্ন মনোলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক মানসের বাক-বৈদগ্ধের অভাব স্নায়ুকে পীড়িত করে না।

"অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের আপেক্ষিক মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা যেরূপ সংকীর্ণ পরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোট গল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সংগতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকা প্রথিতো, শীর্ণ কলেবর জলধারার মতই দেখায়।... আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোটগল্পের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে ; যতটুকু মাধুর্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নেই।"[১]

উদ্ধৃতি বড় হলেও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের জীবনে ছোট গল্পের এত উপাদান এবং আয়োজন থাকা সত্ত্বেও ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটগল্প ছিলনা বললেই চলে এবং রবীন্দ্রনাথও প্রথমে কবি, তারপর ঔপন্যাসিক এবং পরে গল্পকার।

যুগ চেতনার মহা-ঈক্ষণে আমাদের ছোটগল্প আজ বিভিন্ন বোধের রূপকার। সে বোধ একান্তভাবেই বাস্তব-চেতনা প্রসূত। আজ বাস্তবতার নির্ভেজাল স্পর্শে ছোটগল্পের প্রসূণ হৃদয় বাঙ্ময়। রোমান্সের প্রভাব ছিল মধ্যযুগে বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বেদীমূলে। রবীন্দ্রনাথেও রোমান্সের প্রভাব আছে প্রচুর। কিন্তু যুগ বিবর্তনের পাটাতনে রোমান্স হয়েছে স্থানচ্যুত। বাস্তবতা ভীড় জমিয়েছে জীবনের সমস্ত কলরব নিয়ে। সাহিত্যিকরা তাদের অভিজ্ঞতার জারক রসে নিষিক্ত হয়ে আজকের সাহিত্য করেছে সমাজ-সচেতন এবং খাঁটী নির্ভেজাল রোমান্সের মোহমুক্তির ঘটিয়েছে অবসান।

ফলে সঙ্গত কারণেই এ দেশের সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবন-নিষ্ঠ এবং মননধর্মী। একজন গল্পকার জীবনকে যেভাবে দেখেছে, যেভাবে উপলব্ধি করেছে সেভাবেই জীবনের চারিত্র্য দান করবার চেষ্টা করেছে। তাই এখানকার গল্পকারের মনোভাব পলায়নমুখী নয়। বরং হাসি-কান্নায়, সুখ-দুঃখে, অভাবের তাড়নায়, দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে, প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে, ধর্মের পায়ে বলির শিকারে পরিণত হবার চেতনায় নীল হয়ে উঠেছে। এক কথায় জীবনের মুখোমুখী হবার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এসব থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্ধকার নৈরাশ্যের পালকে মুখ গুঁজে দেয়নি কিংবা হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে মুখ থুবড়ে পাঁকে পড়েনি। বরং জীবন সংগ্রামের উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে জীবনের প্রতি

---

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

বিশ্বাসী হয়েছে। তাই এদের রচনা হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ রূপায়নে অকৃত্রিম এবং শিল্পসুন্দর।

শহীদ সাবেরের ছোটগল্প গ্রন্থ 'এক টুকরো মেঘ' এ সত্যের বাহক। এ গ্রন্থের গল্পগুলোর অকৃত্রিম প্রাঞ্জলতাই শহীদ সাবেরের মুন্সীয়ানা। সামাজিক পটভূমিতে চরিত্রগুলোর বেড়ে ওঠার মধ্যে কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। অথচ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনচারণার মধ্যেও যে তীব্র যন্ত্রণা— সে মানসিকতা অনুধাবনেও শহীদ সাবের ব্যর্থ হননি। ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় বিধ্বস্ত মানসিকতা তার গল্পের মূল উপকরণ। মানুষ স্বপ্ন দেখে—ভাঙ্গে সে স্বপ্ন তবুও জীবনের অতল থেকে আশাবাদী সঙ্গীতের ধ্বনি মনকে আচ্ছন্ন করে। চৈত্রের ঝরাপাতায় যে রিক্ততা আর হাহাকার মর্মরিত বসন্তের নবকিশলয় সে শূন্যতায় প্রলেপ দিয়ে যায়। জীবন আবার জেগে ওঠে। স্বপ্ন আবার গান হয়ে ভেসে আসে। শহীদ সাবেরের গল্পে এ চেতনাই প্রতিফলিত। সমাজের মেরুদণ্ডহীন অর্থনৈতিক কাঠামো কিভাবে জীবনকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে—কিভাবে মানুষ মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে কিভাবে অসহ্য যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মঘাতী হচ্ছে সব কিছুই শহীদ সাবেরের রচনায় স্থান করে নিয়েছে। অথচ কোথাও কোন বৈষম্য নেই—কোন বিচ্যুতি নেই। চিরন্তন সংগ্রামের মাঝ দিয়েই জীবনের ভাস্কর তার মূর্তিটি রচনা করতে পারে —এই ছিল শহীদ সাবেরের সাহিত্যকর্মের মূলকথা।

'এক টুকরো মেঘ' দশটি গল্পের সংকলন।

গল্পগুলো হোল এক টুকরো মেঘ, বিষকন্যা, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, জসু ভাবীর জন্য, দেয়াল, যে গল্প কেউ বলেনি, যৌবন, চালচুলো, ছেলেটা, শেষ সংবাদ।

'এক টুকরো মেঘ' সেই সমাজ ব্যবস্থার ছোট্ট একটি কাহিনী যেখানে যুবশক্তির বিনষ্টির জন্য কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়ায় আনু। আর চাকরী না পাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠে পারিবারিক জীবনে। আসলে এ সমস্যা শুধু আনুর একার নয়। এ সমস্যা অসংখ্য বেকার যুবকের। অথচ এ সমস্যার দায়ভার কারো নয়। কেননা এখানে ষড়যন্ত্র করেই যুবশক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। অবশ্য গল্পের শেষের দিকে শেষ পর্যন্ত চাকরী হয় আনুর। বিপর্যস্ত দম আটকানো পারিবারিক জীবনে খুশীর ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়। মনে হয় গল্পের পরিণতিতে একটি রুগ্ন রোমান্টিকতা লেখককে আচ্ছন্ন করেছে। নইলে সমাজের একটুখানি উপরিপাওনাতেই উচ্ছ্বসিত হয়েছে আনু। সামগ্রিক সমস্যার গভীরতা ভাবায়নি তাকে। এবং তার জন্য বেদনার্ত হয়নি আনু। অবশ্য প্রথম গল্পের এ জোলো রোমান্টিকতার ফাঁকটুকু লেখক পুষিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী অনেকগুলো গল্পে।

'বিষকন্যা' মায়মুনা নামক নারী-চরিত্র সম্বলিত একটি গল্প। এ গল্পটিতে একদিকে যেমন গ্রামীন সমাজব্যবস্থার এক টুকরো ক্ষয়িষ্ণু চিত্র দেখা যায় অন্যদিকে তেমনি নারী মনস্তত্ত্বের ভূমিকাটাও মুখ্য হয়ে ওঠে। মায়মুনা গাঁয়ের সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না।

"দূর থেকে মায়মুনার আসার সাড়া পেলেই বউ-ঝিরা ছেলে-পিলে বাইরে থাকলে ঘরে ডেকে নেয়। চঞ্চল ছেলের চোখে ঘুম না এলে তাকে ভয় দেখায়, ঘুমা, ঘুমা, ঐ বিষল্যা আসছে। আর মায়মুনার আসা! এসে পড়ার বহু পূর্বেই তা টের পাওয়া যায়। পথ চলতে মায়মুনার ঠোঁট দুটো নড়ে। মুখ দিয়ে বেরুতে থাকে অনর্গল বকুনি। গালাগাল। কাকে বকছে, কাকে গাল পাড়ছে, বহুক্ষণ অনুধাবন না করলে কিছুই বোঝার উপায় নেই।" (পৃঃ ১২)

এহেন মেয়েকে পাড়ার সবাই ভয় করে। পারতপক্ষে কেউ সামনে পড়ে না। এড়িয়ে চলতে পারলেই বেঁচে যায়। কেননা 'বৃহৎ আয়ত দু'টি চোখ, কিন্তু তাতে শান্তির চেয়ে আগুনই বেশী।...পথ চলতে কেউ যদি হঠাৎ ওর দিকে নজর দেয় তবে অনর্থ হয়ে যাবে সেদিন। তার সাতপুরুষ উদ্ধার করতে সময় লাগবে সাত ঘন্টারও বেশী।' (পৃঃ-১৪)। তবুও বিয়ে হয়েছিল মায়মুনার। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল ময়মুনার স্বামী কালু কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই

গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে। মাসের পর মাস ধৈর্য ধরার পরও কালু যখন ফিরে এলোনা মায়মুনা তখন আরো উগ্র হয়ে উঠলো। এখন শুধু ঝগড়া নয়। মেয়েদের সঙ্গে চুলোচুলিও হয়।

অথচ একদিন সন্ধ্যায় কালুর মত এক ব্যক্তিকে ওদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মায়মুনার কঠিন হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে। ভালবাসার নরম স্পর্শের প্রলোভনে উন্মুখ হৃদয় মায়মুনা। "মায়মুনা পাশের ঘরে ছুটে গেলো। কেউ সেই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পড়লে দেখতে পেতো মায়মুনার চোখের ভাঁটা দুটো সেখানে আর নেই। সেখানে দুটো চোখ মায়া দিচ্ছে।" আশ্চর্য মায়মুনা। আর এই সমান্য কটি লাইনের মধ্য দিয়ে মায়মুনার সমস্ত অন্তরটা যেন প্রতিফলিত হয়ে যায়। মনে হয় বাইরের লোকের সঙ্গে মায়মুনার যে আচরণ তা কেবল নিজেকে লুকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস। আসলে মায়মুনার সঘন আকাঙ্ক্ষা আছে। ইচ্ছের বিন্দুগুলো অহরহ হৃদয় সমুদ্রকে আলোড়িত করে। কিন্তু গল্পের পরিণতি বড় বেদনাবিধুর। যে লোককে এগিয়ে আসতে দেখে মায়মুনার হৃদয়ের বরফ গলতে শুরু করেছিল সে লোক তার বাঞ্ছিত পুরুষ নয়। সে লোক মতলব মাস্টারের বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা গরু কেনার জন্য। আর তখনই ঘরের মধ্যে বসে আশাহত সেই নির্মম কণ্ঠস্বর শুনে "ততক্ষণে ওর চোখের খাঁজে ভাটা দু'টো আবার জ্বলে উঠেছে।"

এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। ছোটগল্পের প্রাণবেগ চমৎকার একটা পরিণতি পেয়েছে। বিষকন্যা মায়মুনার অন্তরটা ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত করে লেখক তা আবার সযত্নে বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ ঐ ক্ষণিকের মাঝেই মায়মুনার সমস্ত সৌন্দর্য সামগ্রিক গল্পকে ছাড়িয়ে গেছে। এক বেদনার সানাইয়ের সুর পাঠক হৃদয়কে মথিত করে।

'প্রাণের চেয়ে প্রিয়' গল্পে আদর্শের সঙ্গে আপোষহীন দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছেন লেখক। রাজনীতির দায়ে ধরা পড়ে কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকে গল্পের নায়ক। বাবার শত আদেশ উপদেশ অনুরোধ তাকে তার আদর্শ থেকে টলাতে পারে না। মার স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা সবকিছুই তাকে আলোড়িত করে-কিন্তু পথে টানতে পারে না। কিছুতেই বন্ড সই করে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে রাজী হয়না নায়ক। এখানেই লেখকের মৌলিকতা। জীবনের সঙ্গে প্রতারণা করে না তার নায়ক। জীবনকে আঁকড়ে ধরে পরাজয়ের গ্লানিতে বিকিয়ে দেয়না বিবেককে।

শহীদ সাবেরের নায়ক ভাবে "পলিটিক্সের জন্য মানুষ জন্ম নেয়নি। মানুষের জন্যেই পলিটিক্স। রাজনীতি মানুষের জন্য। একান্তভাবে মানুষের জন্য, সে রাজনীতির একজন ছাত্র হচ্ছি আমি। জীবনের ওপর থেকে বাধার পাষাণ পাথর সরিয়ে দেওয়াইতো মানুষের রাজনীতি।" (পৃঃ-৩৪)

'জসুভাবীর জন্যে' গল্পে নারী নির্যাতনের এক করুণ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। মানুষের সেই আদিম হিংস্র প্রবৃত্তিগুলো এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যারা তুচ্ছতম প্রতিশোধের স্পৃহায় একটি মেয়ের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। এই পাশবিক উল্লাসকে লেখক নারী হৃদয়ের অন্তঃসলিলা বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে ভারবাহী করে তুলেছেন। এগল্পে লেখক অল্প দু'এক কথার মাঝ দিয়ে জমিদার শ্রেণীর চরিত্রক উদ্ঘাটিত করেছেন। হরিণ ধরতে না পারার অপরাধে রহমতের মাসের বেতন কাটা যায়—ঝগড়া বিবাদ উপলক্ষে জসুদের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হয় ইত্যাদিকার চিত্রগুলো যথার্থ।

বর্ণনাধর্মী গল্পটির স্মৃতি চারণায় লেখকের শৈশব জীবনের একটি ছবি ভেসে ওঠে। মনে হয় গল্পচ্ছলে লেখক জীবনের ছোট্ট একটু স্মরণীয় অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন। তার মামা ছিল জমিদার। জমিদার বাড়ীর খুঁটিনাটী বর্ণনা—মা বাবার সঙ্গে শহরে যেতে চাইতোনা। এসমস্ত কথাগুলো শুধু গল্পের জন্য নয় এর মধ্যে লেখকের জীবনের যোগও যেন আছে। লেখকের শৈশব স্মৃতি চারণার মধ্যদিয়ে জসুভাবীর কথাগুলো জমিদার বাড়ীর প্রকোষ্ঠের অন্তরালে গুমরে মরে—"তোমাকে অনুরোধ যদি এদের হিংস্রতার দম্ভ শেষ পর্যন্ত আমার জন্য দন্ডই বয়ে আনে, তাহলে আমার মত এক অভাগিনীর জীবন নিয়ে একটা গল্প লিখো।" (পৃঃ-৭৩)

'দেয়াল' গল্পটি জেল জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। জেলখানার দেয়ালের পাশে দু'জন কিশোরের ডিউটি দিতে হয়। একজন সান্ত্রী। অন্যজন কোণার পাহার। যতদিন তারা কর্তব্যরত ছিল ততদিন কারো মধ্যে কোন আলাপ জমে ওঠেনি। কিন্তু অসুস্থতার দরুণ জেল হাসপাতালে আসার পর দু'জনের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কেননা এখানে তাদের কারো কোন ডিউটি নেই। অথচ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কেউই দু'জনের মধ্যে আর সে উষ্ণতা খুঁজে পেলো না। মামুলী কথা ছাড়া কেউ প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারল না। ওরা অনুভব করলো যে দেয়ালটার পাশে ওরা ডিউটি করে সে দেয়ালটা ছাড়াও ওদের মাঝে আর একটি দেয়াল গড়ে উঠেছে। সেই অনাবিল বন্ধুত্বের আমেজ ভরা হাসপাতালে ফেলে আসা দিনগুলোয় ওরা কেউ ফিরে যেতে পারে না।

"মাতু তাকিয়ে আছে সান্ত্রীর খাকী পোষাক আর হাতের বন্দুকটির দিকে।"

গল্পটির মধ্যে কিশোর মনস্তত্ত্বের সুন্দর ছায়া আছে। এবং ছোট্ট টুকরো টুকরো সংলাপ ও আচরণের মাঝ দিয়ে তার চমৎকার উদঘাটন হয়েছে। এটি একটি সুখ-পাঠ্য গল্প।

'যে গল্প কেউ বলেনি' কোন একটি গ্রন্থের আত্মকথা জাতীয় রচনা। জোলো এবং প্যানসে। শহীদ সাবেরের দক্ষ মুন্সীয়ানার কোন পরিচয় বহন করে না।

'যৌবন' গল্পের মধ্যে যৌবনের বেপরোয়া উদ্দামতাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যৌবন কেমন সপ্রতিভ হতে পারে এ গল্পের মূল আবেদন তাই। 'চালচুলো'

একটি নিরীহ গল্প। বক্তব্যের অসাধারণতা বা কাহিনীর আমেজ পাঠক হৃদয়কে স্বস্তি দেয় না।

‘ছেলেটা’ একটি অপূর্ব ছোট গল্প। বক্তব্য যেমন হৃদয়স্পর্শী আঙ্গিক তেমনি নিটোল। ছোট পরিসরে একটি ছোট হৃদয়ের অব্যক্ততা লেখক বড় নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ছেলেটির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নির্লিপ্ততা রয়েছে যা সমগ্র গল্পটিকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। মার অসুস্থ অবস্থায় মার কাছে যাবার জন্য সে ব্যাকুল। ভায়েরা বলল সোনাদিয়া নিয়ে যাবে। কিন্তু সে যাবেনা। মার কাছেই যাবে। মার মৃত্যুর পর সে যখন সোনাদিয়া যাবার জন্য কান্না জুড়ে দিল তখই মনে হয় সব হারানোর বেদনা ও বড় নির্মমভাবে বুঝতে পেরেছে। এখানেই শহীদ সাবেরের বিশেষত্ব। অনেক কথা বলে তিনি বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করেননি বা ছেলেটির চরিত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি। নেপথ্যে থেকেই তিনি যেন আবহ সঙ্গীতের সুর বাজিয়েছেন। আর লেখকের নেপথ্য থাকার এই ভূমিকাটুকু গল্পটিকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

“পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে দেওয়া চাদরখানি আলগা করে মায়ের মুখখানি দেখানো হলো তাকে। গত চব্বিশ ঘন্টায় মানুষটার চেহারার যা পরিবর্তন হয়েছে, বিশ বৎসরেই তা ঘটা সম্ভব। যন্ত্রণায় দীর্ণ, বিবর্ণ, মৃত। ছেলেটা কাছে ভিড়ল না। কেবল দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল।

যথা সময়ে দাফন হয়ে গেলো মৃতার। ছেলেটাও সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু একটুও কাঁদেনি।

কাউকে তার হাতও ধরতে হয়নি। নিজ থেকে হেঁটে গিয়েছে। ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। উঠে এঘর ওঘর খুঁজলো অনেক।

তারপর হঠাৎ মবিনের কাছে এসে কান্না জুড়ে দিল, সোনাদিয়া যাব।

সবাই তাকে অনেক বোঝালো, সোনাদিয়া অনেক দূর। সেখানে রাক্ষস, ছোট ছেলেদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে। কিন্তু কিছুতেই তাকে মানানো যায়না। সে খালি বলে সোনাদিয়া যাব।”

ছোট হৃদয়ের আকুলতার রেশ জাগিয়ে রেখে গল্পটি শেষ হয়েছে। এবং এর চাইতে সহজে ও গভীরভাবে আর্তি প্রকাশের ভাষা ছেলেটির জানা নেই। এ কারণেই গল্পটির আবেদন বড় হৃদয়গ্রাহী।

এ গ্রন্থের শেষ গল্প ‘শেষ সংবাদ।’ এক সাংবাদিকের চাকরী যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে রচিত। রফিক ‘বিশ্ববার্তা’ পত্রিকায় চাকরী করে। সাংবাদিক

রফিক যখন তার সংগ্রহ করা শ্রেষ্ঠ খবরটি প্রকাশের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই আরেকটি কাগজে খবর বেরুলো যে উক্ত 'বিশ্ববার্তা' পত্রিকাটিই বন্ধ হয়ে গেছে। রফিকের সংগৃহীত খবরটি আর কোনদিন বেরুবে না এবং 'বিশ্ববার্তা' পত্রিকায় তার আর কোন চাকরী নেই। গল্পটি যেন একটি গতানুগতিক পরিণতিতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

"এক টুকরো মেঘ" গল্প সংকলন ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত। গল্পগুলো তাঁর আগে লেখা। শহীদ সাবের তখন বয়সে তরুণ। দেশ বিভাগের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আমাদের শিল্প-সাহিত্যে অস্থিমাংস সংযোজন হতে শুরু হয়েছে কেবল। তখন প্রতিশ্রুতি নিয়ে লিখছিলেন শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন-আল-আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ তরুণের দল। গুণগত বিচারে শহীদ সাবেরের সব গল্প দীপ্তিবান না হলেও তরুণের দলে তার একটা উজ্জ্বল স্বীকৃতি ছিল।

অপরপক্ষে কালগত দিক থেকে শহীদ সাবেরের রচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। কেননা পূর্ব বাঙলার উঠতি সাহিত্যের যে গতি ছিল সে গতিতে শহীদ সাবেরের সাহিত্যের এক বৈশিষ্ট্যময় স্রোত ছিল। সে বৈশিষ্ট্য খণ্ড চিত্রকে অখণ্ডতায় আবদ্ধ করে তার সামগ্রিক সম্প্রসারণ।

অবশ্য একথা সত্য শহীদ সাবেরের ছোটগল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষার অভাব খুব প্রকট। সাহিত্যকে তিনি কখনো সাহিত্যিক গবেষণাগারের মানদণ্ডে পরিশোধন করেননি। শহীদ সাবেরের গল্প রচনা করার মূলধন তার অপরিসীম দরদ এবং আন্তরিকতা। তার গল্পগুলো এ সত্যের পরিচায়ক। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, তাদের ব্যথা বেদনা হাসি আনন্দে শরীক হয়েছেন কিন্তু যে সুগভীর জীবন-প্রত্যয় উপলব্ধির শুভ উদ্বোধন ঘটায় তার অভাব যেন চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। গ্রন্থের সর্বত্র তার আন্তরিকতা পরিব্যাপ্ত কিন্তু অভিজ্ঞতার রঙধনু আলোকে জীবনবোধের লুকোচুরি-ছায়ায় রৌদ্রদীপ্তি খেলেনি। তার গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে অনন্য কিন্তু মননশীল বৈদগ্ধ কম। তাই তার গল্পগ্রন্থে গল্পরসের আমেজের সঙ্গে শিল্প চিৎ-প্রকর্ষের উত্তরণ ঘটেনি। ছোট গল্পের বিশ্লেষণী চাতুর্য, মনোভংগীর সৌকর্য, গল্পের তীব্র তির্যক মধুরতা যেন অনেক কম। আধুনিক মননশীলতার পরিচর্যাও তিনি করেননি।

সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে বাস্তবধর্মীতাই শহীদ সাবেরকে আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে বেশী। ফলে তার রচনা শিল্প-সৌন্দর্যে বলীয়ান না হয়ে হয়েছে প্রাণরসের মাধুর্যে ভাস্বর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে "প্রাণ ছাড়া যেমন সুসজ্জিত সালংকারা তন্বি-দেহও মূল্যহীন, তেমনি গল্পের রসরূপ ছাড়া আঙ্গি-

কের বৈচিত্র্য ও রকম ফেরেরও কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। শুধু কলাকৌশলের দীপ্তি ও অভিনবত্ব পাঠকের মনে কখনও দীর্ঘস্থায়ী দাগ কাটতে পারেনা।”[২]

সেজন্য বলতে হয় শহীদ সাবেরের ‘এক টুকরো মেঘ’ গল্প সংকলনে আঙ্গিক-গত শিল্প-চাতুর্যের চমক নেই সত্য কিন্তু প্রাণ আছে। সে প্রাণ সাহিত্যরসের ধারাকে উজ্জীবিত করে।

---

[২] আবুল ফজল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা পৃঃ—২৩২

ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

শহীদ সাবেরের ছোটদের সংকলন 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান'। এতে আছে নয়টি গল্প। গল্পগুলো হলো, দুষ্টু ছেলে, বাবা সমানভাগ, ছেলেধরা, বুদ্ধি যদি থাকে, বন্ধু, ছবি দেখতে গিয়ে, ওরা আছে ও ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান।

গল্পগুলোয় আছে নির্মল কৌতুক রসের সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি নীতি-কথার স্পর্শ—বাস্তবের রূঢ় ছবি—নিত্যদিনের না পাওয়ার বেদনা। তবে গল্পের মূল উপাদানকে ব্যাহত করে নীতিকথা তার প্রাণরসকে হরণ করেনি। দু'একটি গল্প ছাড়া আর সব গল্পে লেখক কচিমনের একই সারিতে দাঁড়িয়ে নিজের বয়েসী হিসেব ভুলে কৈশোরের অনাবিল মাদকতায় মেতে গেছেন। আবার কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হতে গিয়েও পারেননি। দারিদ্র্যের গুরুভার মনকে বেদনার্ত করে তুলেছে। এ হয়েছে শহীদ সাবেরের সামাজিক সচেতনতা থেকে। কিশোরের উচ্ছ্বাস সব সময় সমান তালে চলতে পারেনা যদি না তার সঙ্গে থাকে অর্থনীতির সম্প্রীতি।

"মায়ের পেট থেকে পড়েই দোলনার পরিবর্তে যে লুটোপুটি খাচ্ছে ধুলোয়, চোখ খুলেই রঙ্গীন খেলনার পরিবর্তে যে দেখছে ক্ষুধা, কান খাড়া করেই ঘুম পাড়ানো গানের পরিবর্তে যে শুনছে কারখানার সাইরেন, তার চোখে থাকতে পারেনা বিভ্রান্তির কুয়াশা, তার কানে বাজতে পারেনা এলোমেলো কল্প-হাওয়ার গুঞ্জন। পৃথিবীতে পড়েই সে জীবনের সামনা সামনি এসে দাঁড়ায়। মনের জাগরণেই প্রথম যা সে অনুভব করে তা হোল সে শোষিত ; বুদ্ধির উন্মেষেই প্রথম যা সে বুঝতে পারে তা হোল, পৃথিবীতে তাকে স্থান করে নিতে হবে।"

শহীদ সাবেরের গল্প সংকলনের কতগুলো গল্পের ক্ষুদে চরিত্রে এ বোধ চিত্রিত হয়েছে। কল্পনার মায়াপুরী এখানে নেই। নেই লাল কমল নীল কমল। দৈত্য দানব তেপান্তরের মাঠ। এখানে নেই সোনার গাছের সোনার আপেল—দুধ সরোবরে রাজহাঁসের বিরাট প্রাসাদ। শহীদ সাবের সব পেয়েছির দেশে যায়নি। কল্পলোকের ভুবন গড়েনি। শহীদ সাবেরের ক্ষুদে মানুষগুলো দোলনায় দোল খায়নি—রঙ্গীন খেলনা দেখেনি—ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনেনি। তাই এ গল্প সংকলনে আছে ভিন্নতর দুষ্টুমী—আছে জিজ্ঞাসা—কৌতুহল এবং বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা।

সংকলনের প্রথম গল্প 'দুষ্টু ছেলে' গোরা নামক এক দুষ্টু ছেলেকে কেন্দ্র করে রচিত। অন্যকে পীড়ন করে মজা করে গোরা। আনন্দ পায়। অথচ এ আনন্দ যে সত্যিকার আনন্দ নয় স্কুলের বাঙলার শিক্ষক অশোক বাবু গোরাকে এ কথাটাই বুঝিয়ে দেন।

"দুষ্টামী জিনিসটাই ভারী মজার। কিন্তু মজাতো অনেক কিছু নিয়ে হতে পারে। অপরকে কষ্ট দিয়ে যারা মজা পায় আসলে তারা মজার কিছুই বোঝেনা। যা কিছু কর এমনভাবে কর যাতে নিজেও আনন্দ পাও, অপরেও খুশী হয়। তুমি একা দুষ্টামী করে মজা করবে, আর অন্য একজন তার ফলে কষ্ট পাবে, সত্যিকার দুষ্টামীর নাম এ নয়।"

গল্পের শেষে অশোক বাবুর ক্লাশে দুষ্টুমী করার অপরাধে গোরা যখন অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে থাকে তখন তিনি তাকে সত্যি অর্থে দুষ্টু ছেলে হবার জন্য আশীর্বাদ করেন। দুষ্টুমীর মায়া দিয়ে একটি নির্মল আনন্দরসের প্রবাহ এ গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে।

'বাবা' গল্প সেই কিশোরের কাহিনী অর্থের গুরুভার যার আনন্দকে স্তব্ধ করে দেয়। রেশন আনতে গিয়ে সে সিনেমার জন্য পয়সা চুরি করে। সে পয়সা সিনেমা দেখে। তবুও শেষ রক্ষা হয়না। সে আনন্দও বিস্বাদ হয়ে যায় যখন বাবার কণ্ঠ থেকে বেদনার্ত ধ্বনি ভেসে আসে। দুপুরে খেতে না পারার দরুণ বাবা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে বলে,

"খেয়ে যেতেও পারিনি ; বড্ড ক্ষিদে লেগেছিল। টিফিনের পয়সায় কিছু খাব মনে করলাম, আর হোলনা। হোটেলে ঢুকলে একটা টাকা খরচ নির্ঘাৎ। এক টাকা বাঁচাতে পারলে শামীমের শার্ট সেলাইয়ের মজুরী দেওয়া যাবে। সামনে ঈদ আসছে। বাবা চুপ করলেন। শামিমের মনে হোল গোটা লাইট হাউস ছবিঘরটা যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়লো।"

শামীম নামক কিশোরের সব আনন্দ এখানেই ফুরিয়ে যায়। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সব দীনতা এসে আনন্দের সোনার আপেল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শামীমের জীবনের লাল কমল নীল কমলের রঙ ফিকে হয়ে যায়।

'সমানভাগ' গল্প দু'ভায়ের বিবাদকে কেন্দ্র করে রচিত। শেষ পর্যন্ত ছোটভাই বড়ভাইর কাছে হেরে যায়।

'ছেলে ধরা' গল্পটিতে একদিকে যেমন আছে নিষ্ঠুর কৌতুক অন্যদিকে তেমনি সমাজের এক শ্রেণীর লোকের হঠকারিতার কথা। নিষ্ঠুর কৌতুক বলছি এ জন্য যে এ গল্পরসের কৌতুকে নির্মল আনন্দ বলতে বাধে। কেননা এর পশ্চাতে আছে সামাজিক গ্লানি ও ক্লেদ। মার প্রশ্রয় পেয়ে ছেলে রাস্তার ধারে বসে কাঁদে এবং হারিয়ে গেছে এ ধরনের ভান করে। কোন লোক দয়াপরবশ হয়ে বাড়ী পৌঁছে দিতে চাইলে তাকে এখানে নয় ওখানে বলে ইচ্ছামত ঘোরায় এবং কিছু টাকা পয়সা আদায় করে। ঢাকার ছেলে রশীদ কোলকাতায় বেড়াতে গিয়ে এমনি একটি ছেলের পাল্লায় পড়ল। অনেক রাস্তা ঘুরে—অনেক নাকানি চোবানি খেয়ে ওকে যখন বাড়ী পৌঁছিয়ে দিল তখন ওর মা বলল, "তোমার কপাল ভালো যে, চার পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে। পরশুতো খেয়ে দেয়ে পনেরো টাকা ঘরেই এনেছে। আয় ভোম্বল, ঘরে আয়।"

হতভম্ব রশীদ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যারা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল তাদের একজন রশীদকে বলে,

"ও ছেলে সব চেনে মশাই। রোজ ও অমনি করে দূর জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁদে আর লোকের গাঁটের কড়ি খসায়। আপনার বাড়ীতো ঢাকায়। বাড়ী গিয়ে বলবেন, কোলকাতায় ছেলে ধরাই নেই, বুড়োধরা ছেলেও আছে।"

এ ক্ষুদে চরিত্রের অপরাধী বিবেক নেই। মার প্রশ্রয় তাকে বরং রোজগারের পথ বাতলে দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে সমাজের এ পঙ্কিলতা শিশু মনকে দূষিত করছে। এবং এ সমাজ ব্যবস্থায় এ হতে বাধ্য। ছেলেরা কেমন করে কোনখান দিয়ে বখাটে হয়ে যাচ্ছে তাতে কার কি আসে যায় ?

'বুদ্ধি যদি থাকে' গল্পটি ঝুনু নামক ছেলেটির ঘড়ি ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত। নিজে ঘড়ি ভেঙ্গে ছোট ভায়ের ওপর দোষ চাপিয়ে রক্ষা পায় সে। এখানে কিশোর মনের অপরাধী চিত্রকে তুলে ধরেছেন লেখক।

'ছবি দেখতে গিয়ে' গল্প লেখকের সমাজ সচেতন মনের সৃষ্টি। হঠকারী করে একদল লোক কিভাবে পয়সা অর্জন করে এবং অন্ধবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষ তার খপ্পরে পড়ে কিভাবে সর্বস্ব হারায় তার স্বরূপ এখানে উদ্ঘাটিত। তবে কাহিনী নির্মাণে লেখক নাকের ডগায় চশমা এঁটে পাণ্ডিত্য দেখাননি। তাকে কিশোর মনের উপযোগী করে গড়েছেন। হাস্যরসের ছোঁয়াচে প্রাণবন্ত করেছেন।

'ওরা আছে' গল্প কৌতুকরসের উচ্ছাসে ভরপুর। ভূত আছে কিনা তাই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত। অবশ্য পরিশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে ভূত বলে কিছু নেই। এটি একটি সুখপাঠ্য গল্প।

'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' কিশোর মনের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের কাহিনী। অসংখ্য ডিটেকটিভ বই পড়ে খোকা নামক ছেলেটির মনে সারাক্ষণ ঐ ধরণের ঘটনা আনাগোনা করতে থাকে। পাড়ার এক বাড়ীতে নাটকের রিহার্সেল দেখে খোকা চমকিত হয়ে থানার দারোগাকে খবর দেয়। পরে ব্যাপারটা এক হাস্যকর পরিণতিতে এসে দাঁড়ায়।

"থানার ও-সি তথায় গিয়া আইঢাই সংঘের প্রসিদ্ধ অভিনেতা মমতাজ-উদ্দীন সাহেবকে দেখতে পান। ঘরের মধ্যে ঢোল, তবলা, পোষাক এবং একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিও তিনি দেখিতে পান। পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন। কিছুক্ষণ পূর্বে বালকটি যখন সেই পথ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন নাটকের মহড়া চলিতেছিল। বালকটিকে যথোপযুক্ত ধমক দিয়া ও-সি বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যদিয়া তাহার নিকট হইতে জানা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনী তাহার অত্যন্ত প্রিয়। মোট ১৮০ খানা মোহন সিরিজ, ১৮৯ খানা সেক্সটন ব্লেক, সব কটি কেনান ডয়েল, নীহারগুপ্ত, পাঁকড়ি দের সব ক'খানা গোয়েন্দা গ্রন্থ সে ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছে।

ছেলেটি আগাথা ক্রিস্টির নাম শুনিয়াছে। তবে ইংরেজী জানা না থাকায় এখনও শুরু করিতে পারে নাই।"

রোমাঞ্চকর কল্পনার আকাঙ্ক্ষা কিশোর চরিত্রের চিরকালীন সত্য। কল্পনার ভাবনায় ভর করতে পারলে কিশোরের ভাবনা লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। বিশেষ করে অপরাধী সিরিজের বই কিশোর মনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' সেইসব বালকের কাহিনী যারা এডভেঞ্চার ভালবাসে।

'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' ছোটদের জন্য শহীদ সাবেরের প্রথম সংকলন। এর প্রকাশকাল ১৯৫৮। পূর্ব বাঙলার উঠতি সাহিত্যে তখন শিশু-গ্রন্থ ছিলনা বললেই চলে। সেদিক থেকে এ গ্রন্থ মিছিলের পুরোভাগের একজন বলে দাবী করতে পারে।

কবিতা

"নক্ষত্র যে অগ্নিময় জ্যোতিষ্ক তাহা নক্ষত্রের বিশেষত্ব, কিন্তু নক্ষত্র যে রহস্যময় সুন্দর তাহা আমার আত্মার বিশেষত্ব বশতঃ। যখন আমি নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্ক বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রকেই জানি, কিন্তু যখন আমি নক্ষত্রকে সুন্দর বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমার আপনার হৃদয়কেই অনুভব করি।"[১]

শহীদ সাবেরের কবিতা পাঠ করতে গেলে পাঠক হৃদয়ের এ অনুভবের মাত্রা বিস্তার করতে হবে এবং কাব্যরসের প্রাণশক্তির উৎস খুঁজতে হলে আপনার হৃদয়কেই অনুভব করতে হবে। নইলে ব্যর্থ গানের পসরায় কবিতা গুরুভার হয়ে উঠবে।

শহীদ সাবেরের কবিতার কোন সংকলন নেই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলো আমি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করেছি। সংবাদ অফিস এবং ইত্তেফাক অফিস পাকবাহিনী ধ্বংস করার ফলে কিছু কিছু কবিতা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি তিনি চট্টগ্রাম জেলে বসে লিখেছিলেন। আর সমস্ত কবিতা তিনি মানসিক অসুস্থতার মাঝে লিখেছেন। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার। আর এজন্য বেশীরভাগ কবিতায় ভাবের গ্রন্থি শিথিল হয়েছে—এলোমেলো হয়েছে—খাপছাড়া হয়েছে। তবুও এর মাঝে কতগুলো পংক্তি স্বকীয়তার আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়েছে। চেতনার ভাবনাগুলো নির্দিষ্ট আকাশে ডানা মেলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মাঝপথে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। মনেহয় এখানেই শহীদ সাবের হারিয়ে গেছে।

'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি ইলামিত্রের গ্রেপ্তার এবং তার উপরে অনুষ্ঠিত নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব বাঙলার আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল। আর সে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইলামিত্র। ইলামিত্র ছিল সাঁওতাল কৃষকদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী। ইলামিত্রের গ্রেপ্তারের পর মুসলিম লীগ সরকার তার ওপর যে নির্যাতন চালান তখনকার দিনে তা এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। এ কবিতা তরুণ শহীদ সাবেরের প্রাণের প্রচন্ড আবেগে রচিত এবং তার একক বিদ্রোহী কণ্ঠ লীগশাহীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণভাবে সোচ্চার। কবিতার লাইনে লাইনে শহীদ সাবেরের নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করা যায়।

যেমন—
মাগো ক্যাপ্টেন ভের্ণের কি বুঝবে বলো
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলাদলে

---

[১] সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ-২৩১

স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে—
পররাজ্য লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা।

……

তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারুণ যন্ত্রণা বলো
একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ড ঃ আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে
কাঁদছে শিশুটি পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শের আবেগে,
কেউ কোথাও নেই। কেবল দু’টি সান্ত্রীর হাসিভরা চোখ
তুমি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ে নিলে নাড়ী

……

বাংলাদেশের নুরুল পীড়িতা তুমি অলগা ইলামাতা
তোমার জবানবন্দী এসেছে হাতে
নাৎসী কাঠগড়ায় ডিসিট্রভের জবানবন্দীর মতো ঃ
বারুদ ঠাসা।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে তরুণ মনের প্রচণ্ড আবেগ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। ‘শোকার্ত মায়ের প্রতি’ পূর্ব বাঙলার কবিতার ভাণ্ডারের একটি বিখ্যাত রচনা। কেননা এ কবিতার আবেদন সার্বজনীন এবং সর্বকালীন। চিরকালের শোষিত মানুষের কণ্ঠে এ কবিতা প্রেরণার নতুন উদ্দীপনা বইয়ে দেবে।

শহীদ সাবেরের পরবর্তী কবিতাগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো মনের এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি। যে অবস্থা মানুষকে স্বাভাবিক কথা বলতে ভুলিয়ে দেয় সে অবস্থায় তিনি কবিতা লিখেছেন। সব কবিতা যে তার খাপছাড়া হয়ে গেছে তা নয়। অনেক কবিতায় চমৎকার সঙ্গতিও রয়েছে। যেমন ‘আশাকরি অনেক কিছু’ কবিতাটি।

আজও নয় কালও নয়
এমন একটি সুন্দর শুরু
কাছাকাছি ভালোলাগবার মত
অনেক কিছু ছিল, তবু
মনে মনে ভেবে দেখেছি
হয়তো ওদিকে নতুন কোন
সম্ভাবনার ইঙ্গিত। কি আশ্চর্য
এই মুহূর্তটি মনে হয়, আমার
কাছাকাছি পৃথিবী কি অদ্ভুত
ভাললাগবার মত।

এমনি আর একটি কবিতা ‘সমিল স্বচ্ছন্দ কবিতার খ্যাতির প্রশংসায়।’

মহৎ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে দর্পণে মিলায়
গান হয়ে বাজে নির্ঝরের প্রবাহে, জলে ;
চির নতুন বাণীর সত্যও আলোক বিলায় ;
স্মৃতি হয়ে দোলে ;
কিন্তু নিশব্দতার মধ্য থেকে মুক্তোর মত চিত্র নেয়া
উল্টে পাল্টে ভাস্বর করে তুলে দেওয়া
নিজের কল্পনার পটে কখনো তুলিতে নিপুণভাবে সাজায়।
কথাগুলো, এমন অনেক গল্পও চিরকাল মানুষকে
আনন্দ দেয় দিন ও রাত্রির প্রতিপলে।

আবার কোন কোন খাপছাড়া কবিতার উজ্জ্বল কতগুলো লাইন হোল—

দেখ দেখ সাথী ফিরাও মুখ
দেখ জীবনের ওপার হতে আহ্বান আসে
শুকনো ঘাসের বুকে শীতের জমাট শীত
দেখ দেখ। এখানে এখন জীবনেরা জড়ো হয়
পৌষালি। এখানে এখন জীবনের উত্তরণ
ঘটে যেন সিন্ধুতটে অনিবার আছড়ে পড়া ঢেউ
দেখ দেখ এবার
উত্তোলিত হোল পতাকা।

এমনি ধরনের উদাহরণ আরো আছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। শহীদ সাবেরের কবিতায় ভিন্নতর ইঙ্গিত, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক ইত্যাদির সফল প্রয়োগ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তিনি আধুনিক মননশীলতার পরিচর্যা করেননি। সবচেয়ে বড় কথা সচেতন শিল্পী হিসেবে বুকের গহনে কবিতার লালন তিনি করেননি। মানসিক অসুস্থতার মাঝেও তিনি সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় শিল্পচর্যা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘কাব্যরসই কবিতার বিশেষতঃ। এই কাব্যরস কি তাহা বলা শক্ত। কারণ তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য।’ শহীদ সাবেরের কবিতাকে এই অনুভবের মাঝ দিয়ে বুঝতে হবে। কবিতা বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতিতে শহীদ সাবেরের কবিতা-শরীরের ব্যবচ্ছেদ কখনও সম্ভব নয়।

বাংলা একাডেমী
২১—১২—’৭২

সলিনা হোসেন

স্বরচিত রচনা

দ্বিতীয় ভাগ

আরেক দুনিয়া থেকে

আরেক দুনিয়া থেকে

পূর্ব বাংলার সব চাইতে দক্ষিণের শহরটিতে কোর্ট রোড নামে একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে বাঁ ধারে চোখে পড়বে বিরাট নীল রংয়ের একটি প্রাসাদ। কোন কালে দালানটি পর্তুগীজ দস্যুদের মালখানা ছিল। তার শক্ত গাঁথুনিতে ও যুগের ছাপ পরিস্ফুট। যেমন পরিস্ফুট তার দেওয়ালে অত্যাচার আর লুটের চিহ্ন। এককালে এটা ছিল জুলুমবাজির আড্ডা, আজকে এটা বিচারালয়ে পরিণত হয়েছে। এককালে যেখানে রাখা হত লুটের আশরফি আজকে সেখানে বিচারক বসেন ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে। বিশাল দালানটা পাহাড়ের ওপর থেকে শকুনির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে শহরের দিকে। কোথায় কে পকেট কাটল তা এর চোখকে ফাঁকি দেবার জো নেই। যত রাজ্যের পাপী, তাপী, ভণ্ড জোচ্চোর সবাইকে আসতে হবে এখানে। আসতে হবে রাজনৈতিক অপরাধীদেরও।

বিচারালয়ের সামনেই আর একটি পাহাড়। তার ওপরে রয়েছে সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের (আই-বি) কার্যালয়। এককালে মূল ঘর ছিল এটা। এ পাহাড়ের গায়েই আর একটি উঁচু ঢিবি—এর ওপর রয়েছে দণ্ডাগার—কয়েদখানা। কেউ বলে জেলখানা। এককালে এখানে বাঘ ভালুক থাকত—বন্য পশুপক্ষী বিচরণ করত নির্ভয়ে। কথিত আছে যে, এক শাহ সাহেব থাকতেন এখানে। নির্জনে পরমার্থিক সাধনার সব চাইতে উপযুক্ত জায়গা ছিল এটি।

আজকে কিন্তু এর ভোলই গেছে বদলে। সমস্ত পাহাড়টার মাটি কেটে সমতল করা হয়েছে। ঠিক যেন একটা বিশাল গোলাকার বেদী। চার ধারে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ঠিক পাশ দিয়ে সদর সড়ক। সড়ক দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন দু-পাশের উঁচু দেওয়াল এসে মিশেছে একটি ছোট ঘরের দেওয়ালে। সেখানে সাইন বোর্ড ঝুলছে '...ডিস্ট্রিক্ট জেল।' ওপরে চাঁদ তারকাখচিত সবুজ পতাকাখানি পতপত করছে। সামনে রাইফেলধারী চারজন সান্ত্রী। লোহার গেটটা সব সময়েই বন্ধ থাকে। খোলা হয় কেবল নিষ্ক্রমন ও অন্তর্ভুক্তির বেলায়।

লোহার গেইটার সামনে আদালতের প্রিজন ভ্যান এসে দাঁড়াল। বন্দীরা নেমে এল সারি সারি। লোহার গেট খুলে গেল। ছোট একটা প্যাসেজ। এখানে ফাইল অর্ডারে বসিয়ে দেওয়া হল আগন্তুকদের। দুটো সারি। নতুন আর পুরনো।

'আমদানী কত ?' গেটের সান্ত্রী হাঁকল। পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ কি ষাট এমনি একটা কিছু হবে। নতুন আমদানী হল তারা, যারা সদ্য গ্রেফতার হয়েছে এবং বিচারালয় পাঠিয়ে দিয়েছে জিম্মেদারীতে (কাস্টডি)। পুরনোরা জেলেই যাবে।

তারা পনের দিন অন্তর কোর্টে যাবে বিচারের দিন অনুসারে। শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীও আছে এর মধ্যে, যাদের আরো দু-একটা কেস আছে। জামিন পায়নি যারা তারাই আছে। এরা হাজতী। শাস্তিপ্রাপ্তদের বলা হবে সাজাওয়ালা। ভালো বাংলায় কয়েদী।

যাইহোক, আপিসের প্যাসেজে এক দুই করে মাথা গুণতি হবে—লিস্টিবদ্ধ করা হবে সবার নাম। তারপর পুরনোরা ভেতরে চলে যাবে। নতুন আমদানীরা থাকবে। কারণ তাদের মাথা গুণতি ছাড়াও আরো কিছু করণীয় রয়েছে। নতুনদের হাতের, পায়ের, দেহের দাগ, বা বিশেষ ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা দেখা হবে, যাতে সনাক্ত করার সুবিধা হয়। বিশেষ করে জেল-পালানো আসামী ধরার বেলা এসব খুবই কাজ দেয়।

প্যাসেজের দেওয়ালে রকমারি অলংকার ঝুলছে। এগুলিকে জেলের ভাষায় বলা হবে বেড়ি। বেড়ি রয়েছে বহু রকমের। ডান্ডা বেড়ি, শিকল বেড়ি তার মধ্যে প্রধান। ভারী লোহার তৈরী এসব বেড়ি। এ হচ্ছে উপরি সাজা। জেলের মধ্যে নিয়মভঙ্গকারীদের প্রতি এগুলি প্রযোজ্য। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নির্ণীত হবে কে কোন বেড়ি পরবে। নবাগতদের প্রাণে এগুলি স্বভাবতঃই ভয়ের উদ্রেক করে। কিন্তু পরে সে ভয় আর থাকে না তেমন। সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময়েই আমদানী আসে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সারতে সারতে কয়েক ঘন্টা কেটে যাবে। তারপর পশ্চিমা সাহেবদের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে।

‘এই শালা লোক উঠো।’ অনভ্যস্তরা চমকে যাবেন, কিন্তু হুকুম তামিল করবেন ঠিকই।

এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল কয়েদখানার আপিস ঘরটার কথাই বলেছি কিন্তু আপিস ঘরটি কয়েদখানা নয়। ওটা বাইরের দুনিয়ার অন্তর্গত। আপিসের যারা প্রাণী তারা বাইরের দুনিয়ার মানুষ। ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাদের।

আপিস ঘরের প্যাসেজটুকু পার হয়ে দ্বিতীয় গেট অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে আপনি আলাদা দুনিয়ায় পা দিয়েছেন। সে আরেক পৃথিবী। সাধারণতঃ এখানে যারা আসে তারাও দ্বিতীয় দুয়ার অতিক্রান্তির অর্থ তখনি ধরতে পারে না। পারে বহু পরে।

আগেই বলেছি সন্ধ্যার পর নবাগতরা আসে। দ্বিতীয় গেট পার হতে রাত হয়ে যাবে। আদালত আপনাকে খাইয়ে দিয়েছে ছ-আনা পয়সায়। অতএব রাতের খাবারের জন্যে ভাবনা নেই। দ্বিতীয় গেট অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যাবে সারি সারি কয়েকটি দালান। এক নং, দুই নং, তিন নং, চার নং, পাঁচ নং, ওয়ার্ড। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে নবাগতদের জায়গা। দু নম্বরের ঠিক পাশেই এক বিশাল চাঁপা ফুলের গাছ। গোড়াটা তার ইট দিয়ে বাঁধানো। সারিবদ্ধ বন্দীরা এখানে এলেই থমকে দাঁড়াবে। এটা প্রসিদ্ধ চাঁপাতলা।

সান্ত্রীদের প্রধান ব্যক্তি বড় জমাদার—এক মুখ দাড়ি, গাট্টা গোট্টা চেহারা। লণ্ঠনটা তুলে সবার মুখে এক এক করে আলো ফেলে।

খক খক করে কাশছিল এক লোক। জমাদার ধাক্কা দিয়ে বলল, পাঁচ নম্বর। সরে দাঁড়াল সে। বাচ্চা আর মহিলা ছাড়া আর সবাই যাবে পাঁচ নম্বরে। মহিলারা যাবেন জানানা ফাটকে। বাচ্চারা যাবে ছোকরা ফাইলে। জমাদার ইচ্ছে করলে ছোকরাদের ছোকরা ফাইলে না দিয়ে দু নম্বর অথবা তিন নম্বরেও দিতে পারে।

রাত নটা দশটার সময় লণ্ঠনধারী প্রহরীর পিছু পিছু ছেলেটি যখন দু নম্বর অথবা পাঁচ নম্বরে গিয়ে ঢুকবে, তখন ও জানতেও পারবে না কোথায় চলেছে ও। সুন্দর ছেলে হলে তো কথাই নেই। একের পর এক ক্রিমিনালরা চালাবে যৌন অত্যাচার। পাহারা প্রভৃতি দাগী আসামীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্দোবস্ত থাকে বড় জমাদারের। হয়তো পরদিন জমাদার শুধোবেন, কেমন চলল রাত্রে। পাহারা হাসবে। আর ট্যাঁক থেকে বের করে দেবে টাকা।

এই হল কয়েদখানার প্রথম দিন সম্পর্কে।

রাতে শোবার জন্যে তিনটি কম্বল। একটি বিছানার জন্যে, একটি বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আর একটি গায়ে দেবার জন্যে। কোন ওয়ার্ডে হয়তো লেখা আছে '১৬ জন থাকিবেক'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পঞ্চাশ ষাট জনেরও বেশী লোক থাকে। এক জনের ওপর অন্য জনকে শুতে হয়।

সকালে একখানি থালা আসবে, আর আসবে একটি বাটি। কয়েদীরা তাই ছড়া তৈরী করেছে ঃ 'থালা—বাটি—কম্বল, কয়েদখানার সম্বল'। তাতে প্রথম আগমনের সময়ে খেতে হবে 'গাইল' অর্থাৎ গালাগালি। সকালে খেতে বসে পাওয়া যাবে প্রচুর জলো 'ডাইল' অর্থাৎ ডাল। আর উঠতে বসতে দিতে হবে সারি—'ফাইল'। তাই আঞ্চলিক ভাষায় কয়েদীরা ছড়া কেটেছে ঃ

গাইল, ডাইল ফাইল
কয়েদখানার ভাইল ॥

'ভাইল' মানে ব্যবস্থা। শুনে চমৎকার লাগে। এমন চমৎকার সংক্ষিপ্তকরণ কি আর হতে পারে? শুধু সংক্ষিপ্তকরণই তো নয়। বলা যেতে পারে সমস্ত জেল ব্যবস্থাটাকে তিনটি কথার মধ্যে প্রকাশ করা।

হোক কয়েদী তারা। তবু তারা সাধারণ। সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি আর চিন্তাধারা সব সময়েই বাস্তব ও প্রকৃত। তাই ছোট্ট এই ছড়াটার মধ্যে পরিচয় পাওয়া যাবে সমস্ত জেল-ব্যবস্থার তিনটি বিশেষ দিক সম্পর্কে।

পাঁচ নম্বরের অধিবাসীদের সংক্ষেপে বলা হয় হাজতী। ভালো বাংলায় বিচারাধীন বন্দী। বিচারালয়ে 'কেস' আছে। দিন পড়বে ঠিক পনের দিন পর। যাদের কোর্ট আছে তারা কোর্টে যাবে। কোর্টেও রয়েছে কোর্ট-হাজত। পাশে

পাঁচ হাত এবং লম্বায় পঁচিশ হাত একটা কুঠরির মধ্যে একসঙ্গে ভরার পরে পশ্চিমা হাবিলদার যখন লাঠি ঘোরাবে তখন অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যাবে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী।

সেদিন দেশবাসীর সামনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইংরাজরা অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী রচনা করেছিল ; কিন্তু তাদেরই সৃষ্ট বাংলাদেশের কারায় কারায় অসংখ্য অন্ধকূপগুলির কথা কেউ আর লেখেনি। যাইহোক সারাদিন নিশ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় কাটাবার পর হাজতীরা ফিরে আসবে আবার জেলে। আবার বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে আরো পনের দিন।

পাঁচ নম্বরের আলি আহমদকে দেখলেই মনে হবে নেহাৎ বোকা বোকা লোক। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, সে তিন বছর ধরে পকেট কাটছে।

জেলের বাইরে সবাই সাধু। জজের সামনে কেউ নিজেকে অপরাধী বলতে চায় না। এখানে কিন্তু সবাই চোর, সবাই অপরাধী ; নিরপরাধ যদি কেউ থাকে তবুও সে নিরপরাধ বলে বেড়াতে পারে না।

আলি আহমদ বলে, ও আজ পনের মাস যাবৎ হাজত খাটছে। বিচার শেষ হয়নি। শেষ কেন ধরাই হয়নি তার কেস। সে ঠিক জানে হয়তো দু বছর তাকে কাটাতে হবে বিচারাধীন জীবন। তারপর একদিন হয়তো ওর কেস শেষ হবে। শাস্তি হবে হয়তো দু'মাস কি তিন মাসের।

ও পকেটমারার কাজটা শেষ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। জেল খাটার ভয় নেই কারণ বাইরে না খেয়ে মরার চাইতে, ভেতরে খেয়ে মরা ঢের ভালো। কিন্তু দিনের পর দিন যতই যেতে থাকে তিরিক্ষা হয়ে ওঠে মন। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। মা-বাপ তুলে গাল দেয় আলি আহমদ। গাল শুনে বোঝা যাবে না ওটা কাকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিচারক থেকে শুরু করে, সরকার, রাষ্ট্র, জেল কর্তৃপক্ষ কারো মায়ের সম্মানহানি করতে সে ছাড়বে না।

সকাল বেলায় ‘লপসী’ আসবে। আধাসিদ্ধ কতগুলি চাল। সপ্তাহে দু-দিন এক রত্তি গুড় পাওয়া যাবে লপসীর সঙ্গে। অন্যান্য দিন লবণ। তিন মাস যেতে আর সহ্য হবে না। হজম হবে না। শতকরা ৮০ ভাগ লোক ভুগবে পেটের ব্যারামে।

স্নানের জন্যে বরাদ্দ আছে সের তিনেক জল। তিন বাটি জলে স্নান সারতে হবে। প্রতিদিন স্নানের জল পাওয়া সম্ভব নয়। তিন মাস স্নান হয়নি এও বহুবার ঘটেছে কয়েদীদের জীবনে। খাবার জলের অভাব তার চাইতেও বেশী। রাত্রে তেষ্টায় গলা ফেটে গেলেও জল পাওয়া যাবে না এক ফোঁটাও।

হাজতীদের খাদ্য এক বেলায় চার ছটাক আধসিদ্ধ চাল। সঙ্গে কিছু তরকারি, কিছু ডাল মিশানো জল আর হপ্তায় একদিন মাছ। রান্না করা তরকারিতে ঘাস পাওয়া যাবে প্রায়ই। বোতাম পাওয়া গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

কর্তৃপক্ষ কাঠা ঠিক করে দিয়েছে। এক পোর কাঠায় এক এক কাঠা ভাত দেওয়া হবে হাজতীদের পাতে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভেতর থেকে দুমড়ে আনা হয়েছে। বিতরণকারীরা এইভাবে ভাত সঞ্চয় করে প্রচুর। গোপনে বিক্রি হয় এগুলি বিড়ির জন্যে। চার ছটাকের জায়গায় আড়াই ছটাকের বেশী খুব কম সময়েই পাওয়া যায়। তরকারিও তাই। মাছ ? এক ছটাক পাওয়ার কথা ; কিন্তু হরিতকির দানার মত মাছের টুকরোটি দেখে কেউ বলবে না এক কাচ্চার বেশী হবে। বাকি মাছ যায় কোথায় প্রশ্ন উঠতে পারে। কিছু যায় পশ্চিমা জমাদার সাহেবের বাড়ী বাকিটা নিয়ে ব্যবসা। বিতরণকারীরা জমাদারের নিজের লোক। অতএব অসুবিধা খুব হয় না। জেলের সুপার থেকে শুরু করে সবাই জানেন এসব। কিন্তু জমাদার তার রাজ্যে সার্বভৌম। প্রত্যেক অফিসার প্রত্যেক ওয়ার্ডারের নিজের নিজের রাজত্ব আছে।

সেখানে প্রত্যেকেই নিজে নিজে সার্বভৌম। বিচার বিভাগ, বিচারের ক্ষেত্রে। শাসন বিভাগ, শাসনের ক্ষেত্রে। আর দণ্ড দানের বিভাগ, দণ্ড দানের ক্ষেত্রে। খেয়ে পেট ভরে না, আধপেটা খেতে খেতে হাজতীদের ওজন কমে। ওজন কমলে হসপিটাল ডায়েট, খাতায় পত্রে একটু ভালো বটে, কিন্তু আসলে দাঁড়ায় একই। গুণের দিক থেকে ও পরিমাণের দিক থেকে।

এর বিরুদ্ধে বলার সাহস নেই কারো। আলি আহমদ গালাগাল দেয়। সেই ভালো আর কেউ একতার মূল্য বোঝে না। একলা প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কারণ চাঁপাতলা রয়েছে। সেখানে বড় জমাদার সমাসীন। ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে। জেল কোর্ডে দৈহিক শাস্তি দেবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু 'ঠেলার নাম বাবাজী'। আর 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী'। ডাণ্ডা না মারলে ঠাণ্ডা রাখা যাবে কী করে ?

বছরের পর বছর এমনি চলতে থাকে। অধৈর্য হয়ে ওঠে মানুষ। হাজতীদের কে একজন গান বেঁধেছে :

'আমার কপালেতে নাইরে সুখ
অ ভাই দিলের মাঝে নাইরে সুখ
শরীরে না সহ্য ন-যার অ ভাই
জেবলখানার দুঃখ
জেবলখানার চাইর দিকে
পোড়ানি দেবাল
এন্দের মাঝে রাইখ্যে বাঁধিরে ভাই
মনুষ্যের ছাওয়াল
খানা-পিনা-পানির জ্বালায় রে অ
ভাই কারে বুঝাই উম
কপালের দুঃখ।

শরীরে না সহ্য ন-যায় অ ভাই
জেবলখানার দুঃখ
ইংরাজ আমলেরে ভাই, পরাধীন
ছিলাম, একথা শুনি,
এ বেল চান বাঁওটা টুইক্যা মাথায়
দিয়া রে ভাই হইলাম
পাকিস্তানী।
আঁরার ধন-জন-জান দিলাম রে
অ ভাই,
তবু গেল না কপালের দুঃখ
শরীরে সা স্য ন-যায়...।
আঁরার ছেলে পিলে উয়াসে
মরের ;
তারা কতই করের ফান্দ
বিনা দোষে হইলাম রে ভাই
জেবলখানার বন্দী...।'

কয়েদী আছে প্রায় শ তিনেক। খুনী আসামী, রেপ কেস, ডাকাতি সব ধরনের সাজাওয়ালা। পকেটমার, দাঙ্গাবাজ থেকে শুরু করে সরকারবিরোধী প্রচারপত্র বিলির আসামী সবাই আছে। কারো ছ মাস, এক বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, এমন কি পঁচিশ বছরের সাজাওয়ালাও কয়েকজন আছে। সশ্রম কারা-দণ্ডভোগীরা কাজ করে। দড়ি পাকানো থেকে জল তোলা, মাটি কোপানো—সব ধরনের কাজ।

তরীতরকারির বাগান আছে। জেলের মধ্যে সরকার বাহাদুরের আয় হয় প্রচুর।

যেদিন থেকে শাস্তি হবে, সেদিন থেকে হাজতীর পোশাকের বদলে আসবে ডোরাকাটা কয়েদীর পোশাক। একটি লম্বা পায়জামা, একটি হাফ প্যান্ট ; আর একটি বস্তা সদৃশ গায়ের জামা। মশারি নেই। কাউকে কাউকে দেখা যাবে, সারা গায়ে যেন বসন্ত হয়েছে। আসলে ওটা মশার কামড়। এমন ধারা ভুল প্রায়ই হবে। বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজন জামা দিলেও, কয়েদীরা তা পেতে পারবে না। কারণ মশারি টাঙিয়ে শুতে হলে ৫০ জনের ওয়ার্ডে, ৫০ জন রাখা যাবে না।

খাদ্যের পরিমাণ কয়েদীদের জন্যে হাজতীদের চাইতে বেশী। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। হাত বদল হয়ে দাঁড়ায় সেই একই।

জেলের মধ্যে অপরাধের জন্যে শাস্তি আছে প্রচুর। সব চাইতে ছোট শাস্তি হল মার্কা কাটা। এক দিক দিয়ে এটা আবার সব চাইতে বড় শাস্তি। ভালো কাজের জন্যে কিছু দিন 'রেমিশন' মিলবে। যতদিন রেমিশন মিলবে, ততদিন

আগে খালাস পাওয়া যাবে। আবার জেলের মধ্যে অপরাধের জন্যে মার্কা কাটা যাবে। হাসপাতালে ভালো চিকিৎসার বন্দোবস্ত কোন দিন ছিল না, আজও নেই। রোগীদের অবস্থা খুবই খারাপ। সন্ধ্যা বেলায় হাসপাতালের এক নম্বর ওয়ার্ডে দেখা যাবে, দাগী আসামী, 'মেট' পাহারা—এরা সবাই বসে গেছে—গল্প গুজব শুরু করেছে। গল্প চলে অতীত দিনে কে কটা ডাকাতি করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে ইত্যাদি। সব চেয়ে জঘন্যতম বিষয়গুলি এমন অবলীলাক্রমে বর্ণনা করে যায়—ভাবতে অবাক লাগে।

বিড়ি হচ্ছে জেলের মধ্যে এক অতি ভয়ংকর জিনিস। জেলে বিড়ি পাওয়ার নিয়ম নেই কয়েদীদের। বিড়ি দিয়ে না করানো যায় এমন কাজ নেই।...ছোট অল্প বয়সের ছেলেরা, যারা হঠাৎ কোন অপরাধ করে (বা না করে) জেলে এসেছে, তারা এক শ্রেণীর বিকৃত যৌনচেতনা সম্পন্ন 'স্বভাব অপরাধীদের' কাছে দেহ বিক্রি করতে শেখে, বিড়ির লোভে। জেল কোডে না থাকলে কি হবে। জেলে বিড়ি আসে হাজারে হাজারে। কতৃপক্ষও জানেন তা। জমাদারের সঙ্গে জোট থাকে স্বল্পসংখ্যক দাগী আসামীর। ব্যবসা চালায় তারা। শুধু বিড়ি কেন, গাঁজা আফিম সবই পাওয়া যাবে। দাগী আসামীরা নিয়মিত টাকা পাঠায় বাড়ীতে—এই সব ব্যবসা অর্জিত টাকা। নিয়মিত গোপন ডাক ব্যবস্থার মারফত সেগুলি বাড়ীতে যায়।

জেল থেকেই আবার অনেকে ডাকাতি দলের লোক সংগ্রহ করে—কলাকৌশল উদ্ভাবন করে।

জমাদার, তার ডান্ডা, মার্কা কাটা ইত্যাদি গুরু গম্ভীর আবহাওয়াতে মিলে এখানে ভীষণ ভীষণ ত্রাসের জাল বোনা আছে চারধারে। এ ভেঙ্গে প্রতিবাদ করা সোজা নয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে পেটের খিদে নিবারণ করা যায় না। তার জন্যে খাদ্যই দিতে হবে। প্রথমে লোক পেটের দায়ে চুরি করে। তখনো সে চোর হয় না। চুরি তাদের স্বভাবে পরিণত হয় অনেক পরে।

অপরাধীর শোধন এখানে হয় না—আরো বেশী করে অপরাধে প্রবৃত্তি জন্মে। আলি আহমদ বলে, সে বাইরে গিয়েই পকেট কাটবে। নইলে সে খাবে কি? কাজ তো পাওয়া যাবে না কোন।

অব্যবস্থা, ঔদাসীন্য, মারধোর, জুলুম ইত্যাদি মিলে, কয়েদীরা নিজেদের কথা ভাবতে শুরু করেছে। আলি আহমদ বলেছে—'গিঁট শক্ত করতে গিয়ে, দেখো একদিন ফস করে ছিঁড়ে যাবে'।

এক নম্বর, দু নম্বর...পাঁচ নম্বরের পরেই জানানা ফাটক। জানানা ফাটকের পর গুদাম ঘর। গুদাম ঘরের পাশ দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়াল উঠে গেছে। এ যেন জেলের ভেতর আর এক জেল—আমের ভেতর টাম। পরিসরে দেওয়াল ঘেরা এই অংশটি সব দিক দিয়েই জেলের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইরে

থেকে কেবল ওয়ার্ড মধ্যস্থ বিশাল মেহগনি গাছ দেখা যাবে। এটা হচ্ছে অপরাধের প্রায়-শুদ্ধ আছে। তবে কমিউনিস্ট ওয়ার্ড হবে এখানে, যদি আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয় তারা।

বিশাল মেহগনি গাছের গুঁড়িটার আশে পাশে কারা থাকে, সেটা জেলের ভেতরে থেকেও দেখার উপায় নেই। কারণ বলছি ; এটা হচ্ছে কারার ভেতর আর এক কারা। দুয়ারে পাহারা দাঁড়িয়ে আছে ; সর্বক্ষণ দুয়ারটি বন্ধ।

জিজ্ঞেস করে জবাব পাওয়া যাবে এটি কমিউনিস্ট ওয়ার্ড বা রাজবন্দী ওয়ার্ড। আগে এর নাম ছিল ডিভিশন। এখন জেলের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই জানে, এখানে যারা থাকে তারা কমিউনিস্ট। সেপাই সান্ত্রী থেকে জেল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সবাই বলে কমিউনিস্ট ওয়ার্ড।

সম্প্রতি এখানে কমিউনিস্টরাই শুদ্ধ আছে। তবে কমিউনিস্ট বলা ঠিক নয়, কারণ কমিউনিস্ট ছাড়া আরো অন্য সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে। তারা সবাই থাকবে এখানে। অতএব রাজবন্দী ওয়ার্ড বলাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। হলে কি হবে, 'রাজবন্দী' কথাটি সাধারণ কয়েদ-হাজতীদের মুখে আসে না। ইদানিং 'কমিউনিস্ট' কথাটা বহু প্রচলিত। তাই সহজ হয়ে গেছে এর প্রচলন।

কমিউনিস্ট ওয়ার্ডের দরজা খুলে গেল। ধরুণ আপনি ঢুকে পড়লেন ভেতরে। কমিউনিস্টরা অস্পৃশ্য। এখানে কেউ আসতে পারে না। পায়খানা পরিষ্কার করার লোক থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। তাদেরও ওয়ার্ডের বাইরে যাবার নিয়ম নেই। সবাই থাকবে ভেতরে। জেলকোডে নিয়ম আছে, কিছু দিন পর পর বেসরকারী পরিদর্শক আসবেন ভেতরে। দুজন পরিদর্শক ঠিক করাই আছে। এঁরা দুজন ঘুরে ফিরে জেল দেখতে আসেন। কিন্তু ওয়ার্ডে আসেন না, আসা নিষেধ। অর্থাৎ বিনানুমতিতে সবারই প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবু ভাগ্য গতিকে যদি ঢুকতে পারেন তবে প্রথমেই যা চোখে পড়বে তা হচ্ছে 'বিশাল মেহগনি গাছের গুঁড়িটা। গুঁড়িটার চারপাশে ইট দিয়ে গোলাকার বেদী তোলা। শীতকালে যখন রোদ পড়ে তখন বেদীর ওপর বসে দাবা খেলতে বেশ আরাম লাগে। অথবা গল্প করা চলে এখানে বসে বসে। মেহগনি গাছের কাছেই স্নানের 'নাহার'। তার পাশেই পাকের ঘর। পেছনের দিকে পায়খানা। এখান থেকে সংলগ্ন গোয়েন্দা বিভাগের আপিসটা পরিষ্কার দেখা যায়। ডাক দিলে শোনা যায়, এত কাছে।

তারপরে লম্বা হল ঘরটার মাঝখানে পার্টিশন করা। তার ফলে দুটো ওয়ার্ডের সৃষ্টি হয়েছে ; বস্তুতঃ একটিই ওয়ার্ড। এই হল বাইরের দিক থেকে দেখবার জিনিস।

সবশুদ্ধ, এটি আর একটি জেল যেন ; যদিও আকারে অনেক ছোট। সারা জেলের অন্যান্য অংশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর কেউ যদি এখানে আসে তবে অবাক হয়ে যাবে সে, নতুন জায়গার নতুনত্বেও বটে আর ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষেও।

এ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেশী নয়। মোট জনা বাইশের মত হবে—কয়েকজন হাজতী-কয়েদীও আছে এই অন্তর্কারায়।

মেহগনি গাছের গুঁড়ির কাছে এক বুড়ো বসে আছে ; অদূরে ঝাড়ুখানা পড়ে। বুড়োর কাজ ওয়ার্ডটিকে পরিষ্কার রাখা। ডাকাতি কেসের আসামী। নাম ফজলুর রহমান—ও কিন্তু বলে লোকে ওকে মিথ্যে মিথ্যে ধরিয়ে দিয়েছে। বুড়োর পাঁচ বছরের সাজা। বেরুবার আশা কম, হয়তো এখানেই মরতে হবে তাকে। কেমন যেন এক ধরনের নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে বুড়ো সর্বক্ষণ। কাউকে বিড়ি খেতে দেখলে আশে পাশে ঘোরে। চাইতে ভরসা পায় না। ধূমপানকারীর যদি খেয়াল হয়, তবে বুড়োটাকে দেয় বিড়িটা গোড়ার দিকে। নইলে পানবিশিষ্ট বিড়ির টুকরোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল আর কড়ে আঙ্গুলের মাঝে চেপে ধরে টানতে টানতে অন্যদিকে চলে যায়। আগুনের আঁচ লেগে হয়তো হাতে সেঁকও লাগে একটু। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে।

তারপরে আনজু। ওর পদ হচ্ছে ‘ফালতু’। ফালতু কথাটা কাদের দেওয়া জানা নেই। তবু শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। ফালতুর কাজ হল—পরিচর্যার, তদারকের কাজ। আনজু লোকটি জাহাজী টাইপের মানুষ, শহরে বস্তিবাসী ; চার মাস সাজা। চলে যাবে শীগগীর।

তারপরে আসে ফকির। সবাই ডাকে চাচা বলে। লোকটা একটু পাগলাটে। ওর বৌকে কে যেন জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। বিচার হয়নি তার। রাগ হল তার ভীষণ। বৌ কেড়ে নিল জোর করে, গ্রামের ইতর ভদ্র কেউ তার বিচার করল না। ফকির তাই ভাবলে গ্রামশুদ্ধ লোক সবাই যখন অপরাধী, তখন সবাইকে দিতে হবে শাস্তি। তাই গ্রামের ইস্কুল ঘরটি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে সে জেলে। মাথা খারাপ লোক কখন কি বলে তার ঠিক নেই। নিজেকে সে জাহির করে মারফতের সাধক হিসেবে। যেই শোনে সেই হাসে। স্থানীয় এক বিখ্যাত গ্রাম্য কবির আধ্যাত্মিক গানগুলি ওর কণ্ঠস্থ।

‘...’-এর নাম করা ডাকাত সুলতানের পদ হল বাবুর্চির। তবে রান্না তাকে করতে হয় না, যোগান দেয় সে। রান্নার কাজটুকু রাজবন্দীরা নিজেরাই করে। সুলতানের চোখমুখ দেখেই বোঝা যায় ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। দুটো বিয়ে। তা ছাড়া ইতিপূর্বে আরো করেছে। ‘বুঝলি ফজল, সেবার খয়েরপুরে এক ডাকাইতি কইরলাম। ডাকাইতির বাদে আমরা তো গেছি ছুটে বাইশ মাইল দূরে। তিন দিন পরে দেখি ঠিক হাজির। তারপর দিল ছ বছর ঠুকে। এখন আর একটা খবর পেয়েছি। গিয়েই আর এক ধাক্কা চালাব।’ কথাগুলি বেশ নির্লিপ্তভাবে বলে যায় সুলতান।

হাসেম হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বরের পাহারা। লম্বা চওড়া। কালো, ঘন কালো রং। ‘...’-এর লোক। লকলকে চেহারা। যখন চলতে শুরু করে তখন মনে হয় যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম।

যুদ্ধের সময়ে জাপানীরা এবং যুদ্ধের পরে মিত্র শক্তি বর্মায় প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে এসেছিল। সেগুলি ওখানকার অধিবাসীরা পুঁতে রেখেছিল—এখন ব্যবহার করা হচ্ছে বিদ্রোহের কাজে। হাসেম বিদ্রোহী নয়। তবু তার ঘরেও কিছু অস্ত্র, যেমন একটি ভাঙ্গা রাইফেল, একটি ব্রেন গান ইত্যাদি ছিল—সেই সূত্রেই গ্রেফতার হয়েছে ও। সাজা হয়েছে দু বছরের। অসাধারণ সরল প্রকৃতির লোক ঠাট্টা করে সবাই ডাকে হাবসী। হাসেম কিছু মনে করে না। শুধু হাসে—আর কালো হাঁড়ির তলার মত জমকালো মুখখানা ভেদ করে দুখানি ভুট্টার দানা বিকশিত হয়।

তারপরে আসে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রসঙ্গ। সরকারী বন্দীদের ভাগ করেছেন দু ভাগে। বিচারাধীন সাধারণ হাজতীদের সঙ্গে থাকত আগে। তাদের পৃথক কোন রাজনৈতিক সত্তা স্বীকার করা হত না। সেই আধপেটা খাওয়া, অনাচার পীড়ন, সব কিছুই চলত তাদের ওপর।

কিন্তু জেলখানায় বোবা মানুষের ভাষা প্রকাশের একটি অদ্ভুত হাতিয়ার আছে। সেটি হল ভাত না খাওয়া। কেউ হয়তো ইস্কুলের ছেলে ছিল, কেউ কলেজের। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বুঝেছিল সেটা। একটার পর একটা অনশনের পর তারা রাজনৈতিক বন্দী ওয়ার্ডে এসেছেন।

এখন রাজনৈতিক হাজতী-কয়েদী বিশেষ নেই। আগে ছিল প্রচুর। তাদের দুজন শেষ পর্যন্ত রয়েছেন। একজন এখন সবে কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়েছে—হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। চোখে-মুখে আভিযাত্রিক ভাব পরিস্ফুট। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি পাওয়া পূর্ণ বয়সের ব্যঞ্জনা।

তারপর আসে কবি। কবিকে আপনারা চিনে থাকবেন। 'মাশরেকী' পত্রিকায় চাকরি করতেন। কবিতা লেখেন। সব রকমের কবিতা। কবিতায় হাত না পাকলেও সমাজ-সচেতন রচনা সৃষ্টির দিকে একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে কবি এখনো অস্থির আর রোমান্টিক। মুখে আড় নেই কোথাও। জীবনে লুকোবার মত তাঁর কিছুই নেই। সব কিছুই তিনি পরিষ্কার বলেন। সবাই ডাকে তাঁকে কবি সাহেব, কয়েদী-হাজতীরা 'কবি' বোঝে না। বলে কবির। কবির থেকে কবিরদা ; শেষে কবির আহমদে পরিণত হয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক কর্মীদের সংস্পর্শে এসে তার চিন্তা জগতে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। মার্কসবাদী জীবন দর্শন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলেও কবি একটা সুস্পষ্ট বামপন্থা বেছে নিয়েছেন।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের সঙ্গে যে শব্দাবলী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তার একটি হচ্ছে 'নিরাপত্তা'। আটক বন্দীদের আটকনামায় লেখা আছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।

মার্কসবাদীদের কাছে শোনা যায়, রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে শাসকশ্রেণীর একটি যন্ত্র, যা কেবল শাসকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। অতএব এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলতে

তাঁরা বোঝেন স্বার্থের নিরাপত্তা। এই নরাপত্তার ব্যঘাতকারী হিসেবে যারা বন্দী হয়েছেন তাদের পদবী 'নিরাপত্তা বন্দী'।

রাজবন্দী ওয়ার্ডে নিরাপত্তা বন্দী আছেন দশজন। তাদের প্রায় সবারই বাইরে রাজনৈতিক জীবন ছিল। কারো কারো হয়তো তা ছিল না। তাদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী, ভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদী, কৃষক, ছাত্র, সমাজকর্মী, শ্রমিক, পুস্তক বিক্রেতা প্রভৃতি।

প্রথমে বুদ্ধিজীবীটির কথাই ধরা যাক। গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল—গণিতের বইও প্রকাশ করেছেন। জন্মগ্রহণ করেছেন এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু আশৈশব কাটিয়েছেন এমন আর এক পরিবারের সঙ্গে যার প্রতিটি লোক কোন না কোন প্রকারে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে রাজনীতি করেন সেই অনুশীলন-যুগান্তরেব দিন থেকে। ১৯৩৮ সালের শুরু থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে সরাসরি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। সমস্যাগুলি তুলে ধরতে পারেন খুব চমৎকার। মজুরদের মধ্যে কাজ করেছেন। এবং তার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবীসুলভ অহমিকা গেছে কেটে। শান্ত ধীর বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন কর্মী। নাম ধরা যাক চক্রবর্তী।

জেলে তাঁর স্থান খুব উঁচুতে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ভার হচ্ছে তাঁর ওপরে। তিনি হচ্ছেন আপিস প্রতিনিধি। কারো একটা সাবান দরকার তিনি আপিসে চিরকুট দেবেন। চিঠির কাগজ আনানো, চিঠি এল কিনা দেখা ইত্যাদি তাঁর কাজ।

তারপর ধরা যাক ভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদী বন্দীটিকে। অ্যাণ্ডারসনী বাংলার নিপীড়ন আর অত্যাচারের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়েছেন যে সমস্ত লোক, তিনি তাদেরই একজন। বহু জেল খেটেছেন। বাংলাদেশের সমস্ত কারাকক্ষগুলি তাঁর অতি পরিচিত। আন্দামানে বহুদিন জেল খেটেছেন। কারাভ্যন্তরে তাঁর যৌবনের মূল্যবান দিনগুলি কেটেছে। স্বদেশী ডাকাতি করেছেন, গুণ্ডা দমন করেছেন, দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। আন্দামানে মার্কসবাদী হন। মুক্তিলাভের পর সাম্যবাদী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। আবার ধরা পড়েছেন এক বছরের ওপর। বাংলা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন ; নেতৃত্ব দিয়েছেন। কম কথা বলেন, অমায়িক লোক। কিন্তু দোষ-ত্রুটির সমালোচনায় অত্যন্ত কঠোর। বিশাল শরীর। এঁর নাম হতে পারে গুপ্ত। গুপ্ত ভালো রান্না জানেন বলে তাঁকে সবাই সম্মান করে।

কৃষকটির নাম দেওয়া যাক ওসমান। জেলার কৃষক আন্দোলনে তাঁর দান অতুলনীয়। অসংখ্যক কৃষক তাঁর এলাকায় তাঁর ওপরে আস্থা রাখেন। জমিদারী উচ্ছেদ, জমির লড়াই ও খাদ্যের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি তাঁর এলাকায়।

কৃষক সমাজের মধ্যে থেকে তিনি সম্প্রতি মজুর, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রের শহুরে প্রবণতার মধ্যে এসে পড়েছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মানিয়ে নিতে। রাজনীতির দিক দিয়ে সবার মত ও পথ অভিন্ন। সবাই একই জীবনদর্শনে বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত জীবনে গ্রাম্য ছাপ তাঁর গায়ে পরিস্ফুট। মজুর শ্রেণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কমতি নেই। গরীবের ঘরের ছেলে ; মনের মধ্যে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাঁর কাটে ইংরেজী শিক্ষার কাজে। ইংরেজি পত্রিকাখানি নিজে নিজে পড়ে কখন বুঝতে পারবেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন।

ছাত্ররা সাধারণতঃ একটু বেশী অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে। ছাত্রটির বেলায় তার ব্যতিক্রম নেই। তবে এ মার্কসবাদী ছাত্র। তাই ইদানীং মনে করছে কিছু কম অনুভূতিপ্রবণ হবে। কারণ তাতে কাজের ব্যঘাত ঘটে। বনেদী মুসলমান পরিবারে ভাঙন ধরেছে। সে ভাঙনের তরঙ্গের আঘাত তাকে এনে দাঁড় করিয়েছে সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে। গল্প লেখে। কবিতা লেখে। লেখা শেষ হলেই পড়ে শোনায় সবাইকে। ইদানীং খেলাধুলা এবং সাহিত্য চর্চার দিকে মেতে উঠেছে। সবচাইতে বয়সে ছোট। তাই সবার সঙ্গে সম্পর্কও আলাদা এবং সহজ। এর নাম হতে পারে টুলু।

মিলের মজুরটির একটি হাত মেসিনে কাটা পড়েছে। মজুর ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন। কথাবার্তা অত্যন্ত কর্কশ এবং জোরে জোরে কথা বলেন। নিজের কথায় জোর দেবার জন্যে জোরে জোরে হাত নাড়েন। অসম্ভব চা ভালোবাসেন। কালো কুচকুচে শরীরের রং।

তারপর আছেন এমন একজন, যার নাম হতে পারে করিম। ভদ্রলোক গ্রামের লোক। ব্যবহারে সামাজিকতাটুকু বেশ পরিস্ফুট। অশোভন কিছু কখনো করে না। নিজের ব্যবহার ও পরের ব্যবহার সম্বন্ধে খুব সচেতন ও অত্যন্ত হিসেবী। প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। গুছিয়ে কাজ করার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। অন্যান্যদের অগোছালো স্বভাবের জন্যে নিন্দা করেন। ছাত্রটি তাঁর নাম দিয়েছে—'ফুফু আম্মা।'

একটি বাংলা বই প্রকাশকের জেলা শাখার পরিচালক আছেন একজন। শহরে আইনসঙ্গত বইয়ের দোকান ছিল তাঁর কিন্তু আজকের দিনে প্রগতিশীল সব কিছুই —আইনসঙ্গতই হোক আর বে-আইনী হোক—তার ওপর সরকারী কোপ-দৃষ্টি পড়েছে। তার ফলে ভদ্রলোক গ্রেফতার হয়েছেন আজ দু'বছরের কাছাকাছি'।

তারপর দাশগুপ্ত ... মামলার আসামী ছিলেন। আট বছর বন্দীজীবন কেটেছে তাঁর বকসার আর হিজলীর আটকখানায়। শান্ত, ধীর আর চোখে সৌম্য ভাব পরিস্ফুট। সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে কাছে টানার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আলাপী লোক। কার সঙ্গে কি কথা বলতে হবে সেটা বোঝেন খুব পরিষ্কার। এ ধরনের লোককে দিয়ে 'নেগোসিয়েশন' চালানো খুব ভালো হয়।

কারাগারের ভেতরেও সূর্য ওঠে। শীতের সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন সবুজ চিরকুটের ঘাসের ফালিতে কুয়াশা পড়ে। ধীরে ধীরে আলো ফুটতে থাকে। সান্ত্রী বদলী হয়ে গেছে। ভোর রাতের সান্ত্রী এসে ওয়ার্ডের লক আপ খুলে দিয়ে যায়। জমাদার খাতা হাতে মাথা গুণতি করে যায়। তারপর আবার দুয়ারটা ঠেকিয়ে রাখে। মিনিট দশেক পরে ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়ে। গুণতি মিলেছে। দুয়ারটা খুলে যায়। আবার সন্ধ্যা নাগাদের জন্য।

কৃষক কমরেডটি সবার আগে উঠে পড়ে মগ নিয়ে পায়খানায় ছোটে। আস্তে আস্তে পরিষ্কার আলো ফুটে ওঠে।

সুলতান চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। দুধ আছে গতকালের। বিস্কুট আছে। গতকাল সন্ধ্যায় ওয়ার্ডার দিয়ে গেছে। সবার ঘুম ভাঙার আগেই চা এসে পড়ে।

চায়ের বরাদ্দ আছে মাত্র দশজন 'নিরাপত্তা' বন্দীর জন্যে। কিন্তু হয়ে যায় জনা বত্রিশ। ওয়ার্ডের কয়েদী হাজতী এবং সান্ত্রী সবাই বসে যায় চায়ের মগ হাতে।

রাজবন্দী ওয়ার্ডে চা খাওয়া সান্ত্রীদের বারণ। কিন্তু সমাজের নীচের দিককার লোকের কাছে কর্তৃপক্ষের চাইতে রাজবন্দীরা অনেক বেশী আপনার লোক। তার ওপর ভোর রাত থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হবে। অতএব এমন শীতের সকালে এক কাপ চা, তার ওপর রাজবন্দীদের সহানুভূতিসূচক ব্যবহার সে প্রত্যাখান করতে পারে না। একটু শ্রদ্ধাও হয়, কেউ হয়তো বাইরে প্রফেসর ছিলেন, ছাত্র ছিলেন। শিক্ষিতদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে শ্রদ্ধা, সেটুকু তারা রাজবন্দীদের দেয়। কেউ কেউ এর চাইতে আরো একটু বেশী এগোয়। তখন তারা রাজনৈতিকভাবে সহানুভূতি পোষণ করে। মার্কসবাদীদের আদর্শ তারা বোঝে না। কেবল এইটুকু বোঝে যে এরা গরীবের খাওয়া-পরা বাঁচার জন্যে কথা বলে। তারই জন্যে জেলে এসেছে। এটাও বুঝেছে যে বর্তমান সরকার গরীবের প্রতি আর যাই হোক, মিত্রভাবাপন্ন নয়। সান্ত্রীরা মনে করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর ন্যায়ের জন্যে যারা কথা বলেন, তারা সবাই কমিউনিস্ট। যেমন ভাসানী মওলানা সাহেবও কমিউনিস্ট। হোন না তিনি 'আওয়ামী'। তবুও।

চায়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্প জমে ওঠে। মাছের গল্প। চালের গল্প। কাকে কে দলে এনেছে তার গল্প। হাসির গল্প। ছোটখাটো হিউমার।

'লিয়াকত আলী মার্কিন দেশ ভ্রমণে যাবার সময়ে সঙ্গে কি নিয়েছিলেন জানো তো ?' চক্রবর্তী ছাত্রটিকে শুধোন।

টুলু জবাব দেয়, '১৩৫টি সিগারেট লাইটার।'

চক্রবর্তী ঘাড় নাড়েন। 'না, সঙ্গে নিয়েছিলেন একখানা লিস্ট। পাকিস্তানের সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের নামের তালিকাখানা তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে দেখিয়ে বলেছেন, এই দেখ এত কমিউনিস্ট ধরে রেখেছি।'

সবাই শুনে হাসে। এটা হল চুটকির আসর। এ ধরনের ছোটখাটো হিউমার আর হাসির গল্পে এ বেলাটা বেশ কাটে। সব দিনই কিন্তু চুটকির আসর বসে না।

এ মাসের জন্যে ম্যানেজার হলেন চক্রবর্তী। ম্যানেজার মোট দুজন। একজন রান্নার জন্যে। অন্যজন সংগ্রহের জন্যে। গুদাম থেকে নিয়মিত রেশন আনা তাঁর কাজ। গুদাম ঘরটি ওয়ার্ডের বাইরে। পাহারার সঙ্গে চক্রবর্তী বেরিয়ে যান গুদাম থেকে রেশন আনতে। অন্য ম্যানেজার মজুর বন্দীটি।

সাড়ে আটটার মধ্যে চক্রবর্তী গুদাম থেকে ফিরে আসেন রেশন নিয়ে। ইতিমধ্যে রান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন বয়স্করা নানা কাজে ব্যস্ত। যেমন দাশগুপ্ত এখন উর্দু শিখছেন। 'উর্দু কি তিসরি কিতাব' ধরে ছোট ছেলের মত উর্দু পড়তে দেখলে, বহিরাগত উর্দুভাষীদের বেশ মজা লাগবে। হাতের লেখা ইতিমধ্যে বেশ সুন্দর করে এনেছেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ কোথাও আটকে গেলেন।

'ইনকিলাব মানে কি হে টুলু'—দাশগুপ্ত শুধোন।

'আজাদী' জবাব দেয় ছাত্রটি।

দাশগুপ্ত আবার পড়তে থাকেন। এ মাসের মধ্যে তাঁকে 'উর্দু কি তিসরি কিতাব' শেষ করতে হবে। দ্রুত পাঠ আয়ত্ত করতে হবে। শিগগীর উর্দু সাহিত্য ও কাব্য বোঝার পর্যায়ে চলে যেতে হবে। সর্দার জাফরীর 'নয়া দুনিয়া কো লাল সেলাম' উর্দু ভাষায় পড়তে হবে। কিষণ চন্দরের উর্দু গল্প পড়তে হবে। ইংরেজি থেকে অনুবাদে হাত পাকিয়েছেন ইতিমধ্যে। এবার উর্দু থেকে অনুবাদের দিকে ঝোঁক চেপেছে।

রোদ চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। শীতের সকালের আয়ু খুবই ক্ষণস্থায়ী। স্নানের সময় হয়ে আসে। তেল মেখে স্নান সারতে হবে। করিম সবার আগে স্নান সেরে নেন। সবার শেষে আসেন ওসমান। স্নানের সময়ে তাঁর কিছু খেয়াল থাকে না। কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে, শুধু বলেন— 'ও'।

স্নানের সময়েও গল্প চলে এক-আধটু। অতীত দিনের ছোট্ট কোন ঘটনা হয়তো মনে পড়ে যায়। সেটা ব্যক্ত না করে থাকা যায় না। কীই বা আছে আর বলবার। আড়াল নেই এখানে কোথাও। সবই একই পথের যাত্রী।

এগারোটা নাগাদ রান্না হয়ে যায়। সারি সারি সবাই বসে যায় কম্বল পেতে, থালা-বাটি নিয়ে খেতে। পরিবেশন করেন ম্যানেজাররাই। কৃষকরা খায় খুব। ওসমানের খাওয়া দেখলে 'ভদ্রসন্তান'দের অনেকেই নাক সিঁটকাবেন। ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত রোগীর সহ্য হবে না এত খাওয়া চোখে দেখা।

তরকারি, মাছ অথবা ডিম আর ডাল এই বেলার খাওয়া। বিনা বিচারে আটকরা দৈনিক এক ছটাক মাছ পেতে পারেন। অতএব দশজনের মাছে প্রায় ২২ জন লোককে খেতে হয়। সবার রান্না এক সঙ্গেই হয়। নিজেদেব রান্না। অতএব

খাওয়াটা ভালোই হয় কোন কোনদিন। মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখার দিক থেকে বরাদ্দ খাদ্য কোন ক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু রান্না ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ম্যানেজারদের তরফ থেকে। অপর্যাপ্ত খাওয়া। কিন্তু গুণগত ও পরিমাণগতভাবে তার মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করা কিচেন কমিটির লক্ষ্য। রান্নার ব্যাপারে সহজ পাচ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখেন ম্যানেজাররা।

খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তাই ছোটখাটো গোলমাল হয়। কোনদিন হয়তো মাছ আসতে আসতে বেলা বারোটা পেরিয়ে যায়। তারপর রান্না শেষ হতে দেড়টা খেতে খেতে দু'টো। অতএব রুটিন থাকে না। অফিস প্রতিনিধি চিরকুট পাঠান অফিসে—

ডেপুটি জেলার সমীপেষু,

মাছ আসে নাই। এ রকম দেরী আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। আশা করি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে আর না হয়। ইতি—চক্রবর্তী। কমিউনিস্ট ওয়ার্ড।

সকাল বেলায় কোনদিন ডাক্তার আসেন। ইদানীং ডাক্তার পরিবর্তন হয়েছে। এ জেলারই লোক। এককালে তথাকথিত ছাত্রনেতা ছিলেন। 'ডেমাগগ'দের পকেটে পকেটে বিচরণ করতেন। কিন্তু আগের ডাক্তারটি ভালোই ছিলেন। দুনিয়াব্যাপী সংকটের ধাক্কা ডাক্তার সমাজের গায়েও এসে লেগেছে। স্বল্প বেতন অথচ বৃহৎ কর্তব্যের মাঝে পড়ে আগের ভদ্রলোকটি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ওয়ার্ডে। রোগী দেখতে এসে, খুব করে একদিন সরকারের সমালোচনা করলেন। ছাত্রটি বলল—'স্ট্রাইক করলেই পারেন।' ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ, করছি তো। এবার বোধহয় আমাদের বড় রকমের একটা লড়াই হবে।

মোল্লাকে নিয়ে কথা ওঠে। মোল্লা এসে বলল—'দেখুন, আপনি যদি কমিউনিস্ট

যাবার সময়ে ডাক্তার বলে গেলেন, আপনাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। 'আপনারা বিনা বিচারে বন্দী, তাই ডাক্তার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে হন, তবে আপনার চিকিৎসার সম্ভাবনা শতকরা ৭৫ ভাগ কমে গেল। কিন্তু যদি মুসলমান কমিউনিস্ট হন তবে শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাবনা পুনরুদ্ধার করলেন। আবার যদি হিন্দু হন তবে তাও হারালেন।'

সবাই হাসে। তবু ভালোয়-মন্দায় মিলে ডাক্তাররা চিকিৎসা বিভাগের লোক। রাজনীতির বাইরে আজ আর মানবতাবাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার রেশটুকু আছে, এখনো ডাক্তারদের মানবিক দৃষ্টির অবশিষ্টাংশ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীদের একটি প্রধান মিত্রশক্তি।

খাওয়ার পর বয়স্করা শুয়ে পড়েন। অল্প বয়স্করা তাস খেলে। 'পেসেন্স' খেলে। দাবা নিয়ে বসে কেউ কেউ। ছাত্রটি কখনো কখনো পড়াশুনা করে।

দাশগুপ্তের দেখাদেখি আজকাল চক্রবর্তীও উর্দু লিখছেন। মজুরদের মধ্যে কাজ করার সুবিধা হবে বলে। দুপুর বেলায় তিনি হাতবাক্স করেন।

এখন খর রোদ্দুর এসে পড়েছে। বাইরে ধু ধু করছে সব কিছু। বাঁ পাশের সিনেমার দিক থেকে নারী কণ্ঠের অদ্ভুত উর্দু গান শোনা যায়। মহল সিনেমাতে রেকর্ডের গান শুরু হয়ছে। কয়েদী ও পাহারা তাস খেলতে বসেছে। কবি সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখন সংবাদপত্রটি আসবে।

পত্রিকা আসতে আসতে খাওয়ার পর একটু ঘুমানোর পালা শেষ হয়ে আসে। সবার আগে আসবে 'এজিদ' (আজাদ) পত্রিকাখানা। তারপরে আসবে 'পরিদর্শক' (পাকিস্তান অবজার্ভার)। সবার শেষে কলিকাতার বিদেশী পুঁজির ধাই-মা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা। ইদানীং প্রদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিয়ে ভালো আন্দোলন হচ্ছে। পাকিস্তান অবজার্ভার খবর দিয়েছে—কেন্দ্রীয় গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বন্দীদের হেবিয়াস কার্পাসের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। মিটিং বসে তাই নিয়ে। সরকারের কাছে দরখাস্ত যোগে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদে সবাই এক বেলা অনশন করেন।

কোরিয়ার পর থেকে সংবাদপত্রে প্রধান কলম হয়ে দাঁড়িয়েছে—যুদ্ধ সংবাদ। কবি অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকেন। ম্যাকআর্থার ১০ মাইল হটে গেলে তাঁর উল্লাসের অন্ত নেই। নর্থ কোরিয়ান বাহিনীর সিউল দখলের দিন উৎসব করেন বন্দীরা।

পশ্চিম বঙ্গে রাজবন্দীরা ছাড়া পেয়েছেন। এখানেও বন্দীদের মনে তার ছায়া পড়ে। নিশ্চয়ই জনসাধারণ আমাদের মুক্তি দাবী করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন নিশ্চয়ই তীব্র হচ্ছে। এবারে আমরা মুক্ত হব। এ ধরনের আশা ইতিমধ্যে জেগে উঠছে অনেকের মনে।

বৈকালিক চা খেতে আলাপ চলছিল—পাঞ্জাবী-বাঙ্গালী বিদ্বেষ নিয়ে। কথাটা তুলেছিলেন ওসমান। কেরানী থেকে জেলখানার সান্ত্রী, প্রত্যেকের মনে একটা প্রবল বিদ্বেষ রয়েছে জেলখানার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। কারণ ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। বাধা দিয়ে চক্রবর্তী বলে ওঠেন—

'না, তার চেয়ে বড় কথা হল, সে পূর্ববঙ্গে ইস্পাহানীদের পক্ষ থেকে শোষণ চালাতে এসেছে। কই সাধারণ দুঃখী মানুষের মধ্যে মজুরদের মধ্যে তো পাঞ্জাবী-বিদ্বেষ জাগে না। ইংরেজী প্রবণতার বিরুদ্ধে ভারতীয়েরা আন্দোলন করেছিল, সে ইংরেজী বলে নয়। সেক্সপীয়ারকে তো কেউ ঘৃণা করে না। তারা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের শোষণ করেছিল। মাড়োয়ারীদের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ থাকত না, যদি তারা আমাদের শোষণ না করত। সবাই বোঝেন এটা। আলোচনা চলতে চলতে এক সময় বাইরে থেকে হঠাৎ গর্জন ভেসে আসে কানে। উদগ্রীব হয়ে কান পাতেন সবাই বাইরের দুনিয়ার আওয়াজ শোনার আগ্রহে। ছাত্রটি হেসে বলে—নিশ্চয়ই ছাত্ররা আমাদের মুক্তির দাবী নিয়ে শোভাযাত্রা করছে।

কৃষক বন্দীটি কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন—'না, ওরা আবার একটু হেসে বলে—ওই শুনুন ওরা বলছে—ইনকিলাব...

সত্যি বাইরে শোভাযাত্রাকারীরা বলছে, 'আল্লাহু আকবর।' সবটা শোনা না গেলেও এটা বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। ওসমান আবার বললেন—আল্লাহু আকবর—। চক্রবর্তী শুনছিলেন দুজনের কথা।

বললেন—আল্লাহু আকবরের মধ্যে ইনকিলাব আছে।

হঠাৎ বুঝতে পারে না কেউ। তিনি পরিষ্কার করেন—আজকে আল্লাহু আকবরের ধ্বনির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশ্বাস, সংঘশক্তি—সে তো উড়ে যাবে না। সংকটের দিনে, ধাক্কা খেয়ে এই সংঘশক্তিই মানুষকে নিয়ে যাবে বিপ্লবের দিকে, ইনক্বিলাবের দিকে।

খুব বড় তত্ত্ব নয় এটা—তবু যেন এর আশাবাদের মধ্যে বলিষ্ঠতার অন্ত নেই। এ হচ্ছে চরম আশাবাদ। অন্ধকারের রাজ্যে এই আশাবাদই ইন্ধন জোগায়—ভাবনা ও চিন্তার ইঞ্জিনে।

শীতের দিনগুলি ছোট। পত্রিকা পড়া শেষ হতে না হতেই দুপুর গড়িয়ে যায়। এখন শরীরচর্চার পালা। ডাক্তারের সহায়তায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্কিপিং রোপ পাওয়া গেছে। উপকরণ ওইটুকুই। প্রায় সবাই আজকাল শরীর-চর্চা করে। বুক-ডন, বৈঠক, কয়েকটি পর্যায়ে।

কারাকক্ষের একটি অন্যতম শারীরিক শত্রু হচ্ছে—হজমের গোলমাল। হজম না হওয়া থেকে গড়া নানান অনিয়ম। প্রায় সবারই আজকাল অর্শ রোগ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার এক পো তরকারি বাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, র্যাডিকাল ট্রিটমেন্ট এখানে হবে না। পায়খানার সময়ে রক্ত পড়ে। অর্শরোগীদের শারীরিক শত্রুর বিরুদ্ধেও লড়াই চলছে—শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে। বিকেল হয়ে আসে। মহল সিনেমা থেকে 'জাগো অনশন বন্দী' রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। এ সময়ে ইন্টারভিউ আসে কারো কারো। কখনো কখনো আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসে।

তারপর হেলতে দুলতে চাচা আসবেন। গুপ্ত তাঁকে চাচা বলে ডাকেন। চাচাও গুপ্তকে ডাকেন চাচা। চাচার একটি বিড়ি দরকার।

কালেক্টিভ থেকে যে বিড়ি তাঁকে দেয়া হয় তাতে চাচার চলে না। আধ্যাত্মিক কোন প্রশ্ন তুলে চাচা আলাপ জমান। যার শেষ পরিণতি একটি বিড়িতে।

এমনি দুপুরে হঠাৎ কোনদিন হয়তো চিরকুট আসে অফিস থেকে। অমুক খালাস। হৈ হৈ করে ওঠে সবাই। সামান্য একটু দুঃখ হয়—হয়তো কারো কারো মনে। সীমাবদ্ধ পৃথিবীর লোকসংখ্যা কমে যাওয়া মোটেই ভালো কথা নয়। আনন্দও হয় খুব—তবু তো একজন বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে ঘিরে দাঁড়ায় সবাই।

অমুককে আমার কথা বলো।

আমার নামে বই পাঠিও ...

কিছু টাকা পাঠিও ; পারলে কিছু কাগজপত্র জমা দিও তো হে।

অসংখ্য ফাই-ফরমাসের পর বন্ধুটি হাত গুটিয়ে বজ্রমুষ্ঠি তুলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়। তারপর কেউ কেউ সেই সব ফাই-ফরমাস পূরণ করে। কেউ কেউ করে না, বা করতে পারে না। ঠাট্টা করে বন্দীরা বলে—জেলের সামনের বটগাছে ভূত থাকে একটা। ওই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

মুক্তির প্রসঙ্গে আবার বন্দীত্বের প্রসঙ্গও আসে। নিরাপত্তা বন্দী যদি কেউ আসে, তবে তাকেও ঘিরে ধরে সবাই। জানতে চায় বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর। তার রিপোর্ট শোনার জন্য সভা বসে। সেদিন এল নতুন একটি লোক। ক্যালেণ্ডার-ওয়ালা। ছবি বেচত সে।

পার্কে শ্রীকৃষ্ণের ক্যালেণ্ডারের নীচে কায়েদে আজমের ছবির ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়েছিল বলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক মাস পরে 'আটকনামা' এল তার কাছে। সঙ্গে তাকে কেন আটক করা হল তার কারণাবলী লেখা আছে। 'তুমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিলে—তার আলটিমেট এইম ছিল বর্তমান সরকারকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা।'

অর্ডার পেয়ে উচ্চস্বরে কাঁদছিল তসবিরওয়ালা (হায় হায় সে নাকি... রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করছিল।)

তারপর লক আপ হবার পালা। জমাদার আছে। সবাই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। জমাদার মাথা গুণতি করে যায়। যাবার সময় চাবি দেওয়া দরজার ভারী তালাটা বারে বারে টেনে দেখে। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়ে। সব ওয়ার্ডেই 'লক আপ' হয়ে গেছে।

এখন বাতিটা নিয়ে চৌকির ওপর বসে যায় সবাই। ইংরেজি পত্রিকাটি সবাই নিজেরা পড়তে পারে না। তার জন্যে সমষ্টিগতভাবে পড়ার ব্যবস্থা। সরাসরি অনুবাদ করে পড়েন চক্রবর্তী। কোন কোন দিন ছাত্রটিও পড়ে। আর সবাই শোনেন।

আগা থেকে গোড়া পড়া হবে গভীর মনোযোগ দিয়ে। অর্থনীতির খুঁটিনাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁদের নজর এড়ায় না। ব্রিটেনের ডলার সংকট, ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনীতির ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চীন বিপ্লবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য এ সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নাড়া দেয় সবার মনে। এমন করে পত্রিকা পড়া বাইরে অনেকেরই হয় না। নানা দিকের টানাপোড়েন থাকে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাটি কাদের মুখপত্র তা সবার জানা আছে। এ পত্রিকাটি সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে ছাড়ে না। কিন্তু দশটা খবর একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে অনেক নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মেলে। তার জন্যে আছে 'রিভিউ'। সপ্তাহ শেষে এক দুপুরে রিভিউ হবে পত্রিকার সংবাদের ওপর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ঘন্ট-দিকনির্ণয়ের ওপর রাজবন্দীরা বলবেন নিজের নিজের মতামত। পরিবর্তনশীল দুনিয়াকে উপলব্ধি করার জন্যে রিভিউ একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

যাক, যা বলছিলাম। সন্ধ্যার পরে পত্রিকা পড়তে শুরু করেন চক্রবর্তী। সান্ত্রীটাও জানতে চায় দুনিয়ার চাকা কেমন চলছে। সংক্ষেপে জানাতে হয় তাকে কেমন চলছে, তারপর আবার পত্রিকা পড়া চলতে থাকে। সাড়ে ন'টার পর পত্রিকা পড়া শেষ হয়। এবার খাবার পালা। এখন পরিবেশন করবেন গুপ্ত। এ বেলায় মাছ-মাংস সম্ভব হয় না। কারণ ডায়েটের অপ্রাচুর্য।

খেয়ে উঠে হয়তো দেখা যাবে ছাত্রটি গুপ্তের গদী নৌকার মত স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে দিয়ে থালা ধুতে চলে গেছে। ওর নিজের স্যাণ্ডেল জোড়া কোথায় পড়ে আছে কে জানে।

'টুলু'—ধমক দিয়ে ডাক দেন গুপ্ত। টুলু ফিরে আসে। 'এখনও তুমি কমিউনিস্ট হতে পারোনি পুরোপুরি' গুপ্ত বলেন। 'এখনো তুমি শুধু একজন ছাত্রই।'

'বাইরে থাকতে তো এরকম ছিলাম না।' ছাত্রটি জবাব দেয়। ওর মতে এ হচ্ছে জেলে বন্ধ থাকার ফল।

'না' গুপ্ত বলেন, 'বাইরেও এরকমই ছিলে। কেবল ধরা পড়ত না। এখন ক্ষুদ্র গণ্ডি আর সীমাবদ্ধ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।'

অত্যন্ত ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। এর মধ্যে নিহিত আছে আরো বড় তাৎপর্য। খাওয়ার পর তাস খেলা। একটা কি দুটো 'রাবার' পর্যন্ত ব্রিজের আসর। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়া। খাটে শুয়ে শুয়ে আবার আলাপ চলে। কোরিয়ার যুদ্ধ ... ভাসানীর বক্তৃতা ... সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির ভূমিকা।

তারপর আবার সকাল হবে। আবার বন্দীরা জেগে উঠবে। আবার একটি দিন কাটবে। সেই নিয়ম বাঁধা বৈচিত্র্যহীন চলা।

এখানকার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস—সামগ্রিক চেতনাবোধ। কর্তৃপক্ষ বন্দীদের দেখে একেকজনকে আলাদা করে। তা সত্ত্বেও বন্দীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা বিরাট সমষ্টিগত জীবন। কারণ তারা রাজনীতি দিয়ে সহজেই বুঝতে পারে। এ জীবনের তাৎপর্য টাকা-পয়সা থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই যৌথ ব্যবস্থার অন্তর্গত। সকলের টাকা নিয়ে হয়েছে সাধারণ তহবিল। সবার তেল-সাবান নিয়ে হয়েছে 'কালেক্টিভ'। সাধারণ তহবিল থেকে প্রত্যেককে বিড়ি দেওয়া হবে—যারা অভ্যস্ত তাদের। আগে ছিল জনপ্রতি ছ'টা বিড়ি। সম্প্রতি হয়েছে তিনটে। কারো কারো হয় না ওতে। কিন্তু দুজনে মিলে গ্রুপ করে চলার ফলে বেশ চলে যায় ছ'টা বিড়িতে।

কারো টাকা সমান নয়। কারো হয়তো কিছু নেই। আপিসে জমা থাকে টাকাগুলো। কিছু কিনতে হলে চিরকুট পাঠাবার নিয়ম আছে। কারো স্বাস্থ্য খারাপ। একটা টনিক ফুড-এর দরকার ... তহবিল থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে খরচ চলবে না টাকা-পয়সা। প্রত্যেক ব্যাপারে এই যৌথ চেতনা অনেকখানি বিদ্যমান। এই যৌথ মণ্ডলীর মধ্যে কেবল রাজবন্দীরাই নেই। আছে হাজতীরাও। ওয়ার্ডের মধ্যে ৮/১০ জন কয়েদী হাজতীও আছে। কেউ হয়তো জমি নিয়ে দাঙ্গা করে জেলে এসেছে। কেউ এসেছে চুরি করে। কিন্তু রাজবন্দীদের উন্নততর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যেও হচ্ছে যৌথ চেতনার সংক্রমণ।

এখানকার জীবনটা চলে রুটিন মাফিক। অন্য কথায় বলা চলে ভীষণ গদ্যময়। কিন্তু এরি মাঝে রসের সঞ্চার করার প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

গানে, কবিতায়, আবৃত্তিতে, ব্যঙ্গে আর ক্যারিকেচারে ভরপুর হয়ে ওঠে এখানকার অনুষ্ঠানগুলি। সাহিত্যের বৈঠকে চলে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ। বিষয়বস্তুগুলি সব সামাজিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাছাই করা। যেমন ছাত্রটি সেদিন একটি ক্যারিকেচার দেখাল স্থানীয় একজন ডেমাগগ নেতার (সম্প্রতি চুরির অপরাধে যার শাস্তি হয়েছে) বক্তৃতা অনুকরণ করে। কদর্য রাজনীতির ততোধিক কদর্য অভিব্যক্তি।

অন্য একজন দেখাল ভোটের সময় সাধারণ একজন কৃষক সোনা মিয়া কেমন করে ভোটের সময়ে...পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল। তার ইতর ভাষায় বিপক্ষ দলের সমালোচনা সবার কাছে চমৎকার লাগে।

তারপর গান। গান চলে কৃষক আন্দোলনের, শ্রমিক আন্দোলনের নৌ-বিদ্রোহের গান। ঘুমতাড়ানী গান! পূর্ববঙ্গের কৃষকদের গান :

ভুঁড়ি ভাঙাটার বেটাডা
মোটর গাড়ির নেতাডা
মন ভুলাইল ভোটের বচন
দিয়ারে—
ভোটের বচন দিয়া।
এবেল মরি আর বাঁচি না
শুনি তোর ভোটের বচন...

ধরার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ধুয়া তোলে। মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ বিরোধী—'তাক ডুমা ডুম ডুম' সবার মনে সাড়া তোলে।

চক্রবর্তী ওঠেন, দেখান দুটো বক্তৃতা। সম্পূর্ণ দুই ধরণ। প্রকৃত জননেতার বক্তৃতা আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটের বক্তৃতা। চমৎকার প্রকাশ। ঠিক দুই বিপরীত

রাজনীতির খাঁটি এবং নিখুঁত অভিব্যক্তি। এ ধরনের বৈঠক করার ভর হচ্ছে সাংস্কৃতিক কমিটির।

বাইরের লোক, বিশেষ করে কয়েদী-হাজতীদের সঙ্গে কাটাবার পর যদি এ ওয়ার্ডে আসেন তবে অবাক হবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কত সুখেই তো আছেন।

কিন্তু বন্দীত্বের অভিশাপ তখুনি টের পাওয়া যাবে না। যাবে বহু পরে। দিনের পর দিন সম্পূর্ণ বিনা-বিচারে যখন কাটাতে হবে, তখন। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে আসবে না ; বই নেই, পত্র নেই যে একটু পড়া যাবে, এমন একটা অবস্থা। শক্ত রোগ—চিকিৎসা নেই। দিনের পর দিন ওজন যখন কমবে, মুখটা যখন বিবর্ণ হয়ে উঠবে, তখুনি কেবল উপলব্ধি করা সম্ভব বন্দীত্বকে।

তার ওপর আছে রাজনৈতিক জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। ছয় মাস পর পর সরকার গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার পাঠান। তারা বলে—'আত্মসমর্পণ করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন ...' ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় বন্দীরা। অফিসার ফিরে যায়।

কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ, দুর্ব্যবহার যখন আসে, তখন আবার উদ্দীপ্ত হয় মানুষের মন। বিহিত করার জন্যে মন আনচান করে ওঠে। তখন শুরু হয় লড়াই।

বিনা বিচারে আটক বন্দীদের সেদিনও কোন রাজনৈতিক সত্তা স্বীকার করা হত না। ফাইলের ডায়েট—অপরাধীর কাপড়। উঠতে বসতে ফাইল আর গালের সম্মুখীন হতে হত। দুর্ব্যবহার আর অপমান, আত্মসম্মানসম্পন্ন কোন মানুষের সহ্য হত না।

এর বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে সমস্ত প্রদেশের জেলগুলিতে ; তীব্র লড়াই। জেলের মধ্যে অন্যায়ের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উপায় আছে মাত্র একটা। সে হচ্ছে অনশন।

চার চারবার অনশন করেছে কেন্দ্রীয় কারার বন্দীরা। প্রথম বার পাঁচ দিন, দ্বিতীয় বার পঁচিশ দিন, তৃতীয় বার চল্লিশ দিন, চতুর্থ বারে আটান্ন দিন না খেয়ে ছিল বন্দীরা। জোর করে খাওয়ানোর সময়ে নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢোকাবার চেষ্টার ফলে ফুসফুসে নল ঢুকে যায়। তার ফলে প্রাণ দিয়েছে দেশপ্রেমিক ছাত্রকর্মী শিবেন রায়। তারফলে তৈরী হয়েছে সিকিউরিটি রুলস।

ছাত্রদের পড়াশুনার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে বটে। তবে কৌশলে সে অধিকার না দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। খাদ্য অপর্যাপ্ত, পরনের কাপড় কম। উপার্জনক্ষমদের পারিবারিক ভাতা নেই। সামান্যতম ছোট গল্পের বইটি পর্যন্ত দেওয়া হবে না।

তবু বন্দীদের অনমণীয় লড়াইয়ের ফলে কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু দাবী স্বীকার করেছে।

দিন এগিয়ে যায়, পৃথিবীর দিকে দিকে রূপান্তর ঘটছে। খবরের প্রধান উৎস কাগজগুলিতে যদি কিছু নাও থাকে, তবুও থাকে বিজ্ঞাপনগুলি। 'রেডি-মেড' সার্টের বিজ্ঞাপনগুলি দেখে বোঝা যাবে মানুষের রুচির পরিবর্তন। মানুষের মন দিন দিন বৈজ্ঞানিক হচ্ছে। ভড়ংয়ের মোহ থেকে মানুষ মুক্ত হচ্ছে দিন দিন। এই পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসে প্রিয়জনের চিঠিগুলি। ছাত্রটিকে ওর এক দূরসম্পর্কীয় বড় আপা জানিয়েছেন অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। লিখেছেন, 'তোমাদের মত ছেলেদের বেঁচে থাকার দাম আছে।' অথচ এই বড় আপাই ছিল একদিন ওর রাজনৈতিক জীবনের নির্মম সমালোচক। ঘটনার স্রোত এনেছে পরিবর্তন।

সব চিঠিতেই শুভেচ্ছা থাকে না। থাকে এক করুণ চিত্র। ছাত্রটির বাবার চিঠি এসেছে।

তিনি লিখেছেন :

...পরিবার ভেঙে গেল। তোমার জন্যে তোমার আম্মা পাগল হয়ে গেছেন। তোমার ছোট ভাই-বোনদের যন্ত্রণাদায়ক প্রাণান্ত জিজ্ঞাসা আমারও জীবনীশক্তির মূলে আঘাত করছে। তুমি যদি ইচ্ছে কর তবে মুক্তিলাভ করতে পার অনায়াসে। সরকারের কাছে জানাও যে তুমি আর রাজনীতি করবে না। এটা আমাদেরই জাতীয় সরকার। আশা করি তুমি তাই করবে। নচেৎ—বাবা ভয় দেখিয়ে লিখেছেন, 'কবরের এপারে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না বোধ হয়...'। মর্মান্তিক চিঠি।

চিঠি পেয়ে কয়েক দিন গুম মেরে যায় ছাত্রটি। ভেবে চিন্তে শেষে লেখে :

'... আপনার চিঠি পেলাম। আমাদের পরিবারের যে ধ্বংসের চিত্র আপনি এঁকেছেন, তা আমাকে তীব্র বেদনা দিয়েছে ! ...

কিন্তু আচ্ছা, আমি তো শুধু আপনাদের ছেলেই নই, সমাজের ছেলেও। সমাজের প্রতি রয়েছে আমার আরো বড় কর্তব্য।...

'আমি বাইরে এসে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। বাইরে হাজার হাজার বেকার যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তারা সম্পূর্ণ ভবিষ্যতহীন। এই সমাজকে ভেঙে নতুন করে দুনিয়া গড়তে হবে। আপনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বেতন পাননি চার মাসের। ভেবে দেখুন কতটা অমানুষিক এ ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা এর জন্যে দায়ী—তার কাছে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে আশা করি আপনি আর বলবেন না।'

শেষের দিকে লিখেছিল, 'এটা আমাদের জাতীয় সরকার নয়, এ সরকার ইস্পাহানী-হারুনদের, পীরদের-মীরদের, বড় বড় ধনীদের। তারা জাতি নয়, তার

বাইরে রয়েছে মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি শোষিত শ্রেণী। বর্তমান সরকার তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না।'

লিখে শেষে ভাবলে চিঠিতে রাজনীতি করা চলবে না ; তাই কেটে দিয়েছে শেষের লাইন কটি।

কিন্তু এরাও মানুষ। দোষে গুণেই মানুষ। তাই এমন সংগঠিত জীবন আর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বিচ্যুতি দেখা যায়। দীর্ঘ দিনের জেল বাসের ফলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মন। হঠাৎ দেখা যায় ঝগড়া হয়েছে। কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে। অনেক দূর গড়িয়েছে ব্যাপার।

টনক নড়ে তখন। বসে যায় আত্মসমালোচনার বৈঠক। কারণ অনুসন্ধান হয় কেন এমন হল ? বহু আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয়—'অমুক রাজবন্দী—আমাদের যৌথ জীবনে সমানভাবে অংশ নিতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে রাজনীতিকে সবচাইতে ওপরে স্থান না দেওয়া। অমুক তাঁর অন্যায় উক্তির দ্বারা অমুকের এই মনোভাবকে বাড়তে দিয়েছেন। সম্পাদক কেন এর আগে সভা ডাকেননি, সকলের সামনে অবস্থা ব্যক্ত করেননি, তাহলে তো এ ঘটতে পারত না।

রাজবন্দী অমুকও আত্মসমালোচনা করেন,—'আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু দিন ধরে আমার মেজাজ খারাপ হতে চলেছে। আমি ভুলে যাচ্ছিলাম যে আমরা সবাই কমরেড। এ হচ্ছে দীর্ঘ দিনের জেল-বাসের ফল। আমি এ দোষ কাটিয়ে উঠব। সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করুন।'

মরচে ধরা যন্ত্রে তেল দেওয়া যেন এটা। এ হচ্ছে সংগঠনের মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার। আবার পুরাদমে কাজ চলতে থাকে। নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় জেল জীবন কাটানোর জন্যে। প্রস্তাব নেওয়া হয় 'সমাজের ক্রমবিকাশ', 'ডলার সংকট', 'নয়া গণতন্ত্র'—এগুলির ওপর ক্লাস হবে তিনটি, এ মাসে। বিতর্ক সভা হবে একটি। বিষয়—'জাতিসংঘে কোরিয়া প্রসঙ্গ' আলোচনা। তার প্রস্তুতি চলতে থাকে। একঘেঁয়েমি কাটে।

কারাগারের উচ্চ প্রাচীর ভেদ করেও এখানে খবর আসে। 'সৈন্য এসে ভরে গেছে শহর', 'ছাত্ররা আমাদের মুক্তির দাবী জানিয়েছে।' আসে এসব খবর।

সিরাজ সান্ত্রী বলে মিটিংয়ের খবর। বলে, উজীরে আজম তো আমাদের কথা কইল না। আলাপ হয় এ নিয়ে—'বুঝলেন সেপাই সাহেব', ওসমান বলে 'এবার আমাদের এক হয়ে দাঁড়াতে হবে।'

সান্ত্রী বন্ধুটি বলে, আমাদের মধ্যে একতা নেই।

নেই ? না থেকে পারে ? গড়তে হবে একতা, সেপাইও তা জানে।

সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ নিয়ে সান্ত্রীরাও ভাবতে শুরু করছে। পুরোপুরি ধারণা নেই কারো। পেয়েছে কেবল আবছা আবছা একটা ধারণা। তার মধ্যে

দিয়ে তারা বুঝতে পারে সমাজতন্ত্র হচ্ছে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবের, যুক্তি তর্ক করার ভাষা।

সবাই আবার তাও বুঝতে পারে না। এ অঞ্চলে বেশীরভাগ কমিউনিস্টই এসেছে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, সংকটের ধাক্কা এসেছে তাদের ওপরে আগে। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশও নিয়েছেন তারা সবার আগে। সুস্পষ্ট ধারণাহীন কোন কোন সান্ত্রীর মনে এ নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কোন মুসলমান কমিউনিস্ট পেলেই তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে।

তাকে জবাব দেয়া খুবই সোজা। দাঙ্গার প্রশ্নে দৃষ্টান্ত টানতে হয় পাঞ্জাবের দাঙ্গার। সেখানে শত শত লোক কমিউনিস্ট বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজেরা জান দিয়ে বাঁচিয়েছে মুসলমানের প্রাণ। মুসলমানও বাঁচিয়েছেন হিন্দুর। তুলে ধরতে হয় তার সামনে বর্তমান শাসনব্যবস্থার চেহারা। ঢাকার ছাত্রী নাদেরা বেগমের কথা। বর্তমান শাসকদের ধর্মীয় জিগিরের বিরুদ্ধে এর চাইতে বড় যুক্তি আর কি হতে পারে সান্ত্রীদের কাছে।

সান্ত্রীরা জানে এরা হচ্ছে সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই তারা বন্দীদের চমৎকার সব খবর এনে দেয়। কি করে জেল থেকে ৫শ খানা দামী কম্বল চুরি গেল—কোথায় গেল তা। ১শ বস্তা ডালের কি হল, এইসব খবর। লেখা আছে দেড় হাজার টাকার কাঠ কেনা হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে একখানা তক্তপোষ ছাড়া আর কিছুই তৈরী হয়নি। বাকি কাঠ কোথায়? এসব খবর নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। চাচা যদি উপস্থিত থাকেন, তবে হয়তো বলেন—বড় চোর ধরা পড়ে না। তাদের হাতেই তো আইন।

চোর ডাকাতের শাস্তির জায়গা তো এ নয়। এটাও একটা চুরির জায়গা। চক্রবর্তী বলেন—বুড়ো মার্কস ঠিকই বলেছিল যে জেলটা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র। কেতাবের হরফের ছাঁদে চোখ বুলিয়ে সেটা যদি কেউ না বুঝে থাকেন, তবে বুঝবেন এখানে এসে।

জেলের মধ্যে ফন্দিবাজী আর এটা-ওটা পকেটস্থ করার নাম দিয়েছে, লটর পটর করা—আঞ্চলিক ভাষায়—চুদুর-ভুদুর করা। চুদুর-ভুদুরকারীদের বলা হয় বি কেলাশ। কিরে বেটা বি কেলাশ, কেমন আছস? একজন আর একজনকে শুধোয়।

রাজবন্দী ওয়ার্ডে এর বালাই নেই। জেল সুদ্ধ লোক দেখতে পাচ্ছে তাদের। প্রভাবান্বিত হচ্ছে তারা। রাজবন্দীদের লড়াই-পদ্ধতি মনে হয় তারাও আয়ত্ত করেছে। সম্প্রতি কয়েকজন খাওয়া ছেড়েছে। হাঙ্গার স্ট্রাইক উচ্চারণ করতে পারে না তারা। বলে থাণ্ডার স্ট্রাইক। তার ফল ফলেছে ইতিমধ্যে। আগে কয়েদীদের জেলে বিড়ি খাওয়ার নিয়ম ছিল না। সম্প্রতি অনুমতি এসেছে নিজের খরচায় বিড়ি খাওয়ার।

তাস, দাবা, কেরাম খবরের কাগজ, শরীরচর্চা, গালগল্প, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা—এই হচ্ছে এখানকার দৈনন্দিন পরিক্রমণের কক্ষ। সূর্য উঠবে।—লকআপ খুলবে—। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ একই ধারায় রুটিন বাঁধা জীবন। আবার রাত্রি আসবে। আবার পত্রিকা পাঠ। তারপর খাওয়া। ঘুমানো। কারাগারের অন্ধকার তীব্র হয়ে আসে। শহরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসে। লকআপ হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগে। স্টেটসম্যান পত্রিকার পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রশস্তিতে ইতি পড়েছে অনেকক্ষণ। সবাই শুয়েছে খাওয়ার পর। ঘুম আসছে না। ছাত্রটি কবিতা লেখা শেষ করে—

'...বিরাট সম্ভাবনা মেনে নিই
আজ কঠিন বিশ্বাসে
এই দৃঢ় আশ্বাসে
আগামী দিনকে জানাই অভিনন্দন
যখন,
আমার মত বিশ বছরের তরুণ প্রাণ
উদ্ধত যৌবন নিয়ে
        গাইবে জীবনের জয়গান
তাদের শক্ত বাহুর শক্তিতে
খামারে ও ক্ষেতে
ট্রাক্টর পাবে গতি
            (লুপ্ত নিয়তি)
পাহাড় ওড়াবে নদীকে ফেরাবে
সাগরকে মানাবে হার
আর
বন্য জীবনের দুয়ারে লাগাবে খিল
মুক্ত স্বাধীন সোভিয়েৎ দিল।...

রাত্রির কামনা পূর্ণ হবে। আবার প্রভাত আসবে। সৌর তালিকা থেকে খসে খসে পড়বে এক একটি দিন।

প্রস্তরীভূত গ্রানাইটের মত বন্দী জীবন কঠিন। কিন্তু গতিশীল। জীবন এগিয়ে চলেছে।

ভেতর বাইরে সারা দুনিয়ায় আজ দ্বন্দ্ব। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবার পালা এসেছে। একদিন এ তিমির-তপস্যার অবসান হবে—এ আশাটি ধুঁক ধুঁক করে জ্বলছে সবার হৃদয়ে। বন্দীরা বেঁচে আছে।

এক টুকরো মেঘ

- এক টুকরো মেঘ
- বিষকন্যা
- প্রাণের চেয়ে প্রিয়
- জসুভাবীর জন্য
- দেয়াল
- যে গল্প কেউ বলেনি
- যৌবন
- চালচুলো
- ছেলেটা
- শেষ সংবাদ

এক টুকরো মেঘ

সকাল বেলা থেকে কাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে দুপুরের রোদ মাথায় করে বাড়ী ফিরেছে আনু। একপাল ভাইবোনকে খাইয়ে দাইয়ে মা চাটাই-এর উপর গা এলিয়ে দিয়েছেন সবে। এরি মধ্যে আনুর ডাক শুনে মুখ ভার করে উঠে এলেন তিনি। এসে ভাত বেড়ে দিলেন। সবার খাওয়া শেষে তলায় পড়া ঝুর ঝুরে ভাত একটুখানি ডাল আর আলুর ভর্তা। মনে মনে রাগ করলো আনু। খিদে পেয়েছে তার বিষম। কোথায় ভাল একটুখানি তরকারী মা আলাদা করে রেখে দেবেন তার জন্যে, না ঝুর ঝুরে ভাত, তা-ও উনো। এইটুকু ভাতে ওর কি হবে। বয়েস যে তার বেড়ে গিয়েছে সেটা কথায় কথায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বেলায় তো কি মা কি বাবা কেউ কম যান না। কিন্তু মনের রাগ সে চেপে গেল মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। কি জানি কি হয়েছে। আজকাল বাড়ীতে কখন কি যে হয় তার কিছু ঠিক নেই। মনের রাগ তার কোথায় উবে গেল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর একটু ভর্তা দেবে, মা ?'
প্রশ্ন করে মার মুখের দিকে তাকাল আনু।
মা কোন জবাব দিল না।
'আর একটু দাও না ভর্ত্তা।'
'ভর্ত্তা আর নেই।'
আনু চুপ করে গেল।

চেপে যাওয়া রাগটা তার ফুঁসে বেরিয়ে আসতে চাইছে মনের ভেতর থেকে। একটু বেশী ভর্ত্তা কি তার জন্যে রাখা একেবারেই সম্ভব ছিল না ?

'রাখনি কেন আর একটু বেশী করে।' আহত সুরে, অভিমানের ফলা উঁচিয়ে ধরে সে।

'হ্যাঁ রাখবে।' দুই চোখ বড় বড় করে মা তাকালেন তার দিকে, 'কোত্থেকে রাখবে শুনি। এখানে তোর বাপ টাকশাল বসিয়েছে না কি যে, গামলা গামলা সালুন খাবি ? না, তুই কামিয়ে এনে দিচ্ছিস শুতে শুতে, আর একটু দাওনা ? এত বড় ধ্যাংড়া ছেলে। ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে তো বেড়াচ্ছিস খালি। কোত্থেকে আসে কোথায় যায় সে খবর আছে ? খুব তো বলছিলি'—মা আরও বলে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে আনু বল্‌লে, 'থাক মা থাক। আমারই দোষ হয়েছে সালুন চেয়ে। একটু খানি চুপ ক'রে সে আবার বল্লে, 'আমার তো এখন চাকরী নেই যে এটা ওটা তুলে রেখে খাওয়াবে। বেশ তো চাকরী যখন আবার পাব তখনই না হয় চাইবো সালুন।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে সে। তারপর বাসনটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। কথা শুনে মার মুখের অবস্থা কি দাঁড়ালো সেটা লক্ষ্য করবার ইচ্ছা হলনা তার। মুখ ধুয়ে, কুলি করে বিছানায় গিয়ে ধপাস করে পড়ল সে।

অভিমানে মনটা তার চৌচির হয়ে যাবে। কী তার দোষ? তার বয়স বেড়েছে। কিন্তু সে আর কতো। ম্যাট্রিক পাশ করে মাত্র ক'টি বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করে সে চাকরী নিয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, 'ফেল করা ধ্যাংড়া ছেলেকে আর বসিয়ে খাওয়াতে পারবো না। যাও, চাকরী করো গে।'

ধ্যাংড়া! মাত্র ক'টি বৎসর—এরই মধ্যে তার নাকি বয়স বেড়েছে এতখানি। অথচ ছেলের বয়স বাড়ো বাপ—মায়ের কাছে আনন্দেরই তো ব্যাপার। ছেলের বিয়ে থা দেবেন, নাতি নাতনী হবে, এই ভাবেই তো চিন্তা করে এসেছেন সবকালের বাপ মায়েরা। আনুর মনে পড়ে যায় কৈশরের একটি ঘটনা। সে-দিনে আর এ-দিনে কী তফাৎ!

সেদিন সদ্য কালো হয়ে অসা গোঁপের দিকে চেয়ে তার সর্বপ্রথম মনে হ'য়েছিল, কাটা দরকার। ক্ষুর না লাগিয়ে বাপের দাড়ি কামানোর বাকশো থেকে ছোট্ট কাঁচিটা নিয়ে আয়না সামনে রেখে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাঁচি চালাচ্ছিল আনু। বাবাও ঠিক সেই সময়েই ফিরলেন বাইরে থেকে। ঠিক সামনা-সামনি পড়তেই আয়না কাচি দেরাজে রেখে দিয়েছিল সে। বাবার পিছু পিছু আনুও উঠে এসেছিল টেবিল ছেড়ে। ওর পড়ার ঘরের শেষ জানালাটার ধরে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল বাবা বলছেন মাকে—'ওগো' এবার আর কি! ছেলে তো লায়েক হয়ে এলো।' মা বলেছিলেন, 'হবে না তো কচি থেকে যাবে নাকি! তোমার যেমন কথা।'

এভাবে মা-বাবার সংলাপ চুরি আনুর স্বভাব নয়, তবু ও বিষয়টা এত কৌতুহলোদ্দীপক, এত সুন্দর আর আবেগ মাখা যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের রসালাপ সে না শুনে পারেনি। মনে মনে দুজনেরই অসংখ্য প্রশংসা করেছিল সে। সেদিনে কী এক মহৎ সুন্দর ছবি ভেসে উঠেছিল দু'জনেরই চোখে। কোথায় গেল তা'! কেন মিলিয়ে গেল তাদের সেই আশা, আনু তা' ভেবে, পায় না। আচ্ছা দৈন্য কি মানুষকে এত ছোট করতে পারে? বাবা বলেছিলেন চাকরী করো গে।

আশী টাকা মাইনেতে ছোট খাট কেরানীগীরি জুটিয়েছিল সে। নিজের জন্য দু'টো জামাকাপড় আর একজোড়া জুতো, এই মাত্র সে করেছে। বাড়ীতে যা, দিয়েছে তা' এমন কিছুই ছিল না। সামান্য ক'টি টাকা। তবু তাই যেন তার মস্ত যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা কিছু ভাল খাবার তার জন্যে তোলা থাকতো। বাড়ীর প্রতি ব্যাপারে তার মতামতের মূল্য ছিল অপরিসীম। ঘন ঘন বিয়ের কথা উঠতো তার। যদিও অবাস্তব, তথাপি মুখরোচক বিষয় হিসেবে বিয়ের কথাটা বাড়ীর সবার মুখে মুখে ফিরতো।

বোনটা তো আরো পাকা পাকা কথার ওস্তাদ। ভাই, তুমি কাকে বিয়ে করবে ? ওকে ? না, ওকে ? না, ওই ওকে। এসব প্রশ্নে অভূতপূর্ব এক আনন্দের দোলা লাগতো তার মনে। ভুলে যেতো ধমক দিতে। বিছানার এক কোনায় এসে শুয়েছে সে। হেলান দিয়ে একটা গল্পের বইয়ে মগ্ন হয়ে আছে তার বোন নাজমা। ভাল করে শুতে হলে ওর আর একটু খানি সরা দরকার।

—'একটু সরনা নাজু।'

বই পড়ায় বাধা পেয়ে নাজমা চোখ তুলে তাকাল। এ-ই নাকি নাজমা ? এই ক'দিন আগে ওযে ভাইকে কাছে পেলে নানা আব্দারে মুখর হয়ে উঠতো। আর একটা কথাও না বলে সেখান থেকে উঠে এলো আনু।

ঘরে তার এক মুহূর্ত ভালো লাগলো না। গেল পাশেই এক বন্ধুর বাড়ী। আশে পাশের বাড়ীগুলির মধ্যে এক ওখানে গিয়েই সে কিছুটা আরাম পেত। চমৎকার পরিবার, একটি বড় ছেলে, এবং বড় একটি মেয়ে।

কিন্তু ওখানে আজ তেমন সাড়া পেল না সে। আগে ওদের বাসায় গেলেই বন্ধুর মা ডেকে বলতেন—'এসো এসো বাবা। একটু চা দেত মা রোকেয়া।' তারপর আলাপ জুড়ে দিতেন এন্তার।

এই তো কাজের ছেলে। দেখতো, বাপ-মায়ের কাঁধের বোঝা না থেকে এরি মধ্যে দু'পয়সা ঘরে আনছে। বয়স কালে এরাই মানুষ হয়। আমাদেরগুলোর তো আর কিছুই হলো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ কিন্তু একবার দেখেই তিনি পাক ঘরের দিকে চলে গেলেন খুন্তি হাতে। যেতে যেতে রোকেয়াকে ডেকে বল্লেন,—'ও রুকি দে তো নসু কে একটু গোসল করিয়ে। আমার মেলা কাজ।'

রোকেয়া চলে যাচ্ছিল। আনু তাকে থামাল।

'আচ্ছা তোমার সেই সেলাইটার কি হলো। ফুল আঁকিয়ে নেবে না বলেছিলে ?'

'দিলেন না তো ; কত করে বল্লাম তখন।'

ড্রয়ার থেকে একখন্ড রুমালের কাপড় বার করে দিল সে।

—'ফুল এঁকে দিয়ে যাবেন।'

কি ফুল পছন্দ তোমার ?'

দূর থেকে গলা ভেসে আসে,—'ও রুকি কি করছিস আবার। বল্লাম যা কানে গেল না বুঝি ?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রোকেয়া।

ফিরে এলো রুমালের কাপড়টা নিয়ে। বাড়ীতে বসে পেনসিল দিয়ে ড্রয়িং করে সময় কাটাবে ভেবেছিল সে। কিন্তু মন বসলো না।

মনের মধ্যে তখন তার বেদনাহত একটা সুর গুমরে গুমরে মরছে। দম আটকানো ভাবটা ফুসফুসে চেপে বসেছে। চীৎকার করে যদি বলতে পারতো তার এই মুহূর্তের মনের অনুভূতিগুলো!

বিছানায় ধপাস করে পড়ল এসে। মুখ গুঁজলো বালিশটাতে, মনে হলো সে কাঁদবে। কঁকিয়ে উঠ্‌তে গেল কুড়ি বাইশ বছরের সুস্থ, সবল জোয়ান ছেলেটা। চোখের পানি বাঁধ মানে না।

বহুক্ষণ ওভাবে পড়েছিল সে।

তারপর হঠাৎ কার ডাক শুনতে পেল বাইরে থেকে। চোখ মুছে কান খাড়া করে শুনলো খানিকক্ষণ। পরিচিত বন্ধুর গলা। যে মুহূর্তে বন্ধুর মুখের ছবিটা ভেসে উঠলো তক্ষুনি তার মনে হলো, সে যেন মুক্তির পথ পেয়ে গেল এই অবস্থা থেকে।

কিন্তু এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া চলে না। খুব ভালো করে চোখ মুখ মুছে নিল সে। তারপর বেরিয়ে এসে দেখল, শেলী দাঁড়িয়ে আছে। 'চল্।'

—'কোথায়?' আনু জিজ্ঞেস করে।

'চল না! কাজ আছে।'

ওর কথায় আজ কি দৃঢ়তা। বিনা বাক্য ব্যয়ে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

সন্ধ্যা বেলায় যখন বাড়ী ফিরলো, তখন আনুর চোখে মুখে খুশির ঝকমকি। মনের মধ্যকার অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দ চঞ্চল কর তুলেছে তাকে। একবার এঘরে আর একবার ও ঘরে বহুবার ঘোরাঘুরি করল। একবার নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা জুতো নেড়ে চেড়ে দেখলো। তারপর ফিরে এসে কি যেন বলতে চাইলে, মাকে। কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল হঠাৎ। বাবার সামনে দিয়ে যেতে বাবার গম্ভীর ক্লান্ত মুখটা সে দেখে নিল একবার। চুপ করে জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে রইল কিছুক্ষণ।

অনেকক্ষণ পরে মা খেতে ডাকলেন।

পিঁড়িটা টেনে মাথা নীচু করে বসে রইলো আনু। মা ভাত বেড়ে দিলেন। কি আশ্চর্য!

দেখল দু'তিনটে তরকারী বেশ খানিকটা করে সাজানো তিনটে বাটিতে।

মনটা তার এক মুহূর্তে আনন্দে ভরে যায়।

ওর হাবভাব দেখেই মা বুঝতে পারেন কিছু একটা হয়েছে। বলেন, 'এত তাড়া কিসের বাপু, একটু ধীরে সুস্থে খা-না!' সে কথায় জবাব দিল না আনু, শুধু বল্লে, একটা চাকরী হয়েছে মা।' সকালের কথা মনে করে মা হেসে বল্লেন, 'নাকি? কোথায়, কি চাকরী?

'এরোপ্লেনের অফিসে।'

এরোপ্লেন ! আচ্ছা রাখ রাখ।' একটা ডেক্‌চীর ঢাকনা আলগা করতে করতে বলেন, 'কতো দেবে রে ?

'তা দেবে দেড়শোর মতো।'

'দেড়শো ! তবু ভাল। বলেছিস তোর বাপ কে ?'

'না। আমি পারবো না বলতে। তুমি বলো গে।'

খুশিটা তুলে রেখে মা তক্ষুনি উঠলেন।

'শুনছো ?'

ও পাশ থেকে জবাব এলো না।

মা তবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন,

'শুনেছ আমাদের আনুর চাকরী হয়েছে। এরোপ্লেনের অফিসে। দেড়শো টাকা মাইনে'।

খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে বেনী দুলিয়ে ছুটে এলো নাজমা।

চোখে মুখে তার আনন্দ উপছে পড়ছে যেন।—'সত্যি ভাইয়া ? এরোপ্লেনের অফিসে ? দেড়শো টাকা ?'

চোখ ছানাবড়া করে তাকায় সে। কতরকমের চাকরীর কথাই তো সে শুনেছে, কিন্তু এরোপ্লেনের অফিসে চাকরী তো আর যা তা নয়। এবার থেকে সঙ্গিনী-দের কাছে সে গর্ব্ব করে বলতে পারবে, যে, দেখছিস, ওটা আমার ভাইয়াদের কোম্পানীর—উড়ে যাচ্ছে।

সবার খাওয়া দাওয়া চুকলে তাদের পারিবারিক জীবনের এই মস্ত খবরটি নিয়ে আলোচনার আসর বসে। ওর চাকুরী প্রাপ্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা কথা ভিড় জমায়।

'বেতন থেকে তুমি ভাইয়া কিছু কিছু টাকা জমিও।' একটা হাতঘড়ি আর একখানা সাইকেল না হলে চলে না ব্যাটা ছেলেদের। কিন্তু ওকে একটা উড়ুনি কিনে দিতেই হবে। সেই সঙ্গে দুটো গল্পের বই-ও। বাবা জিজ্ঞেস করেন,—'কাজের সময় কখন ?' ওর জবাব শুনে বলেন,—'পারবি তো ? শরীর স্বাস্থ্য যা করেছিস। একটু ভালো জিনিস যে তোদের খাওয়াব সে উপায় কি আর আছে। প্রতি মাসই ধার করতে হচ্ছে। আমার নিজের, দেখ, দু'টোর বেশি জামা নেই। অথচ আর একটা করাতে পারছি না।'

মা বলেন,—তা' আমাকে একখানা ধুতি এনে দিস বাপু। আমার একটা নামাজ পড়ার কাপড় নেই।' চুপি চুপি আনু হিসেব দেয় মাকে, এবারকার

বেতন পেলে কাকে কি দেবে। শুতে গিয়ে অনেক রাত অবধি ওর চোখে ঘুম আসে না। দুপুরের কথা তার মনে আছে। তখনকার মনের অবস্থাটা সে স্মরণ করতে পারে। কিন্তু তার সবই ভুল, সত্যি হলো তার এই মুহূর্তের ভাবনাগুলি। সত্যিই তো, বুড়ো হয়ে গেছেন বাবা। ছেলে যদি এখন রোজগার না করে তা হলে কি করে চলবে। আসলে তাঁরা কেউ খারাপ নন। একটু গালমন্দ করেন, সে-তো তার ভালোর জন্যেই। অহরহ ওরা তাড়া দিয়েছিলেন বলেই তো চাকুরীর জন্য সে অমন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। আর মা ! কি যে তিনি খুশী হয়েছেন, সে তো তার চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। নাজমা সুন্দর বোনটা তার। সে নিশ্চয়ই সারা পাড়ায় বলে বেড়াবে তার ভাই উড়োজাহাজ কোম্পানিতে কাজ করে।

বুকটা তার দুলে ওঠে। আসলে দুনিয়াটা তো তেমন খারাপ নয়, যেমনটা সে দুপুর বেলাতেও ভেবেছে। আকাশ তো নীল-ই, মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্যে একটু খানি মেঘ করে।

বিষকন্যা

কথায় বলে, যেমন মা তেমনি মেয়ে।

মায়মুনার মা বলে, কথাটা একেবারে মিছা। অন্ততঃ মায়মুনার বেলায় ওকথা খাটেনা।

'আসল কথা বিষ মা, বিষ। বিষে জ্বলে পুড়ে মরছে ও মেয়ে। নইলে অমন রূপ আর জোয়ানকি থাকতে করে কেউ ঐ রকম ধারা ?' অতএব বিষই সই। পাড়া-পড়শীরাও মেনে নেয় সে কথা।

দূর থেকে মায়মুনার আসার সাড়া পেলেই বউ-ঝিরা ছেলেপিলে বাইরে থাকলে ঘরে ডেকে নেয়। চঞ্চল ছেলের চোখে ঘুম না এলে তাকে ভয় দেখায়, ঘুমা, ঘুমা, ঐ বিষল্যা আসছে।

আর মায়মুনার আসা ! এসে পড়ার বহু পূর্বেই তা'টের পাওয়া যায়। পথ চলতে মায়মুনার ঠোঁট দুটো নড়ে। মুখ দিয়ে বেরুতে থাকে অনর্গল বকুনি। গালাগালি। কাকে বকছে, কাকে গাল পাড়ছে, বহুক্ষন অনুধাবন না করলে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

'ছাইয়ে হয়না, মাটিতে হয়না। লেবুর রস, তাতে কুলোয়না। হয়েছে কি ? পিতল না হাতী। জ্বালায় বাঁচিনা। সাফ হয়না তো আমি করব কি ? তখন চোখ দু'টো বন্ধ করে কেনা হয়েছিলো ? এখন মায়মুনির মাজা ভালনা, মায়মুনির ধোয়া ভাল না। মায়মুনি এমন, মায়মুনি তেমন।'

বক্‌তে বক্‌তে থালা বাসন নিয়ে পুকুরের দিকে যাচ্ছিল মায়মুনা।

সামনে পথের উপর একগাদা খড়ের বিচালী।

মায়মুনার চলার কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। তবু পা দিয়ে খড়গুলি সজোরে উড়িয়ে দিলো সে।

'একটা পা নিশ্চিন্তে ফেলার উপায় আছে ? দুনিয়ার যত জঞ্জাল জড়ো করে রাখবে পথের উপর। যত সব হা'ভাতে...।'

সামনে যদি কোনো কুকুর পড়ে,

'সর সর সর। সর না কুত্তার বাচ্চা কুত্তা। হা'ভাতের মত পায়ের সামনে পড়ে থাকিস...। অমা সরেও না দেখি। কোন বাড়ীর কুত্তারে বাবা। অমা...' তারপর চলল ঘন্টাখানিক মায়মুনার কথাস্রোত সে আর বন্ধ হয় না। থালা নিয়ে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসার পরেও সেই কুকুর প্রসঙ্গ চলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আপনিই প্রসঙ্গ পরিবর্তন হয়। আক্রমনের খড়গ লক্ষ্য পরিবর্তন করে। পাড়ার প্রতিটি লোক, ছেলে জোয়ান, বুড়ো কেউ বাদ যায় না। কেউ কোনো দিন কিছু

একটা ক্ষতি করে থাকবে কিংবা কেউ কিছু বলেছিলো, সবই তার মনে হতে থাকে। সবার উপরেই তার আক্রোশ, সবাই তার শত্রু।

বয়সের দিক থেকে কুড়ি পেরিয়ে আরো তিন চারটে বছর কাটিয়ে দিয়েছে মায়মুনা। সারা দেহের শক্ত বাঁধুনি আর অতুলনীয় যৌবন-শ্রী-পাড়ায়-পাড়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারতো যদি পাত্রীট মায়মুনা না হয়ে অন্য কেউ হত।

গায়ের রঙ কাঁচা সোনার বর্ণনা হলেও সে গৌরী। সর্বোপরি তার রয়েছে বৃহৎ আয়ত দু'টি চোখ, কিন্তু তাতে শান্তির চেয়ে আগুনই বেশি। ওর চোখের ভয়ে পাড়ার যুবক প্রৌঢ় কাউকে সাহস করে ওর দিকে তাকাতে দেখা যায়নি। পথ চলতে কেউ যদি হঠাৎ ওর দিকে নজর দেয় তবে অনর্থক হয়ে যাবে সেদিন। তার সাতপুরুষ উদ্ধার করতে সময় লাগবে সাত ঘন্টারও বেশী। সুতরাং কাজ কি! সমর্থকরা এড়িয়ে চলাই ভাল মনে করেন।

মায়মুনার বিয়ে হয়েছিলো। স্বামী ছেলেটি পাড়ারই এক বকাটে ছোঁড়া। ফেই ফেই করে ঘুরে বেড়াত ডান্ডাগুলি খেলত আর ছিপ নিয়ে মাছ ধরত। তাকেই শেষ পর্যন্ত মায়মুনার পছন্দ হল। সবাই নিষেধ করেছিলো 'আরে ঐ রোগা পট্‌কা ছেলেটা ? বিয়ে দেবে ঐ হস্তিনীর সঙ্গে ?'

মায়মুনা বেঁকে বসেছিল, 'ও না হলে নয়।'

অগত্যা মায়মুনার মা-ও মত দিয়েছিলো। বিবাহিত জীবন ওদের কেমন সেটা জানবার কৌতুহল ছিল সবার, কিন্তু কেউ বিশেষ কিছুই জানেনা সে সম্পর্কে। কোনোদিন রাত নিশীথে কান্নার শব্দও শোনা যায়নি আর কোনো উপলক্ষ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিও হয়নি ওদের মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল ছেলেটা নেই। দেখা গেল মায়মুনার আর একরূপ। যাকে সামনে পেল, তাকেই জিজ্ঞাসা করল কালুকে দেখেছে কিনা। বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ করতে বাকি রাখল না। যে শুনল মায়মুনাকে স্মামীর খোঁজ করতে, সে-ই হাসল। কিন্তু কালুর খোঁজ পাওয়া গেলনা। মায়মুনা শেষে রেগে বলতো, 'গেছে কোথাও ছোঁড়া, আবার গিলতে তো আসবেই। নিজে কামিয়ে খাবার মুরোদ আছে ? আমার খাটুনীর খাওয়া না হলে তার চলবে ?

কিন্তু কালু আর ফিরে এলো না। একদিন দু'দিন নয় সাত সাতটি বছর। প্রথম প্রথম মায়মুনা বলতো, 'না এসে যাবে কোথায় ছোঁড়া।' শেষে একেবারে চুপ মেরে গেল। আগের মতই লোকের বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ করে দিন গুজরান করতে লাগল মায়ে-ঝিয়ে। মায়মুনার বাপ মারা গিয়েছিল ও যখন ছোট, সেই থেক বিধবা মা মানুষ করছে ওকে। বাপের সম্পত্তি বলতে শুধু একটি ভিটে। তা-ও আশে-পাশের লোকদের বসত বাটির অন্তর্ভূক্ত হতে হতে এক এক হতে দু'হাত করে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সেই ভিটিতে জীর্ণ একখানি

ঘরে মা-মেয়ে দু'জনা রাত কাটায়। সকালে উঠে দুজনে দুজনের কাজে চলে যায় দুই বাড়ীতে। রাত্রে খেয়ে দেয়ে, নতুবা, ভাত সঙ্গে করে আবার শুতে আসে।

শোওয়া, শুধু ঐটুকুই মায়ে-ঝিয়ে সম্পর্ক। নইলে কথা বন্ধ অনেকদিন। চুপচাপ দুজনে দুই বিছানায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়। রাত্রে প্রদীপটা, পানিটার দরকার হলে দুজনেই নেপথ্যে কথা বলে। তাতে কাজ হয়ে যায়। এইভাবে মায়মুনা আর ওর মায়েতে চলে আসছে অনেকদিন ধরে।

শুধু মায়মুনার স্বরূপটা আত্মপ্রকাশ করেছে আগের চেয়ে আরো প্রকট হয়ে। গালাগালি আর বকুনি তো আছেই, থেকে থেকে জোয়ান মেয়েদের সাথে চুলোচুলিও বেধে যায়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়মুনাই জেতে। ফলে পারত পক্ষে এখন কেউ ওর ত্রি-সীমানায় আসতে চায়না। নেহাৎ দরকারী কথা না হলে ওর সঙ্গে কেউ বড় একটা মুখ খোলে না। যে বাড়ীতে ও কাজ করে তারাও উচ্চবাচ্য করেনা। বরং কিছু বলবার দরকারও হয়না। বক্‌লে-ঝক্‌লে হবে কি, মেয়েটা কাজ করতে পারে অসুরের মতো। নিজের কাজ সে নিজেই ভালো বোঝে। বাড়তি কাজ পড়লে সেটা সরাসরি ওকে না বলে পরোক্ষে শুধু দরকারটা ঘোষণা করেই চুপ করে যায় মনিবেরা। ওতেই হয়। কিন্তু কেউ যদি বলতে গেল ও কাজটি হয়নি, তবে সেদিন আর রক্ষা নেই। বক্তাকে গাল না-পাড়ার মত সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান মায়মুনার আছে। শুধু বকুনি আর বিড় বিড় করার মাত্রাটা বাড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। প্রাণান্ত হতে হবে শুনতে শুনতে।

মায়মুনার মা বলে, 'ওকে পেটে ধরেই আমার হয়েছে কাল। পেটে থাকতেই ও মেয়ে আমার জানটা ঠোঁটে এনে ফেলেছিলো তারপর জন্মানো থেকে আমার হাড় কালি করে ছাড়ল।'

হাজী বাড়ীর কুলসুম ভরা পুকুরের ঘাটে বসে বাসন মাজতে মাজতে সহানুভূতি-মাখা-সুরে বলে, 'তোমার কথাই ভাবি খালা। তিন কুলে তোমার আর কে আছে বল। ঐ এক মেয়ে। নসীব, নসীব। নইলে অমন বয়েস, আর একটা সাঙ্গা করলেই পারিস। কেউ মানা করেছে তোকে। সোয়ামী ছোঁড়া মরে যে যায়নি তার কোন প্রমাণ আছ ? অর বেঁচেই যদি থাকে—'

হঠাৎ কুলসুমের জিবটা যেন খসে গেল।

ঘাটের উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মূর্তিমান যমের মত দাঁড়িয়ে আছে মায়মুনা স্বয়ং। মায়মুনার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধোয়া চালের টুকরীটা হাতে করে উঠে দাঁড়ায়।

তরতর বেগে নেমে আসে মায়মুনা। কোমরে হতে দিয়ে ভাটার মত চোখ দুটো জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মায়মুনার দিকে চেয়ে কেঁপে উঠ্‌ল কুলসুমের অন্তরাত্মা।

নির্বাক দৃষ্টিতে বসে থাকলো সে।

'মায়মুনির চর্চা না করলে ভাত হজম হয়না তোদের ?'

কুলসুম কোনো জবাব দিল না।

'যেখানে যাই খালি মায়মুনির চর্চা কেন, মায়মুনি তোদের মায়ের খসম কেড়েছে না তোদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে শুনি ?'

কুলসুম এবার ভয়ে বলল, 'তোমার চর্চা কেন করতে যাবো আমরা ?'

'একশোবার করেছিস। বলে, আমার চর্চা করতে গাল বাঁকা হয়ে গেল তোদের। ফের যদি কখনো শুনেছি মায়মুনির নাম মুখে এনেছিস, চিরে ফালি করে শুকিয়ে শকুন দিয়ে খাওয়াবো।' কুলসুম ততক্ষণে ঘাটের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটু সাহস করে বলল, 'খাওয়াতে হয় নিজের মাকে খাওয়াও। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন ?'

গুম হয়ে যায় মায়মুনা।

'মা, বেটি আবার মা। তোর কি করেছি আমি ? তোর খাই না পরি ? আমার বাপের ঘরে থাকি, মেহনত করে খাই। তোর ধার ধারি আমি। তবে কেন তুই এ-ওর কাছে আমার নাম গেয়ে বেড়াস। আবার বলে মা। তোর জন্যেইত আজ আমার এ দশা।'

মায়মুনার কথার স্রোতে বান ডাকে। অনেকক্ষণ ধরে বলল মাকে, যে বাপ জন্ম দিয়েছে তাকে ; কুলসুমকে, ওর স্বামীটাকে,—ওকে শায়েস্তা করতে না পারার জন্যে, হাজী গিন্নীকে অমন মেয়েকে যায়গা দেবার জন্যে।

আক্রমনের শেষ লক্ষ্য কালু।

'তোকে এমন কি বলেছিলাম যে আমার এমন সর্বনাশটা করলি ?' আসরের আজান পড়তে ঘাটে আসা। বকতে বকতে অনেকক্ষণ সময় পার করে দিয়েছে মায়মুনা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। পুকুরের পাড়ের দিকে আম-কাঁঠালের বন। ঘন ছায়ায় আবৃত হয়ে এসেছে সমস্ত অঞ্চলটা।

বাসন মাজতে মাজতে পুকুর পাড়ের দিকে চেয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে মায়মুনা। দেখল পশ্চিম পাড় দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটি লোক। বগলে ছাতা, পিঠে একটা পুঁটুলী। কে, কে লোকটা ? আরো মুখ তুলে ভালো করে চেয়ে দেখলো সে। বুকের মধ্যে বহুদিন পরে কিসের যেন প্রচণ্ড আলোড়ন অনুভব করে উঠে এলো মায়মুনা। কাছেই মায়মুনাদের বাসাটা। কিছুক্ষণ আগেই মাকে সে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। আস্তে সে উঠে এলো ঘাট থেকে, সোজা ঢুকে গেল ভেতরে।

অনেকদিন বাদে মায়মুনা আজ মাকে ডাকলো। 'মা, মা।'

মা'ও চমকে উঠে তাকাল।

লোকটা পুকুর পাড় বেয়ে সেদিকেই এগিয়ে আসছে। মায়মুনা হাত দিয়ে দেখাল।

মায়মুনার মা'ও দেখল।

বললে, 'যা, ও ঘরে যা আমি দেখছি।'

মায়মুনা পাশের ঘরে ছুটে গেল। কেউ সেই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পড়লে দেখতে পেত মায়মুনার চোখের ভাটা দু'টো সেখানে আর নেই। সেখানে দুটো চোখ মায়া দিচ্ছে।

আয়নাটা অনেকদিন বাদে সে নিল। মুখটা একবার দেখলো। সরিয়ে দিলে মুখের উপর এসে পড়া একগুচ্ছ। গায়ের কাপড়টা সে টেনে দিল, নামিয়ে দিল একটুখানি ঘোমটা।

মায়মুনার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল লোকটা যেন একটুখানি ইতস্ততঃ করছে।

'কে ? কে ওখানে। কে গো তুমি বাছা ?'

লোকটা এগিয়ে এলো।

'কার বাড়ী খুঁজছ ?'

'পথটা তো এখান দিয়েই ছিল মনে হচ্ছে। ঠিক চিনতে পারছি না।
এদিক এসেছিলাম অনেক আগে।'

যাবে কোথায় ?'

'ঐ খাল পারে মতলব মাষ্টারের বাড়ী। একটা গরু বেচবে নাকি।
কাহাড় পাড়া থেকে আসতে আসতে রাত হয়ে গেল।'

'ও', একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল মায়মুনার মার মুখ দিয়ে।

'গরু কিনতে এসেছ। ঐ পথে যাও।' আঙ্গুল দিয়ে পথটা দেখিয়ে দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ল মায়মুনার মা।

লোকটার সঙ্গে মায়ের কথাগুলি সবই সে শুনেছে। মা দেখল, আয়নাটা মাটিতে পড়া। মায়মুনা দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে।

মেয়েকে বুকে নিয়ে গায়ে-পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে মা বললে, 'কপাল মা, কপাল।'

মায়ের ঠান্ডা হাতের স্পর্শে মায়মুনার কড়া শরীরটা যেন গলে যেতে লাগল। ওর চোখ দিয়ে, বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিন্দু বিন্দু মুক্তা।

মায়মুনার মা বলছিল, 'এমন কপাল নিয়ে জন্মেছিলি মা। একটু সুখ যদি তোর নসীবে আল্লা লিখতেন।'

নিরীহ না-বালিকার মত শান্তভাবে মায়মুনা শুনছিলো মায়ের কথাগুলো।

হঠাৎ সে মায়ের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়াল।

ততক্ষণে ওর চোখের খাঁজে ভা'টা দুটো আবার জ্বলে উঠেছে।

প্রাণের চেয়ে প্রিয়

ওরা এসেছে। হ্যাঁ নিশ্চয় ওরা। আনন্দে তোলপাড় করল বুক। কতদিন ওদের দেখিনি ; আজ তিন তিনটে বছর ওরা আমার চোখের অন্তরাল। অনেক অনেকদিন পরে দেখা হবে ওদের সঙ্গে। আব্বা, আম্মা বাচ্চু, মুন্নি—আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা। তাই আপিস থেকে যখন সাক্ষাৎকার 'শ্লিপ' এলো, তখনই অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠেছে মনটা। হবারই কথা। যে আসন্ন সন্ধ্যার মলিন মুহূর্তে শুরু হয়েছিলো আমার বন্দী জীবন, তারপর হতে দিবা-রাত্রির কক্ষ থেকে ঝরে পড়েছে, খসে পড়েছে পাকা ফসলের মত, উড়ে গেছে কালের মহাশূন্যে অনেক অনেকগুলো দিন।

এই তিনটে বছর কেটেছে আমার চতুর্দেয়ালের এই পাষাণ-পুরীতে ; আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনের দর্শন বঞ্চিত এক জীবন। এই দীর্ঘ দিন ধরে যে সব ছবি আমার মনের পটে আনাগোনা করেছে, সে তো তাদেরই, আমার একান্ত প্রিয়জনদের। দিন ও রাত্রির দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে যখনই তাদের কথা ভেবেছি, তখনই ভুলে গিয়েছি সকল দুঃখ ও লাঞ্ছনা। এখন ৫৩ সালের শুরু, আমি জন্মেছিলুম সেই তিরিশ সালের ডিসেম্বরে। সেদিন সেলের বারান্দায় বসে আমি ভাবছিলুম এই পেরিয়ে আসা জীবনের মাইল খণ্ডগুলির কথা। আর হিসেব করেছি যে দিনগুলি কাটল এই বদ্ধ দুনিয়ায়। তিন বছর আগে কলেজের ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে বয়স লিখিয়েছিলাম কত কম। সুতরাং ভুলতে পারিনি অভাব অনটনের মধ্যেও প্রিয়জনদের হাসিমাখা মুখ, আব্বা আম্মার স্নেহময় দৃষ্টি, ভালবাসা ঃ আমার অতি স্নেহের বোন মুন্নি বাচ্চু কাউকেই নয়।

জেল অফিস যাবার পথে ভাবছিলাম, দীর্ঘদিনের না দেখার পর আজকের এই প্রথম সাক্ষাৎকার কি ধরণের হবে। আব্বার গম্ভীর মুখেও কি একটুখানি হাসি ফুটে উঠবে না ? আম্মার মুখের ছবি কি হয়ে উঠবে না পিকাসোর সেই ছবির মত। আজ দীর্ঘদিন পরে অন্ধকার ঘরটাতে তাদের প্রথম দর্শনে হয়ত আমাকে একটু বিব্রত মনে হতে পারে। না, আমি হাসবো। তাঁদের দেখেই হাসবো। কান পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত হাসি। সে হাসি হবে অদম্য। তারপর মুন্নি, গভীর আদরে দু'হাত দিয়ে ওকে টেনে নেবো নিজের কাছে। ওর একটুখানি পায়রা মুখটা তুলে বলব ঃ 'মুন্নি।'—

'ভাইয়া', বলে সে আঁকড়ে ধরবে আমাকে। ওরই মধ্যে বলা হয়ে যাবে অনেক অনেক কথা। আমাদের শৈশবের আর বাল্যের অনেক কথা যা কেবল আমরা দুই ভাই বোনেই জানি। আব্বা আম্মা চেয়ে রইবেন হাসি মুখে। জেল আপিসের কপালে সতর্ক প্রহরীর মতো দুটো বিজলী বাতি ঝক ঝক করছে রোদে। সঙ্গের শান্ত্রী বললে, 'চলুন ভাই, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।' ... কাঠের বড় দুয়ারের বুকে

ছোট্ট দুয়ারটা গেল খুলে। যে ঘরে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে আগেই ওরা বসেছিলেন। আব্বাকে দেখেই চিনলাম, অনেক বদলে গেছেন আব্বা। আগের সেই চেহারাই আর নেই। জেলের ডিপুটি বললেন, আপনার ইন্টারভিউ। আম্মা আসেননি ; কেবল আব্বা বাচ্চু মুন্নি। আব্বার দিকে চেয়ে আমি হাসলাম, হাসতে গিয়েই মনে হলো এ যেন সেই অর্থহীন হাসি। আবার হাসলাম, বড় মলিন ও হাসি।

পা ছুঁয়ে আব্বাকে সালাম করেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। আব্বা বললেন, 'শরীর তো খুবই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

'খুব খারাপ আর কোথায়,' আমি বললাম, 'ভালো স্বাস্থ্য আমার কোনো কালেই ছিল না। আজকাল এক আধটুক ব্যায়াম করছি। শরীর তো আমার আজকাল ভালোই যাচ্ছে। আমার স্বাস্থ্যের জন্য আপনারা ভাববেন না মোটেই।'

ছোট ভাই বাচ্চু তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে ধরে বললো, 'ভাইয়া তুমি আর আমাদের বাড়ী যাবে না!'

'তোমাদের বাড়ী?' আমি হেসে ওর গালে একটা চুমো খেয়ে বললাম, 'কি করে যাবো ভাই? আমি কি নেজের ইচ্ছায় এখানে রয়েছি!' ওর থুতনিটা নেড়ে দিলাম আমি। আমার কথাগুলো সে বুঝতে পারেনি, তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আবার পরিষ্কার করে বললাম, 'আমাকে যে ধরে রেখেছে ভাই।' কারা?' গভীর প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠল ওর দু'চোখে।

'কারা?' জবাব দিতে গিয়েই দেখলাম প্রশ্নটা কত বড়। কারা আমার বন্দীত্বের জন্য দায়ী। আমার বন্ধুদের মধ্যে হয়ত এ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা চালাতে পারি, এই বন্দীত্বের সাথে সম্পর্কে দেখাতে পারে সারা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নের। কিন্তু আমার শিশু ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি শক্ত। কয়েক মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে কোন জবাব বেরুলনা। শেষে অদূরে উপবিষ্ট গোয়েন্দা অফিসারটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই ওরা।'

আমার আঙুল অনুসরণ করে বাচ্চুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যথাস্থানে। একটি ভয় ও ঘৃণামিশ্রিত ভাব ফুটে উঠল ওর চোখে। অত্যাচারীকে সামনে পাওয়া নিরস্ত্র মানুষের মুখের মতোই ফ্যাকাশে হয়ে গেল বাচ্চুর মুখ। ও তাকিয়ে রইল সেদিকে। এই সুযোগে আমি মুন্নির দিকে নজর দিলাম। মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে আমার চেয়ারের হাতল ধরে।

'মুন্নি,' আমি ওকে ডাকলাম, হাত বাড়িয়ে দিলাম সেই আগের মুন্নিকে নেবার জন্যে। কিন্তু কতো বড় হয়েছে মুন্নি। সেই আগের মুন্নিই যেন আর নেই। আমার মনের মধ্যে মুন্নির যে ছবিটা গত তিন বছর ধরে পুষে রেখেছি, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। আমার প্রসারিত হাত গুটিয়ে

নিলাম। 'ভাইয়াকে সালাম করলে না তোমরা। বড় ভাইয়াকে সালাম করতে হয় না?' আব্বা বললেন ওদের। আমার পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেল মুন্নি। আমি ওকে মাঝপথেই ধরে ফেললাম, আর সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল মুন্নি। বুঝলাম শুধু দেহেই নয়, মনেও বেড়ে উঠেছে সে।

কিন্তু এই কি সেই মুন্নি যার কচি মুখখানি আমার দুঃসহ বন্দীজীবনে অহরহ মনে পড়েছে। ওর মনটাও কি ঠিক এমনি বদলে গিয়েছে? ওর মনের মধ্যে আমার জন্যে অমন ভালোবাসা কি এখনও রয়েছে বেঁচে যা ছিলো আশে-পাশের বাপ মায়েদের কাছে তাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে উদাহরণের বস্তু।

'ভাইয়াকে মনে ছিলো তোমার মুন্নি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে। শরমে রাঙা হয়ে উঠল মুন্নি, চোখ নামিয়ে ঘাড় নেড়ে বললো, 'ছিলো।'

আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুন্নির বয়স কত হোল আব্বা?'

বয়স ত কারো পড়ে থাকেনা বাবা। আমরাও তো বুড়ো হয়ে গেলাম। তোমারও তো এখন পরিণত বয়স। তুমি ছিলে আমাদের আশা-ভরসা। তা তুমিই রইলে জেলে বসে। তোমার এই ছোট ছোট ভাইবোন। তা হবে বইকি ওর বয়েস—বারো তো হয়ে এলো। মেয়েছেলে বাড়তে দেরী লাগে না। আর দুদিন পরেই ত বিয়ের বয়স হবে। এদের শিক্ষা, ওর বিয়ে-শাদী এ সবের দায়িত্ব তো তোমারও।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন আব্বা।

বিয়ের কথায় আমি যেন চমকে উঠলাম। যতোই বয়স হোক, বিয়ের বয়স হ'তে ওর এখনও ঢের দেরী। ততদিন দুনিয়াই পালটে যাবে। আব্বার যত কথা। কিন্তু আব্বার ইঙ্গিতটি আমি বুঝলাম। আর তুমি আছো জেলে বসে কথাটি মনে মনে বারবারই আবৃত্তি করলাম আমি। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

'মুন্নি তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করি।

'সিক্স, ভাইয়া' মুন্নি বললে।

'সিক্স! অনেক পড়ে ফেলেছো তুমি।' আমার আম্মার পড়াশুনা নাম লেখা অবধি। গোঁড়া পরিবারে মার জন্ম। আমার নানা নানী যদিও 'শিক্ষার জন্য চীন দেশেও যাবে,' রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এঁর এই বানী জানতেন, তথাপি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। অজকাল তো লেখা-পড়া না জানা মেয়েদের 'দুলা'ই জুটবে না। তাই মুন্নিরা কিছুটা এগিয়েছে বৈকি! ছোট বেলাতেই আমি আব্বাকে বলতাম, বড় হয়ে আমি উকিল হব আর মুন্নি হবে ডাক্তার। আমার উকিল হওয়ার পথে বাধার দেওয়াল। কিন্তু মুন্নিই কি পারবে ডাক্তার হতে?

হঠাৎ মুন্নির দিকে তাকাতে কত কথাই না আমার মনে পড়ে যায়! বাল্যের অসংখ্য স্মৃতি আমার মনের দুয়ার খুলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায় যেন।

'আচ্ছা মুন্নি, আমাদের কাকাতুয়াটা আছে তো?'

'না ভাইয়া ওটা মরে গেছে অনেক আগে।' পাখীটা মরে গিয়েছে। মরে যাওয়াটা অসম্ভব কোনো ঘটনা নয়। একটুও দুঃখ হলনা আমার শুনে। অথচ ছোটবেলা থেকে পাখী আমার কত প্রিয়। গাছের ফুল, উড়ন্ত পাখী আর সবুজ গাছপালা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে উঠতাম আর জেগে উঠত আমার মধ্যে অনন্ত জিজ্ঞাসা।

মনে পড়ে যায়, আমার ছিলো পাখী পোষার দুরন্ত খেয়াল। গাছে গাছে সারাদিন পাখীর ছানা খুঁজে বেড়াতাম আমি। কত পাখী শিশুকেই না আমি সংগোপনে হরণ করেছি নীড় থেকে, মাতৃহীন করেছি তাদের আর পুষে রাখতে চেয়েছি খাঁচায়। কিন্তু বাঁচেনি একটাও। একবার মনে পড়ে, কোত্থেকে একটা শালিকের বাচ্চা নিয়ে এলাম ধরে। তারপরদিন আমার পাখী নিয়েই কাটে। আগে মুন্নির সঙ্গে যেখানে দিন কাটতো, সেখানে পাখীর ছানা ভাগ বসালো। আমাদের রান্না ঘরের পেছনে ছোট্ট একফালি বাগান করেছিলেন আব্বা। সেখানে আহার দিতাম পাখীটাকে। দুধের সঙ্গে রুটির টুকরো মিশিয়ে পাখীটাকে খাওয়ানোতেই আমার সারা পড়ার সময়টা কাটত। কিন্তু পাখীটা গেল মরে। খুবই আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন। তারপর বহুদিন আর কোনো পাখী পুষিনি। একদিন শেষে ভোর বেলায় ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলাম একটি পাখীর ছানা। বাড়ীতে ঢুকেই ডাক দিলামঃ 'মুন্নি, মুন্নি—'। মুন্নি দৌড়ে এলো, কিন্তু পাখীটা দেখে ওর মুখটা হয়ে গেল এতটুকু।

'খুশী হলিনে বুঝি?' আমি ওকে বলেছিলাম। মুন্নি জবাব দেয়নি।

আমি ওকে বললাম, 'যা শিগগির পানি নিয়ে আয়।' মুন্নি দৌড়ালো পানি আনতে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু মুন্নি আর আসে না। আমি ওকে গাল পেড়ে ডেকেছিলাম, 'অ হারামজাদী মুন্নি, এতক্ষণ কি করছিস?'

মুন্নি পানি নিয়ে এলো মুখ ভার করে। পাখীর ছা'টা ওর হাতে দিয়ে আমি বললাম, 'তুই ধর আমি রুটি মেশাই। হঠাৎ মুন্নি আমাকে বলল, 'আচ্ছা ভাইয়া তোমার কষ্ট হয় না? খালি পাখী এনে বেঁধে রাখো। একটুও দয়া মায়া নেই তোমার।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুই ত বলবিই। মেয়েছেলে যখন, তোর ত হবেই কষ্ট।'

কথাটা শুনেই সে চুপ করে রইল। শেষে বলল, 'তুমিত খালি ঘুরে বেড়াও। পাখীর বাচ্চাটাকে বেঁধে রাখলে তার কষ্ট তুমি বুঝবে কি করে? তুমি যদি থাকতে ঐ খাঁচার মধ্যে তবেই বুঝতে।'

'মানুষ আবার খাঁচায় থাকে না কি?' আমি বলেছিলাম, তোকে আর বেশী মুরুব্বী গিরি করতে হবেনা। তুই—।' কথাই আর শেষ হোলনা-হঠাৎ দেখি

পাখীর বাচ্চাটা ওর হাত থেকে বেরিয়ে এসেই ছুটতে শুরু করেছে। ভাল করে তখন উড়তে শেখেনি। পিছু নিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে পাখীটা বাড়ীর পেছনে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর পাওয়া গেল না তাকে। রেগে ওকে মারতে শুরু করেছি দুমদাম। শেষে ওর কান্নায় মা এসে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রে আব্বার কাছে নালিশ। আব্বা বললেন, 'তোদের একটা 'কাকা' আনিয়ে দেব।' সেই কাকাতুয়া।

আব্বা চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এবার আমার কথা শোন।' কথাটা বলেই আব্বা থামলেন, যেন তাঁর কথাগুলি গুছিয়ে নেবার জন্যেই। 'দেখ তুমি হচ্ছ আমাদের বড় ছেলে। বাপ-মায়ের মনে বড় ছেলেকে ঘিরে কত আশা-ভরসা থাকে সেটা তোমাকে বলে দেবার দরকার নেই। আজকে আমি শুধু তোমার সাথে দেখা করতেই আসিনি। আমি এসেছি তোমার কাছে শেষ আরজ নিয়ে।' আব্বা থামলেন। বেদনায় মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠছে তাঁর।

'তোমার জন্যে তোমার মা পাগলের মতো হয়ে গেছে! ওঁর মুখে দিনরাত কেবল তোমার কথা। তোমার ভাই-বোনদের দিনরাতের জিজ্ঞাসা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর আমার স্বাস্থ্য ত দেখছই, এভাবে চললে আর বেশীদিন বাঁচবার ভরসা নেই। সে ক্ষেত্রে কবরের এপারে তোমার সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। বসে নিশ্চিন্ত সময় কাটানোর সময় নেই। বাবা হয়ে আমি আজ তোমার কাছে আরজ গোজার করছি : তুমি ফিরে এসো। এ পথ নয়। যাদের সংস্থান আছে, তারাই করবে রাজনীতি। আমার সম্বল চাকরী। আমাদের ওসব পোষায় না। তোমার মা-বোনের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।' আব্বা আবার চুপ করলেন। ধরে আসা গলাটা একটু যেন বিশ্রাম দিলেন' নচেৎ হয়ত বাঁধ মানবে না।

'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরা বললেন, তুমি রাজনীতি করবে না লিখে দিলে সহজেই মুক্তি পেতে পারো। তোমার কাছে এ আমার অনুরোধ আরজ। আমার শেষ আপীল। তোমার মধ্যে আমাদের জন্য এক ফোঁটা দরদও যদি থাকে তবে তুমি একথা রাখবে। লিখে দাও তুমি।' আব্বা চুপ করলেন।

আব্বার কথাগুলি আমার বুকেও তুফান তুলেছে। আব্বার এক একটি শব্দ এক একটি হাতুড়ীর ঘা হয়ে পড়লো আমার বুকে।

চুপ করে রইলাম তবু। আব্বার কথায় জল এসে গেছে মুন্নির চোখে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, 'চলনা ভাইয়া, আমাদের সঙ্গে চলনা।'

বাচ্চু এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বোধহয় অফিসটা দেখছিলো। আব্বার কথা সে শোনেনি। কেবল মুন্নির কথাই ওর কানে গিয়েছে। হঠাৎ সে বলে উঠল : 'ও মা, আপা কিসসু জানে না ;। ভাইয়াকে ধরে রেখেছে, যাবে কি করে!'

ভারী ভাল লাগল বাচ্চুর কথাটা। হৃদয়ের মধ্যে আমার যে অশান্ত ঝড় বইছে, তার মধ্যে আমার বক্তব্য কিভাবে কতখানি পেশ করা যায় তাই আমি ভাবছিলাম। আব্বার কথার জবাবে আমি বলতে যাচ্ছিলাম আমার কথা, আব্বার মতোই অবেগমাখা কণ্ঠে। বাচ্চু যেন আমার হয়েই কথা বললো। বাচ্চুকে কাছে টেনে নিয়ে মুন্সির দিকে চেয়ে বললাম : 'ওরা আমাকে ধরে রেখেছে। কি করে যাব তোমাদের সঙ্গে।' কথাটা বললাম, কারণ আব্বাও বুঝবেন আমার বক্তব্য। আব্বা আমার অপ্রত্যক্ষ উত্তরটা গ্রহণ করলেন।

'আমি জানি তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।' আব্বা বললেন, 'তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি অন্য দশটা ছেলের চাইতে একটু বেশীই। তোমাকে আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আসিনি।' আব্বা চুপ করলেন। আব্বার চিঠিগুলির কথা আমার মনে পড়ে যায়। আব্বার চিন্তাধারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে বেরুত চিঠিগুলি থেকে। আব্বার প্রত্যেকটি কথার জবাবে আমিও চিঠি লিখেছি।

'যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাব সে আশা আমার নেই। আমি কেবল বলতে এসেছি যে তুমি আমাদের বড় ছেলে। আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তোমাকে নিয়েই। আমাদের সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে তোমার খামখেয়ালীতে। তোমার মা বাবাই যদি মরে গেল, তবে কি হবে রাজনীতি দিয়ে। পলিটিক্স তোমাকে ভাত দেবে, না কাপড় দেবে ?'

ভাবতে লাগলাম কি বলি। আব্বার জীবনটা কি কষ্টের তা আমি জানি। তাঁর জীবনের ব্যর্থতার বেদনা আমায় ভাবায়। অশেষ দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও আব্বা কোনোদিন একটা মিথ্যে বলেননি। অনেক লোভ এবং প্রলোভনের মধ্যেও আব্বা সাত্বিকের জীবন যাপন করেছেন। আব্বাকে চিঠি লিখতে গিয়েও একটি কথা আমার কেবলই মনে হয়েছে : আব্বাও আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা যেন সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে অটুট থাকে। আব্বাকে কষ্ট দিতে আমার কখনও ইচ্ছে হয়নি। অজও ভাবতে লাগলাম কি জবাব দেওয়া যায় আব্বার কথায়। ইচ্ছে হল বলি : পলিটিক্সের জন্যে মানুষ জন্ম নেয়নি। মানুষের জন্যেই পলিটিক্স। রাজনীতি মানুষের জন্য একান্তভাবে মানুষের জন্য, সে রাজনীতির একজন ছাত্র হচ্ছি আমি। মানুষের সুখ আর সমৃদ্ধি, শান্তি জীবনের ওপর থেকে বাধার পাষাণ পাথর সরিয়ে দেওয়াই তো মানুষের রাজনীতি। বলতে গেলাম আব্বাকে সাধারণ কথার মধ্যে দিয়ে।

'দয়া করে রাজনীতি আলোচনা করবেন না : তা হলেই কিন্তু আমাকে 'ইন্টারভিউ' বন্ধ করে দিতে হবে।' অফিসারটি বললে। আমি আব্বার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'এখনি তোমার কোনো জবাব আমি চাইনি। আমার কথাগুলো তুমি একটু অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো। আজই তুমি একটা কথা বলে দেবে সেটা আমি

চাই না। সেটা আমি আশা করেও আসিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তোমার আম্মাকে নিয়ে আসবো। তখন যেন না করো না।'

বুকের মধ্যে থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল যেন। তবুও যে কথাটা বলার জন্যে মনের মধ্যে তৈরী করে রেখেছি, সেটা বলতে না পারার অতৃপ্তি রয়েই গেল মনের মধ্যে।

'তোমার পড়াশুনা চলছে কেমন?' আব্বা শুধালেন। বিষয়ান্তর আমার ভালোই লাগল। উৎসাহের সাথে বললাম, : 'খুব ভাল নয় ; সুযোগ-সুবিধের বড় অভাব।'

'আমার কসির তো তোমার কথা প্রায়ই বলেন। তোমার প্রতি সবারই খুব আশা ছিলো যে পড়াশুনায় তুমি খুব উন্নতি করবে, সবার মুখ আলো করবে।'

আব্বার মনের গোপনে আমাকে নিয়ে কত আশা-আকাঙ্খাই না ছিলো। আব্বা জানেন, পঁচিশ বছর কলম পেশা বৃত্তির পর মৃত্যুর সময় তার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো খড়কুটোই রেখে যেতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে আমিই ছিলাম আব্বার ভরসা যষ্টি। তাঁর সন্তান-সন্ততিদের জন্য জীবন্ত ওয়াসিয়ৎনামা। জবাব দিলাম না কোনো। 'বইপত্রের দরকার আছে?' আব্বা শুধালেন। 'না', বললাম 'আপনি যা পাঠিয়েছেন তাতেই হবে।'।

বাচ্চু এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আব্বার কথাগুলি গিলছিল। কি বুঝছিলো তা সেই জানে। হঠাৎ তার দিকে চাইতেই ভারী লজ্জা পেয়ে গেল সে।

আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম ; বাচ্চুকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন ত আব্বা?' আব্বা বললেন : 'হ্যাঁ।'

কোন স্কুল?

'বাচ্চু, ভাইয়াকে তোমার স্কুলের নাম বলো না।'

'আমি বলতে পারি না', বাচ্চু বলল।

মুন্নিসহ আমি হেসে উঠলাম ওর কথায়।

'ওমা, কি বোকা ছেলে তুমি, বাচ্চু! নিজের স্কুলের নামটাও জানো না।'

লজ্জা পেয়ে বলল, 'বোকা আখ্যা নিতে সে রাজী নয়।

বলল, 'আমি জানি, বলবো না না, না।'

আমি হেসে উঠলাম। এবার আব্বা একটুখানি হাসলেন। অবস্থা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল।

আমার চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল মুন্নি। আমার দিকে একনজর চেয়েছিলো। মুখটা মলিন ব্যথাভরা। ওরদিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে যায় ; কৈশোরের দিনগুলি আর আসবে না।

'কি, কথা বলছিস না যে বড়ো।' আমাদের পুরাতন 'তুই' বলা আবার এসে গিয়েছে।

'কি বলবো ?'

বুঝতে পারি, কথা বলার মত ভাষা আজ ওর নেই। অনেকদিন পর প্রথম দেখার প্রাথমিক সংকোচ কেটে গিয়েছে। কেবল ওর বড় বড় নীল চোখ দু'টি তুলে বিস্ময়ে ব্যথায় তাকিয়ে আছে।

ও যেন কত কথাই ভাবছে। মানুষের জীবনে সে কথার অনেক দাম আছে।

আব্বা ইতিমধ্যেই জেল অফিসারের সঙ্গে আমাদের খাওয়া-পরা, পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অলাপ জুড়েছেন। হয়ত আমাদের ছেলে মানুষি কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যেই। নিরিবিলি পেয়ে আমি ওর কাছ থেকে খবর নিতে শুরু করলাম।

'আমার জন্যে তোর মন কাঁদে না ?'

মুন্নি একটু লজ্জা পেল। প্রশ্নটা ঠিক এভাবে করা উচিৎ হয়নি। বাচ্চু বললে, 'জানো ভাইয়া, মুন্নি আপা খালি তোমার জন্যে কাঁদে। কান্না ছাড়া আর কিসসু জানে না। ও যতো কাঁদে আম্মা ওকে আরও বেশী ভালোবাসে। আমি কাঁদিনা কিনা, তাই আম্মা আমাকে—।'

মুন্নি বাধা দিয়ে বলল, 'বাচ্চু, এই বাচ্চু। এতটুকু ছেলে, এতকথা শিখেছে ভাইয়া খালি বুড়োমী করবে।'

বাচ্চু প্রতবাদ করলো : 'বারে, আমার কি দোষ ? তুমি কাঁদ না ? আল্লার কসম ভাইয়া—'

মুন্নিকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা বাচ্চু, তুমি কাঁদ না যে !'

'আমি যে ব্যাটা ছেলে !'

ওর কথার ধরণ দেখে এবার মুন্নিও না হেসে পারলোনা।

'তুমি কেঁদনা কখনও। কাঁদলে মনটা ছোট হয়ে যায়। যারা কাঁদে তারা বড় হতে পারে না।'

বাচ্চু বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল : 'আমি জানি।'

আমি হেসে ওকে বললাম, 'বাচ্চু তুমি আব্বার কাছে যাও তো।'

কিছু বুঝতে না পেরে একবার মুন্নির দিকে তাকিয়ে আব্বার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ও চলে গেলে আমি মুন্নির হাত ধরে বললাম, 'কাঁদিস কেন মুন্নি ?'

মুন্নি হঠাৎ সত্যিই কেঁদে ফেলল।

'আহা আবার কান্না' আমি বললাম, 'ছি বোন কাঁদিস না।'

'ভাইয়া আমার বদদোয়ার জন্যেই তুমি জেলে গিয়েছ।' মুন্নি কাঁদতে কাদতে বললে।

'তোমার বদদোয়ার জন্যে ?' অবাক মানি।

'সেই যে তুমি আমার চুলের ঝুঁটি ধরে মেরেছিলে তোমার বন্ধুকে বাড়ী নেই বলে ফিরিয়ে দিয়েছি বলে—তখন তো আমি আল্লার কাছে মোনাজাত করেছিলাম তোমার যেন জেল হয়।'

আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ে।

অতীতের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। বাড়ীতে আমাদের গৃহ-বিবাদের মধুর স্মৃতিগুলি মনে করবার চেষ্টা করি।

আমি গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছি। বাড়ীতে আমার ছাত্র-বন্ধুরা আসতো প্রায়। এটা কেউ পছন্দ করতেন না। সাদা পোষাকের লোক এসে বাড়ীর লোকদের মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহজনক সব কথা বলে যেত। তাই আমাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হত বাড়ীতে। তিরস্কার শুনতে হত, দেখানো হতো ভয় ;—'তোর তো জেল হবে', 'কোনোদিন এসে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশে'—এসব কথা স্বভাবতই বাড়ীর সবার সামনেই হত। ছোটরাও বাদ যেত না। মুন্নি জিজ্ঞেস করত, 'আচ্ছা ভাইয়া তোমার জেল হবে কেন ?' তুমি চুরি কর ? চোরেরাই ত জেলে যায়।' আমি বলতাম, 'আজকাল যারা চোর ধরে তারাই যায় জেলে।' কিন্তু আমি জানতাম না কবে আমার জেল হবার জন্যে আল্লার কাছে মোনাজাত করেছিল। আর সে কথা আজও মনে রেখে দিয়েছে। সেটা মনে করে ওর শিশু মনে ব্যথার অন্ত নেই, চোখ থেকে বর্ষণের অন্ত নেই।

ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। চোখের জল ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কান্নার ভাব মুখময়। আব্বাও চেয়ে আছে মুন্নির দিকে। বললেন ; মুন্নি মা, কেঁদনা। ছি এত লোকের সামনে বুঝি কাঁদে ?'

তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ভাবখানা এমনি যেন বলতে চান, কাঁদুক ! কেঁদে কেঁদে পাথর ছেলেটার মনে যদি একটু মায়া মমতার সঞ্চার করতে পারে তো মন্দ কি ?

আমি ওকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বলি ; 'তোমার মোনাজাতের জন্যই আমি জেলে গিয়েছি, একথা বলল কে ?'

'আমি জানি', 'আম্মা বলেন, ছোট বেলার দোয়া আল্লা শোনেন।'

আমি ওকে কি করে বোঝাই যে ওর মোনাজাতের কোন হাতই নেই এ ব্যাপারে। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। অফিসার তাকালো ঘড়ির দিকে। আব্বাও তাকালেন।

'আর তো সময় নেই ;—আব্বা বললেন।

'হ্যাঁ', অফিসারটি সায় দিল।

বুকের ভেতরটা আমার ধুক্ করে উঠল। বেশত ছিলাম বেশত লাগছিল।

মুন্নি আব্বার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আব্বা পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখ মুছে দিলেন।

বললেন, 'পরের বারে তোমার আম্মাকে নিয়ে আসবো তোমাদের ক'দিন অন্তর দেখা করবার অনুমতি দেয় ?'

মুন্নির চেহারা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বাচ্চু আমার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আব্বাকে বললাম : 'আম্মাকে আমার সালাম বলবেন। বলবেন আমি ভাল আছি ; যেন আমার জন্যে চিন্তা না করেন।'

'ভাল যা আছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি ভাবছি তোমার এই চেহারা দেখলে তোমার মা শেষে কি-ইনা করে বসেন।'

'আবার আসার সময় আমার বাহার নানীকে নিয়ে আসবেন।'

অফিসারটি আবার ঘড়ির দিকে চাইল।

বিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, সাক্ষাৎ শেষ। কতদিন পরে দেখা ! আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। আত্মসম্বরণ করতেই পাঁচ মিনিট যায় কেটে। বিশ মিনিটের সাক্ষাৎ করে এখনি আবার ফিরে যেতে হবে 'নতুন বিশে।'

'সায়েব এবার তো উঠতে হবে'। অফিসার তাগিদ দিলে, 'আরো ক'জনার ইন্টারভিউ করাতে হবে। তারা তো এসেই গেল।'

আমি আব্বার দিকে তাকালাম।

মুন্নি আর বাচ্চু আমার দুই হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মুন্নির পিঠে হাত রেখে বললাম, কাঁদিস না বোন। চিরদিন তো আর এরা ধরে রাখতে পারবে না। আব্বা উঠলেন। এগিয়ে এলেন আমার কাছে। মাথা নীচু করে পা ছুঁয়ে সালম করলাম তাঁকে। উঠে দাঁড়াতেই দেখি আব্বার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি।

আব্বা, বাচ্চু আর মুন্নির হাত ধরলেন।

বাচ্চু আব্বার আচকানের কোনা ধরে টানতে টানতে বলতে লাগলো, 'আমি যাবো না। আমি ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।'

আব্বা ওর কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'তিন তিনটে বছর কেটে গেল, তুমি আমাদের মধ্যে নেই। ওরা বলছে রাজনীতি করবে না বললেই ওরা ছেড়ে দেব। তামার একগুয়েমীই কি বড় হবে ? বাব মায়ের প্রাণের কষ্ট

একটুও বুঝবে না ? দশ মাস তোমাকে পেটে ধরেছেন, কেঁদে কেঁদে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল তার দিকে চাইবে না তুমি ?'

মুন্নি নীরবে কাঁদছে।

বাচ্চু বলছে ঃ 'আব্বা আমি যাব না ; আমি ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।'

আব্বা আবার বলতে লাগলেন, 'আজ আর সময় নাই, অন্যদিন যখন আসবো, তখন যেন না করো না।'

আব্বা আমাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'আল্লা আমাদের জন্যে তোমার প্রাণে একটু রহম দিন।'

অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে, 'মৌলবী সায়েব, এবার তো—' আব্বা আর একবার আমার দিকে চেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। আব্বা হাত দিয়ে ধরেছেন মুন্নি ও বাচ্চুকে।

বাচ্চু তখনও কাঁদছে, 'আব্বা আমি যাব না। যাব না ভাইয়ার সঙ্গে—' মুন্নি কেঁদে উঠলো 'ভাইয়া আমি কিন্তু সত্যি তোমার জেল চাইনি। কেবল রাগের মাথায় বলেছিলাম।'

আব্বা ওদের কথায় কান দিলেন না। দু'হাতে দু'জনকে ধরে এগিয়ে গেলেন। তারপর আমার দৃষ্টির সামনেই জেলখানার বড় গেট খুললো। ওরা তখনও কাঁদছে, 'আব্বা আমি যাব না ; ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।' রিকসাটা কখন অদৃশ্য হয়ে গেল টেরও পাইনি।

জসুভাবীর জন্যে

উত্তর লরাবাঁকের ছরার জল পেরুতে গিয়ে জুতো জোড়া খুলতে হল।

অগভীর জল, পায়জামাটা বিগৎখানেক তুললেই চলে। হাতের সুটকেসটা পিঠের উপর গড়িয়ে নিলাম। তারপর কাপড়টা ভাল করে গুটিয়ে নিয়ে ছরার জলে পা দিলাম। স্বল্প জলের তলায় বালির রাশি সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃশ্যমান। ছপ্ ছপ্ শব্দ করে মিনিট পাঁচেক লাগল ছরাটা পার হতে। পারে গিয়ে জুতো জোড়া গলিয়ে নিই। বাতাস বইছে হু-হু করে। শীতের কাল, কোটটা ভাল করে এঁটে নিলাম।

হ্যাঁ, এইত সেই প্রাথমিক স্কুল ঘরটা। স্কুলের পরেই পঁচা ডোবাটা ছিল। ভরাট হয়ে গিয়েছে এখন। ওপারে মাঝের পাড়া, পশ্চিমদিকে শিকদার পাড়া, তারপরেই দক্ষিণ লরাবাঁক। জোরে পা চালিয়ে দিলাম। ভাঙা-চোরা ইস্কুল বাড়ীটার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়ালাম আমি। আমার অক্ষর পরিচয় ঘটেছিলো এই শত জীর্ণ স্কুল ঘরটার ততোধিক ছিন্ন মাদুরে বসে। দীনু মাষ্টার, মফিজ পণ্ডিত—কিন্তু না, শীতের রাত। অত ভাববার অবসর নেই, সময়ও নেই।

দূরে অন্ধকারের মধ্যেও শুপারী বাগানটা চিন্‌তে বাকী রইলো না। শুপারী বাগান, তারপর আম-কাঁঠাল বন, তারপর সদর সড়ক। সড়ক দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গেলাম পশ্চিম দিকে। ছোট্ট একটা মেটে ঘর। এরই মাটিতে একদিন মায়ের নাড়ী ছিঁড়ে পড়েছিলুম, সেই প্রথম পৃথিবী স্পর্শের অমরত্বকে স্মরণ আসায় আমার সর্ব অঙ্গে বয়ে গেল এক চেতনার ঝড়।

টিনের বিশাল বাড়ীটা কাছেই।

এক নিমিষে আমার মনে পড়ে কত স্মৃতি।

সরকারী দপ্তরে চাকরী করতেন বাবা। ছুটি হলেই চলে আসতেন সোনা-পুকুর গ্রামে মায়ের কাছে। মায়ের নিজস্ব একটা বাড়ী ছিলো মামাদের লাগালাগি। তাতেই আমরা থাকতাম। মাঝে মাঝে তিনি যখন আসতেন সঙ্গে নিয়ে আসতেন সওদার পাহাড়। মা তাঁর জন্মস্থান ছেড়ে শহরে যেতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে বাবা জোর করতেন। কিন্তু মায়ের করুণ চোখ ছলছলিয়ে উঠত। বাবা নিরস্ত হতেন।

আর তার ফলে আমার জীবনের দশটা বছর কেটেছে এই গ্রামে। জীবনের দশটা বছর কেটেছে বড় কম কথা নয়। 'আর সেই দশ বছর যদি হয় শৈশব ও কৈশোরের সব চাইতে মনোরম দিনগুলির সমষ্টি তবে ভুলবার নয় তা।' কত ঘটনা, কত ছবি আমার কিশোর মনের কোমল পর্দ্দায় সেই যে আঁকা হয়ে আছে, তা' আর মুছে যায়নি। ছবিগুলি এক এক করে এখন হয়তো আলাদা করতে পারি

না। কিন্তু সবটা মিলিয়ে যে অখণ্ড স্মৃতি–চিত্র আমার স্মরণে খচিত হয়ে আছে তা' দিয়ে রচনা করা চলে একটি বৃহৎ জীবন কাব্য।

মামারা ডাক সাইটে জমিদার। শৈশবে আমার বিস্ময়-মুগ্ধ নয়নে তাদের জমকালো বাড়ী, দাসদাসী, ক্ষেত খামার, সারি সারি গোলা, ভেতরের পুকুর, মসজিদ, কাছারী, পুণ্যাহ, বিয়ে, সবই রূপকথার মতই কারুকার্যময় আনুষ্ঠানিক আর গাম্ভীর্যপূর্ণ মনে হতো। অবাক বিস্ময়ে সব কিছু তাকিয়ে দেখতাম আমি। কাছারী ঘরে মামা সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে বিচারে বসতেন আর পেছনের দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমি শুনতাম তাদের প্রত্যেকটা কথা আর সংগ্রহ করতাম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তার সবকিছু হয়তো বুঝতাম না ; তবু শুনতাম। দুয়ারে দাঁড়িয়ে আ-ভূমি নত হয়ে প্রণাম করত যে লোকটি তার দিকে চেয়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতাম। কখনও কখনও মামার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে সমস্ত হল ঘরটা উঠতো কেঁপে। দরজার আড়ালে থর থর করে কেঁপে উঠতাম আমি ভয়ে। তবু নাটকীয় সম্ভাবনার এক শিশু প্রত্যাশা আমায় চলে যেতে দিত না। তারপর দেখতাম একটি লোকের প্রাণান্ত অনুনয়, মামার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়তো সে। মামা তাকে উঠতে বলতেন। বলতেন যা এবার মাফ করে দিলাম।

গভীর শ্রদ্ধায় আমি মামার দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ক্ষমতা ও প্রতাপের মহামান্বিত সিংহাসনরূঢ় মামাকে দেখে ভয়, বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় মনটা ছোট হয়ে যেত। মামা দয়ালু। ক্ষমার মহত্ব তার অন্তরজাত।

অন্দর মহলে মামীমা বসে থাকতেন আরাম-চেয়ারে। আমার রূপকথার জগতের রাণীর আসনে তাঁকে কল্পনা করতে আমার কোনোদিন বেগ পেতে হয়নি, এমনি ছিল তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি আর সৌন্দর্য। বয়েস আমার তখন আট কি নয়, কিন্তু পথে ঘাটে বেরুলে লোকে আমায় সালাম করত।

বলত, আমাদের মিঞার ভাগ্নে, অমুক মিঞা। আমার লজ্জা হত না। বরং কেউ যদি আমায় যথেষ্ট সম্মান না দেখাত তা'হলেই আমার খারাপ লাগত। মনে হত এ আমার প্রাপ্য। জমিদারের ভাগ্নে, রক্তের সূত্রে আমিও এক সম্মানিত ব্যক্তি। স্কুলে সমপাঠিরা আমাকে সমীহ করত। যদ্দুর মনে পড়ে, শিক্ষকরাও কোনোদিন চোখ রাঙায়নি। এ সবই আমার ভাল লাগত। এই সম্মান, এই প্রতিপত্তি সবই যেন আমার কাছে অমূল্য বলে মনে হত। বরং তা' দাবী করতে শুরু করেছিলাম।

মামারা আমাকে ভালোবাসতেন, সঙ্গে করে খাওয়াতেন, পড়াশুনার খোঁজ করতেন, কোনো আব্দার আমার অপূর্ণ রাখতেন না।

মামা বাড়ীর সেই জমকালো জীবন আমার জীবনে গভীর ছাপ ফেলল। মনে আছে মামাদের সৌখিন যাত্রার কথা।

আর মনে আছে বাৎসরিক ভোজের কথা, যখন হাজার হাজার লোক একসঙ্গে খেত আর দু'হাত তুলে দোয়া করত মামাকে।

সদর সড়ক পেরিয়ে গাবতলায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। কতদিনের কত স্মৃতি মনের পটে একসঙ্গে এসে পড়তে চায়। ছোট টুকরো টুকরো ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

মনে আছে অবশেষে বাবা একদিন নিতে এলেন আমাদের। মা এবার কেন জানি না আর বাধা দিলেন না। আমরা চলে এলাম কোলকাতায়। কোলকাতায় গিয়ে পড়েছিলাম আর এক অবাক বিস্ময়ের মধ্যে। অগুণীত জনতা, গাড়ী-গোড়া, ট্রাম-বাস প্রাসাদ-পার্ক-ময়দান বিজলীবাতী। আমার শৈশব ও বাল্যের দশ বছরের রাজ্যের সঙ্গে কত তফাৎ।

এত দেখিনি জীবনে। জানতাম না এতও আছে পৃথিবীতে। আমার রূপকথার রাজ্যের সঙ্গে মামা বাড়ীর চাইতে সাদৃশ্যটা যেন বেশী এরই। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাও তারপর আস্তে আস্তে কেটে গেল। মিশে গেলাম আমার নতুন জীবনের সঙ্গে। নূতন নূতন ধারণা এসে জড় হল। পৃথিবী সম্পর্কে আমার জ্ঞান আর একখাতে বইতে লাগল। তারপর একটানা দীর্ঘ আরও দশটি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বুকে কত রূপান্তর ঘটে গেল, রূপান্তর ঘটে গেল আমার জীবনেও।

বিশ বছরের তরুণ যুবক হয়ে উঠেছি। পেরিয়েছি কৈশোরের শ্যামলিম গণ্ডী। এখন শিক্ষায় অগ্রসর এক শহুরে ছেলে। শহুরে আদব কায়দায় অভ্যস্থ হয়ে গেছি। পাঠ আর চিন্তার জগতেও অগ্রসর হয়েছি অনেক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আর গোর্কী হুগো টলষ্টয়ের রচনা আর আমার কাছে অপরিচিত নয়। বিখ্যাত সব ছবি, বিখ্যাত বিপ্লবের নাম, সমসাময়িক রাজনীতির টুকরো কথা, মহাযুদ্ধ, ট্যাংক, কামান, কিউ, রেশন কার্ড, ব্ল্যাক আউট, ব্ল্যাক মার্কেট, দুর্ভিক্ষের ট্রেন ধরে গোটা বিশ্বটাই আমার কাছে বদলে গেল। তারপর এই নতুন লব্ধ জ্ঞান নিয়ে অমি যখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছি তখন আর একবার এসেছিলাম আমার এই জন্মপীঠ সোনাপুকুর গ্রামে। সে আজ থেকে দু'বৎসর আগে। একদিন শৈশবে আমার মনে সোনাপুকুর আর তার রাজগৃহের যে চিত্র ছাপা হয়েছিলো, তা আর ঠিক তেমনি ছিলনা তবু মামা বাড়ীকে ভাল লেগেছিলো নতুন করে, নতুন দিক থেকে।

দুই বছর আগে যখন সেবার আসি, তখন পুরো দু'টি মাস ছিলাম। এ দু'মাসের স্মৃতিও রয়েছে জীবন্ত হয়ে।

মনে আছে সেদিন এসেছিলাম এমনি এক সন্ধ্যায়। সুপারী গাছ আর আম-কাঁঠালের বন পেরিয়ে সামনের সড়ক দিয়ে সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম। প্রথম তারা আমায় চিনতে পারেনি কেউ। বাড়ীর মেয়েরা দেখে ভেতরে ছুটে গেল।

মামীমা বেরিয়ে এলেন। তাঁর সৌম্য প্রশান্ত মুখে আনন্দের হাসি। বললেন, 'এই যে আমাদের শহুরে ছেলেটি এসেছে।' পা ছুঁয়ে সালাম করলাম তাঁকে।

মামা এলেন। বললেন, 'কতদিন দেখিনি তোকে।' তারপর আমাকে নিয়ে প্রাচীন বিশাল বাড়ীটা গম গম করে উঠল। আধো চেনা, অজানা মুখগুলি ঘিরে দাঁড়াল আমায়। সপ্রশংস বিস্ময়-ভরা তাদের চোখ। চট্‌পট্‌ কথার জবাব দিচ্ছিলাম তাঁদের।

মামা হাঁক দিলেন, 'করম আলী, করম আলী—'

মুহূর্তের মধ্যে এসে হাজির হল মুখভর্তি দাড়ি সুঠাম চেহারা বুড়ো হলেও যৌবনের সবল পেশীর দৃঢ়তা এখনও বজায় আছে।

মামা বললেন, 'কাল সামনের দীঘিতে জাল দাও। কলকাতা থেকে ভাগ্নে এসেছে, আমার একমাত্র ভাগ্নে বুঝলি ?'

করম আলী বুঝল। মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তারপর চলে গেল সে।

মামা হাঁক দিলেন, 'রহমত। রহমত কই ?'

বেঁটে মানুষটা বাজ পাখীর মতন চোখ দুটি ... রহমত।—'পরশু শিকারে যাও। হরিণ আনো যেন।'

আমার কৈশোরের কথা মনে হয়েছিলো। ভেবেছিলাম, না, কোথাও কোনো পরিবর্তন তো হয়নি। সেই আগের মতই সব কিছু। সেই স্নেহ, মায়া। সেই প্রতাপ। উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ; চাঁপা গাছটা এখনও আছে। ভেতরের পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটের উপর চাঁদনীর ঝলোমলো। ঢেঁকিঘরে একটানা ধান ভানার শব্দ আগের মতই প্রাত্যহিক। পূবের দিকে ফুলের বাগান, দক্ষিণ দিকে সারি সারি ধানের গোলা, রসুই ঘর। সবই একরকম।

মামা-মামীর প্রশ্ন, জবাব আর প্রশংসাসূচক অব্যক্ত উক্তি শুনতে শুনতে ঘন্টাখানেক কেটে গিয়েছিলো। তারপর আহার। বড় ম্যান্টালটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। শীতল পাটির ওপর সতরঞ্জি পেতে বিছানা করা হয়েছে খাওয়ার জন্য।

মামা, বড় মামাতো ভাইটি আর আমি। বসলাম তিনজনে খেতে। মামী তদারক করছিলেন। থেকে থেকে এটা ওটা তুলে দিচ্ছিলেন তিনি।

ঘোমটা টানা একটি মানুষ কখন—এক সময়ে ঘরে এলেন, চোখ তুলে তাকাতে পেলাম না। হাতের বাসনটা তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। ম্যান্টলের উজ্জ্বল আলোকে মুখটা সম্ভবতঃ একটুখানি তাঁর দেখেছিলাম। অপূর্ব। ভাবলাম, কে ? আমার বাল্যের দশ বছরে এঁকে দেখেছি—ঠিক মনে হলো না। হয়ত মামাতো বোনদেরই কেউ হবে। কিন্তু তাদের মুখতো আমার ভুল হবার নয়।

পরিচয় হল ঘণ্টাখানেক পরে। তখন আমাদের খাওয়ার পালা চুকেছে। দাদার কামরাতে বসে বসে আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম শহরে জীবনযাত্রা সম্পর্কে। এমন সময় সলজ্জ হাঁসিমাখা মুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন। দাদা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না ভাই। আমার একটু কাজ আছে। এক্ষুণি আসছি।' দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তিনি। একটু অদ্ভুত ঠেকল। কিন্তু মনে মনে হাসলাম ; ভাবীর সঙ্গে নির্বিঘ্ন পরিচয়ের সুযোগদানের বুদ্ধিটা দাদার আছে দেখে মনে মনে খুশীই হলাম।

'চিনতে পারেন ?'

একেবারে কাছে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না।

'ভাবীকে চিনতে পারেন না, কি রকম দেওর !'

ভুলে গিয়েছিলাম বড় মামাতো ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় মামা আব্বার কাছে লিখেছিলাম আসতে। কিন্তু আসা হয়নি আমাদের কারোই। আব্বা চাকুরে মানুষ, অত খরচপত্র করে যাওয়া-আসা করার চাইতে কিছু একটা পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো মনে করলেন। কিন্তু কথাটা একেবারেই মনে ছিল না।

তাকিয়ে দেখলাম ভালো করে। স্মিত হাসিভরা মুখ। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

'আমাকে চিনতে পারছেন না ভাই সাহেব !' অথচ আম্মার কাছে শুনেছি আমরা নাকি ছোট বেলায় একে অপরের পাতলুন পরেছি।

অবাক হয়ে গেলাম। কথার ভঙ্গিতে নেই এতটুকু জড়তা। প্রথম আলাপেই ভাবীকে আমার পছন্দ হলো। কিন্তু আমার সংকোচ লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আমিও তো আপনাকে চিনতে পারিনি। পাতলুন পরতাম তো সেই কবে, ছোটবেলায়। মা মারা যাওয়ার বছর দুই আগে দেখা হয়েছিলো, সেবার কথায় কথায় আপনার কথা উঠলো যখন, মা বলেছিলেন পাতলুনের কিস্‌সা'।

আমি ভাবতে লাগলাম কিছু মনে পড়ে কিনা। ভাবী বুঝতে পারলেন।

বললেন, 'তখন আমাদের বাড়ী ছিলো ঐ খালের ঐ পারে। এখন যেখানে আম-বাগান ছাড়া আর কিছু নেই।'

হঠাৎ বিদ্যুৎ রেখার মতো আমার মনের আকাশে চমক দিয়ে জেগে ওঠে একটি ঘটনা। বৈশাখের খররোদ্দুরে আমি নাকি একদিন চুপি চুপি ঘুম-শয্যা ছেড়ে, মার পাশ থেকে উঠে এসে মস্ত বড় এক ছিপ হাতে ভেতরের পুকুরে মাছ ধরতে গেলে জসু নামে একটি মেয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো আমাকে পুকুরের জলে। আমি উঠতে না পারলে সে আমাকে বলেছিলো ঘাস ধরে উঠে আসতে। এমন সময় বাড়ীর জোবেদা দাসী গিয়ে পড়ায় আমার প্রাণ রক্ষা পায়।

'আপনার নাম কি ভাবী '

'জওসন আরা।'

হ্যাঁ এইত সেই জসু। আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী, ভাবী।

'মনে ছিলনা আমার কথা ?'

'মনে ছিলো আর শুনেছিও অনেকবার।'

এখন পরিচয়ের পর রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলাম। মনে পড়ল খাল পারের একটি বাড়ী। যেখানে আমরা নানা রকম ফল চুরি করতে যেতাম। সেই বাড়ীতে থাকত জসুভাবী। মামা বাড়ী আর সেই বাড়ীতে ব্যবধান ছিল সরু এক ফালি খালের—

বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই তা চড়া পড়ে থাকতো।

আর মনে পড়ল এক গভীর রাত্রিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। হাঁকে, ডাকে, লোকে লোকারণ্য।

দেখি খাল পারের জসুদের বাড়ীটা জলছে আগুনে দাউ দাউ করে। কেউ কেউ ছুটো ছুটি করছে আগুন নেভানোর জন্যে ; কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে।

মামার সঙ্গে জসুর বাবার সেকি ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত মামা দোনলা বন্দুক বার করলেন। তাঁকে আটকানোর সাহস হয়নি কারো। মামী একাই বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছিলেন।

পরদিনই জসুরা সামান্য মালপত্র যা ছিল গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে শহরে না কোথায় চলে গিয়েছিলো।

দুই বৎসর আগে যখন সোনাপুরে আসি তখন মাস দুই ছিলাম। আর এই দুই মাসের প্রত্যেকটি মুহূর্তই প্রায় কেটেছে জসুভাবীর সঙ্গে। দাদা জমিদারী কার্যোপলক্ষে ঘরে থাকতেন না। অবসর পেলেই আমি গল্প করতাম ভাবীর সঙ্গে বসে।

মামা একদিন বললেন, 'বৌ তোর মা হয় নাকি ? ভাবী সামনেই ছিলেন। লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠ্‌লো তাঁর। প্রথমে কথাটা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। তারপর যখন বুঝলাম তখন এই স্নেহশীল মানুষটার সামান্য রসিকতায় বিরক্তি বোধ করার কিছু রইলো না। মনে মনে তারিফ করলাম, এই সহজ সরল গুরুজনোচিত মস্করার।

মামী বললেন, 'ও হয়েছে ঠিক ওর বাবার মতো ঘর কুনো। বৌয়ের পাশ থেকে নড়তেই চায় না। পুরুষ-মানুষকে জীবনে উন্নতি করতে হলে একটু উড়তি মেলতি হওয়া দরকার।'

মামা বললেন, 'তা' হবে। ও তো শহুরে ছেলে। আমাদের মত তো নয়, আর ভাবী বলতেই আছে ওর একটা। আর বৌয়েরও ত দেবর বলতে ও—ই। আছেই বা কদিন, তারপর তো যাচ্ছে চলে'।

মামা ডাকলেন, 'বৌ মা, মা—'

ঘোমটা দিয়ে মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ালেন ভাবী।

মামা বললেন, 'দেখ বৌ, ও তোমার একটি মাত্র দেবর। আমার বড় আদরের ভাগ্নে। একটু যত্ন আত্যি কোরো।'

এই সময় হঠাৎ উপস্থিত হল রহমত। শিকার ফেরত লোকটা মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বেতন কাটা গেল তোর এ মাসের।'

অবাক হয়ে গেলাম। বনের হরিণ। পাওয়া না পাওয়া মানুষের হাত কতোখানি সেটুকু বিবেচনার শক্তি নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। দুঃখ হল লোকটির দিকে চেয়ে।

মামা চলে গেলেন।

ভাবীকে চুপি চুপি বললুম ; আদরের ভাগ্নে, একটু যত্ন আত্যি করবেন তো ?' ভাবীর মুখটা কালো হয়ে গেল। তাকিয়েছিলেন আমার দিকে একদৃষ্টে। পরে বহুদিন আমি ও-ই দৃষ্টির অর্থ ভেবেছি।

দু'মাস কেটে গিয়েছিল দেখতে দেখতে।

সকালে উঠে দাঁতন হাতে পুকুর ঘাটে দেখি ভাবী হাজির, মুখ ধুচ্ছেন। দেখা হতেই হেসে উঠেছি দু'জনে। কাল রাত্রে দাদা শিকারে গেলেন, আর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা, অর্থাৎ আমি, ভাবী আর তিন মামাতো বোন বসে গল্প করেছি ; আজ আবার ভোর না হতেই দেখা।

যাবার বেলায় সূর্য উঠেছে প্রায় চার-পাঁচ বাশ সমান। সবার কাছে বিদায় নিয়ে ভাবীর ঘরে গিয়েছিলাম। ভাবীর চোখ দুটো ছলো-ছলো।

'যাচ্ছেন' ? ভাবী শুধালেন।

'হ্যাঁ ভাবী।'

ঢিপ করে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম তাঁকে।

'থাক ভাই থাক। সালাম করতে হবে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আপনি ছিলেন, দু'টো মাস আমার বেশ কাটল। চলে যাচ্ছেন আবার হাঁপিয়ে উঠব।'

'দোয়া করবেন'।

এক টুকরো মলিন হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে।

'আমার, দুঃখী মানুষের দোয়া কি আল্লা শুনবেন ?'

তারপর থেকে ছ'বছর কেটে গেছে।

চমকে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দাঁড়িয়ে আছি সজনে গাছটার তলে। হঠাৎ শীত করে উঠল যেন।

উত্তর লরাবাঁকের ছরার জল পেরিয়ে, স্কুল ঘরটা পেছনে ফেলে আম-কাঁঠালের বন পেরিয়ে সদর সড়ক দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে পড়লাম।

শীতের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে যেন। বাড়ীতে ঢুকে সোজা মামীমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বড় পালঙ্কের উপর বসে মামী কোরান শরীফ পড়ছেন।

পড়া শেষ হলে, চোখ তুলে বললেন, 'তুমি এলে বাবা? এদ্দিনে মনে পড়ল আমাদের? তা কদিন থাকবে তো?'

বললাম, 'দেড় মাসের ছুটি আছে।'

মামা শুনে ছুটে এলেন।

'কেমন আছ? তোমার মা কেমন আছে? বাবা?'

একসঙ্গে অত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

'সবাই ভালো আছেন।'

আমার থাকবার কামরা নির্দিষ্ট হল ভাবীর ঘরের লাগালাগি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাবীর ঘরে গেলাম। দাদা ছিলেন বাড়ীতে। ভাবী বসে বসে কি যেন সেলাই করছিলেন। আমাকে দেখে তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

'কেমন আছ ভাই?'

আমাকে তুমি সম্বোধন তাঁর এই প্রথম। গতবারের দীর্ঘ আলাপ আর একান্ত ঘনিষ্টতাতেও যা হয়নি সেই ব্যবধান এক কথায় উড়িয়ে দিলেন তিনি।

'ভালই আছি। আপনি?'

'আমার কথা বলছ?' আবার সেই হাসি। সেই হাসির বর্ণনা দিতে পারবো না। কেবল বলতে পারি তাতে ছিলো এক পরম বেদনার পরিচয়। ভাবলাম কিসের বেদনা ভাবীর মনে। তাঁর মনের এই গভীর আত্ম-নিগ্রহ বেদনার কোনো কারণই আমার কাছে পরিস্ফুট হলনা।

'অমার কথা আর বলো কেন। কিন্তু যে দাঁড়িয়ে রয়েছ। এই দেখ তোমাকে বসতে পর্যন্ত বলিনি।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

'বসো। না, তার চেয়ে ভালো চল তোমার শোবার বিছানা করে দেইগে।' ভাবী শোবার ঠাঁই করে দিলেন।

অনেক পথ এসেছ। এবার একটু বিশ্রাম নাও দিকি। শুয়ে শুয়ে বাজে ভাবনা ভেব না।

'বাজে ভাববো কেন। কাজের ভাবাই ভাববো।'

থমকে দাঁড়ালেন এক মুহূর্ত।

হেসে যেতে যেতে বললেন, 'ভোরে মুখ ধুতে এস ঘাঁটে।'

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম দীর্ঘ পথ যাত্রায়। সেদিন একটু সকালে সকালেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

পরের দিন সকালে চা খেতে খেতে ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'নতুন গল্প-টল্প কি লিখলে বলতো। সেইবার তুমি যে একটা পড়ে শুনিয়েছিলে ভারী সুন্দর লেগেছিল সেটা। আচ্ছা এত গল্প লেখ; আমাকে নিয়েই না হয় একটা লিখে ফেলনা।'

'কি লিখব আপনাকে নিয়ে। আপনার কথাতো আমি বিশেষ কিছুই জানি না ভাবী। শুধু জানি যে আমার এক ভাবী আছে, জসু ভাবী। অমন স্নেহময়ী, অমন মায়াময়ী ...

'দয়াময়ী করুণাময়ী! আরো কিছু?'

হেসে বললাম, 'না আর না!'

ভাবীকে অনুরোধ জানালাম, 'আমার গল্পতো শোনাবো। কিন্তু আপনাকে গাইতে হবে।'

ভাবী যে গাইতে পারেন সেটা শুনেছিলাম মামাতো বোনদের কাছে।

আমার কথায় ভাবী চমকে উঠলেন। বললেন, 'আমি? তা হয় না।'

দুপুর বেলাতে বারান্দায় বসে ভাবীকে বললাম আবার, 'আপনি গান শোনান।'

'বলেছিত ভাই, তা হয়না।'

'কেন হয়না ভাবী?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'তবু বলুন তো শুনি!'

ভাবী জবাব দিলেন না কোনো। চুপ করে গেলাম। মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলাম এই মানুষটার জীবনের কতটুকু জেনেছি যে অমন আগ বেড়ে দাবী করতে যাই। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভাবী উঠে গেলেন। বললেন, 'দেখি মা জেগে আছেন কি না।' কিছুক্ষণ বসে থেকে আমিও উঠে এলাম। বাইরে যাবার জন্য কাপড়-চোপড় পরতে লাগলাম গিয়ে।

দু'বছর বাদে আবার সোনাপুকুর গ্রামে এসেছি। মামা বাড়ীর পাড়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে সোনাপুকুর হাট। হাট মানে সোনাপুকুরের প্রাণকেন্দ্র। বাজার, দোকান পাট, স্কুল, পোষ্ট অফিস, ডিসপেনসারী সব কিছু। সেই সঙ্গে পরিচিত বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবার একমাত্র যায়গাও এই হাট।

হাটে গেলাম।

সেদিন ছিল ফুটবল খেলা। স্থানীয় স্কুল ময়দানে দোকানদার সমিতি বনাম স্কুল।

ভালই লাগল খেলা দেখতে। খেলা শেষে আবার ফিরলাম।

সন্ধ্যাবেলায় হাত মুখ ধুয়ে ভাবীর ঘরে গেলাম কিন্তু দেখা হলনা তাঁর সাথে। রান্নাঘর থেকে আজ আর ভাবীর সাড়া পাওয়া গেলনা। ইজিচেয়ারটা নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় দেহে নেমে এলো কত শান্তি, সস্নেহ, নিবিড়।

আজ খাবার ডাক এলো যখন, আশা করেছিলুম ভাবী পরিবেশন করবেন না। হয়ত কিছু একটা হয়ে থাকবে তাঁর, অসুখ-বিসুখ ত হতেই পারে। কিন্তু খেতে গয়ে দেখলাম ভাবীই পরিবেশিকা। মুখটা অসাধারণ গম্ভীর। অসুস্থতা সত্ত্বেও তার দৈনন্দিন কাজে ঢিলে না দিয়ে তদারকে আসছেন। মনে মনে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালুম তাঁকে।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙলো। শুভ্র চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী অপরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অপরূপত্বকে খান খান করে ভেসে আসছে কোনো এক নারী কন্ঠের চাপা ক্রন্দন। ভাবীর? কান্নার শব্দ আসছে তাঁরই ঘর থেকে। বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল। আজ বুঝতে পারলাম প্রীতি আর শ্রদ্ধায় আমার মনের মধ্যে ভাবীর ছবি আঁকা হয়ে আছে দৃঢ়ভাবে। কিন্তু কেন? কেন এই ক্রন্দন, ভাবিয়ে তুললো আমাকে সেই প্রশ্ন। চাপা কান্না ক্রমে মিলিয়ে গেল। কিন্তু কেড়ে নিয়ে গেল আমার সে রাত্রের সুপ্তি। আকাশ ফর্সা হল, দিনের আলোয় মামা বাড়ীর প্রাঙ্গন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ছোট ইজিচেয়ারটাতে হেলান দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি অর্ধরাত্রি।

মনের মধ্যে অহরহ কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে একটা কথা। কিন্তু কেনইবা তিনি বলতে যাবেন আমাকে সে সব কথা। প্রতি সংসারের প্রতি গৃহে এমন ঘটনাতো ঘটেই আসছে। তাই খবর নেবার দরকার কি আমার! বেড়াতে এসেছি, ফিরে যাবো আবার যেমন এসেছি তেমনই। তবে কি লাভ হবে এদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলিয়ে। ভাবী নিজে থেকে যদি কিছু বলেন, তবেই তা শুনব। ভাবীর কামরার দিকে যেতে যেতে ফিরে এলাম।

আমার ঘরের সম্মুখে এসে দেখি মামী।

'কি বাবা চোখ মুখ অত শুকনো কেন? ঘুম হয়েছিলো রাত্রে?' হেসে বললাম, 'আপনাদের এখানে কাল যেমন ঘুমিয়েছি পরীক্ষার পর আর তেমন ঘুম হয়নি কোনোদিন।'

'বেশ ভালো।'

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'তোমার মেঝ বুবু আর বড় বুবু কাউকেই ত তুমি দেখনি। গতবারেও ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। অথচ শ্বশুর বাড়ী ওদের একেবারে কাছেই। যাওনা একবার। ওরাও খবর পাঠিয়েছে।'

সানন্দে রাজী হলাম।

মামী লোক দিলেন সঙ্গে। তার সঙ্গে গেলাম বুবুদের শ্বশুর বাড়ী। ক্রোশ দুই দূরে বনের ধারে টিনের ছাওয়া এক জমিদার বাড়ী। দিন তিনেক ছিলাম। সেখানে বেশ আনন্দেই কাটল সময়টা। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেখা, বুবু যেন দিশা পেলেন না কী করবেন, কী খাওয়াবেন। একে ডেকে ওকে ডেকে দেখালেন তাঁর শহুরে ভাইটিকে। পাড়া ভেঙ্গে এলো আলাপ করতে। দেখতে দেখতে তিনটি দিন কেটে গেল জমানো আবহাওয়ায় কিন্তু তবুও মনের মধ্যে প্রতি ঘন্টায় বার বার ভেসে উঠতে লাগলো মামা বাড়ীর ছবিখানিই। ফিরে এলাম তিন দিন পরে।

মামী সানন্দে গ্রহণ করলেন। মেয়ের খবর জানতে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। আমাকে তারা কেমন সমাদর দেখালেন তাও তার বিশেষ জ্ঞাতব্য। কিন্তু ভাবী ? কেবলি হাঁসফাস করতে লাগলাম। ভাবী কই ? ভাবীর দেখা নেই। এসেছি ভোরে। খাওয়ার সময় পার হয়ে গেল কিন্তু ভাবীর সাক্ষাৎ নেই। অবশেষে দুপুর বেলায় ভাবীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভাবী শায়িতা। দরজা খুলতে খুলতে যে একটুখানি শব্দ হয়েছিলো তাতেই তিনি জেগে উঠেছেন।

'তুমি নাকি ! আমি ভাবলাম বেড়াল-টেড়াল বুঝি।' ছোট্ট একটি রসিকতা করতে ছাড়লেন না তিনি।

'বসো।'

পালঙ্কের এক প্রান্তে যায়গা করে দিলেন তিনি। নিজে বসলেন আর এক প্রান্তে হেলান দিয়ে।

স্তম্ভিত হলাম জসুভাবীর মুখের দিকে চেয়ে। শ্রাবণ আকাশের সমস্ত ঘনঘটা, বর্ষণ-পূর্ব আকাশের সমস্ত জমাট অন্ধকার যেন একসঙ্গে জমা হয়েছে ভাবীর মুখে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

'কি হয়েছে ভাবী ?'

'কই কিছু না তো !'

গলার স্বরে তাঁর ঝড়ের আভাষ।

'আমাকে বলবেন না এইত।'

স্নেহ-ভালোবাসার অধিকার জিনিসটা এমন সকল সামাজিক অধিকারের মুখে ছাই দিয়ে সে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। নইলে অমন অভিমানহত স্বরে আমিই বা জসুভাবীকে তাঁদের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপারে প্রশ্ন করতে যাবো কেন ?

'তাও ঠিক,' আমি বললাম, আপনার দেওর মাত্র। তবে আমার যায়গায় হতো যদি আপনার রক্ত সম্পর্কের ভাইয়ের মত কেউ তবে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সকল কথা খুলে বলতেন।'

ভাবীর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল হঠাৎ। মুখের সেই ভাব গোপন করার জন্যেই হয়তো হঠাৎ তিনি আমার দিকে পিছন ফিরে ঘুরে বসলেন মাথাটা ঝুঁকিয়ে। পিঠের ব্লাউজটা আলগা করে বললেন, 'দেখ।'

দেখলাম ভাবীর পিঠের উপর লম্বা লম্বা অনেকগুলো দাগ বসে গেছে আড়াআড়ি হয়ে। দাগগুলো লাল হয়ে উঠেছে কোনোটা, কোনটাতে রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে তখনও।

ভাবী হঠাৎ আমার গায়ের উপর চোখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

আমার বিস্ময়, আমার ক্রোধ আমাকে তখন চঞ্চল করে তুলেছে। ভাবীর মাথাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে ভাবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

নিজের কামরায় এসে বিছানায় গা ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলাম। অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে থেকে সবুজ পর্দ্দাটা কে যেন সরিয়ে নিল। বিকালে বেড়িয়ে এসে নিজের ঘরেই বসে রইলাম। মামা-মামী সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, আমার খবর নেবার মত ফুরসত তাঁদের নেই। খাবার সময়ে কেবল তাঁদের দেখা পাই। দিনটা যে কিভাবে কাটলো বলতে পারবোনা। আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও মনের মধ্যকার ঝড়কে যেন আর চেপে মেরে ফেলতে পেরে উঠলাম না।

পরের দিন দুপুর বেলায় খেয়ে—দেয়ে শুয়ে আছি এমন সময় ভাবী এলেন।

'খুব দুঃখ পেয়েছ না? কিন্তু এ তো আমার ভাগ্যে নুতন নয়। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ভাবী বললেন, 'যেদিন থেকে এ বাড়ীতে বউ হয়ে এসেছি তার পরদিন থেকে শুরু হয়েছে এ।'

চুপ করে রইলাম। ইচ্ছে হল বলি, এ আপনি কেন সইছেন। কিন্তু না সয়ে ভাবীর করারই বা কী আছে তা আমার জানা ছিল না।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'কে, কে ভাবী?'

শান্ত কণ্ঠে ভাবী জবাব দিলেন, 'আমার পরম পূজ্যপাদ শ্বশুর সাহেব।'

'মামা'। আমি চমকে উঠলাম।

'হাজী, শরীফ, দয়ার সাগর আমার শ্বশুর সাহেব।'

গুম খেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ। কতক্ষণ তা জানি না। হঠাৎ ভাবী বললেন, 'তুমি গান শুনতে চেয়েছিলে না? মা আজ রসুল ভাইদের ওখানে গেছেন। শুনবে?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ভাবী নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন। ছোট ছেলের মত আমার চিবুকটা তুলে ধরে বললেন, 'কত ভালো তুমি, কত নরম তোমার মনটা।'

তারপর ভাবী নীচু গলায় গান ধরলেন। গানে আজ মন নেই। মনে নেই কি ছিল গানটা। কানে বাজছে তার কয়েকটি কথা, আমার সকল দুঃখের প্রদীপ।

ভাবীর গান শেষ হতেই কখন যে উঠে এসেছিলাম জানি না।

ভাবীর কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যাব, এমন সময় বাইরের কামরার দরজার ধার থেকে সরে এলেন মামী।

নিজের কামরায় এসে দোর বন্ধ করে দিলাম।

বিকেল বেলায় বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। স্কুল-বাড়ী ছাড়িয়ে কাঠের পুলটার উপর উঠে দাঁড়ালাম। চোখ মেলে তাকালেই চোখে পড়ে শ্যামল বনরাজির সমারোহ। ছোট ছরা এখানে সংকীর্ণ হয়ে আসছে আরো। শীর্ণ নদী বয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। নদীর পারেই মাঠ, সবুজের অসীম বিস্তার।

এ মাঠে বালসুলভ চাপল্যে কাটিয়ে দিয়েছি শৈশবের কত প্রশান্ত বিকেল। বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া মসীলিপ্ত দিনগুলি ঠিক মনে পড়ল না যেন।

কাঠের পুলের উপর সন্ধ্যা নামল। মনের মধ্যে তখন একটা কথাই বারে বারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার সেই ভাবনা নিয়েই ফিরে আসলাম মামার বাড়ীতে।

একটু সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লাম সেদিন। খাবার সময়ে ভাবীকে দেখা গেল না। পরের দিন চা-খাবার সময়ও দেখি ভাবী নাই। ছোট মামাতো বোন জুলেখা চা করে দিলে। বললে, 'গোসল করে আমাকে ডাক দেবেন। দেরী করে খাবেন, আর কলকাতায় গিয়ে বদনাম করবেন, সে হবে না।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা'

এতক্ষণে ভাবীর অনুপস্থিতির কারণ অনুধাবন করে মনটা গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। কাল ভাবীর গান গাওয়া, আর জানালার কাছে মামীর দাঁড়িয়ে থাকার কথা, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় আমার সামনে আসা তাঁর নিষেধ হয়েছে।

মনে হল আমি আর ছেলে মানুষ তো নই। আমি এক যুবক। আমার ও ভাবীর সম্পর্ক যে আরও একভাবে ব্যাঘাত হতে পারে সে কথাটা আমার এর আগে মনেই হয়নি।

দুপুরে খাওয়ার পর জেগেছিলাম শয্যায়।

মামাতো বোন জুলেখা নীরবে আমার হাতে তুলে দিল এক টুকরো কাগজ। হাতে লেখা—চিঠি।

'ভাবী দিয়েছেন। পড়েই ছিঁড়ে ফেলতে বলেছেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে রাগে, লজ্জায়, অপমানে হাত কাঁপতে লাগল আমার। আমাদের অনাবিল সম্পর্কে এমন কলংকের কালি লেপে দিলো এরা।'

তাও আমাকে মেনে নিতে হবে ?

গুম খেয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। না, আর একদিনও নয়। কালই আমি রওয়ানা হব। আর একদিনও নয় এখানে। আলনা থেকে কোটটা পেড়ে নিয়ে ভাঁজ করে রেখে দিলাম সুটকেসে। টেবিলের উপর গোটা কয় বই ছিলো, তাও গুছিয়ে নিলাম। যাব, কিন্তু স্মৃতির গ্রন্থগুলো বোধ হয় অত সহজে ছেঁড়া যায় না। সন্ধ্যাবেলায় বাজারে দেখা হয়ে গেল এক বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে। ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়েছি আমরা। সে কিছুতেই ছাড়লো না। বললে, 'কতদিন পরে দেখা! চল আমাদের ওখান থেকে ঘুরে আসবে।' ধরে নিয়ে গেল এক রকম জোর করেই।

সমুদ্রের ধারে বাড়ী। মাছের ছড়াছড়ি। খাওয়ার দিক থেকে বন্ধু আপ্যায়নের ত্রুটি করলো না। আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করল গ্রামোফোনের। হৈ হৈ ও হল মন্দ নয়। কিন্তু সব আয়োজনের মধ্যেই আমি যেন কেমন আনমনা হয়েই রইলাম। মন বসলো না কিছুতেই। বাধ্য হয়েই বন্ধু আমাকে সোনাপুকুরগামী বাসে উঠিয়ে দিল। বাসে প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ভেঙ্গে যাওয়া-আসা। রাত হয়ে গেল পোঁছুতে পোঁছুতে। রাত্রে ফিরে এসেই কাউকে কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম। খাবার জন্যে ডাকাডাকি করার প্রবৃত্তি হল না। দিনের বাস যাত্রার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে একটুও বেগ পেতে হল না।

ভোর রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া জাগিয়ে দেল আমায়। আজ চলে যাব। নিমের ডালের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ভেতরের পুকুরের দিকে চললাম।

পুকুরের ধারেই সারা বছরের কাঠ সঞ্চয়ের গুদাম ঘরটা বাল্যের বহু ক্রীড়ানুষ্ঠানের স্মৃতি জাগরুক করে দেয়। শান বাঁধানো ঘাটে বসে দাঁতন করতে করতে সেদিনেরই কোনো একটি ঘটনা স্মরণ করছিলাম। দেখলাম আনুও মুখ ধুতে এসেছে। আমাকে দেখে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলল না। আবার দাঁতনে মন দেই। একহাত দিয়ে পুকুরের পানিতে ঢেউ জাগাই আর ভাবি জসুভাবীর ইতিকথা।

'ভাই সাহেব, জানেন, আপনি ?'

জুলেখার কথায় মুখ তুলে চাইলাম ওর দিকে।

'না, তো। কি ব্যাপার।' ওর মুখের অস্বাভাবিক ছবি দেখে আপনিই আমার মনে হল কিছু একটা হয়েছে।

'কি, কি, হয়েছে ?' গভীর উদ্বেগ জড়িত গলায় আবার তাকে জিজ্ঞেস করি।
'ভাবী কাল...'

হঠাৎ দুই চোখ তার ছলছলিয়ে ওঠে। দৌড়ে পালিয়ে যায় ঘাট থেকে। আমিও ওর পিছু পিছু উঠে এলাম। ভেতরের উঠান পর্যন্ত আসতেই দেখি বেশ কয়েকজন বাইরের লোক ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসে রয়েছে উঠানের উপর। দাদাকে দেখলাম। চোখ মুখ গম্ভীর, বসে রয়েছেন বারান্দার মাটিতে।

শুনতে পেলাম মামী বলছেন কাকে যেন, 'আল্লার গজব। এ বাড়ীতে বহুদিন ধরে আল্লার রহমত ছায়ার মত ঘিরে ছিলো আমাদের। কোনদিন থেকে সে ছায়া সরে গেল তা'ও আমি জানি।

কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না।

তথাপি জানতে পারলাম সব কিছুই।

যে পুকুরে একটু আগে আমি মুখ ধুতে গিয়েছিলাম, যে পুকুরে ছোট্ট জসু ধাক্কা দিয়ে আমাকে বলেছিলো ঘাস ধরে উঠে আসতে সেই পুকুরের পানিই গ্রাস করেছে তাঁকে।

গলায় নাকি কলসী তাঁর।

টলতে টলতে বসে পড়লাম একখানে।

ভাবীকে সমাহিত করে সেদিনই আমি চলে আসি। সোনাপুকুর ঘাট থেকে নৌকায় করে জাহাজে উঠে আর একবার পিছনের দিকে তাকালাম। ফেলে আসা সোনাপুকুর। আমার শৈশবের স্বপ্নমাখা দেশ। জাহাজটা ছাড়বে। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে হাতে ঠেকল এক টুকরো কাগজ। অসীম কৌতুহলে কাগজখানা টেনে নিলাম পকেট থেকে। ভাবীর দেওয়া চিঠি। না পড়ে কোটের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। খুললাম চিঠিখানা।

ভাই, কাল গান গাওয়াই হয়েছে আমার কাল। তোমাকে দেখা দিতে পারবো না। মা নিষেধ করে দিয়েছেন। আমার দুঃখের কথা তোমাকে বলে শেষ করা যাবে না। মুখে বলার সুযোগ আর হয়ত হবে না। তাই চিঠি লেখা। তোমাকে আমি বলেছিলাম, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে তাই বলছি, শোন। আমার বাবা ছিলেন এই গ্রামেরই জমিদার। তোমার মামার সঙ্গে তাঁর ছিলো বংশানুক্রমিক রোষ। সেই রোষের শিকার হলাম আমি। বাবা বেঁচে থাকতে তোমার মামা লোক দিয়ে এখানকার বাড়ী পোড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। অবশেষে তোমার মামা প্রতিশোধ নিলেন আমাকে এ বাড়ীতে এনে অশেষ নির্যাতনের মধ্যে রেখে। শুনেছি এরা আবার ছেলের বিয়ে দেবেন। কনেও ঠিক হয়েছে। ওরা বলেছেন সতীনের উপর মেয়ে দিবেন না।

জানি না এদের মনে কি আছে। আমার এ ক্ষুদ্র জীবনটার ওপর দু'দুবার হামলা হয়েছে। এদের প্রতিহিংসার আগুন কত জ্বলতে পারে তা' তুমি ধারণাই

করতে পারো না। আমাকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়।

বড্ড ভয় করছে। বড্ড যন্ত্রণায় আছি। মরতে আমি চাই না। আমার সব কিছুই তো জানলে। তুমি বিদ্বান লোক। বলতো, আমি কি করি। আর তুমি লেখক মানুষ। তোমাকে অনুরোধ যদি এদের হিংস্রতার দম্ভ শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে ধ্বংসই বয়ে আনে, তা হলে আমার মত অভাগিণীর জীবন নিয়ে একটা গল্প লিখো। লিখো কিন্তু একটা গল্প ...

দেয়াল

জেলখানার দেয়াল ঘেঁসে বসেছে মাতু। ওর কাজ বসে বসে চারদিকে নজর রাখা যাতে কেউ দেয়াল টপকাতে না পারে। জেলের ভাষায় সে কোনার পাহারা।

জেলের দু'টো দেয়াল যেখানে মিশেছে সেখানে তার ডিউটি। লম্বা চওড়া শক্ত মাতু কৃষাণ-সন্তান। নিশ্বাস নিতে বুকের ছাতিটা ফুলে ওঠে। মাত্র অল্পদিন আগে সাজা নিয়ে এসেছে।

বৈশাখের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে মাতু বসেছিলো দেয়ালের ধারে। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। জায়গাটা নির্জন।

চুপ করে তাকিয়ে থাকলেও চোখে নীল মারে।

জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

মাতু দেখতে পেল খট খট করে বুকে সাড়া জাগিয়ে এগিয়ে আসছে এক সিপাই।

গুদাম ঘরের এলাকা দিয়ে আসবার পথেই মাতু দেখতে পেয়েছিল ওকে। সান্ত্রীটি যখন কাছে এল মাতু ভাল করে লক্ষ্য করল ওকে। খুশীই হল সে। মুখের চেহারায় যৌবনের দীপ্তি ; সান্ত্রীর বয়স অল্প। মাতুর সমবয়েসীই প্রায়।

যাক। অন্ততঃ কথা বলার একটা লোক পাওয়া গেল। ছেলেটা কাছে এলে দুয়েকটা কথাবার্তা নিশ্চয়ই হবে। আর তাতে দুপুরের এই অসহ্য নীরবতা ভাঙবে।

সান্ত্রী এল ঠিকই। এসে দাঁড়াল মাতুর কাছেই। কিন্তু একমাত্র শব্দ যা ধ্বনিত হল তা' বুটের শব্দ।

তার পরেই সান্ত্রী ঘুরে গেল। তার কাজও দেয়ালের ধার ঘেঁসে ঘন্টা দুই পায়চারী করা।

খট্ খট্ খট্। বুটের শব্দ জাগিয়ে সে পায়চারী করতে লাগল। দেয়ালের এক সীমানা থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া, খট্ করে ঘুরে দাঁড়ানো, ফিরে আসা, তারপর আবার যাত্রা। খাকী পোশাক পরা যুবক বলল না একটি কথাও। মাতু অবাক হয়। তাকিয়ে দেখে তার চারদিকে, কেউ কোথাও নেই।

একই বয়সের দু'টি ছেলে। সান্ত্রী যতবার মাতুর কাছে এল, ততবারই মাতু আশা করল, এবার নিশ্চয়ই সে কিছু বলবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হলনা।

মাতু নিজেও চেষ্টা করল কিছু বলতে। কিন্তু সান্ত্রীর দিকে চেয়েই আর কথা বেরয় না তার।

খট্ খট্ খট্ ঃ ভারী বুটের শব্দ শুধু দুপুরের নিস্তব্ধতা ভাঙল। সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমাকাশে। বিকেল নামল, প্রশান্ত বিকেল। দেয়ালের ছায়া ঘুরে গেল। ঘন্টা বাজতেই সান্ত্রী ডিউটি শেষ করে চলে গেল একটি কথাও না বলে।

এরপরে তাদের দেখা হল হাসপাতালে। মাতু ভর্তি হয়েছিল ছোটখাট একটা ঘায়ের চিকিৎসার জন্যে। যে মামলায় তার সাজা হয়েছিল, সেই জমির দাঙ্গায় একটুখানি জখম হয়েছিল ; কিন্তু ঘা' আর শুকোয় নি।

সান্ত্রীটি এল মাতুর দু'দিন পরে। জেল হাসপাতালে ওয়ার্ডার আর কয়েদী সকলেই একসঙ্গে থাকে—একই ওয়ার্ডে রাখা হল তাদের।

বেসরকারী পোষাক পরনে সান্ত্রীটিকে এবারে মনে হল একেবারে অন্যরকম। গায়ে লাল গেঞ্জী, পরনে নীল লুঙ্গি, পায়ে মটর টায়ারের রবারে তৈরী স্যান্ডেল। হাসপাতালের ঘড়িতে দু'টো বাজল।

সারা ওয়ার্ডে জেগে আছে মাত্র পাঁচ জন।

'তোমার বাড়ী কোথায় কক্সবাজার সাইডে না কি ?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করল মাতুকে।

'হ্যাঁ, রামু। কক্সবাজার সাব-ডিভিশন।'

'দেখে তোমাকে সেই রকমই লাগে।'

'কেন ?'

গার্ড এবার মাতুর শরীরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

'তোমার শরীরখানা।'

বিনয়ের হাঁসি হেসে মাতু বলল, 'শরীর ?'

'হ্যাঁ। এমন সুন্দর শরীর কমই হয় এদিকে।'

'নিজেরটা নিজের নজরে পড়ে না কি না।'

'আমার কথা বাদ দাও এই ব্যারাকে থেকে শরীর রাখা যায় ?' দেহ সৌষ্ঠবের পারস্পরিক প্রশংসা দিয়ে দুই জোয়ানের আলাপ পরিচয় শুরু। মাতু জেনে খুশী হয় যে আসলে তারা গাঁয়েরই লোক। তাদের ভাবনা চিন্তাগুলির গোড়াটা একই রকম। অনেকদিক দিয়েই তাদের মিল।

হাসপাতালে থাকতে থাকতেই তাদের পরিচয় প্রায় বন্ধুত্বে দাঁড়াল। ব্যাপারটা এইভাবে গড়ায় ঃ রাতে খাওয়ার পর গার্ড মাতুকে জিজ্ঞেস করলে, 'তাস জান ?'

'কি খেলা ?'

'টোয়েন্টি নাইন।'

খেলতে বসে দেখা গেল 'টোয়েন্টি নাইন'—এ মাতু তুখোড় ছেলে।

মাতু আর সান্ত্রী যুবক অংশীদার।

'ষোল।'
'সতর'
'উনিশ'
'বিশ'
'রং কর'
'রাখ। সিঙ্গেল্যাণ্ড।'

'বাহ্‌বা। চমৎকার, মারহাবা' গার্ড বললে তার অংশীদারকে। তারপর দান জিতে একে অপরকে হাত বাড়িয়ে দিলে। কায়দা করতে গিয়ে ফিল্মে হিন্দুস্থানী বুলি বেরুল, 'জিতা রহো বেটা।'

খেলতে খেলতে ঠাট্টা মস্করাও হল। মাতু একটা পুরনো খবরের কাগজের ছবির দিকে চেয়ে আছে দেখে গার্ড ঠাট্টা করে বললে, 'অত নজর দিয়ে কি দেখ ? ভাবীর মত লাগে নাকি ?'

'আরে না। তাকে ত দেখনি। দেখলে ভয় পাবে।'

'আরে হ্যাঁ কে কার বউকে কবে সুন্দরী বলেছে বল ?'

হাসপাতালে যে কদিন ছিল আলাপ পরিচয় হৃদ্যতা তাদের কম হল না।

হাসপাতাল থেকে মাতুই আগে ডিসচার্জ হল। খবর শুনে গার্ড মাতুর কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিক আছে দোস্ত। আবার দেখা হবে !'

চারদিন পর।

মাতু ফিরে এসেছে তার যায়গায়।

আগের মতই কোনার পাহারা।

দুপুর বেলায় ডেউটিতে দেয়াল ঘেঁসে বসে থাকতে থাকতে মাতু ভাবতে লাগল, এমন সময় যদি সেই সান্ত্রীটির ডিউটি পড়ে তা' হলে বেশ হয়। সময়টা তা'হলে ভালই কাটে।

ঠিক সেই সময়ই মাতু দেখতে পেল দেয়ালের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রী ছেলেটা, মাতুর দিকে পিছন ফিরে।

তাকে দেখতে পায়নি হয়ত !

বুকটা যেন লাফিয়ে উঠল মাতুর। জায়গা থেকে উঠে ধীরে ধীরে সে এগোতে লাগল সান্ত্রীর দিকে। খালি পায়ে শব্দ হল না একটুও।

একটু দূরে মাঠে কাজ করছে কয়েদীরা।

জমাদারের রাউণ্ড-এ আসার সময় হয়েছে।

গার্ডের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাতু। ভাবল ওর দুই কাঁধে হাত দিয়ে পেছন থেকে ঝাঁকিয়ে দেবে ওকে। অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি হাসবে।

আস্তে আস্তে সান্ত্রীর গায়ে এসে দাঁড়াল মাতু। কাঁধের ওপর হাত রাখতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল সান্ত্রীর পরিচ্ছদে। পরনে তার সরকারী পোষাক, আগাগোড়া খাকি, ইস্ত্রি করা ভাঁজ।

নীল লুঙ্গি, লাল গেঞ্জী মিইয়ে গেল।

এক পা পেছনে সরে এল সে।

পরক্ষণেই আবার ভাবল, 'এ সংকোচ অর্থহীন।' দু'পা এগিয়ে আরো কাছ থেকে তাকে ঝাঁকুনি দিতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল দু'টো নল। বন্দুকের দু'টো ফুটো মুখ।

সান্ত্রীর সামনে, ওর হাতের মুঠোয়, দৃঢ়বদ্ধভাবে এঁটে থাকা বন্দুকের নল দুটো আবার বিব্রত করল তাকে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আবার সরে এল সে।

সান্ত্রী ঘুরে দাঁড়ায়।

সে-ও যেন সাদরে একটা কিছু করবে ভাবছে। হাত দুটো ধরবে মাতুর। তা'হলে বন্দুকটা রাখা দরকার...।

বন্দুকটা রাখতে হবে...। কোথায় রাখবে ?—রাখাটা...।

এদিক-ওদিক তাকাল সে। ইতস্ততঃ করতে লাগল। ঠিক করতে পারলনা—। বেশ একটুখানি সময় কেটে গিয়েছে এরি মধ্যে ! 'উষ্ণ অভ্যর্থনা' এখন বড্ড বেমানান। যা করবার আগেই করা উচিৎ ছিলো।

এক পা পেছনে সরে গেল সে।

জিজ্ঞেস করল, 'আজ কি সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসেছিল ?'

'না।'

'তবে ঘন্টি পড়ল যে ?'

'অন্যকেউ এসেছিলো হয়ত।'

'ও হ্যাঁ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা আসে আর খালি আমাদের কাজ বাড়ায়।'

আরও দু'চারটি এই ধরনের কথা হল তাদের মধ্যে। তারপর মাতু গিয়ে বসে পড়ল নিজের জায়গায়। সান্ত্রী পায়চারী করতে লাগল।

আসলে যে দেয়ালটার ধারে ওদের ডিউটি সেটা ছাড়া আরও একটা দেয়াল যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। কোথায়, তা দু'জনের কেউ জানেনা।

মাতু তাকিয়ে আছে সান্ত্রীর খাকি পোষাক আর হাতের বন্দুকটির দিকে।

যে গল্প কেউ বলেনি

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক দেখি আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছেন।

তাঁর সঙ্গে যাব নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে জীবন কাটাবো, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাবে—এসব কল্পনার এখানেই শেষ হবে এমনি করে, তিনি আমাকে ফেলে চলে যাবেন, ভাবতেই আমার কেমন লাগে ; কিন্তু করুণাময়ের অসীম অনুগ্রহ বলতে হবে।

এতক্ষণ যাঁর সঙ্গে ছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়ে অন্য ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'আরে কি ভুলো হয়ে গেছেন আজকাল! আর যাবার বেলায় ভুলে যাচ্ছিলাম।'

তিনি আমাকে হাতে ধরলেন। ভদ্রলোকের নাম-ধাম পরিচয় কিছুই জানি না। কেমন ধরনের লোক তিনি, তা-ও আমার অজ্ঞাত। তবু তাঁর হাতের তালুর নরম পেলবতা থেকে মনে হল কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে তিনি অনভ্যস্ত। লেখা-পড়া জানা লোক নিশ্চয়ই। তা'ছাড়া তাঁর মধ্যে কালচারের ছোঁয়াচ আছে, এ-ও আমি বুঝতে পারলাম।

বুঝলাম তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গি, হাটা-চলা, কথা আর বলবার ধরন থেকে। পরেছেন ধোয়া পায়জামা, পানজাবী, চোখে চশমা। দেখলুম তিনি অমার্জ্জিতভাবে পা ফেলেন না। কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে, ইস্ত্রি করা চালচলন, পলিশকরা হাবভাব। এক মুহূর্তে ভদ্রলোকটিকে আমার বড় ভালো লেগে গেল।

আমার এই ছোট্ট জীবনে বহুতরো মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁদের কেউবা সামান্য লেখাপড়া জানেন, বাংলা ভাষাটা লিখতে পড়তে পারেন মাত্র। চালচলন আর হাবভাবে তাঁরা বড় অমার্জ্জিত। কেমন করে একটা বই ধরতে হয় তা-ও তাদের জানা নেই, কথা বলার আর্ট তো দূরের কথা। হড়বড় করে কথা বললেন, হাসলেন, কিন্তু তার মধ্যেও যে একটা মানুষের পরিচয় মেলে তা' তাদের জানা নেই।

শিক্ষিত, মার্জিত রুচি, ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এঁদের একজনের কথা খালি বারে বারেই আমার মনে পড়ে। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারলে আমি বড় খুশী হতাম। কিন্তু আমার জীবনে তাঁর সাথীত্ব হয়েছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র চার ঘন্টার সখ্য। তা'ও এক ট্রেনে। কিন্তু সেই চার ঘন্টার মধ্যে তিনি আমাকে বুঝতে পেরেছিলেন, আর আমিও বুঝতে পেরেছিলাম তাঁকে। অনেক কথাই তাঁকে আমি বলেছি সেই চার ঘন্টার মধ্যে। কথাগুলি তাঁর এত ভাল লাগছিল যে মনের গোপনতম

ভাবটিও তিনি আমার কাছ থেকে গোপন করতে পারেননি। তার চোখ মুখ তার ভাবময় ব্যঞ্জনা আমাকে মুগ্ধ করছিলো ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম যে কথাগুলি তিনি আমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা' ছিল এই রকম ঃ

"এই পৃথিবীতে জন্মে কত কিছুইত দেখলুম। কিন্তু সব কিছুকে হার মানিয়ে শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি কথাই টিকে থাকে। সে হল, প্রেম। প্রেম মানুষকে মহিয়ান করে, বলীয়ান করে, তার মধ্যে ঘটায় পুষ্প বিকাশের প্রেরণা। সেই প্রেম এসেছে আমারও জীবনে। স্বাগত জীবন, স্বাগত হে আমার নবজন্ম।"

তন্ময় হয়ে তিনি গ্রহণ করছিলেন আমার কথাগুলি। মনে হচ্ছিল আমার কথাগুলি যেন বিদ্ধ করছিল তাঁর মর্মকে। মনে হচ্ছিল সেদিন তিনি আমার কাছ থেকে যা পেলেন তার মূল্য দিতে পারত এমন কিছুই ছিলনা পৃথিবীতে। মানব চরিত্র প্রতিফলনের যে সর্বজন স্বীকৃত ক্ষমতা আমাদের আছে তার বলেই তাঁর প্রতি মুহূর্তের ঘটনা উদ্ভাসিত হচ্ছিল আমার সামনে। মাত্র চার ঘন্টা। চলিষ্ণু পৃথিবীতে হয়ত কিছুই নয় তা। কিন্তু আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল সেই কয় ঘন্টা। তারপর থেকে কোনোদিন তাঁকে ভুলতে পারলাম না আমি। আর যদ্দুর জানি তিনিও আমাকে ভুলতে পারেন নি কোনোদিন। সেদিনের সেই চার ঘন্টার পরিচয় আজও অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর জীবনে।

ভদ্রলোকের নামটি এখনও আমার মনে খোদাই হয়ে আছে। তার সুটকেসের ওপরে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল তাঁর নাম।

আমার নামটা বলি।

আমার নাম মনোয়ারা। নিতান্ত গরিবী হালে আমার জন্ম। দেখতে-শুনতে আমি নাকি সুদৃশ্য।

যাই হোক, বুক পকেট থেকে তিনি একখানি সুদৃশ্য খাতা বার করলেন। তারপর তাতে লিখে রাখলেন আমার প্রথম কথাগুলি।

'এই পৃথিবীতে জন্মে...স্বাগত হে আমার নব জন্ম,' ইত্যাদি।

শুধু যে কথাগুলি লিখেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন, তা নয়। কাজেও লাগিয়েছিলেন সে সব।

আলাউদ্দিন ষ্ট্রীটে এক পরিচিত ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় আলাপ হচ্ছিল। একজন বলছিলেন, 'আরে শুনেছ, আমাদের কাসেম সাহেব তো ডক্টরেট পেয়েছে 'প্রেমের মনস্তত্ব' নামের একখানা বই লিখে।

অন্যজন বললেন, 'কই জানিনেত।'

'আরে এত বড় খবরটা জান না।'

বলতে বলতে টেনে বার করলেন একখানি 'সুদৃশ্য' বই। বইখানা আমার কাছেই ছিল অথচ আমি লক্ষ্য করিনি। প্রথম পাতাটি খুলেই তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন, এই পৃথিবীতে জন্মে...হে আমার নবজন্ম,' ইত্যাদি।

কী আশ্চর্য। এ যে আমার কথা।

কাসেম, কাসেম। এতো সেই ভদ্রলোক। বুঝলাম, তাঁর জীবনে আমার প্রভাব স্থায়ীরূপ পেয়েছে। অথচ মাত্র চার ঘন্টার যোগাযোগ।

বর্তমানে আমি যার সঙ্গে চলেছি, তাঁকে আমি চিনি না। ভদ্রলোক, এইটুকুই মাত্র বলতে পারি। ঐ টুকুই ভরসা। নেহাৎ গোঁয়ার গোবিন্দের পাল্লায় পড়িনি যে কথায় কথায় পিঠে দুটো কিল বসিয়ে দেবে। এমন সব লোকের সঙ্গেও আমাকে জীবন কাটাতে হয়েছে যারা আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেই আনন্দ পেত।

আমি জানি, আপনারা অবাক হচ্ছেন। ভাবছেন, এ আবার কী রকম। হ্যাঁ, আমাদের জীবনটাই এ রকম। কোনো রকম বাছ-বিচার না করেই আমাদের যার তার সঙ্গে যেতে হয়, থাকতে হয়।

কারো কাছে আমরাও সাময়িক আনন্দের খোরাক বই, আর কিছুই নই। দু'চার ঘন্টায় তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তারপর ঠেলে দেন অবহেলা আর অবজ্ঞায়। কারো কারো কাছে আমরা তো গৃহ-স্ত্রী মাত্র। ঘরে কোনো মেয়ে মানুষ থাকলে ঘরের সৌন্দর্য ফোটে, যেমন ফার্নিচার আর কি! এ-ও সেই রকম। আবার কেউ কেউ আমাদের নিয়ে ব্যবসা করেন। একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে আমরা ক্রমাগত বিক্রি হয়ে চলি। মধ্যযুগে যেমন বলা হত Women have no Soul—নারীর আত্মা নেই তেমনি ধারণা লোকে এখনও পোষণ করে। আশ্চর্য ; আমাদের যে একটা পছন্দ আছে, বিচারবুদ্ধি আছে, এ কথা যেন কেউ স্বীকার করতেই চান না। অথচ দেখি এই সব লোকই আবার আত্মার মুক্তি, স্বাধীন চিন্তা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার অধিকার বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়েন, প্রবন্ধ লেখেন, প্রামান্য গ্রন্থ সৃষ্টি করেন। আমার বর্তমানের সাথী ভদ্রলোকটির সঙ্গে রিকশা করলাম।

কোথায় চলেছি জানি না।

ঘন্টাখানেক পরে এসে থামলাম একটা বড় রাস্তার মোড়ে। সেখানে থেকে কয়েকটা গলি পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। চমৎকার, সুদৃশ্য একখানা বাড়ী। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকের।

বেশ আনন্দ হল মনে। নতুন পরিবেশে আমাকে কেমন মানাবে ভেবে অনুভব করলাম অসীম আনন্দ। ভদ্রলোকের সঙ্গে সোজা উঠে গেলাম দোতালায়। দক্ষিণের আলো ঝলমল একটি কামরা। ছোটই বলতে হবে আকারে। মাত্র কয়েকটি চেয়ার, ছোট্ট একখানি টিপয়। দেয়ালের কোণে তিন পেয়ে একটি স্ট্যান্ডের ওপর যত্ন করে রাখা একগুচ্ছ ফুল যাকে আধুনিক সাহিত্যিকরা চন্দ্রমল্লিকার চাইতে ক্রিসনথিমাম বলতেই বেশী ভালোবাসেন।

দেয়ালে তিনটে শেলফ ভর্তি বই। ছোট একটি লিখবার টেবিলে খোলা প্যাড। আমার থাকবার জন্যে ঘর নির্দিষ্ট হল এটিই। যা আশা করেছিলাম তার

চাইতে এ অনেক বেশী। কিন্তু আমাকে সেই ঘরে রেখে ভদ্রলোক যে কোথায় চলে গেলেন, তাঁর আর পাত্তা মিলল না। ভেবেছিলাম খাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়ে দেব অনেক রাত অবধি। কী আনন্দেই না কেটে যাবে মুহূর্তগুলি। এক দৃষ্টে তিনি চেয়ে থাকবেন আমার দিকে। অবশেষে এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি আমাকে বুকে নিয়ে ঢলে পড়বেন নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে। কিন্তু আমার সকল আশা ভরসা ধূলিস্মাৎ করে দিলেন তিনি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল আমার কল্পনার জাল। সে রাত্রে তিনি আর এ ঘরে এলেন না। না এলেন তিনি, না হল আর কারো সঙ্গে পরিচয়। অনিদ্রিত, অবহেলিত সে রাত্রি আমার কাটলো বিনিদ্র।

সেদিন সে ঘরে শুয়ে আমার ফেলে আসা দিনগুলিকে স্মরণ করলাম। তিক্ত মধুর আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। একদিকে যেমন লোকে আমাকে ভালোবেসেছে, আদর করে কাছে টেনে নিয়েছে, তেমনি আমাকে দেখে নাকও সিঁটকেছে অনেকে।

মনে পড়ল প্রথমে যিনি আমাকে গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন এক ষাট বছরের বৃদ্ধ। আমাকে দেখেই তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। চশমার ফাঁক দিয়ে যেন অন্য দিকে তাকাচ্ছেন এমনভাবে রইলেন তিনি। চোখে মুখে তার কামনার উগ্র ছবি জাজ্বল্যমান। তিনিই আমাকে নিলেন।

প্রশ্ন করবেন, আমি কেন গেলাম তাঁর সঙ্গে।

না গিয়ে আমার উপায় ছিল না।

অগত্যা গেলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর সাহচর্য্য আমার একটুও ভাল লাগেনি।

ষাট বছরের বুড়ো, কিন্তু এমন বিকৃতমনা আর চোখে পড়েনি। এক এক সময়ে দেখেছি আমার দিকে চেয়ে আছেন আর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। তার কয়েক ফোঁটা এসে গড়িয়ে পড়তো আমার বুকেও। আমার মসৃণ চকচকে বুক পংকিল হ'য়ে যেতো সেই বৃদ্ধের কুৎসিৎ কামনায়। তার ওখানে ছিলাম মাত্র ছয়টি মাস। তারপরেই তার পরিবার পরিজন এসে পড়লেন। বৃদ্ধের স্ত্রী ছিলেন না। সব চেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স ষোলো কি আঠারো। অবশেষে তার হাতেই পড়তে হল আমাকে। প্রথম প্রথম গোপনে সময় কাটাতে আসতো সে আমার কাছে। আমার দিকে তাকাতেই তার মাথায় রক্ত উঠে যেত। সারা দেহে বইতো উষ্ণ রক্ত প্রবাহ। ছেলেটিকে সেই অবস্থায় দেখতে আমার ভালই লাগতো। সময় সময় আবার দুঃখও হতো মনে। এত ছোট ছেলে। তবু শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গেই বার হতে হলো। সে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে এলো আমাকে। সে বন্ধুর কথা না হয় নাই বা বললাম।

এমনি ধারা বহু লোকের সঙ্গেই থাকতে হয়েছে আমাকে। তাদের সঙ্গে থেকেছি, কথা বলেছি। তাদের মধ্যে জাগিয়েছি অভূতপূর্ব এক চেতনার সাড়া, দিয়েছি অনাস্বাদিতের স্বাদ। তাদের সকলের কথা লিখতে গেলে একটা বিরাট বই

হয়ে যাবে। আমাকে যারা ঘৃণা করে দূরে ঠেলেছেন তাদের কথা না বলাই ভালো। কী হবে তাদের স্মরণ করে।

কিন্তু আজকের এই চাঁদনী রাত, আমি একা। রাত কেটে গেল শুধু স্মৃতির পাতা উলটে।

সকালে চায়ের টেবিলে বসেছি ভদ্রলোকের সামনা-সামনি। সবে আলাপ শুরু হয়েছে। প্রথম কথাগুলি আমার সব সময়েই একই রকম। ভদ্রলোক মেতে গেলেন। প্রায় হা করে গেলার মতই গিলতে লাগলেন আমার কথা। আমিও বুকের পরতের পর পরত আলগা করে দিলাম তাঁর সামনে। কিন্তু বাধা এলো হঠাৎ।

বাইরে থেকে কে যেন কড়া নাড়লেন।

আমার আশ্রয়দাতা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। বন্ধু। বৈঠক ঘরেই তারা আলাপ করতে লাগলেন তারপর। আমার ঘরে আর এলেন না।

আমি শুনতে লাগলাম তাঁদের কথাবার্তা। কথা উঠল সাহিত্য নিয়ে। সব কথা তাঁদের বুঝতে পারলাম না। তবে একটা জিনিষ বুঝলাম। এক ধরনের বই নিয়ে তারা আলোচনা করলেন। বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে এক ধরনের বই যাকে ওরা 'পর্নোগ্রাফি' বলে উল্লেখ করলেন। এবং অনেক গালাগালি দিলেন। একা বসে রইলাম আমি অনাদরে। অবশেষে আগন্তুকের যাবার সময় এলো। আমার আশ্রয়দাতা তাঁকে বিকেলে আসতে বলে গেলেন। আগন্তুক তখন আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বুঝলাম এ বাড়ীতে তাঁর অবাধ গতিবিধি।

তিনি এলেন। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। সেই সঙ্গে আমিও। অশেষ আনন্দে আবিষ্কার করলাম ভদ্রলোক আর কেউ নন তিনি সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে আমি চার ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়েছি। আমার প্রথম কথাগুলি মনে হতেই তিনি মুচকী হেসে আহ্বান করলেন আমাকে। একান্ত অনুগতরমত বেরিয়ে এলাম সেই বাড়ী থেকে।

কাসেম সাহেবের বাড়ীতে এলাম। দেখলাম তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী, কুড়ি-বাইশ বছরের বেশী বয়েস হবেনা তার, দেখতে সুশ্রীই বলতে হবে। আমার সঙ্গে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'এর কথা তোমাকে বহুবার বলেছি। তোমাকে দেখাতে আনলাম। আমার ডক্টরেট পাওয়ার মূলে এর দান বড় কম নয়।'

ভদ্রমহিলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো থাকুক না। দেখব' খন।' তারপর তিনি চলে গেলেন নিজের কাজে।

অবাক হয়ে গেলাম। আমার জীবনে কখনো কাউকেই আমার সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে শুনিনি।

ভাবতে ভাবতে আমাকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করার কারণ বুঝতে পারলাম।

এখন এরা এক সুখী দম্পতি। তাই আমার দিকে বেশী মন দেবারও যেমন দরকার নেই তেমনি মন দিলেও ভীষণ একটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় নেই যার জন্যে অসুস্থ বিকৃতমনাদের মতো লুকোচুরি করতে হবে। সেই থেকে জীবনের দিনগুলি আমার কেটে যেতে লাগল একঘেয়ে ভাবে। কাসেম সাহেবের বাড়ীতেই থাকি। নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় হয়না। আর বাড়ীর কোনো লোকও আমার দিকে নজর দেয়না। আমার আকর্ষণ যেন ফুরিয়ে গেছে। এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবার পর শরীরটা যখন জীর্ণ হয়ে এলো, তখন একদিন আমার ডাক এলো। ব্যাপারটা ঘটেছিলো এই ভাবে ঃ কাসেম সাহেবের চতুর্থ সন্তানের দুধ জাল দেবার জন্য কাগজ না পেয়ে তাঁর স্ত্রী স্বামীর অনুমতি স্বাপেক্ষে আমাকে ধরেই টান মারলেন।

গরম চুলোয় পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলাম আমি। কেবল আমার বহিরাবরণ-টাই পুড়তে লাগল অনেকক্ষণ।

প্রিয় পাঠক এবং পাঠিকা! এতক্ষণে আমাকে নিশ্চয়ই চিনেছেন। আমি একটি বই। যেমন তেমন বই নই, বাজারে আমার হাজার হাজার কাটতি। ঘরে ঘরে গোপনে গোপনে আমার সঙ্গ লাভে ধন্য হচ্ছে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা।

আমি তো পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম। এখানেই আমার জীবন কথা শেষ হবার কথা। তবু বলি, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে এক গল্প দু'বার পড়েন এমন লোক খুব কম ; নইলে অনুরোধ করতাম আমার কাহিনীটা আর একবার পড়ে দেখতে।

আমার নামের কথা বলছেন? ঐ নামের জন্যেইত আমাকে নিয়ে এ লুফালুফি।

যৌবন

'কিরে ফিরোজ এলি ?' বন্ধুকে দেখেই আনিস জিজ্ঞেস করে।

হেসে ফিরোজ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ এলাম।'

গভীর আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দুজনেই। রোজই এমনি হয়। রোজই দেখা হয় দুই বন্ধুতে, অথচ তাদের দেখা হওয়াটা যেন চির নতুন। দেখেই একে অপরকে অভ্যর্থনা জানায় প্রাণখোলা হাসি দিয়ে। শরতের রৌদ্রের মত সে হাসি যেমনি স্নিগ্ধ তেমনি প্রাণবন্ত। শব্দ করে হাসা—সে নয়; নীরবে তাদের হাসির ফোয়ারা, শুধু চোখে আর মুখে খেলে যায় আলোর ঝলকানি। অনেকক্ষণ মেঘের তলায় চাপা থাকতে থাকতে হঠাৎ মেঘ কেটে গেলে পৃথিবী যেমন করে হেসে ওঠে এও তেমনি।

ফিরোজের হাসির জবাবে আজও আনিস হাসলো। বল্লে, 'আয় বসবি চল। দোকানের ভেতরটায় বড্ড শীত করছে। তুই ঐ চেয়ারটা নে, বাইরে রোদে বসা যাক।'

সারা অঞ্চল এখন জনমানবশূন্য। বাজার হয়েছে নতুন, এখনো সব দোকান-পাট বসেনি। যা-ও বা দুয়েকটি বসেছে, বেচা বিক্রি নেই বলে দুপুরটায় দোকানীরা একটুখানি গড়িয়ে নেওয়াটাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত সাব্যস্ত করেছে। সাধারণতঃ এই সময়টাতে বাইরের লোকও বড় কেউ আসেনা। বিকাল হলে পরে কাছের সরকারী কেরানী বস্তির বাড়ীগুলি থেকে নানা রংয়ে শোভাবর্ধন করে মেয়েরা আসে। কাছে পিঠে কোনো পার্ক নেই। তাই খোলা-মেলা, অনেকটা নির্জন, মসৃণ, ধুলো-বালিহীন পরিক্রমণ পথটা পার্কের মত বেড়াবার পক্ষেই বেশী উপযুক্ত। কিন্তু এখনও বেলা দুপুর, সারি সারি দোকান ঘরগুলোর সামনে বাঁধাই রাস্তার ওপর চেয়ার নিয়ে দুজনে বসে পড়ল।

ফিরোজ স্কুলের মাষ্টার। যদিও মাষ্টার বলে পরিচয় করিয়ে না দিলে ছাত্র বলেই ওকে সন্দেহ করবে সবাই। আর ছাত্রতো সে বটেই। অনেক কষ্টে ও পড়াশুনাটা বজায় রেখেছে। দিনে মাষ্টারী, রাতে নৈশ-কলেজে অধ্যয়ন। আনিসও যে বয়সের দিক থেকে একেবারে এমন কিছু বয়স্ক হয়েছে একথা কেউ বলবে না। সেও চাকরীতে ঢুকেছে।

মাষ্টারীর পালা চুকিয়েই ফিরোজ চলে আসে আনিসের কাছে। আসে এরকম রোজই। স্কুলের চাকরী, মেলা ছুটি-ছাটা আছে কর্তব্যের প্রত্যেকটি ফাঁক সে ভরায় তার অকৃত্রিম সুহৃদ আনিসের সাহচর্যে। সব চেয়ে সুবিধে হয়েছে, এই জন্যে যে আনিসেরও নিরুদ্বেগ অবকাশ। দোকানে কাজ করে বটে, কিন্তু আনিস তাকে কাজ না বলে বলে, মাছি মারা। নতুন দোকান, তাও আইসক্রিমের। শীতের মওসুমে কাজ বন্ধ। বাজার বসতে বসতে গরম এসে পড়বে তখন ঘর

পাওয়া যায় কিনা যায় সেইভেবে মালিক ঘরখানা ভাড়া নিয়ে কিছু সাজ সরঞ্জাম সমেত আনিসকে বসিয়ে দিয়েছে। কাজ আর কিছুই না ; গোটা বারোটায় দোকানে আসা, আর সন্ধ্যার পর বন্ধ করে চলে যাওয়া।

মাছি মারার জন্যে ষাট টাকা।

মাঝ থেকে জমে যায় দুই বন্ধুতে।

আজও দুজনে দোকানের সামনেকার প্রশস্ত অলিন্দে শীতের রোদ পোহাতে গেল। আর কিইবা আলাপ। হয়ত একজন বলে ; 'কিরে খুব ভালো হচ্ছে তোর চেহারা। খাওয়া-দাওয়া ভাল হচ্ছে বুঝি আজকাল ?'

'হবেনা ? আসল হল শান্তি। থাকবি আমার মত, দেখবি তোরও ভোল বদলে যাবে। পৃথিবীর কোনো ঝঞ্ঝাটে থাকবি না। কিছু চিন্তা করবি না, কেবল কাজ করবি আর ফুর্তিতে থাকবি।'

অন্যজন হাসে।

কোনোদিন হয়ত আনিস বলে, 'তুই যাই বলিস ভাই পৃথিবীতে টাকাই হচ্ছে সব।'

ফিরোজ জবাবে বলে, 'হুঁ'।

তারা বুঝতে পারে কথাটা তার আদর্শবাদী বন্ধুর মনঃপূত হয়নি। হেসে বলে, 'কথাটা বুঝি মনে ধরল না ?'

'ধরবে না কেন। খুব ধরেছে।'

আলাপ জমেনা। দু'জনেই বুঝতে পারে আলাপ জমাতে হলে অন্য বিষয়ে যাওয়া দরকার।

কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে যেতে হলে অল্পক্ষণের বিরতি দরকার। সেই সময়টুকু ফিরোজ দূর আকাশে মেঘের আনাগোনার অবিশ্রান্ত সমারোহের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর এক সময়ে চোখ ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করে, 'বেতন পেয়েছিস ?'

'না।'

'কবে পাবি ?'

'দশ তারিখ।'

'বড্ড দেরী।'

'হ্যাঁ।'

'বেতন পেলেই এক্জিবিশন দেখতে যাবি, না ?'

'না।'

'না কেন ?'

'পেলেই যাবো না। কারণ, আমার নতুন সার্ট হয়নি। নতুন সার্টটা হলে তবে যাব।'

'না আনিস, একগুঁয়েমী তোর ভাল নয়। নতুন সার্ট পরেই যেতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ আছে।'

গুম খেয়ে বসে থাকে ফিরোজ।

তুই হয়ত রাগ করবি। কিন্তু আমি এই ছেঁড়া সার্টটা পরে কিছুতেই যাব না। হঠাৎ পরিচিত কেউ দেখলে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরোজ মনে ভাবে ওর অবস্থাটা।

হঠাৎ আনিসই আবার কথা বলে, 'একটা সুখবর আছে রে।'

ফিরোজ জানে আনিসের খবরগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কোনো আঁচ করা চলে না। পাখীর বাচ্চা হওয়া থেকে ফুফু আম্মা সর্বশেষে কি বলেছেন, সবকিছুই হতে পারে। অবশ্য ফিরোজের কাছে ওর কোনো লৌকিক মান নেই বলেই এমন হয়। আগ্রহভরে অপেক্ষা করল ফিরোজ আনিস কি বলে শুনবার জন্য।

'খবরটা হচ্ছে এই, নড়ে চড়ে বসতে বসতে আনিস বলে, 'আমার চাদরটা বোধহয় আজকে পাওয়া যাবে।'

লাফিয়ে ওঠার মত খবর নয় কিছু। ফিরোজ শুধু বলে 'ও'।

'এটা বুঝি শোনার মত কিছু নয়?'

'না'।

'কেন নয়?'

তোমার চাদর হয়েছে এ আবার একটা এমন খবর কি হল! তা ছাড়া এযে হবে তা তো তিন মাস ধরেই জনতাম।

আনিস হাসে। ফিরোজ চায় জীবনের সব ক্ষেত্রে বড় কিছু ঘটুক, আর তাই সে বন্ধুর কাছে বর্ণনা করুক। এই যে সে গত তিন মাস ধরে দুপুরের নাস্তাটা একরকম বাদ দিয়ে অতিকষ্ঠে বোনের কাছে টাকা জমিয়েছে, পাক্কা তিন মাস পরে সেই জমানো টাকায় চাদর হতে চলেছে, আর তার ফলে আজ সারাটা দিন গভীর তৃপ্তিতে তার মনটা ভরে আছে, ফিরোজের কাছে এর কোনো দাম নেই। অথচ সে তার গোটা পরিকল্পনাটাই জানে। এ চাদর গায়ে দিয়ে সে শীত পার করবে তারপর ফেব্রুয়ারী আসতে আসতে কেটে একটা পাঞ্জাবী আর একটা সার্ট বানিয়ে ফেলবে। এক ঢিলে দুই পাখী। তাদের বর্তমান অবস্থায় এ ধরণের একটা মৌলিক চিন্তার জন্য ফিরোজ তাকে কোথায় একটু সাধুবাদ দেবে, তা'—না, বড় খবর না হলে তার চলেনা।

আনিস বলে, 'দৃষ্টিটা তোর বড্ড একপেশে ফিরোজ।' বন্ধুর দিকে চোখ পড়তে হেসে ফেলে, বড় কিছু না হলে তোর মন ভরে না, অথচ জীবনের প্রতি ছোট ছোট অংশগুলিতে হরদম যে সব বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটছে, বিরাট ভাবনার জন্ম হচ্ছে, লয় হচ্ছে, সে সব নিয়ে তোর মাথা ব্যথা নেই।

কথাটা শেষ করেই সে আবার বলে, 'কিরে সাহিত্য করে ফেললাম নাকি?'

'খুব উঁচু দরের।'

'বেশ, বেশ' খুশী হয়ে ওঠে আনিস বলে, 'তুই সাহিত্যিক হতে পারিস, কিন্তু জানিস আমিও টাইপ হিসেবে শিল্পী।'

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

প্রতিদিন দুপুরে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর আন্তরিক কথাবার্তায় বাতাসটা পবিত্র হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আন্তরিকতা নাকি কমে এসেছে, কিন্তু ওদের দুজনকে দেখলে এর বিপরীত সত্যই ফুটে ওঠে। ওদের মধ্যে আলাপ হয়না, এমন কিছু নেই। সাহিত্য থেকে শিল্প, শিল্প থেকে দর্শন, দর্শন থেকে জাতীয়তা, আলোচনার প্রজাপতি কোথাও বসেনা, খালি এখানে এক থোক, ওখানে এক 'থোক,' বসতে গিয়ে উঠে আসে। বেশী কথা বলতে হয়না, শব্দ নিয়ে তর্ক হয়না, অন্তর দিয়ে অনুভব করবার শক্তি দুজনেরই আছে।

দুজনে এত মিল, তবু থেকে থেকে মনে হয় কত গরমিল। আনিসের ভালো লাগে রেমার্কের চরিত্রগুলি, ফিরোজের কাছে সেগুলি একঘেয়ে। দুঃখের কাহিনী আনিসের ভালো লাগেনা, এই জন্যে সে শরৎবাবুর—দেবদাস এর প্রতিও বিমুখ, অথচ ফিরোজের ভালো লাগে বেছে বেছে ঠিক ট্রাজেডিগুলিই। আনিসের আদর্শ হল টাকা। উপায় যাই হোকনা কেন। যা কিছু বিত্ত দেয়, তা' কিছু গর্হিত নয়। অথচ ফিরোজের কাছে এ রীতিমত অপরাধ।

প্রেম সম্পর্কেও ওদের দুজনার ধারণার মিল নেই। আনিসের ধারণা, এদিক দিয়ে উন্নতি করতে হলে 'ডমিনেট' করতে শিখতে হবে। ফিরোজ এতে হাসে। ওর মনে হয়, প্রেমের জ্যামিতি নেই ; তাই তার কোনো সাধারণ সূত্র হয় না। এ সব ব্যাপারে ও বোবা।

শীতের দুপুরটা ক্ষণস্থায়ী। রোদের তেজ কমে আসে, বিকালের ছায়া নামে। পিঠের ওপর থেকে রোদ সরে গেলে, দু'জনে আবার দোকান ঘরে এসে বসে।

ফিরোজ বলে, 'চা খাওয়ার দরকার।'

'বেশ ত।'

'পয়সা নেই খাওয়ানা।'

'না, আমারও নেই।'

'তোকে তো দোকানে ধার দেবে। আনালেই পারিস।'

'না এ মাসে আর ধার করবোনা। এমনিতেই যা ধার হয়েছে সেটা শেষ করতে আরো তিন মাস লেগে যাবে।'

'আচ্ছা এটা আমি দিচ্ছি তুই নিয়ে আসতে বল।'

বন্ধু চলে যায় কাছের রেস্তোরার উদ্দেশ্যে। ফিরোজ বসে বসে ভাবে আনিসের কথা। অভাব তার চেয়ে ওর অনেক বেশী।

মাষ্টারীর টাকা ছাড়াও সে অনেক পায় ; অনেক মানে ওর একার তুলনায়। খাওয়া-থাকার জন্যে তাকে এক পয়সা খরচ করতে হয়না। সবটা আয় তার। তবু তার চাহিদা অনেক। আর আনিস ঐ ষাট টাকা দিয়েই নির্বিঘ্নে চলে যায়। অভাব আছে, কিন্তু সে নির্বিকার। চা এলো দুই বন্ধু আবার জমিয়ে বসে।

কাপে চুমুক দিতে দিতে ফিরোজ জিজ্ঞেস করে, 'কিরে তোর বেরিয়ে পড়ার আর ক'বছর ?'

আনিস জবাব দেয়না। ও বুঝতে পারে ফিরোজ তাকে ঠাট্টা করছে। একান্ত আপনজন হিসেবে বন্ধুর কাছে তার কোনো পরিকল্পনাই গোপন নেই। তার ছোট ভাই বোনদের একটু নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েই সে বেরিয়ে পড়বে।

সে বলে চিরন্তন প্রথায় ঘর-সংসার করে বাচ্চা উৎপাদনে মগ্ন হওয়ার তার সখ নেই। তার সখ, সাধ সবকিছু হল বেরিয়ে পড়ায়। বিশ্বকে সে দেখবে, জানবে, জীবনকে উপভোগ করবে।

তার রয়েছে একটা বিশিষ্টতা। সবার মত জীবন-যাপন তাকে সাজবে কেন ? সংসারে টাকা-পয়সা তার চাই, তার বিশিষ্টতার জন্যেই। উপকরণ ও সুযোগ পেলে সে জীবনটাকে একেবারে আলাদা করে রচনা করবে।

'বেরিয়ে পড়তেই হবে এমন কোনো কথা তো আমি তোকে বলিনি। বলেছি ইচ্ছে আছে, তারা বলে, একটা ইচ্ছে। অনেকের মধ্যে একটা। তেমন অবস্থা করে নিতে পারলে, ঘরে বসেই বেরুনোর আনন্দ পাওয়া যায়।'

সে অবস্থা কখনও আসবেনা। তার জন্যে দরকার, হাতের মধ্যম আর বুড়ো আঙ্গুল উলটে দেখায় ফিরোজ।

'টাকা। টাকা তো করা যায়ই, এবং করবোই।'

'তাই নাকি ?' একটু ব্যঙ্গ করার লোভ সামলাতে পারেনা ফিরোজ।

'হ্যাঁ। যে কোন রকমে, যে কোনো ভাবে, উপায় বা পথ সম্পর্কে কোনো বিচার না রেখে।'

প্রতি আক্রমনে কাবু হয়ে পড়ে ফিরোজ। বুঝতে পারেনা এবার কোন পথে এগুবে।

চুপ করে থাকে দু'জনই কিছুক্ষণ।

তুই দেখিস ফিরোজ। প্রথম সুযোগ ব্যবহার করতে আমি কখনও ছাড়বোনা। খালি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি, একটা সুযোগের।'

ফিরোজ ওকে ডরায়। ভারী একগুঁয়ে সে। একবার ভাবলে হয়ত সে তা করেও ফেলবে। সে জানে পৃথিবীতে টাকা পয়সার মূল্য সম্পর্কে আনিসের মতামতগুলি কত সত্যি। কিন্তু বিত্ত সঞ্চয় সম্পর্কে ওর দর্শন ফিরোজের মতামতের ঘোর বিরোধী। প্রচুর বিত্তের অধিকারী হতে সে চায় না। ও বলে এমনিই হাতে আমার দশটি টাকা থাকলে, সেটা খরচ না হওয়া অবধি আমার ঘুম হয়না। তার চেয়ে আমার প্রফেসারীই ভালো। অল্প টাকা, কোনোমতে চলে যাবে। আজীবন লেখাপড়া আর শিল্প নিয়ে কাটিয়ে দেব। আনিস হয়ত জবাব দেয়, 'প্রণয়ের রাজ্যে প্রফেসারের বাজারদর কিন্তু সেলস্‌ম্যানের চেয়ে কম।'

ফিরোজ আহত হয়। হতে পারে আজকের সমাজে টাকাটাই বড়। কিন্তু এ আনিসের বেশী বাড়াবাড়ি। আর তা' ছাড়া সে তো আর অনিন্দ্য সুন্দরী কোনো মালবিকা কুসুমিকা ছন্দকে লাভ করতে যাচ্ছেনা, আর চাচ্ছেনা কোনো মুক্তা ঝরা শাহেরজাদীকে। শ্যামাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী কোনো কৃষ্ণ কলি তার জুটবেই।

নিজে আঘাত পায় জেনেও সে বন্ধুকে আঘাত দিতে ছাড়ে না বলে, দেখ চুরি ডাকাতীর জন্যেও একটা যোগ্যতার দরকার। দুঃখের বিষয়, তোর সে শিক্ষাও নেই।' আনিস হেসে বলে ; আছে কি নেই সেটাতো ভবিষ্যৎ প্রমান করবে। না থাকলে হল না। তবে ইচ্ছেটা আমায় তাই—সেটাই বড় কথা।'

'কিন্তু সমাজ তো আছে ?'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় কি একটা বগলদাবা করে ওর ভাই এসে হাজির।

তোমার আলোয়ান বড় ভাই ; মোড়কটা সে এগিয়ে দেয়।

মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ে একখানা সুদৃশ্য আলোয়ান। বেশীদামের কাপড় নয়, তবু ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে সিল্কের মত। কাপড়টা আনিস ফিরোজের দিকে এগিয়ে দেয়।

'দেখ কেমন হল ?'

কাপড় নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে ফিরোজ। মনে মনে ভাবে, বুদ্ধি আছে ওর। বাকী শীতটা এ দিয়েই কাটানো যাবে। তারপর জামা হয়ে এটা গায়ে চড়বে। দুটি সুদৃশ্য জামা হবে আনিসের। এসব সাংসারিক দিক দিয়ে ওর চাইতে অন্ততঃ আনিস কত ওস্তাদ। নিজেকে তার এক মুহূর্তে অসহায় মনে হয়। কাপড় দিয়ে ভাইটা চলে গেলে আনিস আলোয়ানটা কোলের উপর রেখে বলে, 'চল সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার দোকান বাঁধতে হবে। যেতে যেতে তোর কথার জবাব দেব।'

দু'জনেই ওঠে। ভারী খিলটা লাগাবার সময় একে অপরকে সাহায্য করে। পথে নেমে আনিস বলে, 'সমাজের ভাবনা আমাকে করলে চলবে কেন ? টাকা থাকলে সমাজের মধ্যে সব সময়েই আমার সিংহাসন। তখন দেখিস আমিও একজন সম্মানিত ব্যক্তি।'

'কিন্তু লোকে ত নিজেদের মধ্যে চোর ছাড়া আর কিছুই বলবে না।'

'অব্যক্ত নিন্দারে নাহি করি ভয়'—রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে আনিস। লোকে কি বলবে, তার পরোয়া করিনা। আমি বাঁচলেই হল। পরের জন্য কেঁদে মরা সে আমার নয়।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে পথ চলে। কেউ কারোদিকে তাকায় না।

দু'জনেই হয়তো মনে মনে শর সন্ধানে ব্যস্ত।

কার্জন হল পেরিয়ে হাইকোর্ট এসে পড়ল। তবু কারো মুখে কোনো কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপথের দু'ধারে ম্লান দীপালোকে ছায়াচর প্রাণীর মত দেখাচ্ছে তাদের।

সেক্রেটারিয়েট পেরিয়ে গেল দুজন।

নির্জন হয়ে এসেছে রাস্তাটা ঈতিমধ্যেই। কেবল থেকে থেকে দু'একটি বাসের গর্জন, যাত্রীদের ওঠা-নামা, রিক্সার ঘণ্টাধ্বনিই নিরুদ্বিগ্ন পথিকের পথ-চলার বিঘ্ন ঘটায়।

তারপর দূরে বিশাল প্রমোদ ভবনটির আলোকোজ্জ্বল মূর্তি দৃষ্টির সামনে জ্বলে ওঠে।

মাঠের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে, কনকনে।

আনিস ওর গায়ের চাদরটা আরো ভাল করে জড়িয়ে নেয়। শীতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক মনে করে অজান্তে বেরিয়ে আসে পরিতৃপ্তি-ব্যঞ্জক একটা শব্দ।

অন্যমনস্কভাবে পাশ কাটিয়ে চলে তারা দু'জনেই। হঠাৎ কানে এলো মেয়েলী গলার বিলাপ। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল গাছতলায় বসে আছে একটি মেয়ে। বয়স ছাব্বিস-সাতাশ হবে। সামনে প্রায় খালি গায়ে একটি শিশু। শীতে কাঁপছে মেয়েটি। ছেলেটি কাঁদছে। একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে আবার হাটতে শুরু করল তারা।

ফিরোজ বলে, 'দেখ কি সাংঘাতিক! এই শীতে ছেলেটা খালি গায়ে।'

আনিস বলল, 'হ্যাঁ'।

চলে যাচ্ছিল তারা। পাশ দিয়ে দুটো সায়েব যাচ্ছিল রিকশায় করে। রিলিফ দিতে এসেছে বিদেশ থেকে। খালি প্রান্তরে মেয়েছেলের ডাকশুনেই বোধ হয় রিকশা থেকে তারা নামল।

সাহেব দুটো মেয়েটার দিকেই এগিয়ে গেল। ফিরোজ আর আনিস দু'জনেই পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

আনিস বললে, 'চল দেখাই যাক, ব্যাপারখানা কি।'

ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেল আধো-হিন্দুস্থানীতে একটা সায়েব জিজ্ঞেস করছে মেয়েটিকে, 'হয়েছে কি?'

'কি চাও?' বললে অন্যজন।

মেয়েটি কোনো জবাব দিতে পারে না। চীৎকার থেমে গেছে তার দু'টো জলজ্যান্ত সায়েব থেকে। কাঁদছে শুধু ছেলেটি।

সায়েব দুটি আবার জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি নিরুত্তর।

আনিসরা একটু এগোয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারেও ওরা দেখতে পায় মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে, চেয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

অন্ধকারেও তারা ধরতে পারল সে দৃষ্টির অর্থ ; এরা কি চায় বুঝতে পারছি না, তোমরা একটা কিছু বল।

আনিস এগিয়ে এসে বলে : 'চলে যেতে বলব এদের?'

লম্বা সায়েবটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটি কাঁদছে কেন? কি চায় সে?'

'নাথিং' হাতের একটা ভঙ্গি করে সে বোঝায়, কিছুই না।

সাহেব দুটো বুঝল না। তারা এসেছিলো সাহায্য করতে। দুর্বোধ্য ইংরেজীতে কি বলাবলি করে, ‘কি পয়সা চাও ?’ মেয়েটি জবাব দেয়না। আঙুল দিয়ে কেবল দেখিয়ে দিল ছেলেটার দিকে। শীতে কাঁদছে ছেলেটা।

‘এমন কিছু পেলনা ছেলেটাকে ঢেকে নেবার ? এ শীতে ছেলেটাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে লোক ডাকছে ?’

হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা।

ফিরোজ বললে, ‘চল’।

আনিস তবু দাঁড়াল। গায়ের চাদরখানা খুলে সজোরে মেয়েটার গায়ে ছুঁড়ে দিল সে। বললে, ‘নাও।’

তারপর চুপচাপ অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল তারা। একেবারে নির্ব্বাক থাকল দুজনেই। একসময় ফস্ করে ফিরোজ জিজ্ঞসা করলে, ‘চাদরটা দিয়ে দিলি যে বড় আফসোস করবি না পরে ?’

করবো তো রোজই। কিন্তু সেই মুহূর্তে দুটো বিদেশী সৈনিক আর মেয়েটাকে দেখে আমার মনে হলো আমার চাদরের দরকার নেই, গায়ের গরমেই অনেকদিন চলতে পারবো।’

চালচুলো

ভোর বেলায় হিমেল বাতাস জানালার কাছের পেপে গাছটার পাতা কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকতেই সকিনা বিবির ঘুম ভেঙে গেল। দূরের কোন মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের শেষ কথাগুলো কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেলেও তার অনুরণন জেগে রইল মিষ্টি গানের রেশের মত।

সকিনা বিবির মনে পড়ল, আজকের ঘর-খরচের পয়সা নেই। ধড়মড় করে তিনি উঠে পড়লেন।

সকাল বেলায় ঘুম ভেঙেই হাতে পয়সা না থাকার উপলব্ধি আজ তার নতুন নয়। এ তার বহুবার হয়েছে। এবং সব সময়েই তিনি দ্রুত শয্যাত্যাগ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এমন অবস্থায় দেরী করে বিছানা ছাড়া অপরাধের।

সকিনা বিবি উঠলেন।

ছেলেটার চাকরী-বাকরি নেই। এমনিতেই চারদিকে হাত টান, তার উপর বাড়ীতে কাল মেহমান ছিল। যে দুটি টাকা হাতে ছিল তা'ও নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই উপলক্ষে। পাড়া-প্রতিবেশী কারো কাছ থেকে ধার পাবার সম্ভাবনা একেবারে কম।

সকিনা বিবি কলতলায় গেলেন মুখ ধুতে। কিন্তু মুখ ধুতেও পারলেন না, বদনার উপর হাত রেখে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। পয়সা না হলে আজকের নাস্তা খরচ, বাজার খরচ কোত্থেকে আসবে ভেবে তার দুশ্চিন্তার শেষ থাকলো না।

সোমবার না আজ? হ্যাঁ, তাইতো। আজ না সোমবার!

এমনি হাতখালি পড়েছিল গেল সোমবারে। সেদিন কি করেছিলেন তিনি? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল তার।

যেন একটা উপায় হয়েছে এই ভাবে উঠে গিয়ে চুলো লেপতে বসলেন। সেই সোমবারেও টাকা ছিল না। সকালে উঠে চুলো লেপতে লেপতে ভাবছিলেন দিনটার কী হবে! হঠাৎ পেয়ে গেছিলেন টাকার হদিশ।

তাঁর মন বললো আজও চুলো লেপতে বসো।

চুলোর পাশে বসে কাদা মাখালেন। সুন্দর মসৃণ হয়ে এলো কাদার ধারগুলো। যে দু'একটা যায়গায় মাটি পড়ে গিয়েছিলো তা ভরাট করে দিলেন তিনি। চুলো লেপাটাও একটা কাজ।

কিন্তু এগুলো নিয়ে আরাম আছে কোনো?

এর মুখটা বড্ড বড়। তাঁর নিজের হাতের চুলো হলে এরকম হতোনা। পাশের বাড়ীর ফরিদাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে করানো চুলো। আগের বাসা

থাকতে নিজে করেছেলেন একটা, সে চুলো এখনও চেয়ে দেখার মত। মন মেজাজ ভালো থাকলে এখানেও ঐ রকম একটা চুলো করে নেবেন সকিনা বিবি। কিন্তু একি ভাবনা তাঁর? সকালের মুড়ি কেনার পয়সা নেই ঘরে আর তাঁর মনে চুলোর ভাবনা।

সকিনা বিবি ভাবতে লাগলেন, মুদী ধার দেবে কিনা! আগের দিনই সে জানিয়ে দিয়েছে বকেয়া শোধ না করলে সে আর ধারে দেবেনা। আজকে আবার তার কাছে ধারে জিনিস চাওয়া অসম্ভব।

ভাবতে ভাবতে সকিনা বিবির মুখে অজানা কারণে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল।

তিনি জানেন, বদনা নিয়ে কুয়োর ধারে বসে থাকলে কখনোই মুদীর কথা তাঁর মনে হত না।

আগের দিনেও চুলো লেপতে গিয়েই তার টাকার কথা মনে পড়েছিলো।

আজও যখন মুদীর কথাই মনে পড়েছে, ছোট মেয়েটাকে পাঠিয়েই দেখা যাকনা কেন! মেয়েটাকে শিখিয়ে দিলেন, বলবি কয়দিন পরে সব দিয়ে দেব।

মেয়েটা চলে গেলে সকিনা বিবির মন আশা নিরাশার দোলায় দুলতে লাগল। মুদী ধারে দেবে কি দেবে না, চুলো লেপার কথাটা ঠিক কি বেঠিক!

কিন্তু ঠিক। চুলো লেপার কথাটা ঠিক।

আধ ঘন্টার মধ্যেই মেয়েটা এক রাশ জিনিস নিয়ে এলো। ডাল, নুন, তেল, পেয়াজ, হলুদ, মরিচ, আর এক হালি ডিম পর্যন্ত।

ছেলেটার ততক্ষণে ঘুম ভেঙেছে। গতরাতে মেহমান বিদেয় হতে অনেক রাত হয়েছিল।

ছেলেটা ঘুম ভেঙে অপেক্ষা করল একরাশ গাল শোনার। দেরী করে ঘুম ভাঙলে এ তার প্রাত্যহিক বরাদ্দ। প্রাতঃরাশের মতই অনেকটা। কাজ-বাজ নেই কিছু। ঘরে এক পয়সা আয়ের ব্যবস্থা নেই। তবু ছেলের নয়টা পার করে বিছানা ছাড়া চাই। সকিনা বিবিকে চা করে তবে ছেলের ঘুম ভাঙাতে হবে। কেন? ওর মতো ছেলেরা বাপ হচ্ছে না!' আর ও কাজ জোগাড় করতে পারলে না আজও একটা।

আজ কিন্তু সকিনা বিবি একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দিনটা আজ ভালো যাবে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি তো পড়বেই। খোকা তোর কাছে পয়সা-টয়সা আছে? থাকলে দেনা এক পোয়া গোশ এনে খিচুড়ী রাঁধি।'

কোথায় বকুনি, তা না একেবারে খিচুড়ির লোভ।

ছেলে বুঝতে পারলে না, ব্যতিক্রমটা কিসের জন্যে। শুধু এইটু বুঝল যে কিছু একটা হয়েছে।

খোকা বললে, 'পয়সা-টয়সা নেই অমার কাছে। আপনার কাছে থাকলে দেন, এনে দিই।'

আমার কাছে আর থাকবে কোথেকে। কাল তো খরচ হয়ে গেছে সবই।'

তারপর হঠাৎ গেলেন, 'আচ্ছা দাড়াতো দেখি আমার পাশ বইটা। এর মধ্যে তো আমি মাঝে মাঝে এক আধটা টাকা রেখে দিতাম।' আবার একটুখানি হাসলেন তিনি।

হাসতে হাসতে বললেন, 'জানিস আজ সকালে উঠেই আমি চুলো লেপেছি।' বলে আবার হাসলেন।

মায়ের এমন আনন্দের যুক্তি সহ কারণ খুঁজে না পেয়ে খোকাও হাসল। মনে মনে ভাবলো মার যে কখন কী হয় তার কিছুই বোঝা যায় না। এই ভালো তো এই রেগে কাঁই। ঘন্টাখানিক পরেই আবার সব ঠিকঠাক যেন কিস্সুটি হয়নি।

পাশ বইয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই দুটো একটা টাকা পাওয়া যাবে। একবার না দুবার সেখানে টাকা রাখার কথা তাঁর এখনও মনে আছে।

যেদিন একখানা দশ টাকার নোট ভাঙিয়েছিলেন সেদিন এক টাকা। তারপর আরো একদিন যেন একটা টাকা রাখা হয়েছিলো। কবে তা মনে পড়েনা। টাকাটা যখন আছেই, মনটা প্রসন্ন হবার পথে তা হলে আর কোনো বাধা নেই।

সকিনা বিবি বসলেন।

'সেই শুক্কুর বার খিচুড়ী হয়েছিল না? মাস খানেক তো হোল। বৃষ্টি বাদলার দিন না হলে খিচুড়ীটা চলে না। তুই তো খিচুড়ী খুব খেতে চাস। তা' চাকরী-বাকরি একটা জোটা, তারপর দেখিস কেমন খিচুড়ী হয়। ঘি-টি না হলে কি ওসব করা যায়!'

মায়ের প্রসন্নতা খোকার মেজাজ খোস করে দেয়।

'হ্যাঁ, চাকরীর চেষ্টা তো করছি, পেয়ে গেলে হয়। দরখাস্ত করেছি অনেক জায়গায়। দুয়েক জায়গায় হবে বলে কথাও দিয়েছে। দেখা যাক কি হয়।'

'হ্যাঁ, চাকরী-বাকরির চেষ্টা করলে কি না হয়ে পারে। গতকাল আমিও স্বপ্নে দেখেছি তোর একটা কিছু হবে। সংসারে কত কিছুর দরকার। টাকা না হলে তার একটাও হয়?'

আমি কিন্তু দোকানে কাল ভারী সুন্দর একটা টেবিল দেখে এসেছি। প্রথম মাসের মাইনে পেলে এটা কিনে আনব।'

মা বললেন, 'শুধু টেবিল কেন, তোর তো একটা ভালো জামা-কাপড়ও নেই। দু'একটা প্যান্ট সার্ট আগেই করিয়ে নিবি। সেদিন একটা ছেলে পরে যাচ্ছিল, ভারী সুন্দর ছিট্টা। টাকা থাকলে সেদিনই ও রকম কাপড় একটা করিয়ে দিতাম তোকে।'

সকিনা বিবি উঠলেন।

'দাঁড়া টাকা বার করি। গিয়ে গোশ্‌তে নিয়ে আয়।'

পাঁচ মিনিট পরেই পাশের ঘর থেকে সকিনা বিবির চীৎকার শোনা গেল, 'খোকা, খোকা, আমার পাশ বই ?'

তার গভীর উদ্বেগভরা আওয়াজ শুনেই খোকার প্রাণটা আঁতকে উঠল। 'পাশ বইয়ের কি হল আবার।'

'আমার পাশ বই, পাশ বই। পাশ বইটা যে পাচ্ছিনা', বলতে বলতে এ ঘরে চলে এলেন তিনি।

'আমার পাশ বইটা পাওয়া যাচ্ছেনা। কী সর্বনাশ, ও খোকা কি হবে। ও মা কি হবে বলনা।'

'কোথায় যাবে ভাল করে খুজে দেখনা।'

'গতবার টাকা তুলে পাশ বইটা তুই আর আমাকে দিসনি।'

'দিয়েছি। আপনিই কোথায় রেখেছেন মনে পড়ছে না।'

'না তুই এনে দিসনি।'

বাকসো খুলে হাতে করে টাকা কটা তিনি নিয়ে এলেন। 'এই দেখ পাশ বই দেবার সময়ে টাকা কটা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। পাশ বই তুই আমাকে ফিরিয়ে দিসনি। আমার পাশ বই কি করলি ? নিয়ে আয় আমার পাশ বই। খেলার কথা নাকি ? একটা গোটা পাশ বই হারিয়ে যাবে ?'

'দেখেন আরো ভালো করে খুঁজে দেখেন।'

'দেখতে হবে না। নিয়ে আয় তুই আমার পাশ বই। তা না হলে মুশকিল হবে বলে দিচ্ছি।'

পাশের ঘরে বিনির খেলনা পুতুলগুলি সকিনা বিবি টান মেরে ফেলে দিলেন, দিনরাত খালি খেলা আর খেলা। তোর ভাই একটা এদিকে কাজ করে না, কর্ম্ম করে না, খালি দিনরাত বসে বসে গেল্‌বোর রাজা। এদিকে আমার পাশ বইটা কাকে দিয়ে এসেছে। আয়ের বেলায় নেই, ব্যয়ের মুনশী। যা শিগগীর যা এখান থেকে। এই খোকা ! আমার পাশ বই বার কর।'

তারপর চলল বহুক্ষণ ধরে বকাবকির পালা। খিচুড়ী প্রসঙ্গে অবস্থানটা যতখানি হালকা হয়ে এসেছিলো, গম্ভীর হয়ে গেল তার চেয়ে বেশী। খোকা উঠে এসে মায়ের বাকসো ঘাটতে লাগল।

চুপ চাপ খুঁজছিল সে।

'ওখানে খুঁজে কি হবে, ওখানে কি আর আছে ? ফেলে এসেছিস কোথায়, নিজেরই মনে নেই তোর। এখন বাক্‌সো খুঁজলে পাওয়া যাবে ? সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন কি করা যায় তাই দেখ। আজই গিয়ে তুই তোর ভেদাদাকে ডেকে নিয়ে আয়। তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি যা করার করি।'

খোকা বাক্‌সো ছেড়ে উঠে আসছিলো, হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল কোরান শরীফ রাখার তাকের দিকে। অবশেষে পাশ বইটা সেখানেই পাওয়া গেল।

সকিনা বিবি বললেন, 'তোরই ত কাজ! আমি কখনও ওখানে কিছু রাখিনা।'

খোকা বললে, 'আপনি ত রেখেছেন!' এবারে তার রাগার পালা। বললে, 'নিজে যেখানে সেখানে রাখবেন আর মানুষকে ধরে গালাগাল দেবেন। যান, আমি আর তুলবনা আপনার টাকা।

আমাকে আর দেবেন না।'

'শোনো ছেলের কথা।'

সকিনা বিবি একবার হেসে বললেন, 'তুই না তুললে তুলবে কে! আমার আর একটা বাপ আছে নাকি যে ব্যাংকে গিয়ে টাকা এনে দেবে!' খোকা বলল, 'হুম্‌'।

সকিনা বিবি টাকা কটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'যা বাবা, একটু তাড়াতাড়ি যা। ভাল দেখে রাতের গোশ্‌ত নিয়ে আসবি।'

ঠেলে ঠুলে খোকাকে বাজারে পাঠান হল। ও চলে গেলে সকিনা বিবি হাসলেন কী যে তাঁর হয়েছে আজকাল। মনে থাকেনা কিছুই।

মাংস এল। সঙ্গে এলো খোকার এক বন্ধু। মাকে বলল, 'আমার বন্ধুকে আজ খাওয়াতে হবে।'

'বেশত, খাবে।'

থোকা থোকা রানের গোশ্‌ত দেখে সকিনা বিবির মনটা আবার প্রসন্ন হয়ে উঠেছে।

'তোরা বসে বসে গল্প কর। আমি ততক্ষণে রেঁধে নিই।' দুই বন্ধুতে গল্প জমে।

সম্প্রতি দেখা একখানি ইংরাজী ছবির সমালোচনা দিয়ে শুরু। শেষে সব কিছুই ওদের আলোচনার আঁওতায় এসে যায়। মাঝে মাঝে তর্ক লাগে।

'অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই মানতে পারিনা।'

'যুক্তি থাকলে মানবিনা কেন?'

অন্য জনও টেবিল চাপড়ে বলল, 'কখখোনো নয়।'

ও পাশ থেকে সকিনা বিবির গলা শোনা যায়। 'এই তোরা কি মারামারি করবি নাকি? বসে বসে গল্প করবি তা না এত হৈ-চৈ কেন? একটু আস্তে আস্তে কথা বল না বাপু!'

রান্না হতে কিছুক্ষণ লাগলো।

খোকা জিজ্ঞেস করে, ‘কই মা রান্নার আর কতো দেরী।’ ‘দেরী নেই। এই ত হয়ে এল। আর একটুখানি সবুর কর।’ ওদের হাত-মুখ ধুতে সেই একটুখানি সময় কেটে গেল।

সকিনা বিবি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

রিনিকে বললেন, ‘যাও ডেকচি নামিয়ে নিয়ে এসো।’

বিছানা পাতলেন, মা নিজে। ছেলে আর ছেলের বন্ধুকে ডেকে বসালেন। এমন সময় পাশের ঘর থেকে রিনির চীৎকার।

‘কী হল ? কী হল ?’

সকিনা বিবি গিয়ে দেখলেন, এক ডেকচী গোশ্‌ত মাটিতে পড়ে রয়েছে। রিনি হতভম্বের মত অদূরে দণ্ডায়মান।

‘হায় হায় সব দিয়েছে বরবাদ করে। সব গেল। আমি আর পারিনা বাপু। তোরা যা করবার করগে যা।’ সকিনা বিবি গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

অগত্যা খোকাকেই উপায় করতে হল। সুরুয়াহীন মাংশটা আর একটু মশলা ইত্যাদিয়ে আবার চড়াল সে। রাঁধা গোশ্‌ত, হতে দেরী লাগলোনা।

সালনটা নামিয়ে মাকে গিয়ে ডাকল।

‘মা ওঠো সালন রেঁধেছি।’

ব্যাপার দেখে সকিনা বিবি খুশী হয়ে উঠলেন।

বললেন, ‘ভালোই করেছিস ঘরে একটা বাইরের ছেলে নিয়ে এসেছিস। আমার তো খেয়ালই ছিল না।’

নিজের হাতেই পরিবেশন করলেন তিনি। দিতে গিয়ে বললেন, ‘সোয়াদ-টোয়াদ কি আছে ? সবই তো গেছে মাটিতে।’

কিন্তু তবু খাওয়াটা ভালই হলো। খেয়ে দেয়ে যখন সবাই বসলো, দেখা গেল সবাই পরিতৃপ্ত। । পেটভরে খাওয়ার পর মনটা হয়ে উঠেছে দিল দরিয়া। ও বেলার ভাবনা মনে কারো বিন্দুমাত্র নেই।

সকীনা বিবি ভেবে অবাক হলেন।

সকাল থেকে হচ্ছে তো একই ব্যাপার !

মুদী ধার দেবে না, তা-ও দিয়ে দিলে। টাকা নেই তবু এসে গেল টাকা, পাশ বইটা হারাতে হারাতে আবার পাওয়া গেল।

সালনটা পড়ে গিয়েও খাওয়া হল।

সকালে উঠে চুলো লেপার কী মহিমা !

ছেলেটা

ভেতরে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে মরছে মা। বেদনা শুরু হয়েছে আগের দিন সন্ধ্যা থেকে। এখনও প্রসব হয়নি।

বাইরে আট বৎসরের ছেলেটা থেকে থেকেই কেঁদে উঠছে, মার কাছে যাবে। পুরুষদের সবার মুখ গম্ভীর। তবু থেকে থেকে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করতে ভোলে না কেউই।

কী যে হবে তা' কেউ জানে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে কিনা তার চেয়ে পোয়াতি বাঁচবে কিনা তাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'আহা, কী ভোগটাই না ভুগছে! আল্লা, আল্লা। এমন মুসিবত দুশমনেরও যেন না হয়। বাচ্চা ত নয় শয়তান ঢুকেছে পেটে।'

বুড়ো আজমলি উঠানে বসে মাথা নাড়ে। বললে, 'হয় হয়। যারা নেক বখত, আল্লার পেয়ারের বান্দা এমনি কষ্টই তাদের ভুগতে হয়।' আর থামানো যায় না ছেলেটার কান্না। দৌড়ে ছুটে যায় সে ঝাঁপবন্ধ ঘরটার দিকে যেখানে থেকে মায়ের যন্ত্রণা করুণ আর্তক্রন্দন ভেসে আসছে। উঠানে বসে থাকা বয়স্ক লোকের সংখ্যা মাত্র দুইজন। অন্যেরা সব খবরের জন্য সময় কাটাচ্ছে বাইরের দেউড়ির সামনে।

'আরে ধর ধর ছেলেটাকে। যায় যে!'

ছেলেটি প্রসূতি ঘরে প্রায় ঢুকেই পড়েছিল অমা অমা করতে করতে। ভেতর থেকে এক বর্ষীয়সী মহিলা মুখ বার করে তাকে আটকে দিলে, আরে অ শয়তানের ছা, আসিস কোথায়। একটা ভেতর থেকে জ্বালায়, আর একটা বাইরে থেকে। যা যা এখান থেকে। তোর মা এখন আজরাইলের সঙ্গে লড়াই করছে।'

দরজার ভেতরে মুখটা একবার অদৃশ্য হয়েই আবার বেরিয়ে আসে।

বলি তোমরা বসে রয়েছ কি করতে। আরে অ মবিন, ধরনা বাপু তোর ভাইটাকে।' বোনের অসুখ বলে কয়দিন আগে মবিনের মা মবিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাজের ছেলে, মাছ ধরা আর বাঁশ কাটার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে মেলা যায়গায়। সে-ই এসে ধরলে খালাতে ভাইকে। 'চ' 'চ' এখান থেকে। চল আমরা সোনাদিয়া যাই।' সোনাদিয়ার কথা শুনে ছেলেটা চোখ তুলে তাকায়।

দু'রাত আগে মবিন ওকে সোনাদিয়ার গল্প বলেছিল। বঙ্গোপসাগরের কূলে ছোট্ট মাছধরার দ্বীপ সোনাদিয়া। মাছের সেখানে ছড়াছড়ি। তাজা, শুকনো, নোনা, সব রকম মছের বাজার। কিন্তু ছেলেটার কাছে মবিন সোনাদিয়াকে তুলে ধরেছিল এমন একটা দেশ হিসাবে যেখানে আকাশের চন্দ্র সূর্য তো বটেই, মানুষের

হাত-পা, চোখ-কান, কড়ে আঙুল বুড়ো আঙুল সবই পাওয়া যায়। ওখানে সব পাওয়া যায় ?'

'সব' মুবিন জবাব দিয়েছিলে।

সোনাদিয়ার কথা শুনে ছেলেটা চোখ তুলে তাকাল মাত্র। তার পরেই আবার কাঁদতে শুরু করে দিল।

'মার কছে যাবো, আমি মার কাছে যাব।'

'মা কোথায়। মা বুঝি এখানে আছে? মা তো গেছে সোনাদিয়ায়। চল যাই।'

ছেলেটার বিশ্বাস হয়না। ওর বিহ্বল, জলে ভেজা বড় বড় চোখ তুলে সে খালি তাকায় পোয়াতির ঘরের দিকে। আর বলে, 'সোনাদিয়া যাব না, মার কাছে যাব। সোনাদিয়া যাব না, মার কাছে যাব।' মুবিন শেষে কোলে করে বেরিয়ে যায়। ওকে সে অনেক জায়গায় ঘোরাল, অনেক করে বোঝালো। কিন্তু অনেক স্তোত বাক্য, অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও দিগ্বীজয়-অভিলাষী সম্রাটের মতো সে আপন প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকল।

বহুক্ষণ পরে ছেলেটাকে সঙ্গে করে মুবিন যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল লোকজন বেড়েছে। উঠানের উপর আগে কোনো বাইরের লোক ছিলনা, এখন সেখানে বাইরের লোকই বেশী। আগে যেখানে ছিল উৎকণ্ঠা, এখন সেখানে স্বস্তি। কি করতে হবে এখন তা সবার কাছেই পরিষ্কার।

'কাফনের কাপড় কিনতে পাঠানো হয়েছে ?'

'হ্যাঁ। হাজী সাহেবের বড় ছেলে গঞ্জে গেছে।'

এতক্ষণ ছেলেটা আটকে ছিল মুবিনের শক্ত হাতের মুঠোয়। তার হাতের মুঠো কখন যে আলগা হয়ে গেল সে টেরই পেলনা।

ছেলেটাও যেন হকচকিয়ে গেছে। এই কিছুক্ষণ আগেও সে ছিল সকলের মনযোগের লক্ষ্য। এখন কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে। প্রাণভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল মুবিনের দিকে। কিন্তু কোনো সাড়াই মিলল না। এমনকি মুবিন চেয়েও দেখল না। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে শেষে পা-য়ে পা-য়ে উঠে গেল দাওয়ায়। এখন আর সেখানে যেতে মানা নেই তার। সেই মহিলা এবারে তাকে ডাকল, 'আয় আয়। এখানে আয়। কাকে দেখবি!' আর দেখবি কাকে? সে কি আর আছে?'

পা' থেকে মাথা অবধি ঢেকে দেওয়া চাদরখানি আলগা করে মায়ের মুখখানি দেখান হল তাকে।

গত চব্বিশ ঘন্টায় মানুষটার চেহারার যা পরিবর্তন হয়েছে, বিশ বৎসরেই তা ঘটা সম্ভব। যন্ত্রণায় দীর্ণ, বিবর্ণ, মৃত। ছেলেটা কাছে ভিড়ল না। কেবল দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে!

যথা সময়ে দাফন হয়ে গেল মৃতার। ছেলেটাও সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু একটুও কাঁদেনি।

কাউকে তার হাতও ধরতে হয়নি। নিজে থেকে হেঁটে গিয়েছে, ফিরে এসেছে। ফিরে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে। উঠে এঘর ওঘর খুঁজল অনেক। তারপর হঠাৎ মবিনের কাছে এসে কান্না জুড়ে দিলে, সোনাদিয়া যাব।

সবাই তাকে অনেক বোঝালো, সোনাদিয়া অনেক দূর। সেখানে রাক্ষস। ছোট ছেলেদের ধরে খেয়ে ফেলে। কিন্তু কিছুতেই তাকে মানানো যায় না। সে খালি বলে সোনাদিয়া যাব।

শেষ সংবাদ

খবরের নেশায় ওকে পেয়ে বসেছে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই তার প্রথম মনে পড়ে খবর জোগাড় করার কথা। মুখ ধুতে গিয়ে দাঁতে ব্রাশ চালায় আর ভাবে, কোথায় গেলে খবর পাই। মুখ হাত ধুয়ে নেবার পর সুশ্রী বউটা যখন চায়ের কাপ আর ভাজা মুড়ির পিরিচ নিয়ে ঘরে ঢোকে, তখনও সে থাকে খবরের খেয়ালে মশগুল। অথচ রফিক এরকম ছিলনা।

কলেজে পড়ার সময়ে যখন হস্টেলে থাকতো, তখন বন্ধুরা বলতো, ওকে দিয়ে বড় কাজ কোনোদিন হবে না। এত উড়ু উড়ু মন হলে কি চলে। কোনো একটা বিষয়ে এক মিনিটের বেশী সে ভাবতে পারেনা, তা সে যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হোক। বন্ধুরা বলতো তার ধাতটাই এমন যে, একটা কাজে লেগে থাকা তাকে দিয়ে কোনোদিন হবেনা। পাশ করে চাকরীর খোঁজে যায়গায় বে-জায়গায় ধর্ণা দিয়েছে, দু' এক জায়গায় করেছেও চাকরী। সওদাগরী আপিসে কেরাণী হবার সময়ে মালিক বলেছিল, কাজ তোমাকে আমি দিচ্ছি। কিন্তু টিকতে পারবে তো? অবাক হয়ে গিয়েছিল রফিক। মানুষের চেহারাতেও কি তাহলে চরিত্রের ছাপ থাকে? রফিক হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করেছিল, কেন এ কথা বলছেন, বলুন তো? জবাবে একটুখানি হেঁসে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আচ্ছা করতো আগে কাজ।' তারপর তিনদিন যেতেই রফিক শুনতে পেল তার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, বড্ড চঞ্চল। তিনমাস টিকে ছিলো রফিক সে যায়গায়। তারপর থেকেই তিনমাস, দুমাস, বড়জোর চারমাসের বেশী এক নাগাড়ে কোথাও থাকেনি। অনেক যায়গায় কাজ পেয়েছে, কাজ করেছে, শেষে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে। সব ঘাটের জল খেয়ে শেষে এসে ঢুকেছে খবরের কাগজের আপিসে। আর কি আশ্চর্য্য। এই খানেই সে কাজ করছে আজ দু'বছর। নিজেই অবাক হয়ে যায় রফিক। কি করে রইল সে এতদিন। নাঃ, খবরের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। এ থেকে তার রেহাই নেই। পেশার চাইতেও বড় নেশা। পেশায় অরুচি ধরে, পেশা মানুষ ছেড়ে দেয়। কিন্তু নেশাতে অরুচি নেই, নেশা মানুষ ছাড়তে পারেনা। আর তাই তো শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও রফিক আজও বিশ্ববার্তার রিপোর্টার। সামান্য রিপোর্টার তবু রফিকের মনে হয়, কী অসামান্য কৌলিন্য লুকিয়ে রয়েছে এই সুন্দর কথাটার মধ্যে। লোকে যখন জিজ্ঞেস করে কি করেন, রফিক বেশ 'ডাটসে,' উত্তর দেয়, খবরের কাগজের রিপোর্টার। আর শুধু কল্পনায় অনুভব করাই নয়, কাজেও তার প্রচুর আনন্দ। কোথাও একটা মিটিং হবে, রফিক আগে থাকতে হাজির। জনসভার এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখে আর প্যান্টে গোঁজা হাত দু'টো তার আপনিই মুঠো হয়ে আসে,

মুখের মাংশপেশীতে শক্ত হয়ে ওঠে অসাধারণ এক আত্ম সম্মানবোধ। রিপোর্টারদের টেবিলে বসে নামকরা জননেতার বক্তৃতা শুনতে শুনতে কাগজের উপর পেন্সিল চালায় আর থেকে থেকে একটুখানি মুচ্‌কী হাসে। ভাবখানা এই, কাল দেখবে কেমন রিপোর্টার আমি। বক্তৃতা শেষ হলে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। এক্ষুণি ছুট্‌তে হবে তাকে বিশ্ব-বার্তা অফিসে। গিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি খবরটার সব ব্যবস্থা করবে, দামী খবর হলে জেনে নেবে কোন্ জায়গায় যাচ্ছে, কি হরফ ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপর বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। পথ চলতে চলতে একবার ভেবে নেয় আগামীকাল কোথাও সভা-সমিতি আছে কিনা।

আর এইভাবেই কেটেছে রফিকের দুই-দুইটা বছর।

সাংবাদিকতার পেশাগত কৌলিন্য নিয়ে স্ত্রী সেলিনাকে দু'ঘন্টা বক্তৃতা করতে সে ছাড়েনা। বলে, দেখ সারা দুনিয়ার মানুষ যে খবরটা কাল জানবে, আমরা সাংবাদিকরা সেটা জানতে পাই একদিন আগে। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে তার খবর এসে ভিড় করছে আমাদের টেবিলে। দুর্নিবার গতিতে যেন বলছে, হে সাংবাদিক আমাদের মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।

স্তব্ধ মুখ, গর্বোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সেলিনা চেয়ে থাকে রফিকের দিকে। সেলিনা একদিন বলছিল, আচ্ছা আমাদের বাবুর জন্মের ঘটনাটা তো খবরের কাগজে ছেপে দিতে পারতে। রফিক হাসে ; বলে, 'তাও কি হয় ?'—'কেন হয় না, সব তো তোমাদেরই হাতে। তোমরা যা ছাপবে তাই তো ছাপা হবে।' খটকা লাগে রফিকের। সত্যিই কি তাদের ইচ্ছামত খবর ছাপা হয় ? নিজের পুত্র লাভের ঘটনাটা না হয় নাই রইল কোনো 'নিউজ ভ্যালু', ? তবু সব খবর কি ইচ্ছামত ছাপাতে পারা যায়। কিন্তু বউ এর কথারও একটা জবাব দিতে হয়। সে বলে, 'তোমার বাচ্চা হয়েছে—তাই কি আর একটা খবর হল। এমন কত সেলিনার কত বাচ্চা হচ্ছে। তবু বিয়েতে যদি দু'পার বদলে চার পা ওয়ালা বাচ্চা একটা, তবে সে হতো একটা খবর।'

সেলিনা গুম খেয়ে যায়। দু'পা ওয়ালা বাচ্চা হলে কারো খবর হয়না, চার পা ওয়ালা হলে হয়, এ কেমন কথা।

আসল কথা ঘটনাটা এমন হওয়া চাই যা লোকে জানতে চাইবে।

সেলিনা ভাবে রফিক তাকে ঠকাচ্ছে। সেও খবরের কাগজ পড়েছে।

'ফলনা সাহেব অমুক সাহেবের ভোজে গিয়েছেন' শুধু এই মর্মে খবরও সে দেখেছে ; এবং দেখেছে রফিকের কাগজেই।

আসল কথা, ঘটনাটা বড় কিছু হওয়া চাই। অন্তত বড়লোকের। হয়ত তাই। সেলিনার বিশ্বাস হয়। কত ছোট সেলিনার জগৎটা। চার পাশের হাঁড়ি-বাসন, শাড়ীর আলনার সীমানা ছাড়ার সাধ্য নাই। ওর জীবনটা এক

অলিখিত পাসপোর্ট প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথচ রফিকের দুনিয়ার যেন সীমা নাই। কত কি সে ভাবে। তার মুখের দিকে চেয়ে টের পাওয়া যায়, কত বড় কিছুর ভাবনা অহরহ ঘুরছে তার মনে। কত বড় তার জানার পরিধি।

এরি মধ্যে একদিন রফিক জানতে পারে, আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর জোগাড় করতে পারে সে। খবরটা সম্পর্কে একটুখানি আঁচ পেয়েই উল্লসিত হয়ে ওঠে রফিকের মন। এইখানেই কোপ দিতে হবে। যদি সফল হয়, তবে বিরাট 'নিউজ'—খবর হিসেবে অতুলনীয়। সেদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল রফিক।

সেলিনার প্রশ্নের উত্তরে তাকে দিলে রহস্যময় একটুকরো হাসি। বলল, 'দুনিয়ার মানুষ যে খবর জানবে চব্বিশ ঘন্টা পরে, আর জেনে অবাক হয়ে যাবে, সে খবর আমি পেতে যাচ্ছি চব্বিশ ঘন্টা আগে।'

'কি খবর ? কি খবর ? কি খবর ? বল না।'

আসি তো আগে।' কায়দা করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে তর তর করে। জনৈক বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে দেখা বলল সে। খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন করল অনেক। জানাল খবর। রফিকের আনন্দ আর ধরেনা। বড় বড় চাঁইরা এবার জালে পড়বে। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায় গুটাতে হবে কারো কারো। তাদের মধ্যে রয়েছেন অমুক। এই অমুকের সংগে আবার ক্ষমতার লড়াই 'বিশ্ব বার্তা'র মালিকের—তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন। তা ছাড়াও এ তার নিজের কত বড় একটা সাকসেস। কত সূত্রের সন্ধান করেছে সে কতদিন ধরে। এমন নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য সে পেলই বা কোথায় ? আর এই কষ্টকর অপেক্ষার পর এতদিনে সে পেয়েছে সকল রহস্যের সন্ধান। জীবনে সে অনেকদিন পরে ট্যাকসী ডাকল।

টেক্সীতে চড়ার পর ভাবলে এ তার বেহিসাবীপনা। চুনোপুটি এক সাংবাদিক। বউ-এর একটা ভাল গয়না করে দেবার নাই মুরোদ, তার আবার ট্যাক্সি চড়া। খবরের কাগজের চাকরী'টা যদি আজ চলে যায়, তবে কাল কোথায় দাঁড়াবে, তার নেই কিছু। তারপর আবার মনে হয় আজকের সাফল্যের কথা। করলই বা একটু বেশী খরচ। আজকের এমন দিন তো তার সাংবাদিক জীবনে কমই এসেছে।

'বিশ্ববার্তা' আপিসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। আপিসের সামনে বড় রেস্টুরেন্টটা। পেট ভরে নাশতা করল সে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আপিসে গিয়ে ঢুকলো।

বার্তা সম্পাদকের কামরায় ঢুকল প্রশান্ত একগাল হাসি নিয়ে।

'কি হে, কি খবর ?'

'খবর জাঁদরেল।'

খবরটার সারাংশ বার্তা সম্পাদককে জানিয়ে সে নিউজ সেকশনের টেবিলে গিয়ে বসল। টেনে নিল নিউজ প্রিন্টের প্যাডটা। তার কলম চলল তর তর বেগে। আপনিই মনের মধ্যে চলতি ছবির একটা সুর ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে সংযত করে সে লিখে চলে দিনের যোগাড় করা সংবাদ।

লেখার কাজ শেষ হতে হতে রাত শেষ হয়ে যায়। একটানা খাটুনিতে মেরুদণ্ডের ব্যাথা জাগে।

সেদিন যখন ঘরে ফিরল রফিক, সেলিনা আদর করে অভ্যর্থনা করে ঘরে নেবার জন্য ওর গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল। রফিকের তখন এক গা জ্বর।

—'ওমা, কি সর্বনাশ। গা যে পুড়ে যাচ্ছে।'

তবু রফিক হাসে। বলে, 'ও কিছু না। পরিশ্রমের জ্বর। একটা ঘুম দিলে সকালেই সেরে যাবে।'

শুয়ে শুয়ে সে সেলিনাকে বলতে যাচ্ছিল তার দিনের অভিজ্ঞতার কথা। বলতে যাচ্ছিল আগামীকাল তার কাগজের প্রধান খবরটি। চাঞ্চল্য জাগানো সে খবর। কিন্তু সেলিনা শুনলো না। বললো, কালকের খবর কালই জানব। এখন তোমাকে বক্ বক্ করতে হবে না। ঘুমাও তো।

ভোরে হকার খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। রোজকার অভ্যাসমত সেলিনা কাগজগুলো ওর বিছানার কাছে টিপয়ের ওপর রেখে দেয়। রফিকের কাগজটা ঐ সাত আটটা দৈনিকের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে পড়ে তবে চুলো ধরাতে যাবে, এ সেলিনার ভালো লাগলো না। রুগ্ন স্বামীর স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থাই তার কাছে মনে হল সবার বড়।

চুলো জ্বালিয়ে গরম পানি, দুধ গরম করে শেষে রফিককে হাত-মুখ ধোয়ালো সে। এককাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই রফিক বললো, 'বিশ্ববার্তাটা খুঁজে দাও তো।'

সেলিনা টিপয়ের ওপরকার সর্বপ্রথম কাগজখানা রফিকের হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'বিশ্ববার্তা দেয়নি দেখছি।' রফিক দৃষ্টি দিল কাগজে। দৈনিক "আওয়াজ"। প্রথম সংবাদটির দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে সে। তার মনে হল, রুগ্ন দেহটা শয্যা থেকে গড়িয়ে পড়বে। সেলিনাকে বলল, যাক আর খুঁজতে হবে না। খবরটা সে আবার পড়ল।

শেষ সংবাদ

৩রা মে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, গতকল্য সন্ধ্যার পরে 'রোজ হোটেলে' উদয় প্রকাশ লিঃ-এর সভা হয়। শ্রী দৌলতরাম কাপাসিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার এক সিদ্ধান্ত অনুসারে কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত সকল সংবাদ-পত্রের প্রকাশ অদ্য হইতে বন্ধ থাকিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্য হইতে দৈনিক 'বিশ্ববার্তা' প্রকাশিত হইবে না। গতকল্য রাত্রি দেড় ঘটিকায় সভা শেষ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়।

ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

- দুষ্টু ছেলে
- বাবা
- সমান ভাগ
- ছেলে ধরা
- বুদ্ধি যদি থাকে
- বন্ধু
- ছবি দেখতে গিয়ে
- ওরা আছে
- ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

হেড মাস্টার মাখনবাবু এমনিতেই রাগী লোক, তার উপর গোরার এই নতুন কীর্তির কথা শুনে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন।

মিষ্টিওয়ালা লোকটা হাত জোড় করে জানতে চাইল 'হুজুর, স্কুল মে এহী শিকখা দেতে হ্যায় আপ লোক ?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল হেড-মাস্টারের মুখ। ...ব্যাপার হয়েছে এই।

মিষ্টিওয়ালা লোকটা রোজ স্কুলের সামনে দিয়ে একটা ছোট-খাট গাছ কাঁদে নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে চলে যেত, গাছটা আর কিছুর নয়, পাতা থেকে ফল পর্যন্ত তার সবই মিষ্টি জিনিসে তৈরী, আম, জাম, লিচু সবই ফল আছে এক গাছে, এক একটা ভাঙ্গো আর বেচো। ফলের এক স্বাদ, পাতার আরেক স্বাদ। ছেলেরা দু'পয়সায় পাতা আর এক আনার ফল নিতেই বেশী পছন্দ করতো। গোরার সঙ্গে এই ফল কিনতে গিয়েই একদিন ঝগড়া হয়ে গেল কী নিয়ে, গোরা তাকে শাসিয়ে দিল 'আচ্ছা মজা দেখাব।'

মিষ্টিওয়ালাও রেগে বলেছিল, "যাও, যাও বহুত্ দেখা হ্যায় টোমার মত লেড়কা।"

তারপরেই এই কাণ্ড।

পরেরদিন মিষ্টিওয়ালাকে যেতে দেখে গোরা ছাত থেকে এক ঢিলে ওর সমস্ত আম, জাম ঝরিয়ে দিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো মিষ্টিওয়ালা হেড মাস্টারের কাছে গিয়ে হাজির।

"হুজুর আপ লোক স্কুল মে লড়কা লোগকো এহী শিকখা দেতে হ্যায় ?"

যে কোন হেড-মাস্টারের পক্ষে এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে। মিস্টিওয়ালার কথার একমাত্র উত্তর দিলেন তিনি গোরাকে ডেকে পাঠিয়ে।

নির্ভয়ে এসে দাঁড়াল গোরা।

"এসব সত্যি ?"

গোরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"বল, এসব সত্যি" গর্জন করে উঠলেন হেড-মাস্টার,

"সত্যি।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে মাখন বাবু দেয়াল থেকে চক্‌চকে বেতটা তুলে নিলেন, পাগলের মত দু'হাতে বেত চালালেন তিনি, ভয়ে মিষ্টিওয়ালাও কোন্ সময় হেড-মাস্টারের কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টেরই পেলেন না তিনি, অনেকক্ষণ পরে যখন তার সম্বিৎ ফিরে এল, দেখলেন গোরার হাতে মুখে সব জায়গায় তার বেতের লম্বা দাগগুলো ফেটে গিয়ে তা থেকে রক্ত পড়ছে।

গোরাকে বললেন, "যাও, বেরিয়ে যাও, আমার কামরা থেকে।" ছেলেরা সবাই আগে থেকেই ব্যাপারটা জেনেছিল, মাঠের উপর দাঁড়িয়েছিল তারা গোরাব ভাগ্যে আজ কি ঘটে তা দেখবার জন্যে, আগাগোড়া বেতে লাল গোরাকে বেরুতে দেখে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

"কিরে এতে হবে তো?" উঁচু ক্লাশের এক ভাল ছাত্র ওকে কটুক্তি করতে ছাড়ল না।

কেউ কেউ সমবেদনা প্রকাশ করল, "এত মার খাস, তবু কেন এসব করিস বল তো?"

মাস্টারেরাও একই রকম মন্তব্য করলেন,

স্কুলের সব কথাকে উপেক্ষা করে গোরা শুধু অনমনীয় ভাবে পাশ কাটিয়ে যায়।

ওর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু রফিক গোরাকে বলল, "দেখ এখন তোর ধরন ধারণগুলো বদলে ফেল। এরকম আর কতদিন করবি।"

চোখ দুটো বড় বড় করে, সারা শরীরে এক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গোরা বলল, "রোজ যতদিন এই স্কুলে আছি।"

সত্যি গোরার দুষ্টামী-স্বভাব একটুও কমল না। নিত্য নূতন দুষ্টামীর খবর আসতে লাগল হেড-মাস্টারের কাছে আর ক্লাশ টিচারদের কাছে, হেড-মাস্টার সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন সময় মতো অভিভাবককে অনুরোধ করবেন, ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে, ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষকই গোরাকে বকতে বকতে হদ্দ হয়ে গেলেন।

বকলেন না কেবল বাংলার শিক্ষক অশোকবাবু। গোরার শত দুষ্টামী সত্ত্বেও কোনোদিন তিনি একটুকুও গাল দেননি তাকে, ক্লাশে পড়া না পারলেও কোন দিন তাকে কিছু বলেন নি। বকেন না তিনি কোন ছেলেকেই, কেবল থুতনিটা নেড়ে জিজ্ঞসা করেন, পড়া পারিস না কেন বলতো?

ক্লাশের সব ছেলেই ভালবাসতো তাঁকে, বিশেষ করে গোরাও তাঁকে খুবই ভালবাসতো।

অশোকবাবু বলতেন, ছেলেরা দুষ্ট হবে না তো কারা হবে? তবে ওটা ভাল করে করতে জানা চাই। কিছু কিছু দুষ্টামী আছে যা খুবই চমৎকার জিনিস এবং প্রত্যেক ছেলেরই সে সব অভ্যাস করা উচিত।

তারপর তিনি এক একটা করে দুষ্টামীর ফিরিস্তি দিয়ে যেতেন, আর সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়তো, নিজের ছোট বেলার গল্পও তিনি বলতেন অনেক, তারপরই ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন তারা কে কি দুষ্টামী করেছে, বিশেষ করে গোরা তাঁকে অনেকগুলিই গল্প বলেছে।

গোরার সব চাইতে নতুন দুষ্টামী মিষ্টিওয়ালাকে নিয়ে। সে গল্পও তিনি শুনেছেন। কিন্তু গোরাকে তিনি এ নিয়ে কিছুই বললেন না। কেবল একদিন

ক্লাসে গিয়ে বললেন, দুষ্টামী জিনিষটাই ভারী মজার। কিন্তু মজা তো অনেক কিছু নিয়ে হতে পারে, অপরকে কষ্ট দিয়ে যারা মজা পায় আসলে তারা মজার কিছুই বুঝে না। যা কিছু কর এমন ভাবে কর যাতে নিজেও আনন্দ পাও, অপরেও খুশী হয়। তুমি একা দুষ্টামী করে মজা করবে, আর অন্য একজন তার ফলে কষ্ট পাবে, সত্যিকার দুষ্টামীর নামই এ নয়।

গোরা সবই শুনল, শুনে চুপ করে রইল, ক্লাসের সবাই বুঝল আসলে কথাটা কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। ক্লাসের পর একজন গোরার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কি রে গোরা, কেমন লাগল ?

গোরা জবাবে বললো না কিছুই।

কিছুদিন পরের ঘটনা।

বাংলা ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পড়াচ্ছেন অশোকবাবু, পড়াতে লাগলে তার আর কিছুই মনে থাকে না। বলতে বলতে তন্ময় হয়ে যান তিনি। আজও পড়াতে পড়াতে আরেক রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। সমস্ত ছাত্র নিঃশব্দে শুনছে।

হেডমাস্টার বারান্দা দিয়ে কখন যে হেঁটে যাচ্ছিলেন কেউ টের পায়নি। ক্লাসরুমের দু'নম্বর দুয়ারের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পেছনের দিক থেকে ক্লাসে ঢুকে গোরাকে ডেকে আনলেন অশোকবাবুর সামনে। বললেন, নিন আপনার ছাত্র মাঞ্জা পাকাচ্ছিল, বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন আর একটিও কথা না বলে। অশোকবাবুর মুখটা লাল হয়ে উঠল। সমস্ত ক্লাস দেখল, গোরার হাতে সুতো আর একটা আস্ত লাটাই।

অশোকবাবু সেদিন আর পড়ালেন না। বইটা বন্ধ করে মনিটারের হাতে দিয়ে গোরার কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন। বললেন তার চেয়ে আমার পিঠে একটা জুতো বসিয়ে দিতে পারলি নে তুই, আর কোন কথা বলতে পারলেন না। চুপচাপ ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনিও।

পরের দিন ক্লাস বসেছে, যথারীতি অশোকবাবু পড়াচ্ছেন। আজ গোরার দিকে একবার তাকায় নি। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় গোরা উঠে দাঁড়ায়।

গোরা কাছে যেতে অশোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন "কি ? বলো।"

সমস্ত ক্লাস বিস্মিত হয়ে দেখল—গোরা কাঁদছে।

অশোকবাবু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন গোরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল "আমি আর দুষ্টামী করবো না স্যার, আমি ভালো হবো স্যার, আমি ভালো হবো।"

অশোকবাবু তাকে দু'হাতে বুকে চেপে বললেন, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা তুমি যন সত্যিকারের দুষ্টু ছেলে হতে পার।

বাবা

লাইটহাউসে কি যেন একটা ছবি চলছিল। শামিমের ভালো লাগছিল না কিছুই। আতাহার আসবে, অথচ এখনো পয়সাই যোগাড় করা হয়ে ওঠেনি। আবার ছবিটা না দেখলেও নয়। আজকেই আবার শেষ দিন।

বাবা অফিসে গেছেন সেই সকালে ন'টায় তাড়াতাড়ি ভাতও খেয়ে যায়নি। আসতে আসতে সেই রাত ন'টা। বাবা আসেন বডড দেরী করে। শামিমও এতে খুশী। বাবা বাড়ী থাকলে দুপুর বেলা ঘর থেকে বেরোনো যায় না। বাবা আসতে আসতে কাছে কোন ছবিঘর থেকে অনায়াসে ছবি দেখে ফেরা যায়।

মা'কে শামিমের ভয় নেই। মা ওর পাড়াগায়ের ইংরাজি না-জানা মেয়েমানুষ। অনায়াসে ফাঁকি দেওয়া যায়। ইংরাজি বুলি একটা যোগ করে উত্তর দিলেই মা চুপ করেন। কোন কোন দিন হয়ত একটু এগোন। বলেন—'এতশত ইংরাজি-ফিংরাজি বুঝি না বাপু। বাংলায় বল।'

—'তুমি বুঝবে না মা'—এক কথায় কাজ হয়ে যায়।

কিন্তু যত গোলমাল ওই বাবাকে নিয়ে, ফাঁকি দেওয়া তার কাছে চলে না। অফিস-ফেরতা বাবা তাকে না দেখলে আর রক্ষা নেই। বাবা বকেনও না, মারেনও না। অথচ কেন বাবার চোখের সামনে দাঁড়াতে শামিমের ভয় করে। মনে মনে এ বিষয়ে শামিম চিন্তাও করে দেখেছে। ওর মনটা এত খারাপ আর দোষ করতে করতে ওর আত্মাটা এত ছোট হয়ে গেছে যে, বাবার সামনে সেই অন্তর নিয়ে দাঁড়াতে সত্যিই ভয় করে।

লুকিয়ে সিনেমা দেখা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। অবশ্য এতে যে তেমন কোন জঘন্য অন্যায় হয় তাও নয়। কিন্তু শামিমের মনে এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, সে খুব অন্যায় কাজ করে চলেছে। অথচ ছবি না দেখলে শামিমের চলে না।

একটা বাংলা গল্পের বইয়ের কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই বাইরে থেকে ডাক এলো।

হ্যাঁ, আতাহারই, কিন্তু পয়সা ?—মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো।

—'কিরে হবে যাওয়া ?' আতাহার শুধালো।

—'না ভাই পয়সা পেলাম না'—মুখ কালো করে বললো শামিম।

—'তা হলে যাওয়া হবে না ?'

—'কি আর করা যায় তাছাড়া'—হতাশায় দু'জনেই বসে পড়লো।

'—সত্যিই ভাই, বড় ছেলে হওয়ার ল্যাটা যে কি তা বুঝবি না। দিব্যি আছিস পাঁচটা ভাইয়ের উপরে। এই দেখ না, বাবা তো অফিস ছুটলেন। এবার আমাকে সামলাতে হয় যত ঠেলা, বাজার কর, রেশন আনো কয়লা যোগাড়

কর। বাবা বলে গেছেন, 'কন্ট্রোল', থেকে কাপড় আনতে হবে। রেশন আনতে হবে।'—শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেললো, দু'জনেই চুপচাপ কারো মুখে কথা নেই।

—'যদি হতুম রাশিয়ায়।' দুঃখ করে শামিম বললো : 'তা না হয়ে হলাম কিনা এই পচা ভারতবর্ষে। বিনে পয়সায় দেখতে পেতাম বায়স্কোপ, থিয়েটার, পড়া-শুনা কোরতাম, খেলতাম, বেশ হতো ? শামিম ঠোঁট ওল্টালো।

তার সাথে যোগ করলো আতাহার, 'আর বাবাগুলোও যা একখানা। জন্মেছিলোত সেই রাম রাবনের আগে। এ যুগের ছেলেগুলো যে কি, কি তারা চায়—সে সবের খোঁজ নেওয়া তারা দরকারই মনে করেন না। রাতদিন খালি পড়ো। কোন বাবাকে জিজ্ঞেস করো,—ওয়াল্ট ডিজনি কে ? হাঁ করে থাকবেন। হেমেন রায় কে ?—জিজ্ঞেস করো, পারবেন না। এমন রাগ ধরে। ইচ্ছে হয় যাই চলে... ।'

—'শামু ও শামু।' মা ডাকলেন, 'রেশনটা নিয়ে আয়। এতক্ষণে দোকান খুলেছে। যা শীগগীর।'

—'কোথাও যাওয়ার কথা আপাততঃ তুলে রেখে রেশন নিয়ে এসো।'

অদ্ভূত একটা ভঙ্গি করে শামিম উঠল।

আচ্ছা একটুখানি বোস, এখুনি আসছি।

রেশনের থলি হাতে বেরিয়ে এলো শামিম।

—'চল না ভাই একটুখানি।' শামিম ডাকলো।

—'চল আপত্তি নেই।' আতাহার উঠলো।

দু'জনে রেশনের দোকানে এসে পৌঁছালো। অল্প কয়েকজন লোক। লাইনে দাঁড়িয়ে শামু মেমো কাটাতে যাবে, এমন সময় আতাহার খপ্ করে শামিমের হাত চেপে ধরলো, 'দি আইডিয়া ?'

—'কি বল্ ?'—বিস্মিত শামিম জিজ্ঞেস করলো।

—'তোরা চা'ল কত পাস রে ?'

—'কেন ?'

—'বল না ?'

—তিরিশ সের পাই। কিন্তু কেন বলতো ?

—এক কাজ কর।—আতাহার ফিসফিস করে বললো, 'চাল চার সের কম নিবি।'

—তারপর ? শামিম শুধালো।

—তারপর মেমোটাকে রবার ঘসে তুলে ফেলে তিরিশ সের করে দিবি, বাড়িতে ত আর মেপে দেখবে না, ব্যস, চার সেরের দাম প্লাস কুলি চার আনা এক টাকা চৌদ্দ আনা। দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট। রেশনগুলি দু'জনে নিয়ে যাব।

—কিন্তু, শামিম আম্তা আম্তা করলো।

—'কিন্তু কিন্তু আর নয়। দেখবার ইচ্ছে থাকে চল্। মনে রাখিস আজকেই আবার লাস্ট ডে।'

অগত্যা শামিম রাজি হয়ে গেলো। বললো, 'তাই কর।'

রেশনগুলি দু'জনে কাঁধে করে নিয়ে এলো বাড়ি', রেশনগুলো রেখে পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল গলিয়ে শামিম যখন আতাহারের সাথে ট্রামে চেপে বসলো, তখন দু'জনেই হাঁফ ছাড়লো। দু'জনেরি বেশ খানিকটা আনন্দ হলো। সাথে সাথে ভয়ও হলো পাছে আবার টিকিট না মেলে।

—টিকিট পাওয়া যাবেতরে ?—শামিম শুধায়।

—'এত কাণ্ডের পর টিকিট পাওয়া না যদি যায়, তবে সে আমাদের বরাতের দোষ। কি বলিস ?' আতাহার তাকালো শামিমের দিকে, তা ছবিটা চলছেও বেশ কদিন। পাওয়া যাবে বোধ হয়।'

'পেলেই হয়।'

লাইট হউসে যখন ওরা এসে পড়লো তখন শো শুরু হতে কয়েক মিনিট দেরি। যা ভেবেছিলো ওরা তাই হলো। টিকিট শেষ।'

বরাত ওদের ভালো বলতে হবে। টিকিট মিলে গেল দারোয়ানের কাছে। তবে ডবল দাম। তা হোক ক্ষতি নাই, ছবি দেখা চাই।

ছবিটা খুবই ভালো। দেখতে দেখতে ওরা তন্ময় হয়ে গেলো। দু'জনেরি মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়ায়, ভাবতে ভাবতে ওরা ভুলে গেলো, ওরা দু'জন মাছি-মারা করাণীর সন্তান। বাপ তাদের ভাত খেয়ে অফিসে যাওয়ার সময় পান না। রেশনের পয়সা মেরে তাদের ছবি দেখতে হয়। কল্পনার যাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বহু দূরে চলে গেলো। ছবিও এক সময় শেষ হ'লো।

হল থেকে বেরিয়ে দু'জনে আবার ট্রাম ধরলো। অসম্ভব ভীড়। বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে যেতে এক সময় ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। চাকুরেরা সব ফিরছে। সকলের মুখে একটি ক্লান্তির চাপ।

শামিমের রাগ হয় লোকগুলো দুনিয়ার এত কাজ থাকতে কেরাণীগিরি ক'রে কি যে আরাম পায়। শামিম বড় হলে বিজনেস করবে। গড়ে তুলবে বিরাট শিল্প। টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানি হবে, হেনরি ফোর্ড হবে—এইতো শামিমের স্বপ্ন,—ট্রামের ভেতর এইসব দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে পাশের ভদ্র লোকের জুতোর চাপে একসময় হাঁউ মাউ কোরে উঠলো,—'পা সরান মশাই', শামিম কাঁদো কাঁদো গলায় বললো।

'সরাবার জায়গা কি আর রেখেছে হে।' ভদ্রলোক দেঁতো হাসি হেসে পা তুলে নিলেন। লেডিজ সীট থেকে দু'জন লেডিজ উঠে যেতেই দু'জন বসে পড়লো তাতে।

ট্রাম এসে দাঁড়ালো নামবার জায়গায়। নেমে হাসতে শুরু করলো দু'জনে।

'আরে কন্ট্রোলের কাপড়ের কথা তো ভুলে গিয়েছি।' শামিমের মনে পড়লো।

ততক্ষণে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ ট্রামটি ছেড়েছে। আজকাল সন্ধ্যে হতেই ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়।

মোড়ের কাছে এসে আতাহার বিদায় নিলো 'আচ্ছা আসি।'

'আচ্ছা।'—শামিম বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগলো। বাবা আজ কি বলেন আল্লাহ জানেন। ভয়ে ভয়ে শামিম ঘরে ঢুকে পড়লো। দেখল—না বাবা এখনো ফেরেন নি।

আপা মা'র সাথে রান্না ঘরের কাজে ব্যস্ত। শামিম পড়ার টেবিলে এসে ধপ করে বসে পড়লো। কালই স্কুল খুলবে, ট্রানশ্লেসন বইখানা নিয়ে শামিম নাড়াচাড়া করতে লাগলো। পড়াশোনা ভালো হয়নি।

আপা এলেন, শামিম ভূগোল বইটা তুলে নিলো। না, হিষ্ট্রিটা কিছুই হয়নি। ভূগোল রেখে শামিম ইতিহাস পড়তে লাগলো।

শামিমের মনের ভয় কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছিলো না।

ছবি না দেখে রেশন থেকে কাপড় আনলেই বোধ হয় ভাল হতো।

—'বাবা আসছে না কেন ? রাত আটটা বাজে'—আপা বললেন।

—'সত্যিই বাবা এত রাত পর্যন্ত কি যে করেন', কথা শেষ হবার আগেই বাবা ঘরে ঢুকলেন।

—'কি যে করেন বাবা সে তোরা বুঝবি কি কোরে'।

—'ওকি বাবা ঢুলছো যে' তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন আপা, 'ওমা জ্বরে যে সারা গা পুড়ে যাচ্ছে, ইস,' কাপড় ছাড়িয়ে বাবাকে শুইয়ে দিলেন আপা।

—'এলে কি করে বাবা ?' বাবার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে আপা শুধালেন।

—'হেঁটে এলাম মা, আটটার আগেই আজ ট্রাম বন্ধ, রিক্‌শাওয়ালারা দু'টো টাকার কমে আসবে না,'

বাবার বগল থেকে থারমোমিটারখানা নিয়ে আপা একবার দেখেই আঁতকে উঠলেন, 'একশ দু'ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তুমি হেঁটে এলে বাবা।'

বাবা হাসলেন।

বাবার এ হাশির অর্থ শামিম বুঝতে পারেনি। সত্যিই, এ বাবার অভ্যাস। দু'টো টাকা দিয়ে একটা রিকশা নিলে কিই বা এমন ক্ষতি হতো।

আপার মাথায় হাত দিয়ে বাবা বলতে লাগলেন খেয়ে যেতেও পারিনি, বড্ড ক্ষিদে লেগেছিলো টিফিনের সময় কিছু খাব মনে করলাম আর হলো না। হোটেলে ঢুকলে একটা টাকা খরচ নির্ঘাৎ। এক টাকা বাঁচাতে পারলে শামিমের শার্ট সেলাইয়ের মজুরী দেওয়া যাবে, সামনে ঈদ আসছে।

বাবা চুপ কোরলেন।

শামিমের মনে হ'ল গোটা লাইট-হাউস ছবি ঘরটা যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়লো।

সমান ভাগ

খাই খাই, খাই খাই।

খালি খাই আর খাই। খাওয়া ছাড়া মন্টু আর কিছু জানে না। হ্যাঁ, আরো একটা জিনিস তার জানে। সে হল খাওয়া নিয়ে ঝগড়া। মন্টুকে মা সন্দেশ দিলেন তো ছোট পিন্টু আড়চোখে তাকিয়ে দেখবে, ওরটা বড় হল কিনা। যদি সামান্য একটু বড় হলো, সেদিন আর ওকে পায় কে। বাড়ী শুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলবে। অথচ পিন্টুকেই যদি একটু জিনিস দিয়ে বল, যাও মন্টুর সঙ্গে ভাগ করে খাও গে ; তা হলে আরদেখতে হবে না। মন্টুকে সে তো দেবেই না, নিজে সবটা খেয়ে উধাও হবে।

সন্ধ্যা বেলায় ঘরে এলে যদি বলতে যাও, তা হ'লে সে আর মোটেই পড়বে না, খাবে না, রাগ করে ঘুমিয়ে পড়বে।

মন্টু বড় হলে হবে কি, পিন্টুর কাছে সব সময়েই তার হার। মন্টুর একটা সার্ট হ'লে এর দু'টো চাই। মন্টুকে একটা পেয়ারা দাও তো পিন্টুকে দিতে হবে বেশী। মন্টুর সমান আদরে তার কিছুতেই পোষাবে না। সব সময়ই মন্টুর চেয়ে তাকে কিছু বেশী পেতে হবে।

মা খালি বকেন।

বলেন, 'পিন্টু তোমার খুব অন্যায় হচ্ছে। কিছু একটা জিনিস পেলে তোমরা দু'জনে ভাগ করতে পারো না।'

'না, না, সমান ভাগ ভাল না,' পিন্টু বলে, 'সমান ভাগ নেব না আমি। আমাকে বেশী দিতে হবে।'

সেদিন বাবা বাজার থেকে কমলা এনেছেন। মা সকলকে ভাগ করে খেতে দিলেন একটা একটা করে।

মন্টুকে একটা দিয়ে পিন্টুর দিকে যেই একটা লেবু বাড়িয়ে দিয়েছেন, অমনি পিন্টু কেঁদে কেটে অস্থির।

'না আমাকে দু'টো দিতে হবে। আমি একটা নেব না।' পিন্টু কাঁদতে লাগলো।

মা ওকে বোঝান, বাবা ওকে বোঝান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষে মা ওকে দু'টোই দিলেন।

ওকে দু'টো দিতেই ওদিকে মন্টু উঠল কেঁদে।

'ও'কে দু'টো দিয়েছেন, ওকে দু'টো দিয়েছেন, তা হলে আমিও দু'টো নেব।

পিন্টু দেখল, বিপদ। ওকে দু'টো দিলে তার আদরটা বেশী হয় কোথায়। সে ওমনি যোগ করে দিল, 'তা হলে আমি তিনটে নেব।'

মা ওকে বোঝান, 'ছিঃ মন্টু, তুমি না বড়। তোমার তো বুদ্ধি আছে। ও যে বোঝে না।'

অনেক করে তবে মন্টুকে বোঝানো গেল।

এর কিছুদিন পরে বাবা একদিন ওদের একটা চাকা গাড়ী এনে দিলেন। চাকা-গাড়ী চেনো তো ?

জুতোর সঙ্গে বেঁধে স্প্রিংয়ের ওপর চলে। কিছু দূর টেনে নিতে হয়। তারপর শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেই হলো, চাকা-গাড়ী তারপর আপনিই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে।

হ্যা, সেই চাকা গাড়ী।

জিনিসটা পেয়ে মন্টু-পিন্টুর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মুশকিল হল একটা। এ সমান ভাগ হবে কি করে।

বাবা অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, 'সমান ভাগ করতে হবে। আধ ঘন্টা যদি মন্টু চড়ে, তা হলে আধ ঘন্টা চড়বে পিন্টু।

ঠিক ঘড়ি দেখে তোমরা চাকা গাড়ী বাঁধবে। মন্টু তাতেই রাজি।

পিন্টু আর বলতে পারে না। ওর দু'টো চাই। একটাই জিনিস তাদের ভাগ করে নিতে হবে। পিন্টু তবু ভাইকে চোখ রাঙ্গিয়ে বললো, 'সমান সমান চড়তে দিতে হবে কিন্তু।'

ওর মুখে সমান ভাগের কথা শুনে মা-বাবা দুজনেই হেসে উঠলেন।

মন্টু বললে, 'আচ্ছা',

পিন্টু বললে, 'কেমন করে চড়বে তা হলে ?'

মন্টু বললে, 'আমি একটা মোড়ে গিয়ে দাঁড়াব, আর তুমি আর একটা মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর চাকা গাড়ীটা চালিয়ে আমি তোমার কাছে যাব। আমি খুলে দিলে তুমি পরে নেবে।

পিন্টু ভাবলো, বেশ তো।

এতে তার ঠকবার সম্ভাবনা নেই। তাই সে রাজী হয়ে গেল। মন্টু এদিকে বেছে বেছে একটা মতলব ঠাউরে ভাইকে নিয়ে এল একটা মোড়ে।

সেই মোড় থেকে শুরু হয়েছে একটা পুল। রাস্তাটা পুলের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে উচুতে উঠে গেছে।

মন্টু বললে, 'আমি ঠিক মধ্যখানে গিয়ে দাড়াই। গাড়ীটা তুমি নিয়ে এসো।

পিন্টু মন্টুর বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে না পেরে আস্তে আস্তে পুলের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। মন্টু হেটে হেটে উঠে গেল পুলের মাঝখানের উঁচু জায়গায়।

সেখান থেকে চীৎকার করে সে বলল, পিন্টু উঠে এসো ;

পিন্টু অতি কষ্টে উঠতে লাগল।

পুলের উপর পর্যন্ত উঠতে তার দস্তুর মত হাঁপানী ধরে গেছে। তবু খুব খেটে-খেটে পিন্টু চাকা গাড়ীটা উপরে তুলতেই মন্টু ওটা নিজের পায়ে লাগিয়ে নিলে। পিন্টুকে সে বলল, 'তুমি হেঁটে হেঁটে আবার আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও। তারপর চাকা গাড়ীটা গড়িয়ে চলল, চরর চরর করে। আহ ; কী আরাম মন্টুর। ওকে একটুও কষ্ট করতে হয় না, পুলের উপর থেকে নীচের দিকে চাকা গাড়ী কি সুন্দর নেমে যাচ্ছে। ও শুধু গাড়ী বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

পুল থেকে নেমে চাকা গাড়ীখানা পিন্টুকে দিয়ে মন্টু বললে, আমি উপরে যাচ্ছি, তুমি চলে এসো তাড়াতাড়ি।

মন্টু হেঁটে হেঁটে আবার পুলের মাঝখানে যায়, আর পিন্টু প্রাণপণে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ীটা উপরে তুলে আনে।

যত আরাম মন্টুর।

তার খালি তর্ তর্ করে নেমে যাওয়া।

যত হয়রানি পিন্টুর।

সে খালি টেনে টুনে চাকা গাড়ীখানা উপরে তোলে। এরকম চার পাঁচবার হতেই পিন্টু কেঁদে ফেললে। বললে, 'আমি আর চড়ব না।'

মন্টু বললে, 'তা হলে আমি একাই চড়ি।'

পিন্টু হেরে গিয়ে বললে, 'চড়ো।'

সেদিন থেকে পিন্টু আর মন্টুর চেয়ে বেশী খেতে চায় না।

ছেলে ধরা

কোলকাতার সবই মজার।

সেবার ছুটিতে রশীদ গেল কোলকাতায়। প্রথম কদিন খুব ঘুরে বেড়াল সে। মেট্রো, লাইট হাউস, টাইগার কোথাও ছবি দেখতে বাদ রাখল না। মিউজিয়াম, জু, বোটানিকেল গার্ডেন, ইডেন, গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোনটাই নয়। তারপর সে ঠিক করল হেঁটে হেঁটে গোটা কোলকাতা শহরটা বেড়াবে।

রোজ সকালে উঠে সে খবরের কাগজ পড়ে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে জেনে নেয়, বিশেষ কিছু দেখার থাকলে দেখতে যায়।

সময়টা ছিল শীতকাল। ভোরে উঠে বেশ গরম এক কাপ চায়ে চুমুক দিয়েছে সে, এমন সময়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল খবরের কাগজখানার দিকে।

বেজায় খবর। সারা শহর তোলপাড়, কোলকাতায় আবার ছেলে ধরার উপদ্রব।

চাখানায় তাই নিয়ে তুমুল বাগ বিতন্ডা শুরু হল। একজন বলল, 'আরে কি বলব মশায়, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে চুরি হচ্ছে, সে এক এলাহি কাণ্ড।'

—'এ সব কেন হচ্ছে জানেন?' আর একজন বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বললেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরে এখন হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।'

কথাটা অনেকের বিশ্বাস হল না।

কেউ কিছু বলল না দেখে সেই ভদ্রলোক তখন আবার বললেন, 'কি জানেন? মানব দেহে ঐ বোমার রশ্মি কি রকম কাজ করে, তাই নিয়ে পরীক্ষা হবে; সেদিন জ্যান্ত ঘোষাল তো তাই বললেন।'

সবাই জিজ্ঞেস করল, 'জ্যান্ত ঘোষালটা কে?'

'আরে যা, জ্যান্ত ঘোষালকে চেনেন না? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্যান্ত ঘোষাল; এবার গুলিষ্ট্রিতে ফক্কাইট পুরস্কার পেলেন।'

সবাই ঘাড় নেড়ে বলল, 'না মশাই চিনি না।'

আর একজন, 'কস্মিন কালেও না।'

'তা হলে আর আপনাদের সাথে কথা বলা চলে না', রাগ করে ভদ্রলোক কোটটা টেনে নিয়ে উঠে পড়লেন, 'এত বড় বৈজ্ঞানিক জ্যান্ত ঘোষালকে যারা চেনে না, তাদের সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারী।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

রশীদও উঠে পড়লো। ঠিক কলকাতায় এসে যদি ছেলে ধরার রহস্যই না জানা গেল, তা হলে ঢাকায় গিয়ে সে গল্প করবে কিসের! সিনেমা বায়োস্কোপের

গল্প করে জুত হবে না। কারণ ও সব কম বেশী ঢাকাতে আছেই। তা ছাড়া বই পড়েও অনেক জানা যায়।

অতএব এই ছেলে ধরার ব্যাপারটা কি, তা' তাকে আচ্ছা করে জানতে হবে।

বেরিয়ে পড়ল রশীদ। লম্বা, ছোট, ঢ্যাঙা মেলা লোকই সে দেখল। কাউকেই তার ছেলে ধরা বলে মনে হল না। পথ চলতে চলতে রশীদ ভাবল, কে জানে হয়ত তার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে একজন ছেলে ধরা। চিনবার জো আছে কোলকাতায় ? বৈজ্ঞানিক জ্যান্ত ঘোষালকেই চেনে না। তা এত একটা ছেলে ধরা।

রশীদের চোখ দুটো ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। কিন্তু ছেলে-ধরার সাক্ষাৎ কোথাও মিলল না।

সেদিন দুপুর বেলা কলেজ ষ্ট্রিট বেয়ে চলছে রশীদ। উদ্দেশ্য চাচার হোটেলে পরোটা খাওয়া। আলি সাহেবের বইতে চাচার হোটেলের যা গল্প পড়েছি। কোলকাতায় এসে যদি চাচার হোটেলে খাওয়া না গেল তা হলে আসাটাই মাটি।

ট্রামে বাসে গেলে তার বেড়ানো হল কোথায়। তাই সে চলেছে পায়ে হেঁটে। কলেজ ষ্ট্রিটের কাছে তখন বিশেষ লোকজন নেই। জায়গাটা প্রায় ফাঁকা। রশীদ হেঁটে চলছে, এমন সময় তার নজরে পড়ল ছোট একটা ছেলে। বছর আট-নয়েকের মতো বয়েস হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ছেলেটা।

ছেলেটা একা।

ধুক্ করে উঠল রশীদের বুক ঃ নিশ্চয়ই এ কোন ছেলে ধরার কান্ড। ধরতে না পেরে লোকজনের ভয়ে এখানে ফেলে গেছে।

রশীদ ধীরে ধীরে ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেলেটা চোখ কচলে কচলে কাঁদছে।

'কি হে খোকা কাঁদছ কেন ?' সে জিজ্ঞেস করল।

খোকা কোন জবাব দেয় না।

'কাঁদছ কেন তুমি ?'

ওর মুখটা তুলে ধরে রশীদ আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওর কোন জবাব নেই। সে যেমন কাঁদছিল তেমনি কাঁদতে লাগল। অগত্যা রশীদই জিজ্ঞেস করল, 'কেউ বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে ?'

কিন্তু কী মুশকিল ! তবু জবাব দেয় না ছেলেটা।

হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে খালি কাঁদে।

এমন অবস্থায় কী যে ওর করা উচিৎ রশীদ তা ভেবে পেল না।

তার মন বলল, এ অবস্থায় তার একটা কর্তব্য রয়েছে। চুরি করবে বলে কোনো ছেলে ধরা হয়তো ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তাকে এখানেই ফেলে পালিয়েছে। কোলকাতা শহরে কে কার খোঁজ রাখে।

ছেলেটা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলেও কেউ তার খোঁজ করবে না। মাঝখান থেকে অন্য কোনো ছেলে ধরার নজরে পড়লেই হলো ঃ ছেলে ধরার উৎপাত কী রকম বেড়েছে তা তো সে নিজের কানেই শুনল।

আবার সে খোকার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডাকল।

ছেলেটা সাড়া দেয় না।

'বাড়ী কোন দিকে।'

তবু জবাব নেই। আচ্ছা ছেলে তো !

'চকলেট খাবে ?'

এবারে ছেলেটা হাত নামাল চোখ থেকে।

রশীদ তার হাত ধরে নিয়ে এল একটা দোকানে। চার আনার চকোলেট দিল তাকে। কিন্তু কি রাক্ষুসে সেই ছেলেটা, বাপস। একবার সবটা চকলেট চিবিয়ে ফেলল সে।

তারপর রশীদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

রশীদ তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়ী কোনদিকে।

আঙুল তুলে ছেলেটা একদিকে দেখিয়ে দেয়।

রশীদ তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিকে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে আরেক ফ্যাসাদ। ছেলেটা আর নড়তে চায় না।

'কি মুশকিল ! দাঁড়ালে কেন খোকা ? চল বাড়ী যাবে।' ছেলেটা একেবারে নট নড়ন চড়ন।

তাকে অনেক বুঝাল রশীদ। কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় পাশের একটা লোক জিজ্ঞেস করলে, কি মশায়, হয়েছি কি ?'

রশীদ তখন তাকে সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে সেই ভদ্রলোক বললেন, 'কেন মশায়, খামখা নিজের জানটা হারাবেন ঢাকা থেকে এসে। কখন কে ছেলে-ধরা মনে করে এই-সা মার লাগাবে ; একেবারে বাপের নাম ভুলিয়ে দিবে, জানেন সেদিন রাস্তায় এক ছেলে-ধরাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়েছিল।'

এ্যাঁ, পিক্তিয়ে ? পক্তা ! ভয়ে বিকৃত উচ্চারণ বেরুল ওর মুখ থেকে।

না, না তক্তা বলতে চায় না সে। বিদেশ বিভূইয়ে এসে কেন বেঘোরে জানটা দেবে।

খোকাকে ছেড়ে দিয়ে রশীদ উল্টো পথ ধরল। কাজ নেই পরের উপকার করতে নিজের জান দিয়ে। তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল।

মাত্র কয়েক পা গিয়েছে সে, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে ছেলেটা দৌড়ে আসছে। ছেলটা ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরল তাকে। রশীদ যত তাকে ছাড়িয়ে দিতে চায়, ততই সে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরে থাকে।

'আহ্ খোকা ছাড়, ছাড়।'

কিন্তু খোকা ছাড়ে না তাকে। অথচ এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিপদের। এরকম একটা ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে দেখলেই লোকের মনে সন্দেহ হবে?

'আচ্ছা খোকা, তুমি বিসকুট খাবে?'

বিসকুটের নাম শুনেই মুখ তুলে তাকায় ছেলেটা। ছেলেটা যেন বিসকুটের জন্যই ওরকম গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দোকান থেকে বিসকুট কিনে দিতেই সে আবার চলতে শুরু করল বেশ ভাল মানুষের মত। বিস্কুট খেতে খেতে চলেছে ছেলেটা।

রশীদ তখন তার সংগে গল্প জমাতে চেষ্টা করে। 'আচ্ছা খোকা, তোমার মা বাবা নেই?'

ওর কথার কোন জবাব দিল না ছেলেটা। বিস্কুট খাবার বেলায় চোখ তুলে তাকায় আর কিছু জিজ্ঞেস করলেই বোবা, আশ্চর্য লাগে রশীদের।

অথচ চলতে চলতে ঠিক আর কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল ছেলেটা।

ওকে সে যত জিজ্ঞেস করে সে থামল কেন, ততই সে আরো বেশী করে কাঁদে। পথচারী দু একজন ওদের দিকে তাকায়।

অগত্যা একটা অস্ত্র ছুড়তে হল রশীদকে, 'কিছু খাবে?'

ও মাথা নেড়ে জানায় খাবে।

'কি খাবে?'

আঙুল দিয়ে ছেলেটা দেখিয়ে দিলে পাশেই একটা মিষ্টির দোকান। হায় আল্লাহ্! এ দেখছি আচ্ছা কলকাতিয়া ছেলে!

মিষ্টির দোকানটি যেই দেখেছে আর নড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে ওর জন্যে একটু করুণাও হয়। আহা ছেলে-মানুষ। বাপ-মা হয়ত তেমন কিছু কিনে খাওয়াতে পারে না।

মিষ্টির দোকানে গিয়েও নিস্তার আছে? এটা খাব ওটা খাব করে রশীদের ট্যাঁক প্রায় খালি করে তবে ছাড়ল। পুরো তিনটে টাকা খসিয়ে তবে রক্ষা।

ছেলেটা আঙুল দিয়ে যেদিকে ওর বাড়ী বলেছিল সেই দিকে চলতে লাগল দুজনে।

কিছুদূর গিয়ে রশীদ জিজ্ঞেস করলে, এইখানে?

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে জানায় না।

লোকজনকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল রশীদ। বলল, 'এই ছেলেটা হারিয়ে গেছে, পথ চিনে বাড়ী যেতে পারছে না। তবে এদিকটা দেখিয়ে দিচ্ছে। বলতে পারেন কাদের ছেলে।

কেউ বলতে পারে না।

এদিকে ছেলেটা কিছুদূর গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল।

'কি খোকা, পেটটিত বানিয়েছ রাক্ষসের। আবার কি ঢোকাবে ঐটুকুন পেটটাতে।

উত্তরে ছেলেটা নাকিসুরে বলে, 'লেবু খাব।'

'খাবে ত খাও।'

রাগ ক'রে রশীদ ওকে পাঁচটা কমলালেবু কিনে দিল।

কমলা পেয়ে সে অমনি খেতে শুরু ক'রে দেয়। আর নড়ে না। রশীদ ভেবেছিল ছেলেটা বুঝি খেয়ে দেয়ে চলতে চাইবে। কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে, যখন দেখল পাঁচ পাঁচটা কমলা খেয়ে তবু দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা।

এবার সে বায়না ধরে কোলে চড়বে, হাঁটতে পারছে না।

'চড়ো বাবা চড়ো ঢাকাইয়ার পিঠ পেয়েছ, মজাসে চড়ে নাও। বলে সে ছেলেটাকে পিঠে চড়িয়ে নিল।

অনেক হয়রানির পর শেষে এক জায়গায় এলে এক মুদী বললে, 'আরে ও ত আমাদের ক্ষান্ত পিসির ছেলে। ঐ ছেলেকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? মাইরি আপনারাই মহা মানব।'

খুঁজে খুঁজে ক্ষান্ত পিসীর বাড়ী বার করল রশীদ। দরজার কড়া নাড়তেই 'কে রে ?' বলে মুখ বার করল সাক্ষাৎ একটা মোটর গাড়ীর মত মেয়ে-মানুষ।

বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করলে 'কি হয়েছে ?'

রশীদ আমতা আমতা করে বলে, 'আপনার ছেলেটা।'

'ছেলে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাতে হয়েছে কি ?

'পথ হারিয়েছিল।'

'পথ হারিয়েছিল ? আমার ছেলে পথ হারিয়েছিল ? ওকথা মুখে এনো না। বলে ঐ ছেলে একা একা সিমলা-দিল্লী ঘুরে আসতে পারে, আর কলকাতা শহরে পথ হারায়। বাড়ী কোথায় তোমার ?'

'জি ঢাকায়।'

'তাই বল, বাঙালের আর কত বুদ্ধি।'

রশীদ হঠাৎ ছেলেটির দিকে চাইতেই দেখতে পেল পিট্ পিট্ করে হাসছে সে।

মা বলল, 'তা ক টাকা খসাল শুনি ?

'টাকা মানে ইয়ে, বেশী নয়, চার পাঁচ টাকা।'

মোটে। তা তোমার কপাল ভাল যে, চার পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে, পরশু তো খেয়ে দেয়ে পনেরো টাকা ঘরেই এনেছে। আয় ভোম্বল, ঘরে আয়।'

ছেলেটা তেমনি পিট্ পিট্ কর হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল। মা দড়াম করে দুয়ারটা বন্ধ করে দিল।

দুটো লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। ওদের কথা-বার্তা সবই তাদের কানে গিয়েছে। তাদেরই একজন রশীদকে বলল, 'ও ছেলে সব চেনে মশাই। রোজ ও অমনি কোরে দূর জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর লোকের গাঁটের কড়ি খসায়। আপনার বাড়ী তো ঢাকায়। বাড়ী গিয়ে বলবেন, কলকাতায় ছেলে ধরাই নেই, বুড়ো-ধরা ছেলেও আছে।'

বুদ্ধি যদি থাকে

সকালে উঠেই ঝুনুর ভাগ্যে এমন বিপদটা ঘটবে তা কি সে জানতো। ঘুম থেকে উঠে কার মুখ না জানি সে দেখেছে, দিনটাই তার বরবাদ হয়ে গেল।

বিপদ বলে বিপদ—আস্ত একটা ঘড়ি ভাঙ্গা কি আর চাট্টিখানি কথা? ওদের ছোট টেবিল ঘড়িটা কে আজ ভেঙ্গে ফেলেছে হঠাৎ। ভেঙ্গে ফেলেছে বললে ভুল হবে। ঘড়িকে আর কেউ ইচ্ছে করে ভাঙ্গে না। হাত থেকে পড়ে গিয়ে ঘড়িটা ভেঙ্গে গিয়েছে। তাই ভয়েই ঝুনু সারা। এক্ষুণি মা এসে পড়বেন, কিংবা আপা এসে দেখে ফেলবেন। অমনি সারা বাড়ী তোলপাড়। আপা তো ওকে বকুনি দেবার জন্য তৈরী হ'য়েই থাকেন, দেখতে পেলেই চীৎকার করে বলবেন, দেখ মা দেখ, ঝুনুর কান্ডটা একবার দেখে যাও।'

মা এলে ঘড়িটা তুলে ধ'রে নেড়ে চেড়ে দেখাবেন তাকে। তারপর কি যে হবে ঝুনু তো তা ভাবতে পারে না,

তা হ'লে এখন উপায়?

পড়ার টেবিলে বসে ঝুনু ভাবে এখন কি করা যায়? এক হয় যদি ঘটনাটা জানাজানি হবার আগেই সে একটা নতুন ঘড়ি ঠিক ঐ রকম দেখতে এনে টেবিলে রেখে দেয়। কিন্তু ঘড়ি কিনতে টাকা লাগে। ঝুনুর কাছে রয়েছে মাত্র একটি টাকা।

কি হবে, কি হবে! ভাবতে ভাবতে তার আর পড়া হয় না। কিসের ট্রানশ্লেসন কিসের কি—চুপ করে বসে বসে সে ভাবতে লাগল।

পাশের ঘরে মা এলেন বোধহয়। তার গলার শব্দ পেয়েই ঝুনু তাড়াতাড়ি একটা খোলা বই ঘড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দিল। মা যদি এ কামরায় এসেও পড়েন তবু দেখতে পাবেন না।

কিন্তু মা আর এ ঘরে এলেন না। ঝুনুর ভয় আরো বেড়ে যায়।

অনেক ভেবে সে ঠিক করল, সে বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে।

যেই না ভাবা অমনি কাজ। ওর সম্বল একটি টাকা পকেটে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। বাড়ীতে ফিরে এলে তখন কি হবে তাও সে ভাবল না। শুধু ঘরের মধ্যে ভয়ে ভয়ে বসে থাকতে সে চায় না। সে চায় মুক্তি! সন্ধ্যা বেলায় এসে না হয় বকুনিই খাবে খুব করে। এমন কি মারও খেতে হতে পারে। কিন্তু কবে বকুনি খাবে, কবে মার খাবে, তার অপেক্ষা করে থাকাটাই সহ্য হয় না ঝুনুর।

রাস্তায় বেরিয়ে সে ভাবতে লাগল কোন দিকে যাবে? বন্ধু লিটনের বাড়ী কাছেই। সে ঠিক করল তার ওখানে যাবে।

কিন্তু গিয়ে দেখল লিটন বাসায় নেই। তখন আর কি করা, যে দিকে দু'চোখ যায় সে হাঁটতে শুরু করে দিল।

রমনার মাঠের কাছে এসে তার মনে হল খুব খিদে পেয়েছে। কাছেই একটা মিষ্টির দোকান। ঢুকে এক চোটে সে বার আনার জিলিপি খেয়ে ফেলল। খিদে যখন মিটল, মনটাও তার তখন খুব খুশী হয়ে উঠল। আপন মনে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল ঝুনু।

শিস বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে চলছে এমন সময় ঝুনু দেখতে পেল এক জায়গায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

সে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে।

একটা লোক খেলা দেখাচ্ছে।

ম্যাজিক! বেশ হয়েছে, ঝুনু ভাবল, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখবে সে।

লোকটা তখন বলছে, জীবন্ত মানুষের জিব কেটে আবার জোড়া লাগাতে দেখেছেন আপনারা? এবারে দেখবেন সেই আশ্চর্য কান্ড। ম্যাজিক নয়, যাদু নয়, ভেলকী নয়। সত্যি সত্যি! আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ডাক্তার থাকেন এসে পরীক্ষা করতে পারেন। আছেন কেউ?

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। সবাই চুপচাপ।

তখন খেল-ওয়ালা আবার জিজ্ঞেস করে, আছেন কেউ?

কোন ডাক্তারই পাওয়া গেল না।

খেল-ওয়ালা এবার বলল, 'আপনাদের মধ্যে এমন সাহসী লোক কেউ আছেন? তার জিবটা আমি কেটেই আবার জোড়া লাগিয়ে দিব। কে আছেন মরদের বাচ্চা! আসুন দেখি।

ঝুনু এদিক ওদিক তাকায়। কিন্তু একটা লোকও এগিয়ে এল না।

ব্যাস? ব্যঙ্গ করে খেল-ওয়ালা বলে কিসিকা হিম্মত নেহী! এত লোকের মধ্যে কারো বুকের পাটা নেই?

সবাই অবাক হয়ে দেখলো কালো কুচকুচে একটা লোক বেরিয়ে এল পিছন থেকে।

'সাবাশ! খেল-ওয়ালা বাঁশীতে ফু দিল। বাঁশী বাজিয়ে একবার এক চক্কর ঘুরে নিল সে। তারপর আবার বলল, 'সাব্বাস! এই তো- মরদ কা বাচ্চা! বাড়ী কোথায়?

'এখানেই লোকটা বলল'

'বাঙালী।'

'হ্যা'

'মিথ্যে কথা।'

'হ্যাঁ আমি বাঙালী।'

'না বাঙালী নও। বাঙালীদের সাহস নেই।'
'কে বললে সাহস নেই ?'
'আছে ?'
'নিশ্চয় আছে।'
'ঠিক আপনারাও বললেন আছে ?'

খেল-ওয়ালা বাঁশীর ডগা ঘুরিয়ে সবার কাছ থেকে জানতে চায়।

এবার এক সঙ্গে অনেক লোক বলে উঠল, আছে আছে।

'আচ্ছা আচ্ছা। আমিও বাঙালী। এই খেল বাঙালীরা দেখতে পারে না। আমি শিখেছি আমার ওস্তাদের কাছ থেকে। তার বাড়ী পশ্চিমে। ডেরা ইসমাইল খাঁয়ের নাম শুনেছেন ? সেইখানে।' বলেই আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল সে।

ঝুনু তখন ওর আশে-পাশের লোকগুলির দিকে তাকায়। সবার চোখে-মুখে সে কী উদ্বেগ।

সেই কালো কুচকুচে লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর একটা ছুরি নিয়ে খেল-ওয়ালা তৈরী হল।

ময়লা চাদর দিয়ে লোকটার গা'ঢেকে দিয়ে কাপড়টা একটুখানি তুলে চোখ দু'টো বুজে আল্লাকে ডাকলো খেল-ওয়ালা। তারপর ঠোঁট কামড়ে ছুরি চালাল।

একটু পরেই কাপড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল এক টুকরো জিব। ছোট্ট টুকরোটা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। আর কাঁপছে খেলোয়াড়ের হাত।

চাপা গলায় সে জিবখানা সকলের সামনে ধরে বলল, 'আসুন দেখুন সত্যি সত্যি মানুষের জিব কিনা।' ঝুনুর মনে হল সত্যিই ওটা মানুষের জিব। ভীষণ ভয় হল তার। তবুও সে অপেক্ষা করল শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্য।

জিবখানা আবার কাপড়ের তলায় হাত দিয়ে লাগিয়ে দিল খেল-ওয়ালা। বিড় বিড় করে কি যেন পড়লো। তারপর অন্য খেলা দেখাতে লেগে গেল সে। একটা দুটো করে তিন তিনটি ম্যাজিক দেখল ঝুনু। কিন্তু তবু তার আসল আগ্রহ জিব কাটা লোকটার কি হল দেখা।

অনেকক্ষণ পরে খেলা শেষ করে ম্যাজিক-ওয়ালা মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার চারপাশে সাতবার ঘুরে এসে বলল, 'ওঠো জাগো।'

অমনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার গায়ে তখনো রক্ত লেগে রয়েছে। লোকটা জিব বার করে সবাইকে দেখাল।

তারপর খেলা ভাঙ্গল।

ঝুনু এখন কি করবে ?

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার দৃষ্টি যায় দূরের ঐ ছবি-ঘরটির দিকে।

পকেটে তার বারো আনা পয়সা রয়েছে।

একেবারে সামনের ক্লাশে বসে ছবি দেখবে সে।

ঝুনু করলোও তাই।

দশ আনায় টিকিট কেটে একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসলো।

ছবিটা ছিল একটি ডাকাতীর কাহিনী।

আগা-গোড়া খুব ভাল লাগল ঝুনুর। ছবি দেখতে দেখতে কেমন করে সময় কেটে যায় ঝুনু তা টেরই পায় না। টের পেল তখন যখন শো ভাঙল।

হলভর্তি লোকের সংগে ঝুনুও বেরিয়ে গেল।

এসে দেখে সন্ধ্যা হয় হয়।

ছ্যাৎ করে উঠল ওর অন্তরটা। এবারে বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ীতে আছেন মা, আপা, বাবা আর একটা ভাঙা ঘড়ি।

ঝুনুর বুকটা ধুক্ ধুক্ করে।

কিন্তু তবু তারে ঘরে ফিরতে হবে। পা চলতে না চাইলেও উদ্দেশ্যহীন-ভাবে চলতে লাগল ঝুনু। বাড়ীতে তাকে যেতে হবে, বকুনীও খেতে হবে।

ঝুনু ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে ঘরে এসে দেখল ঘড়িটা তেমনি পড়ে আছে। তেমনি ভাবে বইয়ের আড়াল দেওয়া।

কেউ এখনো আবিষ্কার করেনি যে ওটা ভাঙা।

আচমকা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল পাকঘরের দিকে।

সেখানে আপা আর মা বসে আছেন।

আপার ছোট ছেলে বাবুটা ওর পিঠের উপর ভর দিয়ে খালি নাকি সুরে কাঁদছে।

ঝুনু গিয়ে ওকে কোলে তুলে নেয়। আপার সামনে আজ হঠাৎ সে ভীষণ আদর করতে লাগল ওকে।

তারপর তাকে সে ওখান থেকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে।

খানিক বাদেই ঝুনুর চীৎকার শুনে মা আপা ছুটে এলেন।

তাঁরা এসে দেখলেন ঘড়িটা ভাঙা।

'কেমন করে ভাঙল রে ?'

দুজনেই তারা এক সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

ঝুনু তখন রাগ দেখিয়ে বলে, 'আবার কে ?'

আপা খোকাকে টেনে নিয়ে ওর গালে বসিয়ে দিলেন দুই চড়।

ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল ছেলেটা।

আপা ওকে আরো মারতে যাচ্ছিল।

ঝুনু বাধা দিল।

'থাক থাক আর মেরে কি হবে ? ওকে মারলে তো আর ঘড়িটা ভাল হয়ে যাবে না। যা দুষ্টু হয়েছে এক মিনিট অন্যদিকে মন দেবার জো নেই। একটু বইগুলো রাখতে গেছি, অমনি দিয়েছে ঘড়িটা ফেলে।

খোকাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দোকানে গিয়ে ওকে কিছু চকোলেট কিনে দিল ঝুনু ওটা মার খাওয়ানোর খেসারৎ।

বন্ধু

ছেলেটার টানা-টানা চোখ, চওড়া কপাল, আর কী সুন্দর মমতা মাখানো মুখটা তার।

বাংলার শিক্ষক সিরাজ সাহেব দরদ-ভরা গলায় পড়াচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, অন্যদিন হলে আজাদ তন্ময় হয়ে শুনতো, আজ কিন্তু সে খুব আনমনা হয়ে গেল, বারে বারে তাকাতে লাগল নবাগত ছেলেটির দিকে। কি তার নাম, কোত্থেকে এসেছে, আগে কোথায় পড়তো, কেমন ছেলেটা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ঘুরতে লাগল তার মনে, সিরাজ সাহেব কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু আজাদ তার জবাব দিতে পারল না।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল আজাদ। তার মনে হল সিরাজ সাহেবের দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে সে বেঁচে যায়। ক্লাশে যে ফার্স্ট হয়ে এসেছে বরাবর। কোনো দিন কোনো শিক্ষকই অমনোযোগের দোষ দিতে পারেননি তাঁকে,

'মুখ তোলো, আমার দিকে তাকাও' সিরাজ সাহেব বললেন।

আজাদ মুখ তোলে। সিরাজ সাহেব সস্নেহে বললেন, "যতক্ষণ ক্লাশে থাকবে মন দিয়ে পড়া করবে। বুঝলে?" বলেই তিনি আবার পড়াতে শুরু করলেন।

মুখ নামাতে গিয়ে হঠাৎ আজাদের চোখাচোখি হয়ে গেল নতুন ছেলেটির সঙ্গে। মুখে লেগে রয়েছে মিষ্টি হাসিটি।

ছুটির ঘন্টা বাজতেই দলে দলে বেরিয়ে এল ছেলেরা। হেড -মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করছেন ছেলেরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বেরিয়ে এল কিনা। লাইন করে বার হয়েই আজাদের চোখ ঘুরে বেড়াল চারদিকে। কিন্তু কোথাও দেখা পেলো না তার। আজাদ ভাবল ওকে দেখলে সাথে সাথে গিয়ে পথে আলাপ করবে ওর সাথে। ভাব জমাবে। কিন্তু এদিক ওদিক কোথাও তাকে না দেখে আজাদের মনটা গেল খারাপ হয়ে। খেলার মাঠে গিয়ে দেখল সেখানেও সে নেই।

অগত্যা সে বাড়ীর পথ ধরলে।

বেশী দূরে যায়নি, এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল আজাদ।

দেখল, সেই ছেলেটি।

এক মুহূর্তে খুশীতে ভরে গেল তার মন।

'বইগুলো একটু ধরতো', কাছে এসে ছেলেটি বলল তাকে।

হাত বাড়িয়ে আজাদ বইগুলো নিল।

পকেট থেকে পয়সা বার করলে সে। পাশেই একটা দোকান। মনিহারী জিনিষ-পত্রের দোকান সারি সারি কাঁচের পাত্রে সাজানো চকোলেট। লজেন্স, টফি আরো কত কি? এক পাশে ছোট্ট একটা পান বিড়ির দোকান।

বেশ বুদ্ধি আছে তো ! আজাদ ভাবল, একটা ভাল বন্ধু পাবে ভেবে খুশীতে নেচে উঠল ওর মনটা। দোকান থেকে আসুক কিনে। তারপর চকোলেট কি টফি মুখে পুরে দুজনে চলতে চলতে বেশ আলাপ জমিয়ে নেবে।

ছেলেটা ফিরে আসতেই আজাদ এক মুখ হেসে প্রশ্ন করে, 'কি নাম তোমার ভাই ?'

'হবে হবে, সবই হবে। তার আগে।'

মুচকি হেসে পকেটে হাত দিল সে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আজাদ। ছেলেটা সিগারেট খায়। এক মুহূর্তে সমস্ত কল্পনাই যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তার।

ছেলেটা সিগারেট খায়।

আজাদের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'নাও'।

মুখটা অসম্ভব কালো করে আজাদ শুধু বললে, 'না, ওসব খাই না আমি।'

খাও না ! বল কি ? শহরে থাক অথচ সিগারেট খাও না, আশ্চর্য তো !'

ওর কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করলো না আজাদের। চুপচাপ হাঁটতে লাগল সে।

আজাদের মনে হলো, খুব যেন ঠকেছে সে। চুপচাপ হাঁটছিল সে ওর পাশাপাশি। একটা কথাও সে আর বলতে পারল না। আজ সকাল থেকেই সে ভেবে আসছে ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আর বন্ধুত্ব করবে। কী মিষ্টি ওর মুখখানা ! তার সমস্ত আশাই চুরমার করে দিয়েছে সে।

ছেলেটিই সেই নীরবতা ভাঙল।

—কি বন্ধু, একেবারে চুপ করে গেলে যে ?

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল আজাদ। দৃষ্টি গেল ওর আঙুলে ধরা সিগারেটের দিকে।

আজাদের হঠাৎ মনে হলো, কেউ যদি তাদের দেখে ফেলে এই সময়ে। সিগারেট খেতে খেতে চলেছে একটা ছেলে। তার পাশে আজাদ। —তাহলে ?

ভীষণ ভয় হল তার।

হয়তো কেউ ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে। না, আর এক মুহূর্তও নয়। এক্ষুণি তার চলে যাওয়া চাই ওর কাছ থেকে।

মোড়ের মাথায় এসে সে বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। চলি,' আর একটি কথাও না বলে সে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করে দিল আর একটা রাস্তা দিয়ে।

ছেলেটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই। বহুদূর গিয়ে সে পিছন পানে ফিরে তাকাল। আজাদ দেখতে পেলে ওখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

কী আশ্চর্য ! তার নামটাও জানা হয়নি।

বাড়ী ফিরেই সে ভাবতে লাগল ওর কথা। কারো সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না সে।

ওর চুপচাপ ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত ভাবী ওকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করেন, 'কিরে ? কি হয়েছে তোর ?

আজাদ বলে, 'কই কিছু হয়নি ত ?

ভাবীর সঙ্গে তার ভারী ভাব। তার কোন কথাই গোপন থাকে না তার কাছে, ভাবী বার বার প্রশ্ন করাতে আজাদ শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল তাঁকে।

'ও ! এই কথা ?' সব শুনে তিনি বললেন, 'এতে মন খারাপ করার কি আছে। তুমি যদি ওর বন্ধু হও, তা হলে বরং ওর সঙ্গে মিশে ওকে ভাল করবার চেষ্টা করো। ওর এই খারাপ অভ্যাস যাতে সে ছাড়াতে পারে সেই রকম চেষ্টা করো তুমি।

বেশ। আজাদের খুব মনে লাগল ভাবীর কথা। কাল থেকে সে স্কুলে গিয়ে ওর সাথে খুব মিশতে শুরু করবে, একান্ত প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবে ওর। তারপর সিগারেট ছাড়াবে তাকে।

সারারাত সে খালি ভাবল কি কথা সে তার সঙ্গে বলবে।

পরের দিন ঠিক সময়ে স্কুলে গেল আজাদ। আগে থাকতেই ক্লাশে এসেছিল ছেলেটি। ক্লাশের অন্য সব ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে এরি মধ্যে।

আজাদ ক্লাশের ঢুকেই শুনতে পেলে খসরুটা বলছে, 'দেখো এখানেও ফাষ্ট হতে পারো কিনা ভাই। আজাদটার ভারী গর্ব, ফাষ্টবয় বলে আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না।'

ব্যাপরটা বুঝতে আজাদের এক মুহূর্তও দেরী হল না। তার অনুপস্থিতিতে এরা নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছে। নানা রকম কথা বলে ওর বিরুদ্ধে তার মনটা বিষিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে খসরুটা। খেলা-ধুলায় ভাল হলেও বার দুই ফেল করে একই ক্লাসে পড়েছে সে গত তিন বছর থেকে। তার ওপর আরো নানা রকম বাজে স্বভাব তার। আজাদ পারতপক্ষে ওর সঙ্গে বড় একটা মিশত না।

আজাদ ধীরে ধীরে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসে পড়ল।

খসরুই তখন আজাদের দিকে চেয়ে বলল, 'এই যে চেনাশোনা হয়নি নিশ্চয়ই। আমাদের নতুন বন্ধু মিঃ—বাধা দিয়ে ছেলেটা বলে, 'মিষ্টার আবার কি ? শুধু রফিক আহমদ।'

খসরু তখন আজাদের পরিচয় দেয়,—

'আমাদের ছাত্র-চূড়ামনি, ফাষ্টবয়, স্বনাম ধন্য বদরুল আজাদ, পোল জাম্প চ্যাম্পিয়ান আর—

ক্লাশ শুদ্ধ সবাই ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

খসরুর কথার্বাতা আজাদের ভালো লাগল না মোটেই। খসরু আরো কিছু

বলতে চাচ্ছিল। আজাদের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল।

হাত দু'টো কপালের ওপর তুলে অভিনয়ের ভঙ্গিতে সে বলে, 'ক্ষমা করুণ জনাব—'

আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল। আজাদের খারাপ লাগল আরো এমন কি নবাগত ছেলেটিও হাসছে।

কিন্তু সকলের সমবেত হাসিকে ডুবিয়ে দিয়ে জেগে উঠল একটি কথা, 'ষ্ট্যাণ্ড—'

উঠে দাঁড়াল সবাই। পড়া শুরু হয়ে গেল।

সবাই চুপচাপ পড়ছে, আজাদের মনে তখন একটি মাত্র ভাবনা। খসরু বলছিল রফিককে, এখানেও ফাষ্ট হতে পারো কিনা দেখো আজাদটার ভারী গর্ব।'

ওকে হেয় করবার জন্যে খসরু যখন অমন করে পরিচয় দিচ্ছিল তখন সে হেসেছে।

কোথায় সে আজ ওর সঙ্গে ভাব করতে এসেছে, তা' না, হল শেষে এই।

আরো একটা আঘাত পেল আজাদ। ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র সুযোগ পেয়েও সে রফিকের সঙ্গে কথা বলতে পারল না। বাংলা ক্লাশে সুলতান সাহেব সেদিন নতুন ছেলেটিকে রিডিং পড়তে বললেন। পড়তে গিয়ে অজস্র ভুল করল রফিক। আজাদ বুঝতে পারে কোথায় কোথায় তার ভুল হয়েছে। উচ্চারণগুলো ওর বড্ড বিশ্রী।

পাশ থেকে সালাম ফিস্ ফিস্ করে বলে, এই উচ্চারণ নিয়ে সে ফাষ্ট হতো ?

সুলতান সাহেব আজাদকে বললেন তুমি পড়তো, তারপর থেকে।

গর্বে ফুলে উঠে আজাদের বুকটা।

অন্যদিনের চাইতেও ভাল রিডিং পড়ল সে। পড়তে পড়তে সে রফিকের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। বেশ মন দিয়ে পড়া 'ফলো' করছে ছেলেটা। থেকে থেকে থেকে জায়গায় পেন্সিলের দাগ বুলাচ্ছে।

দিন-চার দিন কেটে গেল।

এখনও আজাদ রফিকের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেনি। এমন কি সেদিনকার ঘটনার পরে কেউ কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলেনি।

রফিক চেষ্টা করেছিল অনেকবার। কিন্তু তা'হলে হবে কি, কোথায় যেন তার মস্ত বড় একটা সঙ্কোচ।

ছুটির পরে সেদিন ম্যাচ ছিল অন্য কোনো একটা টিমের সাথে। ছাত্ররা সবাই তৈরী হচ্ছিল। সবাই জড়ো হয়েছে স্কুলের মাঠে। পাশে রাখা রয়েছে স্কুলের লাল-সাদা জার্সি। এমন সময় দেখা গেল ওদের লেফট আউট আসেনি। স্কুলের ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন রশীদ মুখ ভার করে বসে আছে। ওর জায়গায় কাকে দেবে তাই নিয়ে প্রায় ঝগড়া বাধার উপক্রম। রফিক দূর থেকে ওদের কথাবার্তা

শুনছিল। হঠাৎ সে-ই এগিয়ে এল।

বলল, ‘আমি খেলতে পারি লেফট-এ।’

আজাদ রাইট আউট হিসেবে খেলে নাম করেছে ইতিমধ্যে।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, ‘আগে ম্যাচে নেমেছে কোন দিন।’

একটুও বিব্রত না হয়ে রফিক জবাব দিল, অনেকবার।

‘বেশ তাহলে পরে নাও।’

তারপর বিকেলের চকচকে রোদে ঝলমলিয়ে উঠল ওদের লাল-সাদা জার্সিগুলো। খুব কম সময়ের মধ্যেই খেলা উঠল জমে।

কিন্তু আজাদদের অবস্থা সেদিন সত্যিই সঙ্গীন। বল বার বারই ওদের বার-এর কাছে এসে ঘুরতে লাগল। অপর পক্ষ খুব উৎসাহ নিয়ে খেলছে। আজাদরা নিজেদের রক্ষা করতেই বেশী ব্যস্ত।

কিন্তু তবুও কোনো পক্ষে কোন গোল হলো না।

হাফ-টাইমের পরে যখন খেলা শুরু হলো তখন ধীরে ধীরে ওদের খেলা ভাল হতে লাগল।

চারদিকে হাততালি আর উৎসাহ দেবার ধুম পড়ে গেল।

ওদের সেন্টার ফরওয়ার্ড বিপক্ষ দলের কাছ থেকে বল কেড়ে আজাদকে পাস করল। বল নিয়ে দৌড়াতে লাগল আজাদ। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পেল তিন দিক থেকে তিনজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। বলটা ফসকে যায় যায়। হঠাৎ কি ভেবে যেন বলটা সে ঠেলে দিলো পিছনের দিকে। ওদের সেন্টার সে বল ধরল আর সোজা পাঠিয়ে দিল রফিকের পায়ে। রফিক যেন এরই অপেক্ষা করছিল। দুজনকে পাশ কাটিয়ে খুব দ্রুত বল নিয়ে গোলের দিকে এল সে। চার পাশ থেকে চীৎকার করে তাকে উৎসাহিত করল ছেলেরা।

‘এ-গোও—’

‘কিক্’

‘সাবাস নিউ কামার।’

ওদের উৎসাহে আরো দ্রত দৌড়াতে লাগল সে। আজাদ দেখল ও যদি এক্ষুনি বলটা পাস করো না দেয় তাহলে বিপক্ষ দলের আক্রমণের চাপে পড়ে বলটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চীৎকার করে সে বললে, ‘পাস অন রফিক। পাস অন।’

রফিক শুনল ওর কথা। মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে সে বলটা পাস করে দিল আজাদের দিকে।

কিন্তু শীগগীরই বলটা আবার ফিরে এল রফিকের পায়ে।

‘কিক্—’

‘শট্—’

‘গোল, গোল—’

সারা মাঠ যেন এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, গোওল। রফিক বলটা ঘাসকাটা শট্ মেরে সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছে বারে।

স্কুলের সব ছেলের সে কী আনন্দ !

অনেকক্ষণ ধরে হাততালি যেন আর থামতেই চায় না। হাততালির সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, সাবাস নিউ কামার, সাবাস নিউ-কামার।'

বল সেন্টারে রেখে আবার সারা মাঠ শান্ত হয়ে গেল তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কোনো পক্ষ গোল করতে পারল না আর। খেলা ভাঙতেই ছেলের দল ঘিরে ধরল খেলোয়াড়দের। ওদের বিশেষ উৎসাহ রফিককে নিয়েই। নীচু ক্লাশের ছেলেরা পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ওকে।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলে রুমাল বাধা, সারা গায়ে ঘাম। অস্থির ভবে এক টুকরো লেবু চিবাচ্ছে সে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সবাই উঠল।

আজাদও খুশী হয়েছে। তার সব দ্বিধা যেন কেটে গেছে এই খেলার মধ্য দিয়ে।

রফিকের হাতখানা জোরে নেড়ে দিয়ে সে বলল, অভিনন্দন।'

রফিকও হেসে বলল, 'ও জিনিসটা কিন্তু দু'জনেরই সমান প্রাপ্য।'

'অমন চমৎকার বলগুলো না পেলে গোল করা আমার এ-জন্মে সম্ভব হতো না।'

হ্যাঁ, তাই বই কি ? আজাদ বলল।

পরক্ষণেই আজাদের মুখটা আবার ভারী হয়ে এলো, মনে পড়ল ছেলেটা সিগারেট খায়।

রফিক আর আজাদ দু'জনেই এসে বসল পুলটার ওপরে।

বসেই রফিক বলল, 'কাল কিন্তু অমন ভাবে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি। আজাদ কোন জবাব দেয় না।

রফিক বলে, 'এক দিক দিয়ে কিন্তু খুবই ঠিক করছিলে তুমি।'

সব দিক চেয়ে আজাদ ওর দিকে তাকায়।

'আমাদের গাঁয়ের স্কুলে সবাই খায়, তাই আমিও খেতাম। কিন্তু গতকাল আমাকে সিগারেট খেতে দেখে তুমি যখন ঘেন্না করে চলে গেলে তখন ভীষণ অনুশোচনা হল আমার। ঠিক করেছি আর কখনো সিগারেট ছোঁব না।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল আজাদ।

বললে ঃ আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, সত্যিকার বন্ধু।

রফিক বলল তুমিও।

দুজনে চলতে লাগল।

সারাটা আকাশ জুড়ে অগুনতি তারা ঝিকমিকিয়ে হাসছে।

ছবি দেখতে গিয়ে

অনেক বলে কয়ে মামাকে বলে রাজী করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য ছবি দেখা। কি ছবি তার কিছু ঠিক নেই। ছবি দেখতে হবে। ব্যাস্। বেরিয়ে পড়েছি ঠিক দুপুরে।

মামা আমার লেখাপড়া জানেন না। ব্যবসা করেন আলুর। মাঝে মাঝে দেশ থেকে আসেন আলু নিতে, তখন আমার বায়স্কোপ দেখার ধুম।

বাস থেকে নেমে ঘড়ি দেখে মামাকে বললাম, আর মাত্র দশ মিনিট বাকী। তাড়াতাড়ি চল নইলে শুরু হয়ে যাবে।

মামা হেসে বললেন—ও তুমি ভেবেছ তিনটার শো দেখা! মোটেই নয়। দিনে আলু-টালু কিনব, সন্ধ্যেবেলার শোতে ছবি।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল বই কি? তবু মনকে প্রবোধ দিলাম এইবলে যে, ফসকে তো যায় নি? সন্ধ্যায় হলেও ছবি তো দেখছি। আচ্ছা তাই সই। চল আলুর বাজার। আলুর বাজারে কি সব দর-দাম করলেন মামা, সে সব মনে নেই। শেষ কথাটা শুনলাম, সন্ধ্যাবেলায় এসে দাম দিয়ে যেতে হবে। ভোরে আলু পাওয়া যাবে। তখন আবার আলুর ব্ল্যাক মার্কেট চলছে। আলুর সাথে আমার কি সম্পর্ক। পাওয়া যাক আর না যাক, তাতে আমার কি! ছবি দেখানোর কড়ারে এই দুপুরে বেরিয়ে এসেছি, ছবি দেখা আমার চাই-ই চাই। হোক না সেই সন্ধ্যায়, ক্ষতি কি!

এখনো আড়াই ঘন্টা বাকী। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ করবে কি?
মামাও বললেন, 'তাই তো! চল, কিছুক্ষণ হোটেলে গিয়ে বসি।

রাজী হতে দেরী হল না। বললাম হ্যাঁ, তাই।'

যাচ্ছিলাম কাছের একটা হোটেলের দিকে এমন সময় দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে ভীড় জমে গেছে। ভীড়ের ভেতর থেক ভেসে আসছে শব্দ ডুগ ডুগ, ডুগ ডুগ।

ও! খেলা হচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে মামাকে বললাম, 'মামা, মামা চল খেলা দেখি!'

মামা ও আমি দুজনে আস্তে আস্তে কোন রকমে পথ ধরে একবার ব্যূহের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

খেলাওয়ালার মুখময় দাড়ির জঙ্গল কতদিন গোসল করেনি আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু দেখা গেল খেলা নয়। ডুগডুগিটা স্রেফ লোক জমানোর কৌশল। তবু এসে যখন পড়েছি আমি আর মামা ভাবলাম দেখেই যাওয়া যাক।

এই যে দেখছেন তাবিজ, এ হল বুন্দেল শাহ পীরের স্বপ্ন দেখা ওষুধ। বাবা জীবন্ত পীর, এ তাবিজ যে নিয়ত করে গলায় দিবেন, সে নিয়ত পুরা হবেই। বিনে পয়সায় দেব। যার যার দরকার বলুন। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ।

মামার দিকে চেয়ে বললাম, বুজরুকী। তাই না ?

মামা হয়ত তাঁর আলুর কেনা-বেচার ভবিষ্যৎ ভেবে একটা নেবেন ভেবেছিলাম। আমার কথা শুনে বললেন, তা হলে নেবার দরকার নেই, কি বল।

চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবার খেলাওয়ালার গলা শোনা গেল।

তাবিজ বেচার নিয়ম নেই বটে। কিন্তু আসছে বোশেখ মাসে বাবার সিন্নি তার জন্য যে যা পারেন দিয়ে একটা করে তাবিজ নিয়ে যাবেন। যার পকেটে পয়সা নেই, তিনি বিনি পয়সায় পাবেন, কিন্তু যার আছে, তিনি যেন সাধ্যমত দিতে ভুল না করেন। বাবার শক্তি অসীম। বাবাকে ফাঁকি দিতে গেলে বাবা রেহাই দেবেন না।

জিন্দা পীর বাবার বদদোয়ায় একবার পড়লে চৌদ্দ পুরুষ বরবাদ হয়ে যাবেন। যার যেমন শক্তি—ডুগ, ডুগ।

আশে-পাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম, কেউ নেয় কিনা। না, কেউই নিচ্ছে না। তবে শুনছে সবাই। বক্তার গলায় যেন কি ঝাঁজ। কেউ বিশ্বাস করছে না, অথচ চলেও যাচ্ছে না। কেউ নিচ্ছে না দেখে দাড়িওয়ালা এবার রেগে গেল একটুখানি।

বললে, ভাল জিনিসের দর কমে যাচ্ছে এদেশে। আল্লা-রসুল পীর-দরবেশে ভক্তি নেই আগের মত। নইলে সিনেমা বায়স্কোপে পয়সা খরচ করতে পারেন আপনারা কেবল বাবার সিন্নির জন্যে পয়সা দিতে জেবে হাত যায় না। আমি বলে দিচ্ছি আপনারা শুনে রাখুন। যে পকেটে পয়সা রেখে দেবে না, এখান থেকে দশ কদম যেতে পারবে না সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি, সারা শরীর জ্বলতে থাকবে। জিন্দা পীরের সঙ্গে চালাকি চলবে না। হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, ভাটার মতো জ্বলতে লাগল চোখ দুটো। কিছুক্ষণ চুপচাপ সবাই। কেবল পীরভক্ত তাকাতে লাগলো এদিক থেকে ওদিক আগুনের দৃষ্টি নিয়ে।

আমার একেবারে পাশের লোকটা পকেটে হাত দিতেই ডুগডুগিওয়ালা তাবিজ হাতে এগিয়ে এল। একখানা দশ টাকার নোট। ঐ তাবিজটার দাম। সবার চক্ষু ছানাবড়া, দশ টাকা !

দেখুন, দেখুন সবাই দেখুন। এই ভদ্রলোক নিলেন তাবিজ একটা দশ টাকা দিয়ে। বুন্দেল শাহের স্বপ্ন দেখা তাবিজ। যে নিয়ত করবেন তাই পুরা হবে। এই অমূল্য জিনিসের দাম হয় না। যে যা দেবেন সিন্নির জন্য খরচ করা হবে। ডুগ ডুগ ডুগ...। একবার ঘুরে আসতেই খেলওয়ালা গোটা পাচ ছটা তাবিজ গছিয়ে ফেলেছি। মামাও নিতে যাচ্ছিলেন। আমি ওকে হাত ধরে থামিয়ে দিলাম। আরো কিছু তাবিজ বিক্রি হল। ফুলপ্যান্ট-পরা এক সাহেব দিলেন

দশ টাকা, ধুতি-পরা এক বাবু তিনি দিলেন পাঁচ টাকা। ভক্ত-কণ্ঠ চীৎকার করে বলে উঠল ঃ হিন্দু পর্যন্ত বুন্দেল শাহের গুণে পাগল। তাই মুসলমান আপনারা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবেন না বাবাকে।

—না, না, ওসব চলবে না। চলবে না! আমার টাকা টাকা দাও। চাই না তোমার তাবিজ ফিরিয়ে দাও আমার টাকা। যত সব বুজরুকী।

তাকিয়ে দেখি সেই যে প্রথমে দশ টাকা দিয়েছিল, সেই লোকটাই।

ফিরিয়ে দাও অমার টাকা।

ফেরৎ চাও?

—হ্যাঁ, ফেরৎ দাও আমার টাকা।

—ভাল করে ভেবে দেখ।

—দেখেছি, ওসব বুজরুকী, আমি বুঝতে পেরেছি। চাইনা তোমার তাবিজ।

—অবুঝ হয়ো না। এ তোমার বাবার বাড়ী নয় যে, একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবে। চালাকী খাটবে না বাবার সঙ্গে। মনে রেখ বুন্দেল শাহ জিন্দা পীর।

কিন্তু লোকটা শুনল না। বলল, থাক থাক হয়েছে। ওসব ঢের শুনেছি।

খেলওয়ালার মুখটা এবার অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটি বিস্ফোরিত। তাবিজ ক্রেতার কাছে এসে তার দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বললে,—নাও।

লোকটা টাকাটা হাত পেতে নিলে—ফিরিয়ে দিলে তাবিজ।

তারপরেই বিদ্যুতের বেগে ঘুরে দাঁড়াল সে। এক বিকট হাঁক দিয়ে হাত পা কাঁপিয়ে বাবাকে যেন সশরীরে আহ্বান করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

যে লোকটা তাবিজ কিনে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সবাই দেখল সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

মৃগী রোগীর মত হাত-পা ছুড়ছে আর বলছে, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল।

হা-হা করে উঠল সবাই। তাবিজওয়ালার মুখে মুচকী হাসি। লোকটা যেন অসহ্য কষ্টে মরে যাচ্ছে। সহানুভূতি আর ভয়ে সবার মুখ পাংশু।

আহা, ও ভাই ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

কিন্তু কোথায় কে কার কথা শোনে! লোকটা গোটাতে থাকল।

'ছেড়ে দাও ফকির, ছেড়ে দাও।' কারা যেন চীৎকার করে উঠল আমার পেছন থেকে। 'ইয়া আলী' বলে হাত কাঁপিয়ে আকাশের দিকে তাকাল তাবিজওয়ালা। তারপর মোনাজাত করল সে। ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল লোকটা, তাবিজওয়ালার পা জড়িয়ে ধরে বলল, ফকির মা'ফ করে দাও আমাকে।

খেলওয়ালা পা ছাড়িয়ে নিলে। জোর করে।

আমি মাফ করার কে? মাফ চাও বাবার কাছে। যাও তোমার টকা নেব না। এমনি দিলাম তোমাকে তাবিজ, নিয়ত পুরা হবে, যাও। সালাম করতে করতে কাঁদো কাঁদো মুখে চলে গেল সে। আবার এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন আর মাত্র কয়েকটা তাবিজ আছে। দেখতে দেখতে ফকিরের টিনের রঙটো বাকসটা ভরে উঠল টাকায় সিকিতে, আর দশ টাকা পাঁচ টাকার নোটে। আর কী আশ্চর্য। আমার পকেটে ছিল চার আনা, আমি একটা নিয়ে নিলাম। সামনে পরীক্ষা। গোয়ার্তুমি করে কি লাভ? মামা তো দশ টাকার নোটই একখানা দিয়ে ফেললেন। বললেন,—কত পয়সা কত দিকে যায়।

তাবিজ নিয়ে ভীড় থেকে বেরিয়ে এলাম দুজনেই। আলুর বাজার পেরিয়ে এসেছি আধ মাইল। সেই আধ মাইল আবার হেঁটে আসতে হল। কারো মুখে কোন কথা নেই। মামাকে বললাম, তোমার লেনদেন শেষ করে ফেল। নইলে ছটার শোও পাবে না।

ছবি টবি আজ আর দেখা হবে না। মামা বললেন।

শুনে দমে গেলাম একেবারে।

দশ টাকা বেরেয়ে গেল, আর বেশী খরচ করতে গেলে তোমার মামী আর তোমার ভাই-বোনদের নিয়ে মারা পড়ব।

বলতে যাচ্ছিলাম,—তবে দিতে গেলে কেন? কিন্তু সেই দৃশ্যটা মনে হতেই চেপে গেলাম।

সন্ধ্যা বেলা আলুর বাজারে এসে ব্যাপারীদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেলেন মামা।

কথায় কথায় দুপুরের তাবিজ-প্রসঙ্গ কথা উঠতেই ব্যাপারী মুচকী হেসে জিজ্ঞাসা করলো, দিয়েছ নাকি কিছু?

মামা বললেন, একেবারে দশ টাকা।

ব্যাপারী আমাদের সঙ্গে নিয়ে পেছনের অন্ধকার গলিতে এসে ভাঙ্গ দরজা একটাতে কড়া নাড়ল।

কে? —ভেতর থেকে চেনা গলার আওয়াজ আসে।

দরজা খুলে ভেতরে যেতেই দেখি অবাক কাণ্ড। সেই ফকির সাহেব, গোসল-টোসল করে মাথা আঁচড়ে সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে পান চিবাচ্ছেন, হাতে একটা সিগারেট। সেই লোকটা—যে প্রথম টাকা দিয়ে পরে ফেরৎ নিতে গিয়ে এত কাণ্ড ঘটালো সে দেখি দিব্বি একটা হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। আর যে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলে চেঁচিয়েছিল, তাদের কেউ বা নিয়েছে তবলা, কেউ বা শুধু তাল ঠুকছে। ফুলপ্যান্ট-পরা দশ টাকা দাতা আর ধুতি-পরা পাঁচ টাকা-দাতা বাবু সবাই শীতল পাটির উপর বসে চায়ের কাপে চুমু দিচ্ছে।

মামা বললেন কী সাংঘাতিক।

আমি বললাম, এতো জানতামই। ব্যাপারীর কৃপায় মামা টাকাটা ফেরৎ পেয়ে গেলেন। ছবি দেখা ছটার শোতেও আর হল না। তবে মামা কথা দিলেন আগামী কালকের ম্যাটিনী ফেল হবে না।

ওরা আছে

টিচার্স রুমে সেদিন তুমুল তর্ক। শিক্ষকদের সরব চীৎকার শুনে ছাত্ররা পর্যন্ত ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো। টিচার্স রুমের পিছনটায় একটু-খানি ফাঁকা মাঠ। মাঠমুখী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারা শুনতে লাগল তাদের একান্ত ভক্তি-ভাজন শিক্ষকদের সেই তুমুল বিতণ্ডা। ক্লাস রুমে অধ্যাপনারত শিক্ষকদের গুরু-গম্ভীর কথা শুনতে অভ্যস্থ। ছাত্ররা ভাবতেই পারে না যে তাদের অতি-পরিচিত শিক্ষকেরা এতও শব্দ করতে পারে।

কাজেই অবাক হয়ে শুনতে লাগল তারা।

এদিকে বাংলার শিক্ষক শিরাজী সাহেবের সঙ্গে আলম সাহেবের রীতিমত হাতাহাতি হবার জোগাড়।

অন্যান্য শিক্ষকেরা জোর করে তাদের থামিয়ে দিলেন। দুজনকে দুদিকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ছাত্রদের ধমকে সরিয়ে দেওয়া হলো জানালা থেকে। কিন্তু তারা কি আর যায়। ধমক খেয়ে কিছুদূর সরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা।

এতক্ষণে আবার তুমুল তর্ক লেগে গিয়েছে। তর্কটা হচ্ছে ভুতের অস্তিত্ব সম্পর্কে।

আদ্যিকাল থেকেই লোকে বলে আসছে, ভুত ভুত। কিন্তু ভুত কোথায়। কেউ কি দেখেছে ভুতকি। চাক্ষুস প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। আসলে ভুত জিনিসটা মানুষের মনের সৃষ্টি, একেবারে মনগড়া, যাকে বলে অলীক মিছে।

অন্যপক্ষও তেমনি জোর দিয়ে বললেন,—যা রটে তার কিছুটা ঘটে। শুধু শুধু তো আর একটা কথা ছড়িয়ে যায় না, তার মূলে কিছুটা ভিত্তি থাকা চাই। আর চোখে দেখার কথাই যদি উঠে, তা হলে আল্লাহ্ তালাকে কেউ চোখে দেখেছে ? তবে লোকে তাঁকে মানে কেন ?

তাঁকেও যখন কেউ চোখে দেখেনি তখন আল্লাহ্ তালাকেও অলীক আর মিছে বলে তারা তো অনায়াসেই উড়িয়ে দিতে পারে।

আলম সাহেব বললেন, ভুতের সঙ্গে আল্লাহ্ তালার তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ্র অস্তিত্বেরই প্রমাণ। এমন কেউ আছে যে খণ্ডাতে পারে এই প্রমাণ। তো আমরা অহরহ পাচ্ছি। এই যে আপনি কথা বলছেন, আমি কথা বলছি এতো আল্লাহ্ তালারই 'শান'। তিনি না থাকলে দেশ-দুনিয়া চলতো কি করে ? সারা পৃথিবীর লোককে আহার জোগাচ্ছেন কে ? জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি এসব হচ্ছে কার আদেশে এই যে আলো, এই যে বাতাস, এই যে স্কুল ঘরটা সবই তো আল্লাহ্র অস্তিত্বেরই প্রমাণ। এমন, কেউ আছে যে খণ্ডাতে পারে এই প্রমাণ। কেমন তাই না ? প্রশ্নটা করা হলো সরাসরি শিরাজী সাহেবকে।

'শিরাজী সাহেবও আচমকা বলে ফেললেন, তা তো ঠিকই। তা নিয়ে তো কেউ কোন প্রশ্ন তুলছে না।'

ব্যস, ব্যস। তা হলেই দেখুন আমরা আল্লাহ্-তালার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। কিন্তু ভূতের প্রমাণ মিলছে না।

শিরাজী সাহেব দেখলেন এর একটা সমুচিৎ জবাব দেওয়া না গেলে সব কিছুই ভেস্তে যায়। কাজেই তিনি বলে ফেললেন, 'ও তো কোন চাক্ষুস প্রমাণ হলো না। আল্লাহতালাকে আপনারা দেখেছেন কেউ? তাকে যদি না দেখে বিশ্বাস করেন, তা হলে ভূতকেও না দেখে করবেন না কেন?

মোলভী সাহেব এতক্ষণ এক কোণায় বসে বসে এক মনে এঁদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। সাধারণতঃ এসব উচ্চ বিষয়ে তিনি বড় একটা কথা বলতে আসেন না, শিরাজী সাহেবের উক্তি তাঁর ধর্মপ্রাণ মনে আঘাত করল প্রচণ্ডভাবে।

তিনি বলে উঠলেন, 'ল হাওলা, ওলা কুওত'।

শিরাজী সাহেবও বুঝতে পারলেন যে, কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। বুদ্ধিমান লোক তিনি চট্‌পট্ সামলে নিয়ে বললেন, 'কথা হচ্ছিল ভূত নিয়ে। এর মধ্যে আল্লাহকে টেনে আন আমাদের উভয় পক্ষেরই ভুল হয়েছে।

কথাটা সেখানেই পড়ে যেতে পারত। কিন্তু রফিক সাহেব বলে বসলেন, 'আচ্ছা না হয় তাই সই। অন্য প্রমাণে আসা যাক। আমি প্রস্তাব করছি সরাসরি প্রমাণের কোন আবশ্যক নেই। কেউ যদি ভূতের অস্তিত্বের কোন যুক্তি-সহ নিদর্শন দেখাতে পারেন, তা হলেই হবে।

অতএব সিদ্ধান্ত হলো ভূতের নিদর্শন দেখানো হবে।

কিন্তু কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ভূতের নিদর্শন। বুড়ো রহিম সাহেব বললেন, 'বেশী দূর যেতে হবে না, কাছেই তেজগাঁ পেরিয়ে একটুখানি গেলেই ছোট-খাটো দলের উপদ্রবে বাড়ীটা পরিত্যক্ত হয়ে আছে। ইতিমধ্যেই ছবার হাত বদল হয়েছে বাড়ীটা। কত ভাড়াটে এলো আর গেলো, কিন্তু কেউ টিকতে পারে না ওখানে। রাত দুপুরে ধুপ-ধাপ শব্দ, তারপরেই হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে কান্না। ভয়ে কেউ টিকতে পারেনি আজো। একবার এক প্রফেসার ভাড়া নিয়ে ছিলেন ঘরটা গরম কাটানোর জন্যে, কিন্তু দুদিন থেকেই বোঁচকা পোটলা নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তিনি নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন ভূতকে। কংকালসার একটা ছায়ামূর্তি-দু'হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। যেন কাছে এসেই গলা টিপে ধরবে। প্রফেসর তো প্রাণের ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা দে ছুট মাঠের সপরিবারে রাত কাটতে হয় তাঁকে। সেই থেকে বাড়ীটা আর ভাড়া হয়নি। অমনিই খালি পড়ে আছে। ভূতের প্রমাণ পাবার এর চেয়ে আর ভাল জায়গা কোথাও পাওয়া যাবে না। যদি চান তো চলুন সেখানে। সামনে ছুটি আছে। তদুপরি এ অধীনের বাড়ীটা কাছেই। আমরা চার পাঁচজনা যাব। তবে হ্যা, এদের উপদ্রব নাকি বেশী লোকের মধ্যে হয় না। সুতরাং

আমরা সকলে পালা করে রাত কাটবে একে একে। আর নিজেও এ্যাদ্দিন ধরে কেবল শুনেই আসছি, এ সুযোগে আমারও এ সম্পর্কে সত্যা-সত্য। যাচাইয়ের একটা সুযোগ পাব।

কথাটা বলে তিনি চুপ করলেন।

ব্যাপারটা এতক্ষণ শুধু তর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সকল তর্ক যখন বাস্তব সমস্যার কাছাকাছি এল তখন সবাই চুপ। শিরাজী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি রাজী।'

অন্যান্যরা সবাই তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে জানালেন যে, তাঁরাও রাজী।

সুতরাং সব রকম বন্দোবস্ত পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেল। কথা রইল আসছে ছুটিতেই সবাই রওয়ানা হবেন। রহিম সাহেব ছাড়া আরও যাবেন চারজনা। রফিক সাহেব, আলম সাহেব, শিরাজী সাহেব আর ওসমান সাহেব। শেষের জন এতক্ষণ কোন কথায় যোগ না দিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন তার বাড়ীও ঐ এলাকার কাছাকাছি। ভারী রসিক লোক, কথায় কথায় চমৎকার ছড়া কাটতে পারেন। তিনি বললেন,

ভূত ভূত ভূত !
না দেখলে নাই জুৎ।

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি এসে গেল। দল বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলেন শিক্ষকদল। ঢাকা থেকে এক সঙ্গেই তারা বাসে উঠলেন বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে। দেখা গেল সবশুদ্ধ সাতজন ছাত্র সঙ্গী হয়েছে। আলম সাহেব জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তাদের বাড়ীও ঐ এলাকাতেই।

সে যাই হোক বাসে বেশীক্ষণ লাগল না গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছুতে। রহিম সাহেবদের বাড়ীর দেউড়ীটা বেশ বড়োই। সকলের এক সঙ্গে থাকতে বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না। সে রাতে তাঁরা দেউড়ীতেই কাটালেন, সিদ্ধান্ত হলো পরের দিনই তাদের যে কেউ একজন থাকতে যাবেন ঐ বাড়ীতে। প্রথমেই রফিক সাহেবের পালা। তর্কের দিনে তিনি অপেক্ষাকৃত নির্লিপ্ত ছিলেন, কাজেই তার মতামত প্রথমে শোনা দরকার।

বাড়ীটা ছোটখাটই বলতে হবে। সবশুদ্ধ চারটে ঘর-দু'টো ওপরে, দু'টো নীচে। ইতিমধ্যে একদিন দিনের বেলায় এসে গিয়েছিলেন সকলে।

নীচের কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। সিঁড়িটা আবার ভেতর দিক থেকে।

নীচের একটা ঘরে রফিক সাহেবের শোবার বিছানা করে দিয়ে গেছে ছেলেরা। রাত তখন দশটা। যাবার সময়ে ছেলেরা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে ঃ বিপদ বুঝলেই ডাক দেবেন সার। আমরা কাছেই থাকব।

তাদের ভয়ার্ত মুখ দেখে শির শির করে উঠলো রফিক সাহেবের গা। তবুও ছেলে-পিলেদের সামনে মনের ভাব গোপন করে বললেন, 'না না ভয়ের কি আছে।

ওসব ভূত-টুতে আমার বিশ্বাস নেই। আর সত্যিই বলতে কি ও সবের কোন অস্তিত্বই নেই। ও কেবল মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে কতকগুলি কথা মাত্র। তার বেশী দাম নেই ওর।

ছেলেরা তবু বার বার অনুরোধ জানাল যেন বিপদে তাদের স্মরণ করেন।

নিস্তব্ধ রাত। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ীটাও একেবারে মাঠের মধ্যিখানে—পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে। জোরে চীৎকার ছাড়লে সে আওয়াজ পর্যন্ত পৌছনো দায়। দিন দুপুরে কেউ কাউকে গলা টিপে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না। রফিক সাহেব একবার ঘরখানার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোণে একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে আর এক কোণে কুজো ভর্তি জল, একটা গেলাস, এ ছাড়া ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

আত্মরক্ষার হাতিয়ারের মধ্যে কেবল একটা ছোরা। ছোরাটা অজান্তেই তার হাতের মধ্যে উঠে এল। তবুও রফিক সাহেবের বুক দুর দুর করতে লাগল ভয়ে। কিন্তু তিনি ভাবলেন সম্বিৎ হারালে তাঁকে চলবে না। তিনি এসেছেন এক বিরাট সত্যের যাচাই করতে। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলেন রফিক সাহেব। পাশেই ছিল টলস্টয়ের বিশাল 'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসখানা। বইখানা টেনে নিয়ে তিনি বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দেখতে দেখতে বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি। তারপর কোন্ সময়ে যে ঘুমিয়ে পড়লেন টেরও পেলেন না।

তারপর অনেক পরে। রাত দু'টো কি তিনটে হবে। ধড়মড় করে জেগে উঠলেন রফিক সাহেব। মনে হলো কে যেন গলা টিপে ধরেছে তাঁর। দম আটকে আসছে। বুকের ওপর অসম্ভব চাপ। তার মনে হলো এ যাত্রা বুঝি আর রক্ষা নেই। শরীরে সমস্ত শক্তি জড়ো করে রফিক সাহেব প্রাণপণে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কেও কোথাও নেই। কোণের হারিকেনটা তখনো জ্বলছে টিমটিম করে। বাইরের ঘন কালো অন্ধকার, এক হাতের বেশী দৃষ্টি যায় না। অন্ধকার যেন প্রাণহীন, নিস্পন্দ। চারদিক থম থম করছে। রফিক সাহেব আর পারেন না।

হঠাৎ দূরে রাত্রির নীরবতা ভেঙে জেগে উঠল অসংখ্য শব্দ। ধুপধাপ, ঝুপঝাপ। যেন অসংখ্য লোক এক সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। বহুক্ষণ ধরেই চললো সেই ধুপধাপ। তারপর এক সময়ে মিলিয়ে গেল সেই শব্দও। তার জায়গায় ধীরে ধীরে জেগে উঠলো কান্না। করুণ সুরে, অনেকটা মেয়েলি গলায় দীর্ঘস্থায়ী করুণ বিলাপ। কেউ যেন হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে কাঁদছে। সে কান্নার ধ্বনি যেন রাত্রির বুক চিরে সমস্ত পৃথিবী মথিত করে তুলছে।

আর কী আশ্চর্য অবাক হয়ে শুনলেন রফিক সাহেব কান্নাটা যেন এগিয়ে আসছে এদিকেই। হ্যাঁ একেবারে এদিকে। এই ঘরের দিকে। কাছে, আরো

কাছে। আরো, আরো, আরো। তারপর রফিক সাহেবের মনে হলো কেউ যেন ঘরের মধ্যেই কাঁদতে শুরু করেছে। আর সেই মর্মভেদী বিলাপে রফিক সাহেব দিশেহারা হয়ে উঠলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি শুনে আসছেন অশরীরী জীবন নাকি আগুনকে খুব ডরায়। সে বিশ্বাসে হারিকেনের দিকে ছুটে গেলেন তিনি। অজান্তেই হারিকেনটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। কান্নাটা যেন আরো বেড়ে উঠেছে। প্রাণ-ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালেন রফিক সাহেব। হারিকেনটা হাতে নিয়ে উঠে গেলেন দোতালায়। কান্নাটা অসহ্য ঠেকছে, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই কান্নার হাত থেকে যেন আর রক্ষা পাওয়া নেই। কান্নাও যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দোতালায়। হ্যাঁ এবার আর নিস্তার নেই। কারা যেন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছু ধাওয়া করেছে। আর বাঁচবার পথ নেই তাঁর। এবার পৈত্রিক প্রাণটা বুঝি নিঃসন্দেহে হারাতে হয়।

ভয়ে অন্তরাত্মা উঠে গেল তার। শব্দটা এবারে একেবারে কাছে ঠিক পিছনটিতে। চীৎকার করে ঘরে দাঁড়ালেন রফিক সাহেব। দেখলেন তাঁর সামনেই একটা জলজ্যান্ত কংকাল মূর্তি হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে তার দিকে।

এমন সময়ে তাঁর মনে পড়ল তাঁর ছাত্রদের কথা। বিপদের সময়ে বার বার করে ডাকতে বলে গিয়েছিল তারা। কিন্তু কি আশ্চর্য চিৎকার করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

বহু কষ্টে তিনি ডাকতে লাগলেন ঃ কে আছো ? কে আছো ? বাঁচাও বাঁচাও ? প্রতিধ্বনি জাগল ‘কেঁ আঁছো ? কেঁ আঁছো বাঁচাও বাঁচাও।

চীৎকার করতে করতে আবার নীচে ছুটে এলেন রফিক সাহেব। হারিকেনটা কখন যে হাত থেকে পড়ে গেছে টেরও পান নি। সমস্ত ঘরভরা জমাট অন্ধকার, কোথায় যে বিছানা কোথায় যে বালিশ, আর তার নীচে ছোরা বা কিছুই খুঁজে পেলেন না তিনি।

কান্নাটা আবার নীচে নেমে আসছে।

প্রাণভয়ে ছুটে চললেন শিরাজী সাহেব। না আর এখানে নয়। কাজ নেই বীরত্ব দেখিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তারপর অন্ধকারেই দে ছুট। ছুট্ ছুট ছুট। কিন্তু কোথায় গ্রাম ! কোথায় পথ। চোখে অন্ধকার দেখলেন রফিক সাহেব। পথ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। দুঃখে ক্ষোভে রফিক সাহেব চলার শক্তি হারিয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে গেলেন।

পরের দিন ছাত্রের দল খুঁজতে বেরিয়ে তাকে সেই অবস্থায় মাঠের মধ্যে আবিস্কার করলো। তারা যতই শুধায় ব্যাপার কি স্যর ? রফিক সাহেব ততই শুধু বলেন ঃ আছে, আছে। তারা আছে। ভূত আছে, তোমরা কেউ অবিশ্বাস কোরো না বাবারা। ওরা আছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সবাই বাবারা পীড়াপীড়ি করলে কি ব্যাপার খুলে বলতে। কিন্তু রফিক সাহেব মুখ খুললেন না। কেবল বলতে লাগলেন ঃ আছে আছে।

অনেক বলা-কওয়া সত্ত্বেও কেউ যখন কোন বিবরণ আদায় করতে পারলে না তার কাছ থেকে, তখন আলম সাহেব তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন আপনার কথা আমরা মানতে পারিনা আপনি যখন কোন বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারছেন না, তখন আমরা একথাই ধরে নিচ্ছি যে, আপনার কথায় সত্যতার অভাব আছে।

রফিক সাহেব প্রতিবাদ করলেন না সে কথায়, শুধু বললেন, 'আছে আছে, সব আছে।'

আলম সাহেব বললেন, 'বেশ ত আজই প্রমাণ হয়ে যাবে আছে কি নেই। আজই আমি থাকব। হ্যাঁ সারারাত থাকব। দেখি ভূত কেমন জিনিষ।'

রফিক সাহেব এবারে উঠে আলম সাহেবের হাত দুটি ধরে বললেন ঃ আমার একটা কথা রাখুন, ও কাজটি করতে যাবেন না। আপনি আমার 'কলিগ' মানুষ। আপনাকে আমার অনুরোধ, দয়া করে ও কাজটি করবেন না। বেঁচে থাকলে তর্ক করার সময় অনেক পাবেন, কিন্তু গোঁয়ার্তুমী করে জানটি দিতে যাবেন না।'

আলম সাহেব বললেন, 'বেশত ! আপনি তা হলে কি দেখেছেন, কি জেনেছেন, সব খুলে বলুন না। আপনার কথা যদি যথাযথ বলে মনে হয় তা হলে আমরা মেনে নেব।'

কিন্তু রফিক সাহেবের ঐ এক কথা।

"বেশী কিছু বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, ওরা আছে।"

কেউ সন্তুষ্ট হলো না ওঁর কথায়। কাজেই ঠিক রইল আলম সাহেব যাবেন সেদিনই ঐ পোড়া বাড়ীতে রাত কাটাতে। রফিক সাহেবের অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্বেও আলম সাহেব যখন আপন সিদ্ধান্তে অটল রইলেন তখন আর কি করা ! ছাত্ররা সব আগের দিনের মতো পোড়ো বাড়ীতে খাবার দাবার সহ আলম সাহেবের বিছানা করে দিয়ে এল।

যাবার সময়ে বললেঃ গতকাল আমরা অনেকক্ষণ থেকে যখন কোন সাড়া শব্দ পেলাম না, তখন বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম। আজকে একেবারে কাছাকাছি থাকব স্যার। ঐ যে আম গাছটা দেখছেন ওখানেই বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করবো আমরা। দরকার হলেই একটা ডাক দেবেন। অমনি এসে পড়বো আমরা সবাই।

আলম সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন ছাত্রদের কথা, বললেন, "আরে দুর দুর। তোমরাও যেমন। স্যারের কথা বিশ্বাস করতে গেছো। কিসসু করার দরকার নেই তোমাদের। তেমরা সবাই বাড়ী গিয়ে ঘুমাওগে। কালকে দেখবে সকালে সুস্থ শরীরে রহিম সাহেবের দেউড়ীতে বসে আমি চা খাচ্ছি।"

ছাত্রদের একজন বললে ঃ কিন্তু স্যার ওঁর কথাই বা অবিশ্বাস করি কি করে। তিনি তো আর মিথ্যে বলবেন না।

"মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়। ও হল মনের ভুল। মানুষ যখন ভয়ে বিহবল হয়ে যায়, তখন সে যা ভাবে ঠিক তাই দেখে।"

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল আলম সাহেবের। কী আশ্চর্য বুকের উপর কে যেন বসে আছে। ঘুমের মধ্যে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি কোথায় এবং কি করতে এসেছেন হঠাৎ যখন তাঁর মনে পড়লো, তিনি এসেছেন এক পোড়া বাড়ীতে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে চাক্ষুস প্রমাণ পেতে, তখনি বুকের উপরকার চাপটা তার শতগুণ বেড়ে গেল যেন। তখনও তিনি যদি জানতেন যে রফিক সাহেবেরও এ মনটা হয়েছিল, তাহলে তখনই সতর্ক হয়ে যেতেন, কিন্তু আলম সাহেব ভাবলেন হয়তো পোড়োবাড়ীর ছাত থেকে কিছু একটা বুকের ওপর পড়ে গিয়ে থাকবে। অনেক কষ্টে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে দাড়ালেন তিনি।

হঠাৎ তার শ্রবন শক্তিকে বধির করে জেগে উঠল সেই সুতীব্র কান্না, মিহি গলা, যেন নারী কণ্ঠের আর্ত ক্রন্দন। কান্নাটা যেন দোতলা থেকেই আসছে, এবং নেমে আসছে একতলার দিকে। আলম সাহেব কান পেতে শুনলেন সেই কান্না, ক্রমেই কান্নার শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, এবার নীচে, একেবারে নীচে! ঠিক যেন অনেকগুলি মেয়ে মানুষ কেঁদে কেঁদে ছুটে আসছে তার দিকে।

শুধু কি কান্না? সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ধুপধাপ শব্দ। কিন্তু আলম সাহেব তবু সম্বিৎ হারালেন না, সারাঘর যেন অদৃশ্য কোন জীবের দাপাদাপিতে মেতে উঠলো। দরজা-জানালাগুলি আপনা-আপনি খুলতে আর বন্ধ হতে লাগল। সে কি বিকট ধুপধাপ আওয়াজ। পাশের ঘরে ছুটে গেলেন আলম সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা জেগে উঠলো সেখানে।

আর এরি সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির সাথেও যেন এল বিরাট পরিবর্তন। ঘন্টা দুই আগেও আকাশের অবস্থা বেশ পরিস্কার ছিল। ইতিমধ্যে বাইরে সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যেও এসে পড়তে লাগল তারই এক একটা দমকা। হঠাৎ এক ঝটকায় হারিকেনটা পড়ে গেল। তেল উঠে খানিকটা বেশ করে জ্বলে উঠেই হারিকেনটা গেল নিভে।

সমস্ত ঘর জমাট অন্ধকার।

বাতাসের হুহুঙ্কার দাপাদাপি আর কান্না সব কিছু মিলিয়ে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হলো আলম সাহেবের কঠিন প্রাণও আঁতকে উঠলো তাতে।

কান্নার শব্দটা একেবারে কাছাকাছি। চমকে ফিরে তাকাতেই আলম সাহেব দেখতে পেলেন একটা অস্থিসার জীব বিকট মুখভঙ্গি করে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

এবারে আর কান্না নয়। হিহি, হিহি, হিহি,...কেউ যেন নাকি সুরে হাসতে লাগল। ওরা যেন বলতে চায়, কেমন দেখলে তো মজা। এবার যাবে কোথায় বাছাধন?

পিছিয়ে গেলেন তিনি।

একবার মনে পড়লো ছাত্রদের কথা। কিন্তু তাদেরও তিনি 'না' করে দিয়েছেন, পিছুতে পিছুতে একেবারে জানালার কাছে এসে পড়লেন আলম সাহেব। জানালার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ পেছন থেকে জানালাটাও দপ করে বন্ধ হয়ে গেল। দরজা জানালাগুলিও যেন ওদের ইচ্ছামত কাজ করছে। সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, পাশের ঘরে যাবার জানালাটা তখনও খোলা আছে। কি জানি পাছে দুয়ারটা বন্ধ হয়ে যায়, এই ভয়টা ভীষণ পেয়ে বসল তাকে। ছায়ামূর্তি খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আলম সাহেব দু'হাতে মুখ ঢেকে সজোরে ছুটে গেলেন দুয়ার দিয়ে। কপালক্রমে দুয়ারটা তার ঠিক পেছনেই বন্ধ হয়ে গেল আলম সাহেবও অমনি দুয়ারে খিলটি লাগিয়ে দিলেন।

একেবারে সব ঠাণ্ডা!

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাওয়ার অর্থ আরো ভয়ানক। তিনি ভাবতে লাগলেন বাইরে যাবেন কি যাবেন না। এমন অবস্থায় বাইরে গেলে ---! তার চেয়ে বড় কথা ছাত্রদের তিনি গর্ব করে বলেছেন, সকালের আগে বাসায় ফিরবেন না। তাদের কাছেই বা মুখ রক্ষা হয় কি প্রকারে।

শব্দটা যখন থেমেই গেছে তখন যাওয়া যাক না। কিন্তু তবু গা ছম ছম করতে লাগল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার।

দড়ির খাটির উপর দপ্ করে শুয়ে পড়লেন তিনি। বালিশে মুখ গুজে রইলেন। ভাবলেন কোন রকমে একটা ঘুম দিতে পারলে হয়। আর কোন উপদ্রব যদি না ঘটে তা হলে সকালে আল্লার নাম নিয়ে আস্তানায় ফিরা যাবে। চুপচাপ অনেকক্ষণ কাটালো। এমন অবস্থায় ঘুম কি আর আসে! শুয়ে শুয়ে তিনি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ একি? একি কাণ্ড! খাটটা যেন দুলে উঠলো না? হ্যাঁ, তাইতো খাটটা যে ক্রমেই শূন্যে উঠে যাচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই গায়ের উপর এসে পড়লো মস্তবড় একটা বাদুড়ের পাখার মত জিনিষ, একাধারে নরম আর গরম। ভীষণ ভয় পেয়ে হাউমাউ করে কেদে ফেললেন আলম সাহেব। আর সঙ্গে জেগে উঠলো একটুখানি নাকি গলায় ভীষণ অট্টহাসি ঃ হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ।

সে হাসি আর থামতে চায় না।

ভীষণ একটা শব্দে বন্ধ হয়ে গেল কামরার দুয়ারটা, আলম সাহেব ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলেন, দূর কোণায় একটা কালো রঙের ছায়া মূর্তি। মূর্তিটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

তারপর দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মূর্তিটা। কিন্তু অট্টহাসি থামলো না।

আলম সাহেবের ঠিক পিছনে একটা সামান্য শব্দ হতেই তিনি পেছনে ফিরলেন সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল কার সঙ্গে।

খ্যাঁক্ খ্যাঁক ... এইবার এইবার ...

কী আশ্চর্য।

অনেকগুলি মূর্তি তখন হেটে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

এইবার, এইবার। অবিশ্বাস কর, অবিশ্বাস কর।

কি করবেন ভেবে পেলেন না আলম সাহেব। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে ফেললেন তিনি। তিনি দেখলেন ওরা সংখ্যায় অনেক। মরতে হয় বীরের মত লড়াই করে মরাই ভাল, তিনি ঠিক করলেন তাঁর গায়ে হাত পড়লেই তিনিও ঝাপটে ধরবেন একটাকে, যা থাকে কপালে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। যাট হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

তবু গা ছম ছম করতে লাগলো তার।

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ। ...হাসি।

হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ।—আর অট্টহাসি।

হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ — কান্না।

তার উপর দুপদাপ শব্দ।

সারা ঘরে অনেকগুলি কালো মূর্তি।

কংকাল মূর্তি আবার এগিয়ে আসছে মুখ ব্যাদান করে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই অশরীর কায়া। হেলেদুলে। কাছে, আরো কাছে। আরো আরো আরো।

আলম সাহেব চোখ বন্ধ করে জাপটে ধরলেন মূর্তিকে।

তারপর ?

তারপর কি হল তাও বলতে হবে ?

তারপর রাত কেটে যথারীতি সূর্য উঠলো।

না আলম সাহেব মরেন নি। অদৃষ্ট সদয় ছিলেন তাঁর উপর। কপালক্রমে রক্ষা পেয়ে ফিরে এসে আবার স্কুলের কাজে যোগ দিয়েছেন। আসার সময়ে সদলেই এসেছিলেন সবাই তবে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেননি।

এরপর একদিন টিফিনের ছুটিতে টিচার্সরুম গরম হয়ে উঠলো আবার। হেড মাস্টার, এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার প্রভৃতি বয়স্ক জন ভিন্ন সকল শিক্ষকই উপস্থিত হয়েছেন। আজ এক জটিল তত্ত্বের মিমাংসা হবে। আজ সবাই ভূত-বিদ্বেষী আলম সাহেবের কাছ থেকে শুনবেন তার অভিজ্ঞতার কিসসা।

আলম সাহেব একটা প্যাকেট হাতে ঘরে ঢুকলেন।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন, বলুন দেখি, কি জানলেন।

'বলুন বলুন কি দেখলেন।'

আলম সাহেবের মুখ গম্ভীর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'বলছি।'

'শুধু একটা কথা বলুন প্রথমে ভূত আছে কি নাই ?

জবাবে আলম সাহবে বললেন, 'আছে।'

'আছে ?'

'আছে ?'

'কেন !'

'কি রকম ?'

'শুধু আছে যে তাই নয়, আপনাদের জন্য ভূতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও সংগ্রহ করে এনেছি।'

বলতে বলতে তিনি প্যাকেটখানা খুলে ফেললেন।

বেরিয়ে পড়লো কনুই অবধি একখণ্ড হাড়।

সবাই কাছে চলে আসছিলেন সে হাড় দেখবার জন্য। আলম সাহেব হাত তুলে তাদের নিরস্ত করে বললেন, 'এর সঙ্গে ছোট শ্লিপও লাগানো রয়েছে। এই যে দেখুন সুতোয় করে ঝুলছে। এতে লেখা আছে ডি, এম, সি,—আপনারা সবাই জানেন, ডি· এম· সি· হল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

ইতিমধ্যে স্কুলের দপ্তরী রহমান ছোট্ট আর একটা বাকসো নিয়ে এলো। সেখান থেকে বেরুল একটা সার্ট, কিছু সংখ্যক দাড়ি এবং পাঁচটা বোরখা।

পাঁচ জন ছাত্রকেও হাজির করলেন তিনি। তারা লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সার্টটা তিনি শিরাজী সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'এটাতো আপনারই।'

শিরাজী সাহেব হেসে বললেন, হ্যাঁ ভেবেছিলাম ওটা যখন আপনি আঁকড়ে ধরলেন তখন আমি ভেবেছিলাম, সার্ট আপনার হাতেই থাক আমি চলে যাই।' তার একথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল হলশুদ্ধ শিক্ষক ছাত্র। আলম সাহেব কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'থামুন, হাসার সময় পরে অনেক পাবেন।'

শিরাজী সাহেব বললেন, 'আমাদের দোষ হয়েছে। যে কোন শাস্তি আমরা নিতে রাজী।

আলম সহেব বললেন : 'আমি সব সময়ই আদর্শ শাস্তি দেবার পক্ষপাতী।' এই বলে তিনি বেয়ারাকে হাঁক দিলেন 'রামধানিয়া—'

রামধানিয়া আসতেই আলম সাহেব একখানা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, 'গরম ফুলুড়ি আর সবার জন্যে এক কাপ করে চা।'

ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, ছোট্ট একটি গলির ভিতর দিয়ে আসছিল খোকা, অন্ধকার হয়ে এসেছে, গলির ভেতরটাতে আরো অন্ধকার, এদিকটায় গ্যাস বাতি জ্বলে, আর সেই গ্যাসের আবছা আলোয় পথ চিনে যেতে বেশ অসুবিধে।

গলির মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ কি একটা শব্দ এলো তার কানে, থমকে দাঁড়ায় খোকা। এক মিনিট মাত্র, তারপরই একটা অসম্ভব চিন্তায় বুকটা তার ধড়াস করে উঠল, ভয়ে হাঁটু দু'টো কাঁপছে তার। সে ভাবতে লাগল, কি করবে, কি তার করা উচিত ? ইতস্ততঃ করতে লাগল খোকা।

কিন্তু বেশীক্ষণ এই অবস্থা রইল না। ধীরে ধীরে মনের সাহস ফিরিয়ে আনল সে। তার মনে হল এই মুহূর্তে সে যেন একটা বিরাট কর্তব্য করতে যাচ্ছে। অসীম সাহসে বুক বেঁধে সে পা টিপে টিপে এগুলো।

পাশেই একটা পুরনো একতলা বাড়ী। বাড়ী খানার প্রায় ভেঙ্গে-পড়া দশা। তা হলেও খোকা বেশ বুঝতে পারল ওর ভেতরে লোক থাকে। একটু ভেতরের দিকের একটা কামরাতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে—তারই একটুখানি আলো এসে পড়েছে রাস্তার ওপর। খোকা পাটিপে টিপে সেই আলো লক্ষ্য করে এগুলে।

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে খোকা এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। জানালাটা বন্ধ।

কিন্তু কাঠের ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়। একবার দৃষ্টি দিয়েই শুকিয়ে উঠল খোকার অন্তরাত্মা।

দেখল ঘরের ভেতর একপাশে একটা ভাঙ্গা লণ্ঠন জ্বলছে। আবছা আলোয় দশ বারো জন লোক বসে আছে। তাদের সবাইকে ভাল করে দেখা যায় না। তবু যা দেখলে তাতেই খোকার প্রাণ যায় যায়।

একটা লোক হতভম্বের মতো ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে আর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, হাতে তার একটা রিভলবার।

বাকী লোকগুলো ওকে ঘিরে রয়েছে।

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটা বলছে, 'না', ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।'

রিভলভারধারী কঠিন দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'করতেই হবে তোমাকে। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছ—।'

রিভলভারটা একবার নাড়ালো সে।

'একটুও শব্দ হবে না, একেবারে আধুনিক যন্ত্র' সামান্য একটু হিস্। তার পরেই ব্যাস।'

কিন্তু লোকটার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, মনের বল তারও কম নয়।

নিরুত্তর বসে রইল লোকটা।

তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অস্ত্রধারী আবার বললে, 'শোন তেওয়ারী, আধ ঘন্টা সময় দিলাম তেমাকে। এর মধ্যে মনস্থির করো। এই রইল কাগজ কলম। শুধু একটা সই, নইলে আধঘন্টা পরে আত্মারাম আর খাঁচায় থাকবে না।'

হঠাৎ চেতনা ফিরে এলো খোকার।

আর মাত্র আধ ঘন্টা। আর মাত্র আধ ঘন্টা। তার পরেই একটা প্রাণ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। খোকার মনের মধ্যে গেল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। না, আর এখানে নয় খোকা ভাবল। ত্রস্তে নেমে এল সে জানালা থেকে।

পা টিপে টিপে গলি থেকে বেরিয়ে খোকা দিল এক দৌড়। এক দৌড়ে এসে পড়ল রাস্তার মোড়ে।

বগলে বই চেপে সে ভাবতে লাগল, কি করবে এখন। কোথায় যাবে? খোকার মনে হল যেমন করেই হোক লোকটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র সে। বয়স্কো লোক যদি হতো, বন্ধু-বান্ধবদের জুটিয়ে সে নিজেই উদ্ধার করতো লোকটিকে।

বড় রাস্তায় অনেক আলো। ভয় তার কেটে গেল অনেকটা। তার জায়গায় ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল সাহস।

হ্যাঁ সাহস করে শুনতে হবে তাকে। এমন একটা কর্তব্য তাকে করতে হবে যা কতদিন ধরে সে কল্পনা করে এসেছে।

চট করে তার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বইয়ের অতি-পরিচিত মানুষগুলির কথা। সত্যেন ঘোষ। ডিটেকটিভ সত্যেন ঘোষ হবারই এইটেই সুযোগ।

কিন্তু খোকা ভাবল সত্যেন ঘোষ তো বয়স্ক বুড়ো লোক। সে বরং তার সাগরেদ তরুণ সুব্রত হতে পারে। ঠিক। সে হল সুব্রত। শক্তিমান, বলিষ্ট নির্ভীক সুব্রত। কোন চালাকী তার কাছে খাটে না। প্রত্যেকটা খুনী তার কাছে ধরা পড়ে। যারা পড়ে না তারা অসাধারণ। কিন্তু খোকাকে এবারে সে দুঃসাহসিক কাজের বিবরণ পড়াই নয়, এবার হাতে কলমে এগুতে হবে। এতদিন সে বীরের কীর্তি কলাপের কাহিনী পড়েই এসেছে, এবার সে নিজেই বীর হবে।

কিন্তু এখন কি করা যায়। মাথায় তার বুদ্ধিও আসছে না। দীনেন রায়ের ব্লেক যদি এই অবস্থায় পড়তেন তা হলে কর্তব্য ঠিক করতে তার এক মুহূর্তও দেরী হতো না। অথচ সময় খুব কম। না, আর দেরী করা চলে না। মাত্র আধঘন্টা সময়, তার মধ্যে আবার পাঁচ মিনিট ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।

তাইতো। লোকটাকে বাঁচাতে হবে যে। সেই আধঘণ্টা কাটবার আগেই আচমকা হানা দিয়ে লোকটাকে বাঁচাতে হবে মৃত্যুর কবল থেকে।

সে ভাবতে লাগল সত্যেন ঘোষ এরকম অবস্থায় পড়লে করতেন। ভাবতে ভাবতে তার মনে হলো এমন অবস্থায় তার কর্তব্য হচ্ছে একজন ইনসপেক্টার সঙ্গে করে সরাসরি ঘরে গিয়ে হানা দেওয়া।

ঠিক।

কিন্তু ইনসপেক্টার কোথায় থাকেন, তাও যে তার জানা নাই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। খোকা ভাবল, সমস্ত ব্যাপারটা একে একে খুলে বলাটা কেমন হবে ?

বিপদ আছে তাতে। এসব আনাড়ি লোক হয়তো চেঁচামেচি করে সব মাটি করে দেবে। টের পেয়ে পাখী ততক্ষণে উড়েই যাবে।

তবে হ্যাঁ, ইনসপেক্টরের খোঁজটা ওর কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

লোকটার সামনে গিয়ে সে খুব বুদ্ধিমানের মতো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এখন কয়টা বাজে বলতে পারেন ?'

লোকটা একটু অবাক হলেন। তারপর হেসে বললেন, 'সাতটা।'

খোকা একটু ভাবল।

'আচ্ছা, পুলিশের ইনসপেক্টর কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?'

'কেন খোকা ! পুলিশের ইনসপেক্টার দিয়ে কি করবে ?'

লোকটার কথায় খোকার রাগ হয় খুব।

খোকা ভাবে : লোকটা পেয়েছে কি তাকে, কতবড় একটা কাজ করতে বেরিয়েছে সে ! যদি সফল হয় তা হলে কালকের 'প্রভাতী' সংবাদ পত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে তার কীর্তিকথা প্রচার করা হবে।

লোকটার কথার জবাবে খোকা বললে, 'আমার দরকার। কোন ইনসপেক্টরের ঠিকানা জানা থাকলে দয়া করে বলুন।'

ভদ্রলোক একটুখানি চুপ করে থেকে তাকে বললেন, 'কেন, তুমি থানায় গেলে তো পার।

কথাটা ঠিক মনে ধরলো তার। থানায় রওয়ানা হল খোকা।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে থানার পথ চিনে সোজা সে হাজির হল থানার অফিস-ঘরে। সামনেই বসে ছিলেন ও-সি।

দেখলেন বেশ একটা অল্প বয়স্ক ছেলে কি যেন বলবে মনে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খোকা কি দরকার তোমার।

আবার খোকা মনে মনে বেজায় চটে গেল সে। কিন্তু মুখে শুধু বললে, 'অনেকগুলি লোক মিলে একটা লোককে খুন করছে।'

ও-সির কাজই হল অপরাধ যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। কাজেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

কোথায় ? কেমন করে ? তুমি কি করে জানলে।

খোকা তাকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বলল, সব শুনে ও-সি মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই তো।'

খোকার তখন সাহস আরও বেড়ে গেল।

সে বলল, 'শিগগীর চলুন। এতক্ষণে হয়তো লোকটাকে ওরা মেরেই ফেলেছে।

ও-সি তখন সঙ্গে জনা দশেক কনস্টেবল নিয়ে একটা জীপে গিয়ে উঠলেন।

জীব গাড়ীটা ছুটে চলছে। খোকার তখন কী আরাম। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে খোকা। দুরু দুরু কাঁপছে তার বুক। কত বড় একটা অভিযানে চলেছে সে। তার মনে হয় ওদের জীপটা যদি অন্য একটা জীপকে অনুসরণ করতে হত তা' হলে বেশ হত। সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যেত এক একটা গাড়ী। অবশেষে অপরাধীর গাড়ীটা ধরে ফেলতো তারা।

সেই গলির মোড়টা এসে পড়তেই খোকা বলল, 'থামুন, এইখানে।'

হুড়মুড় করে নেমে পড়লো সবাই।

খোকা বলল, 'সাবধানে পা টিপে টিপে আসুন নইলে,—ফুড়ুৎ।'

খুব সন্তর্পণে এগিয়ে এসে সেই একতলা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ভেতরে তখনও আলো জ্বলছে। আর ঘর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হাসির সাড়া। জানালার কাছে এসে খোকা উঁকি মারলে।'

ও-সিকে ফিস ফিস করে বলল, 'ওই ওরা।' ও-সি এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দুয়ারে আঘাত দিল। ভেতর থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর 'কে ?'

'দুয়ার খোল।'

দুয়ারটা পরক্ষণেই খুলে গেল। একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি চান ?'

খোকা দেখেই তাকে চিনতে পারল। সেই রিভলভারধারী।

'আরে এ যে দেখছি মমতাজ সাহেব।' ও-সি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার ?'

মমতাজ সাহেব বল্লেন, 'আমিও তো বলি কি ব্যাপার। আপনি যে হঠাৎ। তা আসুন আসুন ভেতরে আসুন।'

মমতাজ সাহেবের পিছু পিছু সকলে ঘরে ঢুকল। ও-সি সারাটা ঘর একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর চেয়ারের উপর পড়ে থাকা কাগজ-পত্রগুলি দেখতে-দেখতে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন।

মমতাজ সাহেব ও তার সঙ্গীরা সকলেই তখন দারুণ হকচকিয়ে গেছেন। এক সঙ্গে এতগুলি পুলিশ, দারোগা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল।

ও-সির হাসি দেখে তারা ঘাবড়ে গেল আরো। ও-সি তাদের ভয় ভাঙানের জন্যে বললেন, কিছু মনে করবেন না। অসময়ে হানা দিয়ে আপনাদের কাজের ব্যাঘ্যাত করলুম বলে। ব্যাপার কিছুই নয়। আমরা সবাই এসেছিলাম একটা অনুরোধ নিয়ে। আমরা যেন বাদ না পড়ি।

মমতাজ সাহেবও হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

তারপর কিছুক্ষণ খোশগল্প করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আসার সময় খোকাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে ভুললেন না ও-সি।

বাইরে এসে খোকাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন মোহন কখানা পড়েছ বল দিকি ?

খোকা বুঝতেই পারল না ও-সি কি বলছেন।

এ আবার কেমন রহস্য, সে ভাবল।

'মাথাটাতো গুলে খেয়েছ। দুনিয়া শুদ্ধ খালি চোর ডাকাত খুনী ছাড়া আর কিছু দেখনা। তোমাদের নিয়ে যে কি হবে, তাই আমি ভেবে পাই না।' খোকাকে আচ্ছা করে ধমকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এলেন।

বড় বড় অক্ষরে নীচের ঘটনাটি বেরুল।

গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজামিত্র রোডের বাড়ীতে আইটাই অভিনেতা সংঘ যখন তাঁহাদের নূতন নাটক 'খুন আর খুনের' মহড়া দিতেছিলেন তখন ফরাককাবাদের ও-সি-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ তথায় গিয়ে হানা দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সৈফুদ্দীন ওরফে খোকা নামে এক বালক থানা পুলিশকে সংবাদ দেয় যে কিছু লোক মিলে অপর একটি লোককে হত্যা করিতে যাইতেছে। তাহারা সেই লোকটিকে কোন একটি দলিলে স্বাক্ষর করিবার আদেশ সহ আধ ঘন্টার সময় দিয়েছে, এই আধ ঘন্টার মধ্যে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর না করিলে তাহাকে রিভলভার দ্বারা হত্যা করিবার হুমকী দেওয়া হইয়াছে। বালকের নিকট হইতে এই মর্মে সংবাদ পাইয়া ফররককাবাদের পুলিশ তথায় হানা দেয়। আরো জানা গিয়াছে যে, থানার ও-সি তথায় গিয়ে আইটাই সংঘের প্রসিদ্ধ অভিনেতা মমতাজ উদ্দীন সাহেবকে দেখিতে পান। ঘরের মধ্যে ঢোল, তবলা, পোষাক এবং একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিও তিনি দেখিতে পান, পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন। কিছুক্ষণ পূর্বে বালকটি যখন সেই পথ

দিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন নাটকের মহড়া চলিতেছিল, বালকটিকে যথোপযুক্ত ধমক দিয়া ও-সি বাড়ী পেঁৗছাইয়া দেন। জিজ্ঞেসাবাদের মধ্যদিয়া তাহার নিকট হইতে জানা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনী তাহার অত্যন্ত প্রিয়, মোট ১৮০ খানা মোহন সিরিজ, ১৮৯ খানা সেক্সটন ব্লেক, সব কটি কনান ডয়েল, নীহার গুপ্ত, পাঁচ কড়ি দের সব খানা গোয়েন্দা গ্রন্থ সে ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছে। ছেলেটি আগাথা কৃষ্টের নাম শুনিয়াছে, তবে ইংরাজী জানা না থাকায় এখনও শুরু করিতে পারে নাই।

অনুবাদ

- পুশকিনের ইসকাপনের বিবি

  ও

  গোগোলের পাগলের ডায়রী
- ক্যাথারিন ওয়েন্‌স্ পিয়ার-এর কালো মেয়ের স্বপ্ন

জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইস্কাপনের বিবি

> "ইস্কাপনের বিবি—গোপন অকল্যাণ"
> —আধুনিক ভাগ্য গণনার বই।

"আর বৃষ্টির দিনে
তারা এসে জমত
প্রায়।
তারা খেলত জুয়া—খোদা তাদের বাঁচান
পঞ্চাশ থেকে
শ'।
আর প্রায় তারা জিতত।
আর টাকার অংক লিখত
চক দিয়ে।
আর এমনি করেই তারা
সময় কাটাত বর্ষার"

রক্ষী বাহিনীর অফিসার নরুমোভের ঘরে একদিন তাস খেলছিলাম আমরা। দীর্ঘ শীতের রাত কেমন করে যে কেটে গেল টেরও পাইনা। ভোর পাঁচটার শেষে খেতে বসলাম আমরা। যারা জিতছিল তারা খেল খুব। অন্যেরা স্থানুর মত প্লেট সামনে নিয়ে কেবল বসেই থাকল। কিন্তু শ্যাম্পের আসার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। সবাই এসে যোগ দিল তাতে।

ঘরের কর্তা শুধালেন, "কি সুরিণ, কেমন কাটলো তোমার?" "রোজ যেমন,—হার। এটা মানতেই হবে যে আমি বড় দুর্ভাগা। আমি তো আর জুয়া খেলি না! চটতে পারি না আমি। কখনো মনকে আমি ঘুরে বেড়াতে দিই না। অথচ সব সময়েই আমি হারি।"

"আর কখনো প্রলোভন জাগেনি তোমার? তোমার স্থিরতায় অবাক হলাম।"

"কিন্তু হেরম্যানের খবর কি?" এক যুবক ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ করে অতিথিদের একজন বললেন, "জীবনে ইনি কখনো তাস হাতে করেন নি। তবু আমাদের সঙ্গে পাঁচটা অবধি বসে থেকে খেলা দেখছেন।"

"খেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে," হেরম্যান বললে, "কিন্তু আমার পক্ষে একান্ত দরকারী সম্পত্তি য কিছু আছে, বাড়তি পাবার লোভে সে টুকুও হারাতে চাই না আমি।"

"হেরম্যান না হয় জাতে জার্মান। কাজেই অর্থনৈতিক জ্ঞান ওর টনটনে" টর্মস্কি বললে, "এটা বুঝি। কিন্তু পৃথিবীতে যদি কাউকে আমি না বুঝে থাকি, তা হলে সে আমার দাদীমা, কাউন্টেস আনা ফেদোতোভনা!"

“ব্যাপার কি? সেটা কি রকম?” অতিথিরা জানতে চাইলেন। টমস্কি বলতে লাগলো, “এ আমার ধারণায় আসে না, কেন যে আমার দাদীমা তাস খেলেন না।”

“আশী বছরের এক বুড়ি জুয়া খেলবেন না এতে অবাক হবারই বা কি আছে বুঝলাম না।”

“তা হলে আপনারা দেখছি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানেন না।”

“সে তো ঠিকই। তাঁর সম্পর্কে সত্যিই আমরা কিছু জানিনে।”

“বেশ তা হলে শুনুন। সে ষাট বছর আগের কথা। পারী শহরে বেড়াতে গিয়ে দাদী সেখানে একবার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। মস্কোর এই উর্বশীকে দেখবার জন্যে লোকে তার পিছু পিছু ছুটত। রিচল্যু পর্যন্ত তাঁকে প্রণয় নিবেদন করে ছিলেন। দাদীমা বলেন লোকটা নাকি একটু হলেই দাদীর হৃদয়হীনতায় ক্ষেপে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছিলেন। তখনকার দিনে মেয়েরাও ‘ফারো’ খেলতেন। একবার রাজসভায় খেলতে গিয়ে তিনি নাকি অনেক টাকার কর্জে পড়ে গিয়ে ছিলেন। ঘরে ফিরেই তিনি তাঁর সৌন্দর্য তিলক মুছে ফেললেন, তুলে ফেললেন তার স্কার্টের হুপ্, দাদাকে তাঁর ঋণের কথা জানিয়ে তাকে সেটা পরিশোধ করতে বললেন। আমরা যদ্দুর জানি, দাদা ছিলেন অনেকটা দাদীর মোসাহেব গোছের। দাদীকে তিনি দারুন ভয় করতেন। আগুনকে যেমন মানুষ ভয় করে তেমনি ছিল তাঁর ভয়। যাই হোক, এতবড় ক্ষতির কথা শুনে তিনি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিসেব করতে লেগে গেলেন। দাদীকে তিনি দেখালেন যে ছয় মাসে তাঁদের পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আরো বললেন যে, পারীতে থেকে তাঁরা মস্কো এবং সারাটোভের জমিদারীর উপর টাকা পেতে পারেন না কাজেই টাকাটা দিতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন। দাদীমা তাঁর কান মুচড়ে দিয়ে সে রাতে একাই শুতে গেলেন—এই ভাবেই তিনি তাঁর অসন্তোষ জাহির করলেন। পরদিনই স্বামীকে ডেকে পাঠালেন। ভাবলেন পারিবারিক শাস্তির ফল নিশ্চয়ই ফলেছে। তাঁর জীবনে সর্ব-প্রথম তিনি যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু দাদা একেবারে অনড়। দাদী ভেবেছিলেন, যুক্তি তর্ক দিয়ে তিনি দাদাকে জয় করতে পারবেন। তাঁর যুক্তি হল চারধারে অনেক ঋণ হয়েছে বটে, কিন্তু একজন প্রিন্স আর এক ছুতার মিস্ত্রির মধ্যে পার্থক্যও আছে। কিন্তু যুক্তি তর্ক সবই ব্যর্থ হল। দাদা বিদ্রোহ করলেন। সে-ই দাদীর সংগে তাঁর শেষ সম্পর্ক। কী করবেন ভেবে পেলেন না দাদী। সম্প্রতি কিছুদিন ধরেই তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তির সংগে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই কাউন্ট সেইন্ট জার্মেইনের নাম শুনেছেন। তার সম্পর্কে মেলা গল্পই তো চালু রয়েছে। আপনারা জানেন এই ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিতেন ‘ভবঘুরে ইহুদী’ বলে—সে ইহুদীটি নিজেকে ‘জীবন রস’ এবং দার্শনিকের পাথর এর আবিষ্কর্তা হিসেবে জাহির করতেন। লোকে তার দিকে চেয়ে হাসতো, মনে করতো আসলে ও হচ্ছে একটা ঠগ, যদিও ক্যাসানোভা তাঁর জীবনীতে তাকে

গুপ্তচর বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, সেন্ট জার্মেইন তাঁর রহস্যময়তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত-দর্শন ছিলেন ; আর ছিলেন একজন অত্যন্ত বিনয়ী সামাজিক মানুষ। আজ পর্যন্ত দাদী তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসেন এবং কেউ যদি তাকে মন্দ বলে তা হলে এখনো তিনি ভয়ানক রাগ করেন।

'দাদীমা জানতেন যে সেন্ট-জার্মেনই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি তাঁর উপরেই নির্ভর করবেন ঠিক করলেন। অনতিবিলম্বে তার কাছে চলে আসার জন্যে তিনি তাঁর কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। খেয়ালী বুড়োও চলে এলেন অসম্ভব তাড়াতাড়ি।' এসে দেখলেন গভীর হতাশায় ডুবে আছেন দাদী। তার কাছে স্বামীর নিষ্ঠুরতার বিবরণ দিলেন তিনি মসীময় করে। দাদী তার দয়া ও বন্ধুত্বের উপরেই নিজের সমস্ত আশা ভরসা ন্যাস্ত করলেন। সেন্ট জার্মেইন একটুখানি ভাবলেন। "টাকাটা আমি আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু আমি জানি, টাকাটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনি শান্তি পাবেন না। কাজেই আমি আপনাকে আর কোন নতুন উদ্বেগ দিতে চাইনে। টাকা শোধ করার আরো একটা উপায় আছে। টাকাটা জুয়ায় জিতেও আপনি ফেরৎ দিতে পারেন।"

"কিন্তু প্রিয় কাউন্ট, আপনাকে আমি সত্যিই বলছি, টাকা পয়সা আমাদের একেবারেই নেই।"

'এর জন্যে অর্থের প্রয়োজন নেই', কাউন্ট সেন্ট জার্মেইন বললেন, 'দয়া করে আপনি আমার কথা শুনুন।'

তারপর তিনি তাঁকে এমন একটা রহস্যের সন্ধান দিলেন, যা শুনলে পরে 'তার জন্যে আমাদের সকলকেই সাংঘাতিক মূল্য দিতে হবে।' একথা শুনে যুবকদের মনযোগ বর্দ্ধিত হল দু'গুণ। টম্স্কি একটা পাইপ ধরাল। লম্বা একটা টান দিলে সে তাতে। তারপর আবার বলতে লাগল।

"সেই সন্ধ্যাতেই দাদী ভার্সাইতে জ্য-দে-লা বাইনের খেলায় এসে হাজির হলেন। টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখছিলেন ডিউক অব অরলিন্‌স। দাদীমা দেনার টাকাটা না আনার জন্যে একটুখানি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অজুহাত হিসাবে খাড়া করলেন একটা বানানো গল্প। তারপরই তার বিরুদ্ধে খেলতে বসলেন। তিনটে তাস তিনি বেছে নিলেন, একের পর এক বাজী ধরলেন সেগুলির উপরে। তিনটে দানই তিনি জিতলেন এবং যা' হারিয়েছিলেন সবটাই একে একে পুনরুদ্ধার করলেন।"

"নিছক ভাগ্য," দর্শকদের একজন মন্তব্য করলেন।

"ঠিক যেন রূপকথা", হেরম্যান বললে।

"হয় তো তাসে কোন মার্কা দেওয়া ছিল", তৃতীয় আরেকজন বললেন।

টম্স্কি গম্ভীর ভাবে বললে, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

নরুমোভ অবাক হয়ে বললে, "তোমার দাদীমা পরপর তিন তিনটে তাস আঁচ করে খেলতে পারলেন, আর তুমি কিনা আজও সেই রহস্যের সন্ধান পাওনি ?"

"হ্যাঁ, সে কথা জাহান্নামে যেতে দাও। দাদীমার চার ছেলের একজন হলেন আমার বাবা। চারজনই পাঁড় জুয়াড়ী। কিন্তু তবু তিনি তাঁর রহস্য তাঁদের কারো কাছেই উদ্ঘাটন করেননি বা আমাকেও বলেননি। তবু আইভান ইলিচ চাচার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তাই আমি আপনাদের বলছি। কথাটা তিনি আমাকে শপথ করে বলেছিলেন। মৃত চ্যাপলিটস্কি, অসম্ভব দারিদ্রের মধ্যে যার মৃত্যু হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করবার পর জুরিখের কাছে তিনি একবার তিন হাজার টাকা হারলেন। ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি। যুবকদের এসব ভুলত্রুটির প্রতি দাদীমা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর—কিন্তু যেমন করেই হোক, চ্যাপলিটস্কির উপর তাঁর দয়া হল খুব। তিনি তাঁকে তিনটে তাস দিয়ে বললেন, তাস তিনটে যেন তিনি একের পর এক খেলে যান এবং তাঁকে শপথ করালেন যে তিনি যেন জীবনে আর কখনো জুয়া না খেলেন। ক্যাপলিটস্কি তাঁর পাওনাদারের কাছে হাজির হলেন। পয়লা তাসেই পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজী জিতে গেলেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বাজির অংক দুইগুণ বাড়িয়ে দিলেন এবং ফের জিতলেন। তিন নম্বর তাসে যা হারিয়েছিলেন তারও কিছু বেশী আয় করেছিলেন ..."

"সে যাই হোক, এখনি পৌনে ছটা বেজে গেছে।"

সত্যিই তখন সকাল হয়ে আসছিল, যুবকেরা এক চুমুকে তাদের গ্লাস খালি করলে। তারপর তারা বিদায় নিলে।

দুই

“মনে হচ্ছে ম'সিয়ে যেন সেবিকাদেরই
বেশী পছন্দ করেন।”
“সে ক্ষেত্রে মাদাম কি করতেন ? তারা
একটু বেশী পবিত্র।”
—চালুকথা।

বৃদ্ধা কাউন্টেস ... ড্রেসিং রুমে আয়নার সামনে বসেছিলেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে তিনজন সেবিকা। এক জনের হাতে রয়েছে মুখে মাথার পাউডার, আর একজন নিয়েছে হেয়ার-পিনের বাক্স, তৃতীয় জনের হাতে একটি লেস—ক্যাপ—তাতে কড়া লাল রিবণ। সুন্দরী হবার ভান একটুও কাউন্টেস করতেন না, সে তার অন্তর্হিত হয়েছে বহু পূর্বেই। কিন্তু যৌবনের অভ্যাসগুলি তবুও বজায় রেখেছিলেন তিনি। সত্তর সালের দিককার প্রচলিত অভ্যাসগুলি পুরোপুরি পালন করতেন কাউন্টেস। আগের মতো ঠিক তেমনি সময় এবং ততটা যত্ন সহকারেই রূপসজ্জা করতেন।

জানালার কাছে এমব্রোয়ডারীর ফ্রেম নিয়ে বসেছিল একটি মেয়ে। সে বৃদ্ধার পালিতা।

অভিবাদন জানিয়ে ঘরে ঢুকল এক যুবক অফিসার।

“আদাব দাদীমা, আদাব মাদমোয়জেল লিজি। দাদী, তোমার কাছ থেকে আমি একটা অনুগ্রহ চাইব।

“কি সেটা বল ?

“তোমার সংগে আমার এক বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেব। তাকে আমি শুক্কুরবারে ‘বল’ এ নিয়ে আসতে চাই।”

“বেশ তো, শুক্কুরবার দিন সোজা বল-এ নিয়ে এসো ওকে। সেখানেই আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিও। তুমি কি...এর ওখানে গিয়েছিলে গতকাল ?”

“তা গিয়েছিলেম বই কি। চমৎকার সময় কাটালাম—সকাল পাঁচটা অবধি নাচলাম। ইলেটস্ কায়াকে কি সুন্দরই না লাগলো !”

“কী যে বলিস নাতি ! ও কি আর একটা সুন্দর ! ওর যে দাদী ছিল সেই রাজকুমারী পেট্রোভ্ নাকে দেখতে হত ! ভাল কথা, ও মহিলা নিশ্চয়ই এতদিন অনেক বুড়িয়ে গেছেন।”

“কি বললেন ; বুড়িয়ে ? উনিত মারাই গেছেন আজ থেকে সত্তর বছর আগে।”—অন্যমনস্কভাবে টমস্কি বলে ফেললে।

এই কথায় জোয়ান মেয়েটি চোখ তুলে যুবকটির দিকে ইংগিত করল। তার মনে হল, বুড়ির সমসাময়িক মহিলাদের মৃত্যুর খবর বুড়ির কাছ থেকে গোপন করে আসা হচ্ছে। এ কথা মনে হবার সংগে সংগে সে ঠোঁট কামড়ালো। এ খবরটা যদিও তার কাছে নতুন ছিল, তবু বুড়ি তেমন কোন উৎসাহ দেখালেন না।

কাউন্টেস বললেন, "মারা গেছেন? আর আমি কিনা খবরটাও জানিনা! একই সময়ে আমরা সম্ভ্রান্ত সেবিকা নিযুক্ত হয়েছিলাম। যখন আমাদের রাজদরবারে হাজির করা হল তখন—"তারপর মহিলা এই নিয়ে শতবারের জন্যে ঘটনাটি বললেন তাঁর নাতিকে।

"এখন তা'হলে পল"—একটু থেমে তিনি বললেন, "আমাকে একটু ধর দেখি, উঠে দাঁড়াই। লিজা আমার নস্যদানীটা কোথায়? প্রসাধন শেষ করবার জন্যে মহিলা সেবিকাদের সঙ্গে পর্দ্দার অন্তরালে চলে গেলেন। টম্স্কি এবং তন্বী মেয়েটি একা রয়ে গেল।

"কে কার পরিচয় করিয়ে দিতে চাও?" —নীচু গলায় লিজাভেটা আইভানোভ্না জিজ্ঞেস করলেন।

"নরুমোভ। তাকে চেন তুমি?"

"না,। সৈনিক, না বেসামরিক?"

"সৈনিক।"

"ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের?"

"না, ঘোড়সওয়ার দলের।"

মেয়েটি হাসল, কিন্তু আর কোন কথা বলল না।

"পল"—পর্দার পেছন থেকে কাউন্টেসের গলা শোনা গেল, "কিছু নতুন উপন্যাস পাঠিও। নতুন, কিন্তু দয়া করে আধুনিক উপন্যাস পাঠিও না।"

"কী রকম উপন্যাস চান দাদী?"

"উপন্যাসটা এমন হবে যাতে নায়ক তার বাপ মাকে গলা টিপে হত্যা করে না, যেখানে জলে ডুবে মরা নেই। জলে ডুবে মরার কথা শুনলে সাংঘাতিক ভয় হয় আমার।"

"ও-ধরনের নভেল আজকাল হয় না। মনে হচ্ছে, আপনি রুশ ভাষায় কিছু চান।"

"কিন্তু রুশ ভাষাতে কি আর নভেল আছে? বেশ তো নাতি, থাকে যদি তবে না হয় একখানা পাঠিও।"

"মাফ করবেন দাদী, আমার একটু তাড়া আছে...যেতে হচ্ছে আমাকে... ক্ষমা করো লিজাভেটা আইভানোভ্না। কিন্তু নরুমোভ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে আছে এ ধারণা কেন তোমার হল, তাত বুঝলাম না।"

কথা বলেই টম্স্কি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একা রইল লিজাভেটা আইভানোভ্‌না। একা একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সংগে সংগে রাস্তার অপর পারে একটা দালানের কোণ থেকে বেরিয়ে এল এক যুবক। তাকে দেখে লিজার মুখে ফুটে উঠল সলজ্জ রক্তিম আভা। সে আবার কাজে লেগে গেল। আবার ক্যানভ্যাসের উপর ঝুঁকে পড়ল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এলেন কাউন্টেস পরিপূর্ণ সাজে।

"লিজা"—তিনি ডাকলেন, "গাড়ীতে ঘোড়া জুততে বলো। একটু বেড়াতে যাব আমরা।"

লিজা ওর এমব্রোয়ডারী ফ্রেমের পেছন থেকে উঠে এসে হাতের কাজ সরিয়ে রাখতে লাগল।

"কি হয়েছে তোমার মেয়ে! তুমি কি কালা হয়েছ? শিগগীর বল গাড়ী জুতুক।"

"যাচ্ছি।"—শান্ত সুরে মেয়েটি বললে, তারপর দৌড়ে গেল হলঘরের দিকে। এক পত্র-বাহক প্রিন্স পল আলেজান্দ্রোভিচের পাঠানো কিছু বই তুলে দিল কাউন্টেসের হাতে।

"বেশ, তাকে আমার ধন্যবাদ জানাবে," কাউন্টেস বললেন "লিজা, লিজা, কোথায় দৌড়াচ্ছ তুমি!"

"কেন, যাবার জন্যে কাপড় পরতে।"

"অনেক সময় আছে নাতনী। বসো এখানে, প্রথম খণ্ডটি খোল। জোরে জোরে পড়।"

মেয়েটি একটা বই নিয়ে কয়েক ছত্র পড়লো।

"আরো জোরে", কাউন্টেস বললেন, "কী হলো তোমার বলো তো! কি, তুমি কথা বলতে পার না! ব্যাপার কী ... দাঁড়াও ... তোমার টুলটা কাছে নিয়ে এসো, আরো কাছে ... এইবার, এইবার।" লিজাভেটা আইভানোভনা আরো ছ পাতা পড়ল।

কউন্টেস হাই তুলতে লাগলেন।

"রেখে দাও ও-বই" কাউন্টেস এবার বলনলন," কী বাজে! আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বইটা পলের কাছে ফেরৎ পাঠাও। কিন্তু গাড়ীর কি হলো?

"গাড়ী তৈরী,"—রাস্তার দিকে তাকিয়ে লিজা উত্তর দিল।

"তা হলে তুমি এখনো কাপড়-চোপড় পরনি কেন? সব সময়ে আমাকে তোমার জন্যে বসে থাকতে হয়। এ অবস্থা অসহ্য নাতনী।"

লিজা ওর ঘরের দিকে ছুটে গেল। ছ মিনিট না যেতেই কাউন্টেস রেগে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। তিনজন সেবিকা তিন দিক থেকে আর একদিক থেকে এক জন আর্দালী ছুটে বেরিয়ে এল।

"এতক্ষণ ধরে খালি ঘন্টা বাজাতে থাকবো নাকি তোমাদের জন্যে?" চীৎকার করে কাউন্টেস বললেন—"যাও লিজাভেটাকে গিয়ে বলগে আমি বসে আছি ওর জন্যে।"

পোষাক পরে হ্যাট হাতে করে লিজা ঘরে এসে ঢুকল।

"এতক্ষণে হলো নাতনী! কিন্তু এত চটপটে দেখাচ্ছে তোমাকে! এত সব কিসের জন্যে? কার মন ভোলাতে চাও তুমি? কি রকম ঝড়ো আবহাওয়াটা দেখছ তো!"

"না, মহাশয়া"—চাকরটা বললে, "আবহাওয়া খুবই শান্ত।"

"তুমি ত সব সময়েই মাথায় তোমার পয়লা যা আসে তাই বলে ফেল। যাও জানালা খোল! ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম! বেশ বাতাস! সাংঘাতিক ঠাণ্ডা। গাড়ী ফিরিয়ে রাখতে বল। আজ আমরা বেরুব না। তোমার অমন করে সাজ-গোজ করার কোন মানে হয় না।"

"কী যে একটা জীবন আমার।" লিজা ভাবলে। সত্যি! লিজাভেটা আইভানোভ্না ছিল একটা দুর্ভাগা মেয়ে।

দাঁতে বলেছেন, বেগানা জনের অন্নও তিতো। আর পুরোনো সমাজের নারীর চেয়ে পরাধীনতার অর্থ আর কেউ বেশী বোঝে না। কাউন্টেস আদতে মন্দ স্বভাবের ছিলেন না। তাঁর প্রকৃতি ছিল খামখেয়ালী রকমের। জীবন যারা এ পৃথিবীতে ফুরিয়ে ফেলেছেন তিনিও ছিলেন তাঁদের মতোই কৃপণা, পরিকল্পিত স্বার্থপরতার শীকার। তাঁর নিজের শতাব্দী তিনি পেরিয়ে এসেছেন পুরোনো সমাজের আর মানুষের মতোই, বর্তমানে যাদের কাছে অপরিচিত। তবু সমাজের সমস্ত হৈ-চৈ এর মধ্যে তাঁরও একটা অংশ থাকতো। বলনাচের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াতেন; বসে থাকতেন নাচ ঘরের কোনো এক কোণে গিয়ে, মুখে মাখতেন রং আর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল তার পুরানো জমানার। তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি যেন বলরুমের ক্ষয়প্রাপ্ত অথচ ঘরের পক্ষে অপরিহার্য কোন সজ্জা-দ্রব্য। অতিথীরা এসেই এগিয়ে যেতেন তাঁর দিকে। অপরিহার্য ধর্মাচারের মতোই তাঁর সামনে মাথা নোয়াতেন তারা, তারপর তাঁকে নিয়ে আর কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না। সারাটা শহর এসে জড়ো হতো তাঁর ঘরে, আদব-কায়দায় তিনি ছিলেন একেবারে নিখুঁত—দেখা মাত্র কাউকে চিনে উঠতে পারতেন না।

তার অগুণতি চাকর-বাকরদের বসে বসে মুটিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। নিজেদের খেয়াল-খুশী মাফিক চলা—আর মনিবের অন্ন ধ্বংস করাই ছিল তাদের কাজ।

লিজাভেটা আইভানোভনা ছিল একটা পারিবারিক শহীদ। সে চা করত আর চিনি বেশী দেবার জন্যে গাল খেত। সে নভেল পড়তো, লেখকের দোষত্রুটির জন্যে দায়ী করা হত তাকে। বেড়াতে যাবার সময়ে কাউন্টেসের সংগে যেত কিন্তু মন্দ আবহাওয়া এবং রাস্তা খারাপ হবার জন্যেও তারই দায়িত্ব। একটা মাসোহারার

ব্যবস্থা ছিল তার জন্যে, কিন্তু টাকাটা পুরোপুরি কখনোই সে পেত না। তবু তার কাছ থেকে আশা করা হতো সে অন্য সবার মতই সাজগোজ করুক। অন্য সবার মতো—তার মানে সবার চেয়ে আলাদা। সামাজিক জীবনে ওর ভূমিকা ছিল বড় অসহায়ের। কেউ তার দিকে দৃষ্টি দিত না। নাচের আসরে সংগীর অভাব হলেই কেবল ওর ডাক পড়তো। যখনই কোনো মহিলার প্রসাধনের প্রয়োজন হতো, তখনই তিনি এসে লিজার বগলে একটা হাত গলিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেতেন এটা-ওটা তুলে দেবার জন্যে। তার ছিল আত্মমর্যাদাবোধ। কাজেই নিজের অবস্থা তাকে বড় বাজত। চার পাশে কেবলি সন্ধান করতো যদি কোথাও তার মুক্তিদাতার সন্ধান মেলে। কিন্তু হিসেবী যুবকেরা তাদের মিথ্যে অহমিকাবোধের ফলে কখনো ওর দিকে নজর দিত না। অথচ দেখতে-শুনতে লিজা—সেই সব 'অগ্রসর' ভোঁতা [illegible], যাদের কাছে ওরা প্রেম নিবেদন করতো—তাদের চেয়ে শতগুণ বেশী সুন্দরী ছিল। কতবার সে বিশাল নির্জন বৈঠকখানার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চলে গিয়েছে পর্দা ঝুলানো ওয়ালপেপার ঢাকা, দেরাজময়, ছোট ছোট আয়না আর বিছানা-সর্বস্ব তার নিভৃত কামরাটিতে নির্জনে বসে কাঁদতে। গল্পের শুরুতে যে সন্ধ্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার দু'দিন পরে আর যে ঘটনা উপরে বলা হল, তার ঠিক এক সপ্তাহ আগে লিজা একদিন জানালার ধারে তার ফুলতোলা ফ্রেম নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ বাইরের দিকে দৃষ্টি যেতেই সে দেখলে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের একজন সামরিক অফিসার তার জানালার দিকে চোখ দুটি নিবন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নীচু করে লিজা আবার কাজে মন দিল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার তাকিয়ে দেখল সে। যুবক অফিসার তখনও ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা চলতি অফিসারদের সংগে প্রেম করার অভ্যাস লিজার ছিল না। কাজেই সে আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালনা। দু'টো অবধি সেলাই করল সে, এর মধ্যে একবারও মাথা তুলল না। ডিনার তৈরী হল। তখন সে উঠে হাতের কাজ গুছিয়ে রাখতে লাগল। হঠাৎ বাইরের দিকে দৃষ্টি যেতেই আবার সে দেখতে পেলে অফিসারটিকে। ডিনারের পরে একটু অস্বস্তি নিয়েই সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এবারে সে আর অফিসারটিকে দেখতে পেলো না। তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। ছয় দিন পরে কাউন্টেসের সংগে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে আবার সে দেখতে পেলো অফিসারটিকে। ঠিক আগের জায়গাটিতেই সে দাঁড়িয়ে আছে কলারে মুখ ঢেকে। ওর হ্যাটের মধ্যে থেকেও কালো চোখ দু'টো উঁকি মারছে। অজানা কারণে লিজাভেটা আইভানোভ্নার মনে কেমন যেন একটা ভয় হলো। সর্ব শরীরে অনুভব করলো এক অবর্ণনীয় শিহরণ।

ঘরে ফিরেই সে ছুটে গেল জানালায়। ঠিক আগের জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে অফিসারটি। ওর চোখ দু'টি লিজার দিকে নিবন্ধ। লিজা চলে এল সেখান থেকে। কৌতূহল ফেটে পড়ছে তার—এমন একটা অনুভূতির তাড়না জাগলো তার মধ্যে, যা সে ইতিপূর্বে আর কখনো অনুভব করেনি।

এই সময় থেকে একদিনও বাদ যায় না, রোজ ঠিক নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অফিসারটি। ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা প্রথাগত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে গেল। জানালার ধারে বসে কাজ করতে করতেই লিজা টের পেত, সে এসেছে। মাথা তুলে তাকাত ওর দিকে, অনেকক্ষণ ধরে এবং ক্রমেই বেশী বেশী করে। লিজার মনে হল, যুবক যেন এর জন্যে ওর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। যৌবনের তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে সে দেখতো—যত বারই ওদের চোখে চোখে মিলন ঘটতো তত-বার যুবকের বিবর্ণ মুখমণ্ডলে দ্রুত রংয়ের আভা ছড়িয়ে পড়তো। এক হপ্তা পরে লিজা একদিন ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলল ...

টর্মস্কি যখন কাউন্টেসের সঙ্গে যুবকের পরিচয় করিয়ে দেবার কথা পাড়ল, লিজার তখন বুক দুরু দুরু কাঁপতে শুরু করেছে। নরুমোভ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করত না, সে ছিল অশ্বারোহী—এ-খবর জানার পর তার দুঃখ হলো যে, বাচাল টর্মস্কির প্রশ্নের তোড়ে সে তার মনের কথা প্রকাশ করে ফেলছে।

হ্যারম্যান আধা-রুশ এক জার্মান ভদ্রলোকের ছেলে সামান্য পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির মালিক। নিজের স্বচ্ছল অবস্থাকে সুদৃঢ় করবার প্রয়োজনীয়তা সে গভীরভাবে বোধ করত, সুদের টাকাটায় একেবারেই হাত দিত না, একটুও বাজে খরচ করতো না, তদুপরি সে ছিল গভীর প্রকৃতির এবং উচ্চাভিলাসী। ওর অতিরিক্ত কৃপণতায় হাসবার সুযোগ খুব কমই পেত ওর বন্ধুরা। হেরম্যানের চিত্তবৃত্তি প্রবল, কল্পনা-শক্তি উদ্দাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কঠোরতাই তাকে যৌবনের খেয়ালীপনার হাত থেকে রক্ষা করেছে। এই কারণেই অন্তরটা তার জুয়াড়ীর হলেও সে কখনও একটা তাসও হাতে নেয়নি। তার মতে ওর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে, "বাড়তি পাবার লোভে হাতেরটাকে সে বিসর্জন দিতে পারে।" তা'সত্ত্বেও সারারাত জেগে সে তাসের টেবিলে বসে থাকবে আর তাস-খেলার নানা অধ্যায় অসম্ভব উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ করবে।

তিন তাসের কাহিনী শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হল সে। সারারাত ভাবনার হাত থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারল না।

পরের দিন সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবতে লাগল, "আচ্ছা যদি বৃদ্ধা কাউন্টেস্‌ তাঁর রহস্য আমার কাছে প্রকাশ করতেন, তা'হলে? যদি তিনি সেই অপরাজেয় তাস তিনটি কি কি, তা' আমাকে বলে দেন? নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করবার চেষ্টাই বা করবো না কেন? ... তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবো, তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী হবো, হয়তো তাঁর ভালবাসাও পাব। কিন্তু এ সবের জন্য সময়ের দরকার। বয়সও তার আশী হলো—হয়তো হপ্তা না পেরোতেই মরে গেলেন। এমন কি হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই। কিন্তু গল্পটাই বা কি রকম? বিশ্বাস করা যায়? ... না। তার চেয়ে মিতব্যয়, সংযম আর অধ্যবসায়ই বরং ভালো। এরাই আমার অপরাজেয় তাস। এসবের মধ্য দিয়েই আমার আয় বাড়বে

তিনগুণ হয়তো বা সাতগুণও। এর মধ্য দিয়েই আসবে আমার সুদিন আমার স্বাধীনতা।"

এইভাবে মনে মনে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে করতে সে দেখল, ইতিমধ্যেই সেন্টপিটার্সবার্গের একটা বড় রাস্তার উপর পুরানো ধরনের একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে সে। অগুণতি গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ, গাড়ীগুলো একের পর এক গিয়ে মিশেছে ঐ বাড়ীর উজ্জ্বল আলোক-সজ্জিত অঙ্গণের সঙ্গে। প্রতি মুহূর্তেই গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে কোন-না-কোন তন্বীর দুখানি পেলব চরণ, অফিসারের ডোরা কাটা মোজা আর কূটনীতিকের জুতো। সজ্জিত দ্বারবানের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে এক মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠবে ফারকোট ম্যান্টেলের উজ্জ্বল আলোয়। হেরম্যান থেমে গেল।

এক কোণে দাঁড়ানো এক পাহারাওয়ালাকে সে জিজ্ঞেস করল, "কার বাড়ী এটা?"

"... কাউন্টেস্ ... এর", পাহারাওয়ালা জবাব দিলে। হেরম্যান কাঁপতে লাগল। তাক্ লাগানো গল্পটা আবার ওর কল্পনাকে মেলে দিলে। বাড়ীটির এপাশ থেকে ওপাশ অবধি পায়চারি করতে লেগে গেল হেরম্যান। আর ভাবতে লাগলো, বাড়ীর মালিক আর তার আশ্চর্য সম্পদের কথা। নিজের ঘরটাতে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল ওর। অনেক রাত অবধি একা জেগে রইল অবশেষে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েও সে দেখলে তাসের স্বপ্ন—একখানা সবুজ টেবিল, ব্যাঙ্ক নোটের স্তূপ আর স্বর্ণমুদ্রার পাহাড়। একের পর এক তাস তিনটে খেলে গেল সে, তার হাতের শক্ত বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা তাসের কোণাগুলি জিততে থাকল সে, টেনে নিতে লাগল স্বর্ণরাশি, আর ব্যাঙ্ক নোটগুলি পকেটে ভরতে লাগল। ঘুম ভাঙলো খুব বেলাতে। কল্পনার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে মনে মনে দুঃখ হল ওর। তারপর আবার শহরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখল, সে এসে দাঁড়িয়েছে কাউন্টেসের বাড়ীর সামনে। ওর মনে হলো, কোন অদম্য শক্তির বলেই বাড়ীটা তাকে টেনে নিচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকাতে লাগল সে। একটা জানালায় সে দেখতে পেল একটা ছোট কালোচুলো মাথা ঝুলে আছে, হয়তো কেউ বই পড়ছে কিম্বা কোন কাজ করছে। একটুখানি মাথা তুললে সে। এবারে একটা ছোট মুখ আর কালো চোখ দেখতে পেল সে। সেই মুহূর্তটিই নির্ধারিত করে দিল তার ভাগ্যকে।

তিন

"তুমি আমাকে পত্র লেখ দেবী, চার পাতার বেশী,
আমার পড়ার গতির চেয়ে দ্রুত"—চিঠিপত্র।

লিজাভেটা সবে ওর পোষাক আর টুপীটা খুলে রেখেছে এমন সময়ে কাউন্টেস তাকে ডেকে পাঠালেন। বলে দিলেন আবার গাড়ী তৈরী করতে। আবার গাড়ীতে উঠতে গেলেন তাঁরা। ঠিক যে সময়টাতে দুই বাহক বৃদ্ধা কাউন্টেসকে ধরে গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে যেতে সাহায্য করছিল ঠিক সেই সময়ে একেবারে গাড়ীর চাকার কাছেই সে দেখতে পেলে ইঞ্জিনীয়ার যুবককে। লিজার হাতটা সে তুলে নিলে, লিজার ভয়-বিহ্বলতা কাটবার আগেই সে দেখতে পেলে ইঞ্জিনীয়ার অন্তর্হিত হয়েছে। লিজার হাতে একখানা চিঠি। চিঠিখানা সে দস্তানার নীচে লুকিয়ে ফেললে। যতক্ষণ গাড়ী চলল কিছুই সে শুনলে না, কোন কথাই তার কানে গেল না। কাউন্টেস গাড়ীতে উঠে প্রতি মুহূর্তে একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "লোকটা কে গেল ? এই পুলটার নাম কি ? ওখানে সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে ?" আজ কিন্তু লিজাভেটা একেবারে এলোপাথাড়ি জবাব দিয়ে কাউন্টেসের মেজাজ চড়িয়ে দিলে।

"কি হল তোমার মেয়ে। তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? আমার কথা কানে যাচ্ছে না তোমার ? বুঝতে পারছ নে আমার কথা ? ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো কথা বলার শক্তি হারাইনি।"

লিজাভেটা ওর কথা শুনছিল না। ঘরে ফিরেই সে ছুটে গেল তার নিজের কামরায়। দস্তানার মধ্য থেকে চিঠিখানা বার করে দেখলে চিঠিখানা শীলমোহর করা। চিঠিখানা সে পড়লে। ভালবাসার ঘোষণা। বিনয়-নম্রতার ভাষা, চিঠিখানা পুরোপুরি এমন কি প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে একটা জার্ম্মান উপন্যাস থেকে। লিজাভেটা আইভানোভনা জার্ম্মানি জানতো না, কাজেই চিঠি পড়ে সে খুশী হল।

তবুও চিঠিখানা দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করলে তার মনে। তার জীবনে এই সর্বপ্রথম সে কোনো যুবকের সঙ্গে গোপন এবং আন্তরিক একটা সম্পর্কের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। যুবকের ঔদ্ধত্যে ভয় হল তার। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে অনেক ভর্ৎসনা করলে সে। নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারল না লিজা। সে কি জানালার ধারে চুপ করে বসে থেকে অবহেলা দ্বারা

ওর অগ্রগতিতে বাধা দেবে? চিঠিখানা কি ফেরৎ দেবে, না বেশ ভোতা আর কটূক্তি করা একখানা জবাব লিখে দেবে? পরামর্শ দেবার মতো কেউ তার ছিল না। তার না ছিল কোন বন্ধু, না কোন উপদেশদাতা, লিজাভেটা ঠিক করল জবাবই সে দেবে।

ওর ছোট্ট লেখার টেবিলটাতে গিয়ে বসল লিজা। কাগজ কলম টেনে নিয়ে সে ভাবতে লাগল। কয়েকবারই সে চিঠিখানা শুরু করল, তারপর আবার ছিঁড়ে ফেলল প্রত্যেকবারই। কয়েক ছত্র শেষ পর্যন্ত যখন লেখা হয়ে গেল, লিজা সন্তুষ্টই হলো।

লিজা লিখল, "আমি নিশ্চিন্ত যে আপনার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল এবং আপনি কোনোমতেই আপনার চিন্তাবর্জিত ব্যবহার দ্বারা আমাকে আঘাত দিতে চান না। কিন্তু আমাদের পরিচয় এইভাবে হওয়া উচিৎ নয়। আমি আপনার চিঠিখানা ফেরৎ পাঠাচ্ছি, আশা করি, ভবিষ্যতে আমার পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে নিরর্থক অসৌজন্যের অভিযোগ করার কোন কারণ থাকবে না।

পরের দিন হেরম্যানকে আসতে দেখেই সে তার হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল, হল-ঘরে গিয়ে বড় জানালাটা খুলে ফেললে। তারপর যুবক অফিসারের তৎপরতার উপর ভরসা করে চিঠিখানা সে ছুঁড়ে দিলে রাস্তায়। হেরম্যান ছুটে এসে তুলে নিল চিঠিখানা। কাছাকাছি একটা বিস্কুটের দোকানে গিয়ে বসলে সে। শীল ভেঙে দেখতে পেলে তার নিজের চিঠিখানাই। সঙ্গে লিজাভেটার জবাব। এইটেই সে আশা করেছিল, কাজেই তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরল সে। এর তিন দিন পর ছোট একটি মেয়ে, উজ্জ্বল চোখ দুটি তার কাছের একটা দোকান থেকে তার জন্যে একখানা চিঠি নিয়ে এল। অসম্ভব আগ্রহে চিঠিখানা খুলে ফেলল লিজাভেটা। ভাবল, হয়তো কেউ কিছু অর্থ ভিক্ষা করেছে। কিন্তু হঠাৎ হেরম্যানের হাতের লেখা চোখে পড়লো তার।

"তুমি ভুল করেছ বোন, চিঠিখানা আমার নয়।" সে বললে।

"আমি নিশ্চিত। চিঠিখানা আপনারই" অসংযত মেয়েটা অর্থপূর্ণভাবে হাসল বলতে বলতে, "দয়া করে চিঠিখানা পড়ুন।"

লিজাভেটা চিঠিখানা পড়ল। হেরম্যান সাক্ষাৎপ্রার্থী। অনুরোধের ক্ষিপ্রতা এবং লেখার ধরন—উভয়ই অবাক করলে লিজাভেটাকে।

"এ নিশ্চয়ই আমার চিঠি নয়।" চিঠিখানা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

—"চিঠিখানা যদি আপনারই নয়, তা হলে আপনি ছিঁড়লেন কেন? না হলে আমি ফিরিয়ে দিতে পারতাম যার চিঠি তাকে।"

ওর কথায় ফেটে পড়ল লিজাভেটা, "ভবিষ্যতে আমার কাছে আর কোন চিঠি-পত্র আনবে না। যে এই চিঠি দিয়েছে তাকে বলো যে, তার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু হেরম্যান হার মানবার লোক নয়। কোন না কোন উপায়ে প্রতিদিন লিজার কাছে একখানা করে চিঠি পৌঁছাতে লাগল। এখন আর জার্মান থেকে অনুবাদ নয়। হৃদয়াবেগের প্রেরণায় সে নিজেই লিখতে লাগল, একে বারে স্বকীয় তার ভাষা। ওর পত্রে প্রতিফলিত হলো ওর বাসনার উদগ্রতা আর কল্পনার উদ্দাম বিশৃঙ্খলা।

চিঠি ফিরিয়ে দেবার কথা লিজাভেটা আর চিন্তাও করল না। ওরই মধ্যে মগ্না হয়ে গেল সে, জবাব দিতে লাগল সবগুলির। পত্রগুলি ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে উঠলো। অবশেষে নীচের চিঠিখানা সে জানালা দিয়ে ফেলে দিলে।

"আজ ... দূতাবাসে 'বল' নাচের আসর। কাউন্টেস সেখানে যাবেন। আমাকে একাকী দেখতে পাবার তোমার সুযোগ। কাউন্টেস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকরগুলি আমাকে ছেড়ে যাবে। কেবল সামনের দরজায় দ্বারবানই বসে থাকবে। কিন্তু সেও সাধারণতঃ তার ছোট কামরাটিতে চলে যায়। ঠিক সাড়ে এগারটায় এসে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেও। হল-ঘরে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে কাউন্টেস বাড়ী আছেন কি-না জিজ্ঞেস করবে। তারা 'না' বললে, সে ক্ষেত্রে তোমার ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু খুব সম্ভব কারো সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে না। দাসীরা সব তাদের নিজেদের কামরাতেই থাকবে। এন্টি-রুমের কাছে এসে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা এগিয়ে গেলে কাউন্টেসের শয়ন ঘরের সামনে এসে পড়ব। শয়ন ঘরে পর্দার অন্তরালে ছোট দু'টি দরজা দেখতে পাবে। ডান দিকেরটা চলে গেছে ছোট-খাট একটা পড়ার ঘরে। এটা কখনো ব্যবহৃত হয় না। বাঁ দিকের দুয়ার দিয়ে পড়বে ছোট একটা পথে। এর শেষে ছোট আঁকা-বাঁকা একটা সিঁড়ি—তার শীর্ষে আমার কামরা।"

বাঘের মতোই হেরম্যান পরম মুহূর্তটির অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে রইল। রাত দশটা বাজতে না বাজতে সে কাউন্টসের বাড়ীর সামনে এসে হাজির হল। আবহাওয়ার অবস্থা সাংঘাতিক। বাতাস গর্জাতে লাগল, সাদা তুষার কণিকাগুলি পড়তে লাগল ঝরে ঝরে, ঝাপসা আলো, রাস্তা জনশূন্য। থেকে থেকে দু'য়েকজন নিদ্রাহীন কোচয়ান মেলা-শেষের যাত্রী পাবার আশায় পথ অতিক্রম করছে। হেরম্যান ওর লম্বা কোট গায়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, বাতাসে এবং বরফ পাত সত্ত্বেও সে যেন কিছুই অনুভব করতে পারল না। অবশেষে কাউন্টেসের গাড়ী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হেরম্যান দেখলে কাউন্টেসের খেদ্‌মৎগার কাউন্টের হাতে ধরে তুলে দিচ্ছে। ফারকোট পরিহিতা কাউন্টেস উঠে আসতেই ওর ঠিক পেছনেই হেরম্যান দেখতে পেল ওর সঙ্গিনীকে, পাতলা কোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, ওর চেহারার একটুখানি নজরে পড়লো হেরম্যানের। গাড়ীর দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, তারপর বরফাচ্ছন্ন রাস্তার উপর গভীরভাবে চাকার দাগ বসিয়ে গাড়িটা

চলে গেল। হল-ঘরের রক্ষক সদর ফটকটা বন্ধ করে দিলে, জানালার বাতি নিবল। পরিত্যক্ত বাড়ীটার এক পাশ থেকে অন্য পাশ অবধি হেঁটে বেড়াতে লাগলো হেরম্যান। একটি ল্যাম্প-পোস্টের সামনে গিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সে। এগারোটা বেজে বিশ মিনিট। ঘড়ির উপর চোখ রেখে বাতির নীচে দাঁড়িয়ে রইল সে, বাকী সময়টা কাটাবার প্রতীক্ষায়। ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়ে সে কাউন্টেসের প্রাসাদের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর উজ্জ্বল আলোক সজ্জিত হল-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হল-ঘরের রক্ষক সেখানে ছিল না। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ছুটে গেল হেরম্যান, খুলে ফেলল এণ্টি-রুমের দুয়ার, দেখল একটা পরিত্যক্ত পুরনো আরাম কেদারার উপর বাতির কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছে চাকরটা। পা টিপে টিপে হেরম্যান পাশ কাটিয়ে গেল ওকে। নাচ-ঘর আর বৈঠকখানা অন্ধকার কেবল একটা আবছা আলো এসে পড়েছে এণ্টি-রুম থেকে। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করল হেরম্যান। সোনার বাতিদানে বাতি জ্বলছে ক্রুশচিহ্নিত একটা বেদীর সামনে। দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সোনালী কাজ করা চেয়ারগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে, চীনা কাগজে সারা দেয়াল মণ্ডিত। একটা দেয়ালে ঝুলানো প্যারিসে তৈরী মাদাম লেব্রার আঁকা দুটো পোট্রেট। একটা ছবি হল বেশ সমর্থ চল্লিশ বছর বয়স্ক এক লাল মুখো মানুষের। পরনে উজ্জ্বল তারকা খচিত সবুজ রংয়ের ইউনিফর্ম। অন্য ছবিটি উন্নত নাসা এক সুন্দরী যুবতীর। কলপ দেওয়া চুলগুলি সামনে থেকে পেছনের দিকে আঁচড়ানো, তাতে একটা গোলাপ। কোণায় কোণায় পোর্সেলিনের রাখালিনী মূর্তি, সুবিখ্যাত শিল্পী লীরয়-এর তৈরী ডাইনিং-রুম, বাক্স, পাখা, গত শতাব্দীতে প্রচলিত মেয়েদের নানা রকম খেলার সরঞ্জাম। তার সঙ্গে আছে মন্টগলফারের বেলুন, মেসমারের পঞ্চবশীকরণ। পর্দার পেছনে গিয়ে ঢুকল হেরম্যান। সেখানে একটি লোহার বিছানা দেখতে পেল সে, ডান দিকে পড়ার ঘরে যাবার দুয়ার, বাঁদিকের দুয়ার দিয়ে যেতে হবে বারান্দায়। দুয়ারটা খুঁজেই হেরম্যান দেখল, সরু একটা সিঁড়ি এঁকে-বেঁকে উঠে গেছে কাউন্টেস সঙ্গিনীর কামরার দিকে ... কিন্তু হেরম্যান ফিরে এসে অন্ধকার পড়ার ঘরটাতে গিয়ে বসলো। সময় কাটাতে লাগল ধীরে ধীরে। সব কিছুই নীরব। ড্রয়িং রুমের ঘড়িতে বারোটা বাজল। তারপর আবার পরিপূর্ণ নীরবতা। ঠাণ্ডা স্টোভের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেরম্যান। এখন সে শান্ত, কোন লোক যদি ভয়ংকর অথচ অবশ্য কর্তব্য কোন কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে তখন তার অবস্থা যেমন, ঠিক তেমনি স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল হেরম্যানেরও হৃৎস্পন্দন। ঘড়িতে একটা বাজল, তারপর দু'টো, দূর থেকে গাড়ী চলার শব্দ ভেসে এল কানে। আপনা থেকেই তার মধ্যে জেগে উঠল সে এক ধরণের অদ্ভুত উত্তেজনা, গাড়ীটা কিছুটা চলেই থেমে গেল। গাড়ীর পাদানী লাগাবার শব্দ এল তার কানে। ঘরের মধ্যে তুমুল হট্টগোল। চাকর-বাকর সব দৌড়ে বেরিয়ে গেল, নানা-জনের গলা, সমস্ত বাড়ী আবার আলোকিত হয়ে উঠল। তিনজন বৃদ্ধা সেবিকা শোবার ঘরে এসে ঢুকল ! তার পরেই

এলেন কাউন্টেস্। দেহে প্রাণ আছে মনে হলো না, এসেই একটা আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিলেন তিনি। হেরম্যান একটা ছিদ্র দিয়ে দেখতে লাগল। লিজাভেটা আইভানোভনা গেল একেবানর ওর পাশ দিয়েই। বাঁকানো সিঁড়ির ওপর লিজার পদশব্দ পর্যন্ত পেলো হেরম্যান। তার মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে অনুশোচনার একটুখানি দংশন যেন জাগল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল সেটা। আর পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্টেস্ কাপড়-চোপড় খুলতে লেগে গেলেন। তার গোলাপী ফিতেওয়ালা টুপী খুলে রাখলেন, ধূসর চুলের ওপর থেকে পাউডারের আচ্ছাদনটি রাখলেন খুলে। বৃষ্টির মত অসংখ্য হেয়ারপিন ঝরে পড়লো তার চার পাশে। রূপার কাজ করা তার হলদে পোষাক পড়ে গেল মাটিতে। প্রাচীন প্রসাধন প্রণালীর অচলতার সাক্ষী হয়ে রইল হেরম্যান। শেষ পর্যন্ত কাউন্টেসের পরিধানে শুধু একটা ড্রেসিং গাউন আর একটা নাইট ক্যাপ ভিন্ন আর কিছুই রইল না। তাঁর বয়সোপযোগী পোষাকে যেন তাঁর বার্ধক্যের ভয়াবহতা গেল অনেকখানি কমে, তিনি যেন অনেকখানি স্বকীয়তা পেলেন।

সমস্ত বয়স্ক লোকের মতো, কাউন্টেসও অনিদ্রা রোগে ভুগছিলেন। পোষাক ছেড়ে সেবিকাদের বিদেয় করে তিনি জানালার ধারে আরাম কেদারাটিতে এসে বসলেন। ঘরের মোমবাতিগুলি সেবিকারা নিয়ে যাওয়াতে কেবল মাত্র ল্যাম্পের আবছা আলোই ঘরটাকে আলোকিত করছিল। পুরু ঠোঁটের ফালি দু'টো নাড়তে নাড়তে কাউন্টেস সেখানেই বসে রইলেন আর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে এদিক ওদিক দুলতে লাগলেন। ওর স্থির চক্‌চকে চোখ দেখে মনে হলো ঠিক এই মুহূর্তে কাউন্টেস একেবারে ভাবনা-চিন্তা-হীন। তাঁর দিকে চেয়ে যে কারোরই মনে হবে এদিক ওদিক দুলুনিটা যেন তাঁর ইচ্ছেয় করছেন না, তিনি কোন অদৃশ্য শক্তির তাড়নাই যেন এইভাবে দুলিয়ে দিচ্ছে তাঁকে! হঠাৎ সেই মৃত-মুখে দেখা দিল অদ্ভুত এক পরিবর্তন। চোখ দু'টো ধক্ করে জ্বলে উঠল, ঠোঁট নড়া থেমে গেল।

আবার, একটা অজানা অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। "ভয় পাবেন না, ঈশ্বরের দোহাই ভয় পাবেন না", মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরে হেরম্যান বললে' "আপনার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছাই নেই আমার। আপনার কাছ থেকে কেবল একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি।"

বৃদ্ধা নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল তিনি যেন ওর কথা শুনেন নি। হেরম্যানের মনে হল, তিনি যেন কানে শুনতে পান না। বৃদ্ধার একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে কথাটা আবার বলল হেরম্যান। বৃদ্ধা আগের মতোই নীরব।

"আপনি আমার জীবনে শান্তি বিধান করতে পারেন", হেরম্যান আবার

বলতে লাগল, "তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমি জানি, আপনি আমাকে পর পর সেই তিনটে তাসের নাম বলতে পারেন... "

হেরম্যান থামে। কাউন্টেস্ যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তাঁর কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে। তিনি যেন জবাব খুঁজতে লাগলেন।

"ব্যাপারটা একটা ঠাট্টা, সত্যি বলছি, ও-কথাটা একেবারে নিছক একটা ঠাট্টা" কাউন্টেস্ বললেন।

রাগ করে হেরম্যান বলে উঠল, "ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। চ্যাপলিটস্কির কথা মনে করুন। আপনি তাকে হারানো সম্পদ ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।"

কাউন্টেস্ যেন খুবই বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর সর্বশরীরে ফুটে উঠল তীব্র হৃদয়াবেগ, কিন্তু একটু পরেই তিনি আগের মত আচ্ছন্ন অবস্থায় ঢলে পড়লেন।

হেরম্যান বলতে লাগল, "তাস তিনটে কি, তা আপনি আমাকে বলবেন না?"

কাউন্টেস্ নীরব।

তবু হেরম্যান বলতে লাগল, "কার জন্যে আপনি আপনার এ গোপন তথ্য রক্ষা করছেন? আপনার নাতিদের জন্যে? এমনিতেই তারা অজস্র বিত্তবান। তা ছাড়া অর্থের মূল্য তারা বোঝে না। অমিতব্যয়ীর কাছে আপনার তাসের কী মূল্য আছে, যে লোক তার বাপের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে না, সে তো দারিদ্র্যের মধ্যে মরবেই, তা যত বড় দানবই তাকে সাহায্য করুক না কেন। আমি অমিতব্যয়ী নই, অর্থের মূল্য আমার জানা আছে। আমার হাতে পড়লে আপনার তাসের অমর্যাদা হবে না। এখন আসুন ... বসুন "

হেরম্যান থামল। দুরু দুরু বুকে ওঁর জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল। কাউন্টেস তবু নীরব। হেরম্যান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

"আপনার অন্তরে যদি ভালবাসার অনুভূতি জেগে থাকে, একবারও ভালবাসার উদ্দামতার পরিচয় যদি পেয়ে থাকেন, যদি কখনো হেসে থাকেন, নবজাতকের প্রথম পৃথিবী স্পর্শের কান্নায়, আপনার অন্তরে যদি একটুখানি মানবীয় অনুভূতিও জেগে থাকে, তা হলে সেই স্ত্রীত্বের নামে, সেই ভালবাসার নামে, সেই মাতৃত্বের নামে— জীবনের যত পবিত্র জিনিস, সব কিছুর নামে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাই, দয়া করে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না। আপনার রহস্য উদঘাটন করুন আমার কাছে। কি দরকার তাতে আপনার? হয়তো এর সঙ্গে কোন ভয়ংকর পাপের প্রশ্ন জড়িত আছে, হয়তো ফলে পরলোকে আত্মার মুক্তি থেকে চিরতরে বঞ্চিত হতে হবে, হয়তো এর ফলে শয়তানের ফাঁদে পড়তে হবে ... ভেবে দেখুন ঃ আপনি বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশি দিন বাঁচবেন না। আমি

আপনার যত পাপ সব আমার নিজের কাঁধে নিতে রাজী আছি। কেবল আপনার রহস্যের সন্ধান দিন আমায়। মনে রাখবেন, একটা লোকের সুখ-শান্তি সবই নির্ভর করছে আপনার ওপর। শুধু আমি নই, আমার সন্তান-সন্ততি, নাতী-নাতনী, পৌত্র-পৌত্রাদিক্রমে আপনাকে আমরা স্মরণ করব, এক মনে করব পবিত্রতম ...”

বৃদ্ধা একটা কথাও বললেন না জবাবে। হেরম্যান উঠে দাঁড়ায়।

“বুড়ি পেত্নী কোথাকার! হেরম্যান বললে, “দাঁড়াও, কথা বার করছি তোমার মুখ থেকে।”

এই কথা বলেই সে পকেট থেকে পিস্তল বার করল। পিস্তল দেখে দ্বিতীয় বারের জন্যে বৃদ্ধা দারুণ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করলেন। মাথাটা পিছনের দিকে ঢলে পড়ল, হাত দু'টো উপরে উঠে গেল, যেন পিস্তলের গুলী থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই। তার পিছনের দিকে হেলে পড়ে স্থির হয়ে রইলেন।

“থাক! আর খুকিপনা করতে হবে না,” তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হেরম্যান বললে, “শেষবারের জন্যে আমি বলছি তাস তিনটের নাম আমাকে বলবে কি, বলবে না?” কাউন্টেস্ নিরুত্তর।

হেরম্যান দেখল, কাউন্টেস্ মৃতা।

চার

লিজাভেটা আইভানোভনা নিরের কামরায় বসেছিল, পরনের নাচের পোষাক তখনো খোলা হয় নি—গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘরে ফিরেই সে তাড়াতাড়ি ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ সেবিকাদের বিদায় করলে। সে নিজেই পোষাক ছাড়লে। তারপর কম্পিত পদে নিজের কামরাটিতে গিয়ে হাজির হল। সেখানে সে হেরম্যানকে দেখতে পাবার আশা করছিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মন চাইছিল, হেরম্যান সত্যি সত্যিই এসে না পড়লেই যেন ভাল। একবার চোখ বুলিয়েই লিজা দেখতে পেল, হেরম্যান সেখানে নেই। পোষাক না খুলে সেখানেই বসে পড়ল। ওর সঙ্গে দেখা না হবার জন্যে অদৃষ্টকে সে ধন্যবাদ জানাল। বসে বসে লিজা ভাবতে লাগল, কেমন করে তাদের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে এতদূর গড়াল। যুবক হেরম্যানকে জানালা থেকে প্রথম দর্শনের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে—ইতিমধ্যেই লিজা ওর সঙ্গে পত্র-বিনিময় করতে শুরু করেছে। অবশেষে হেরম্যান ওর কাছ থেকে গোপন সাক্ষাৎকারের সুযোগ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

পত্রের স্বাক্ষর থেকে লিজা ওঁর নাম জানতে সক্ষম হয়েছে। আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোন কথা হয়নি লিজার। আজকের সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বরও কোন দিন শুনতে পায় নি। কী অদ্ভুত যোগাযোগ।

আজই সর্ব্বপ্রথম টমস্কি প্রিন্সেস পলিনের সঙ্গে রাগারাগি করলেন— পলিন ওর স্বভাব অনুসারে ওর সঙ্গে ঢলাঢলি করতে চান নি। কাজেই ওর প্রতি অবহেলা দেখিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে লিজাভেটাকে ডেকে ওর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে 'মাজুরকা' নাচল। আর সারাক্ষণ সে ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসারদের প্রতি ওর পক্ষপাতিত্ব নিয়ে খালি ঠাট্টা-মস্করা করল। এও বললে যে, ওর সম্পর্কে লিজাভেটার যতখানি ধারণা, আসলে সে তার চেয়ে অনেক বেশী জানে। কয়েকটি মস্করা এমন চমৎকার খেটে গেল যে, লিজাভেটার মনে হল সে যেন তার গোপন কথা জেনে ফেলেছে।

হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "এসব কার কাছ থেকে জানলেন ?"

টমস্কি জবাব দিলে, "তোমার পরিচিত এক বন্ধুজনের কাছ থেকে। অত্যন্ত নামকরা একজন লোক।"

"তার নাম হেরম্যান।"

লিজাভেটা আইভানোভনা কোন জবাব দিলে না। কিন্তু তার হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল।

"এই হেরম্যান লোকটা সত্যিই একটা রোমান্টিক লোক। দেহের গঠন তার নেপোলিয়নের মত। আত্মা তার মেফিস্টোফেলিসের মতো। আমার বিশ্বাস, তার আত্মায় তিনটে পাপের চিহ্ন খোদিত আছে। আরে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছো তুমি।"

"আমার বড্ড মাথা ধরেছে", লিজা বলতে লাগল, "কিন্তু এই হেরম্যান না কে, সে তোমাকে কি বললে ?"

"হেরম্যান ওর বন্ধুর প্রতি অসন্তুষ্ট। সে বলে ওর জায়গায় যদি সে হত তাহলে সে অন্য রকম করত। আমার এও মনে হয় যে, তোমার উপরেও তার নজর আছে—অন্ততঃ ওর বন্ধুর কথা উঠলে গভীর মনোযোগ দিয়ে সে তার প্রেমের উপাখ্যান শোনে।"

"কিন্তু আমাকে সে কোথায় দেখতে পাবে ?"

"হয়ত গীর্জায়, কিংবা রাস্তায়। অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার কামরাতেও হতে পারে! এমন কিছু নেই যা সে ..."

তিন জন মহিলা খবর জানতে এসে ওদের এই বিব্রতকারী অথচ চমৎকার আলাপে বাধা দিলে।

টর্মস্কি প্রিন্সেস পলিনকেই বেছে নিল। নাচের অসংখ্য ঘুরতির মধ্যে টর্মস্কির সঙ্গে পলিন তার ভুল বোঝা-বুঝির অবসান করতে সমর্থ হল। নাচ শেষে টর্মস্কি ওকে আসন পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, নিজের আসনে যখন ফিরে এল তখন তার মন থেকে হেরম্যান আর লিজাভেটা অন্তর্হিত হয়েছে। লিজাভেটা মরিয়া হয়ে ওদের বাধাপ্রাপ্ত আলাপ শেষে আবার শুরু করতে চেষ্টা করল, কিন্তু এরি মধ্যে নাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় কাউন্টেস প্রস্থান করলেন।

টর্মস্কির কথাগুলি নাচের আড্ডায় গল্পের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। কিন্তু তবু নবীনা স্বপ্নময়ী তরুণীর বুকে তা' গভীর দাগ কাটলো।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। হেরম্যান এসে ঘরে ঢুকল। কাঁপতে লাগল লিজা।

অস্ফুট ভয়ার্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় ছিলে তুমি ?"

হেরম্যান জবাব দিলে, "বুড়ি কাউন্টেসের ঘরে। এখনি সেখান থেকে আসছি আমি। কাউন্টেস মারা গেছেন।"

"হায়! হায়! কি বলছ তুমি!"

হেরম্যান বললে, "মনে হচ্ছে আমিই তার মৃত্যুর কারণ।"

লিজাভেটা আইভানোভনা ওর দিকে তাকিয়ে দেখলে। টর্মস্কির কথাগুলি ওর মনে প্রতিধ্বনি তুলল। "লোকটার আত্মায় তিনটে পাপের চিহ্ন আছে।"

হেরম্যান লিজার কাছেই জানালার ধারের একটা আসনে বসে পড়ল। তারপর সব ঘটনাই বললে তাকে।

লিজাভেটা আইভানোভনা গভীর ভয়ে ওর কথা শুনলো। ত'হলে অতসব আবেগময় পত্র, আন্তরিক অনুরোধ আর অতসব সরাসরি এবং একরোখা কার্যকলাপের পেছনে ভালবাসা ছিল না? টাকা! অর্থের প্রতিই তা'হলে ছিল

ওর আত্মার তৃষ্ণা? ওর কামনার ধন, সুখের আকর তা'হলে লিজা নয়? সে তা'হলে শুধু অন্ধভাবে সাহায্য করেছে এক ডাকাতকেই, যে ডাকাত তার বৃদ্ধা আশ্রয়দাত্রীর হন্তা?

গভীর শোকমথিত দুঃখের অশ্রুধারা বয়ে গেল তার চোখ বেয়ে। হেরম্যান নীরবে তাকিয়ে রইল তারদিকে। তার অন্তরও ভেঙ্গে গেছে। লিজার অশ্রু কিংবা তার অপূর্ব সৌন্দর্য কোনটাই সে দুঃখের কারণ নয়। বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্যেও তার দুঃখ নয়। কেবল একটি জিনিসই আতংকিত করে তুলেছে তাকে, সেই গোপন রহস্যের অবলুপ্তি, যে ক্ষতি অপূরণীয়, যে রহস্যজ্ঞানের সহায়তায় হেরম্যান ধনবান হতে চেয়েছিল।

'তুমি একটা দানব', অবশেষে লিজাভেটা বললে।

'আমি ওর মৃত্যু চাইনি। আমার পিস্তলে টোটা ছিল না।' হেরম্যান জবাব দিলে।

ভোর হয়ে আসছিল। লিজা নিভু নিভু বাতিটা নিভিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে কেবল একটা ঝাপসা আলো। অশ্রুভরা চোখ পরিষ্কার করে সে দু'টি লিজা তুলে ধরল হেরম্যানের দিকে। জানালার ধারে একটা আসনে বসেছিল হেরম্যান, হাত দু'টি ভাঁজ করা, গভীর বিরক্তি ভরা মুখ। নেপোলিয়নের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য সেই মুখাবয়বের। সাদৃশ্যটা লিজাভেটারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'বাড়ী থেকে বেরুবে কি করে?' অবশেষে লিজাভেটা জিজ্ঞেস করল।

'ভেবেছিলাম গোপন সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাউন্টেসের শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাতে আবার ভয় করছে।'

'লুকানো সিঁড়িটা কোথায় আমাকে বল। আমি পথ খুঁজে বেরুব। লিজাভেটা আইভানোভনা উঠে দাঁড়াল। ওর দেরাজের ভেতর থেকে বার করল একটা চাবি। চাবিখানা সে হেরম্যানকে দিল। তারপর বিস্তারিত নির্দেশ দিলে তাকে। হেরম্যান ওর শীতল, নিথর হাতে একটুখানি চাপ দিয়ে ওর নত মস্তকে একটা চুমো খেল, তারপর বেরিয়ে গেল।

ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল হেরম্যান। তারপর আবার ঢুকল গিয়ে কাউন্টেসের কামরায়। বৃদ্ধা প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হয়ে আছেন। মুখের ভাবে গভীর প্রশান্তি। বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়াল হেরম্যান। তারপর বহুক্ষণ ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল যেন এই ভয়ঙ্কর বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চায় সে। তারপর সে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দরজার পর্দাটা পেছনেই সরে গেল। গভীর উত্তেজনায়-ক্ষুব্ধ মনে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সে।

তারপর মনে হল, এই সিঁড়ি দিয়েই ঠিক এই সময়েই ষাট বছর আগে হয়ত কোনো এক যুবক প্রেমিকপ্রবর গোপনে এ গৃহে প্রবেশ করেছিল। গায়ে ছিল

তার কাজ করা কোট, রাজছাঁটে চুল কাটা, বুকের উপর আঁকড়ে ধরা তিন-কোণা হ্যাট। সে হয়ত বহুদিন ধরেই তার কবরের মধ্যে পচে মরছে। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষতার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ শুধু আজই ...।

সিঁড়ির গোড়ায় হেরম্যান দেখলে একটা দরজা ; চাবি দিয়ে খুলে ফেললে সে। তারপরই স্যাঁত স্যাঁতে একটা পথ—সেই পথে সে রাস্তায় এসে পড়ল।

পাঁচ

সেদিনকার সেই পরম গুরুত্বপূর্ণ রাত্রির তিন দিন পর। সকাল বেলা হেরম্যান স্থানীয় একটা গীর্জায় গিয়ে হাজির হল। সেখানে মৃতা কাউন্টেসের শেষকৃত্যাদি পালন করা হচ্ছে। অন্তরে তার অনুতাপ বলে কিছু ছিল না যদিও, তবুও বিবেক জিনিসটা একেবারেই চুপ করে ছিল না। ক্রমাগত তার বিবেক যেন তাকে বলতে লাগল, "তুমিই এই বৃদ্ধার হন্তা।" সত্যিকারের ধর্ম বিশ্বাস তার মধ্যে কিছুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও তার মনটা ছিল কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। তার বিশ্বাস, মৃতা কাউন্টেস তার জীবনে নিশ্চয়ই কোনো না কোন অশুভ ছায়া বিস্তার করবে। কাজেই সে কাউন্টেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। উদ্দেশ্য কাউন্টেসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

গীর্জা লোকে লোকারণ্য, ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে বেশ কষ্ট হল ওর। ভেল্‌ভেটের চাদরের উপর দামী শবাধারটি রাখা হয়েছে। তার মধ্যে শায়িতা কাউন্টেস। বুকের ওপর হাত দুটি আড়াআড়ি ভাবে রাখা, মাথায় লেসের টুপী, পরনে সাদা সার্টিনের কাপড় ; তাঁকে চার পাশে ঘিরে রয়েছে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘরের লোক। চাকরদের গায়ে কালো কোট, কাঁধের উপর শোক-চিহ্ন, হাতে মোমবাতি। আত্মীয়েরা সবাই শোক প্রকাশ করছে, কাউন্টেসের ছেলে মেয়ে, নাতী-নাতনী, পৌত্র-পৌত্রী সবাই। কিন্তু কাঁদছে না কেউই। কান্না মানে আন্তরিক শোক। কিন্তু বুড়ির এতটা বয়েস হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুতে কেউ অবাক হয়নি। তাঁর আত্মীয়েরা মনে করতেন যে, বুড়ি বড় বেশী বেঁচে যাচ্ছে। বিখ্যাত এক পাদ্রী প্রার্থনা পুস্তক পড়লেন। সহজ কিন্তু আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি বর্ণনা করলেন এই ন্যায়-পরায়ণা মহিলার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনা। বললেন, 'সত্যিকারের একজন খৃস্টানের মৃত্যুবরণের জন্য বহুদিন ধরে প্রশান্ত ভাবে অপেক্ষা করছিলেন তিনি, মৃত্যুদূত মহৎ প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন মধ্য রাত্রির এই কন্যার আশায়। গাম্ভীর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে পরিচালিত হল অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান। মৃতদেহের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে পয়সা পেলেন কাউন্টেসের নিকট-আত্মীয়েরা। তারপরই অন্যান্যদের পালা—যারা এতদিন ধরে এর অলস লীলার সঙ্গী ছিলেন ; তাঁরা এসেছেন তাঁকে সালাম জানাতে। তাঁদের পরে বাড়ীর চাকর-বাকরদের পালা। সর্বশেষে গেলেন এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা—বয়সে মৃতার প্রায় সমতুল্য। দুইটি কুমারীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। মাটি পর্যন্ত নত হবার শক্তি তাঁর ছিল না। কেবল তাঁর চোখেই দেখা গেল অশ্রুবিন্দু। তিনিই কেবল মহিলার হস্ত চুম্বন করলেন।

হেরম্যান ঠিক করলে এবারে সে এগিয়ে যাবে। আভূমি নত হলো তার দেহ, ঠাণ্ডা মাটিতে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে রইল সে ; তার পর মাথা তুললো। তখন

মৃতার মতই বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখমণ্ডল। তারপরই সে বেদীর কাছে গিয়ে নুয়ে পড়ল। ... ঠিক সেই সময়েই তার মনে হল মহিলা যেন তাকে বিদ্রূপের দৃষ্টি হানলেন। দ্রুত পিছনে সরে আসতে গিয়ে পদক্ষেপের ভুল হওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পেছনে মাটিতে এসে গড়িয়ে পড়লো স। কয়েকজন ধরাধরি করে দাঁড় করিয়ে দিলে তাকে। ঠিক সেই সময়েই মূর্চ্ছিত-প্রায় লিজাভেটা আইভানোভনাকে কয়েকজন মিলে মৃতদেহের কাছে বয়ে নিয়ে গেল। এই ঘটনায় অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্য অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য চূর্ণ হলো যেন।

সমবেত জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। শুকনো-গোছের এক রাজ-কর্মচারী নিকটস্থ এক ইংরেজ পুরুষের কানে কানে বললে, "এই যুবক হল কাউন্টেসের জারজ-সন্তান।"

ইংরেজ ভদ্রলোক নিস্পৃহভাবে বললে, "ওহ।"

সারাদিন ধরে হেরম্যানের অন্তরে ঝড় বইল। রাত্রে খাবার খেলো জনশূন্য সরাইখানায়, যা সে কোনদিন করেনি—প্রচুর মদ টানল। ভাবলে মদের বন্যায় তার ভেতরের অশান্তিকে ডুবিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মদ খেয়ে ওর অশান্তির মাত্রা যেন শতগুণে বেড়ে গেলো আরো। ঘরে ফিরে নিজেকে সে ঢেলে দিলো শয্যায়। কাপড়-চোপড় পর্যন্ত ছাড়লে না। শীগগীর ঘুমিয়ে পড়ল তারপর।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন মধ্যরাত্রি। ঘরের মধ্যে চাঁদনীর আলো এসে পড়ছে। ঘড়ি দেখল, রাত্রি পৌণে তিনটে। চোখে ঘুম অন্তর্হিত হয়েছে তার। বিছানার ওপর বসে বসে কাউন্টেসের অন্ত্যেষ্টির কথা ভাবতে লাগল হেরম্যান।

ঠিক এই সময়ে রাস্তা থেকে কেউ যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখল। হেরম্যান সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। এক মুহূর্ত পরেই সামনের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। হেরম্যান ভাবলে,—আর্দালীটা বুঝি রোজকার মত মাতাল হয়ে ফিরছে। কিন্তু পায়ের শব্দ যেন অচেনা ঠেকল। কেউ যেন চটি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল শ্বেত-বসনা এক নারী। হেরম্যান মনে করল—বুঝি তার বুড়ি নার্সটা, কিন্তু এত রাত্রে সে কেন আসবে তা ভেবে পেলে না। কিন্তু ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে মূর্তিটা হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হলো। হেরম্যান চিনতে পারল,—কাউন্টেস!

বেশ স্পষ্ট স্বরেই কাউন্টেস বললেন, "আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার উপর আদেশ হয়েছে তোমার উপদেশ রক্ষা করার। তিন, সাত্তা আর টেক্কা—এই তিনটেই তোমার জিতের তাস, একটার পর একটা খেলে যাবে। কিন্তু একটা শর্ত। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা তাসের বেশী খেলতে পারবে না। সারা জীবনে আর দ্বিতীয়বার তাস খেলতে পারবে না। আমার মৃত্যুর জন্যে ক্ষমা করতে পারি তোমকে, যদি তুমি আমার সঙ্গিনী লিজাভেটাকে বিবাহ কর।"

এই কথাগুলি বলে ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে গেলেন তিনি। সপ্ সপ্ শব্দ করে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাইরের হল-ঘরের দ্বার বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলেন হেরম্যান। তারপর আবার দেখতে পেলেন কেউ যেন জানালা দিয়ে দেখছে তাঁকে।

অনেকক্ষণ অবধি হেরম্যান সহজ হতে পারল না। পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকলো সে। আর্দালীটা মেঝের উপর পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। অনেক কষ্টে তাকে জাগাল সে। রোজ যেমন আজো সে তেমনি মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ওকে জিজ্ঞেস করে কিছুই বুঝলে না হেরম্যান। বাইরে রাস্তার পার্শ্বের গেট বন্ধ। নিজের কামরায় ফিরে গেল হেরম্যান, একটা বাতি জ্বালাল, তারপর যা-যা দেখলে তার একটা বর্ণনা লিখে ফেলল।

ছয়

বস্তু-জগতে যেমন দু'টি বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে না, তেমনি মনের জগতেও দু'টি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা একই সঙ্গে মনের মধ্যে অবস্থান করতে পারে না। হেরম্যানের মনের মধ্যে মৃতা কাউন্টেস সম্পর্কিত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল 'তিন, সাত্তা আর টেক্কা।' তিন-সাত্তা-টেক্কা সব সময়ই তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, ও কথাটা সব সময়ে লেগে রইল তার ঠোঁটে। একটা মেয়ে দেখলে সে বলবে, "আহ কী সুন্দর। ঠিক যেন হরতনের তিনকা।" কেউ যদি সময় জিজ্ঞেস করে তাহলে সে বলবে, "সাতটা বাজতে পাঁচ।"

মোটা, গাট্টাগোট্টা কোন লোক দেখলেই তার টেক্কার কথা মনে পড়ে যাবে। তিনকা, সাত্তা অরা টেক্কার দৌরাত্ম্য এমনি প্রবল হল যে, ও তিনটে ঘুমের মধ্যেও নানারূপে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। ঘুমের মধ্যে তিন্‌কা-টি গরম-দেশের ফলবন্ত কোন গাছের রূপ নিয়ে হাজির হবে। সাত্তাকে তার মনে হবে প্রাচীন ঘর-দরজার বাঁকানো উপরি ভাগের মত। আর টেক্কা একটা বিরাট মাকড়শা।—তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা একটি মাত্র ভাবনার মধ্যে মিশে গেছে, আচ্ছন্ন করেছে তাকে ; সে ভাবনা হল ঃ কেমন করে কাজে লাগানো যায় তার গোপন শক্তি যা সে আয়ত্ত করেছে অসামান্য ক্ষতি দিয়ে। একবার সে ভাবলে পদত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবে। ভাবলে, সরকারী জুয়ার আডডায় গিয়ে ভাগ্যদেবীর হাত থেকে তার ধন-সম্পদ কেড়ে নেবে। ঘটনাক্রমে সেই অসুবিধে থেকে সে বেঁচে গেল।

খুব ধনশালী জুয়াড়ীদের একটা সমিতি তৈরী হয়ে গেল মস্কোতেই। বিখ্যাত চেকালিনস্কি হলেন তার সভাপতি—সারাটা জীবন এক রকম তাসের আডডায় কাটিয়েছেন বললেও চলে। জিতের টাকার জন্য বিল-অব-এক্সচেঞ্জ আর হারের অংশ কাঁচা টাকায় পরিশোধ করে এককালে লক্ষ লক্ষ টাকা করেছিলেন তিনি।

তার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার দরুণ বন্ধু-বান্ধবরা তার উপর সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করল, তার উন্মুক্ত গৃহ বিখ্যাত বাবুর্চি, অমায়িকতা এবং প্রফুল্ল স্বভাবের জন্যে সাধারণ্যে তার নাম ছিল। সেন্ট-পিটার্সবার্গে এলেন তিনি। শহরের নও-জোয়ানরা তাসের আসরের নাচ ছেড়ে তার কাছেই ভীড় করতে লাগল এসে। তরুণীদের সঙ্গে প্রেম করার চেয়ে 'ফারো' খেলাই তারা বেশী পছন্দ করল। হেরম্যানকে সঙ্গে করে নরুমোভ গেল তার সঙ্গে দেখা করতে।

বিশাল সুসজ্জিত কামরার পর কামরা অতিক্রম করে তারা এগিয়ে চলল, পথে সতর্ক বান্দারা দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন মিলিটারী জেনারেল আর

প্রিভিকাউন্সিল-সভা "হুইস্ট" খেলছিলেন। যুবকেরা ভীড় করে বসে আছে তার চারিদিকে। নরম কুশনে বসে বসে তারা বরফ খাচ্ছে আর পাইপ টানছে। বৈঠক-ঘরে একটি লম্বা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে জনা কুড়ি নওজোয়ান তাদের মধ্যেই বসেছেন গৃহকর্তা—টাকার ভাণ্ড তার হাতে। প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি তার বয়স, খুবই সম্ভ্রান্ত-দর্শন তার চেহারা, রূপার মত সাদা চুলে মস্তক আবৃত, তার পরিপূর্ণ সতেজ মুখে সদাশয়তা, আর সব সময় উজ্জ্বল হাসিতে চিক্ চিক্ করছে চোখ দু'টো।

নরুমোভ হেরম্যানের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। চেকালিমিনস্কি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন তার সঙ্গে। বললেন, তারা যেন দয়া করে "আনুষ্ঠানিকতা" না করেন। তারপর আবার তাস বিলি করতে লেগে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরেই খেলা চললো। তিরিশখানার বেশী তাস পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর। প্রত্যেকবার তাস বিলির পরেই চেকালিনস্কি একটু-ক্ষণ থামবেন, যাতে খেলোয়াড়েরা তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করতে পারেন, অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাদের অনুরোধগুলি শোনেন চেকালিনস্কি। কোনো অসতর্ক খেলোয়াড় যদি কোনো তাসের কোণ দুমড়ে দেন, তাও তিনি আশাতীত ভদ্রতার সঙ্গে টিপে সোজা করে দেন। এমনি করে অবশেষে দান শেষ হলো। চিকালিনস্কি আবার তাস কেটে বাঁটতে লাগলেন!

মোটাসোটা এক ভদ্রলোক—খেলছিলেন তিনি। তাঁর পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে হেরম্যান বললে, 'আমি কি একটা তাসে বাজী ধরতে পারি?'

চেকালিনস্কি হাসলেন। স্বীকৃতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। হেসে নরুমোভও অভিনন্দন জানালো তাকে বহুদিনের 'উপবাস' ভঙ্গ করবার জন্যে। পয়লা খেলাড়ীর সৌভাগ্য কামনা করলো সে তাঁর জন্যে। একখানা তাসের পেছনে চক দিয়ে লিখতে লিখতে হেরম্যান বললে, "আমার বাজী—"

ব্যাংক-কর্তা চেকালিনস্কি চোখ দুটো ছোট করে জিজ্ঞেস করলেন, "কত? আমি আবার চোখে দেখতে পাইনা।" "সাত চল্লিশ হাজার", হেরম্যান বললে।

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মুখ ঘুরে গেল। সবার চোখ হেরম্যানের দিকে।

নরুমোভ ভাবলে, হেরম্যানের বুঝি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

স্বভাব-সিদ্ধ হাসি সহ চেকালিনস্কি বললেন, 'দেখুন, যদি অনুমতি করেন তো বলি। বাজীটা খুব বেশী ধরেছেন। এখানে কোন ভদ্রলোক এক সঙ্গে দু'শো পচাঁত্তরের বেশী বাজী ধরেন নি।'

'তা বেশ,' হেরম্যান জবাব দিলে, "কিন্তু আমাকে আমার তাসে বাজী ধরতে দেবেন ত, নাকি?'

চেকালিনস্কি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লেন, বললেন, "আমি কেবল এই কথাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, যেহেতু আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের

বিশ্বাসভাজন হবার গৌরবের অধিকারী, কাজেই কাঁচা টাকার উপর ভিন্ন আমি খেলতে অপারগ। আমার পক্ষ থেকে এইটুকু বলতে পরি যে, আপনার কথার উপর বিশ্বাস করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু খেলার শৃঙ্খলা আর হিসেবের সুবিধের জন্যে আমি আপনাকে বলবো, টাকাটা আপনার তাসের উপর রেখে দিন।"

তাস বিলি করতে লাগলেন তিনি।

হেরম্যান পকেট থেকে একখানো ব্যাংক নোট বার করে তাসের উপর রাখলেন। তারপর এগিয়ে দিলে চেকালিনস্কির দিকে। টাকাটার দিকে একটি দৃষ্টি নিয়েই চেকালিনস্কি টাকাটা তাসের উপর রেখে দিলেন।

তাস বাঁটতে লাগলেন তিনি। ডান দিকে বেরুল—একখানা নয়লা, বাম দিকে একখানা তিনকা।

তার তাস দেখিয়ে হেরম্যান বললে, 'তিন জিতেছে।' খেলোড়দের মধ্যে বয়ে গেল অস্ফুট গুঞ্জন। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল চেকালিনস্কির। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর হাসিটা ফিরে এল আবার।

'তা হলে পাওনাটা আপনার মিটিয়ে দিই, কি বলুন?' চেকালিনস্কি শুধালেন হেরম্যানকে। 'আপনার দয়া' হেরম্যান বললে।

পকেট থেকে কয়েকখানা ব্যাংক নোট বার করলেন তিনি। পাওনাটা তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দিলেন। টাকাটা নিয়ে হেরম্যান টেবিল ছেড়ে চলে এল। নরুমোভ তো হতভম্ব! হেরম্যান এক গ্লাস লেমোনেড খেয়ে বাসায় ফিরল।

পরের দিন আবার চেকালিনস্কির ঘরে এসে হাজির হল হেরম্যান। গৃহকর্তা তাস বাঁটছিলেন। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন হেরম্যান। খেলোয়াড়রা সঙ্গে সঙ্গে জায়গা করে দিলে তাকে। চেকালিনস্কি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

হেরম্যান পরবর্তী দানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর একটা তাস বেছে নিয়ে তার সাত চল্লিশ হাজার টাকা সহ আগের দিনের জিতের টাকাটা রাখল তার উপর।

চেকালিনস্কি দান দিতে লাগলেন। ডান দিকে পড়ল একটা গোলাম। বাঁদিকে একটা সাত্তা।

হেরম্যান তার হাতের সাত্তাটা দেখাল। ঘরের মধ্যে বিরাট কোলাহল শুরু হয়ে গেল। চেকালিনস্কিকে দেখেই মনে হল বড্ড অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। চুরানব্বই হাজার টাকা গুনে হেরম্যানের হাতে তুলে দিলেন তিনি। খুবই শান্তভাবে টাকাটা তুলে নিয়ে হেরম্যান সেই মুহূর্তেই ঘর ছাড়ল।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার খেলার টেবিলে এসে হাজির হল হেরম্যান। প্রত্যেকেই আশা করছিল তাকে। যে সব জেনারেল এবং প্রিভিকাউন্সিল-সভ্য খেলা দেখছিলেন তারা 'হুইস্ট' খেলা ছেড়ে এলেন এমন একটা অসাধারণ খেলা

খেলতে। যুবক অফিসার সোক্কা থেকে উঠে এল খেলা দেখতে। এমন কি চাকরবাকরগুলি পর্যন্ত বৈঠক ঘরে এসে জড়ো হলো। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো হেরম্যানকে। অন্যান্য খেলোয়াড়রাও খেলা ছেড়ে এসে জড়ো হলো, হেরম্যানের ভাগ্যে এবারে কি ঘটে দেখবার জন্যে। চেকালিনিস্কির মুখটা বিবর্ণ, তবু হাসিটুকু লেগে আছে। তার বিরুদ্ধে খেলবে হেরম্যান একা—খেলার অপেক্ষায় টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে।

প্রত্যেকেই একটা প্যাকেট করে তাস বার করলে। চেকালিনিস্কি তাস ফেটলেন। হেরম্যান তুলে নিলেন একটা তাস। একরাশি ব্যাংক নোট দিয়ে ঢেকে দিলে সে তাসটা। এ যেন এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা।

চেকালিনিস্কি তাস বাঁটতে লাগলেন; হাত কাঁপতে লাগল তাঁর। ডান দিকে বেরুল রাণী আর বাঁ দিকে একটা টেক্কা।

নিজের তাসটা মেলে ধরে হেরম্যান বললে, "টেক্কা জিতেছে"

বিনয় করে চেকালিনিস্কি বললেন, "আপনার রাণী হেরে গেছে।"

চমকে উঠল হেরম্যান। সত্যিই! টেক্কার বদলে তার হাতে একখানা ইস্কাপনের রাণী! নিজের দৃষ্টি-শক্তিকে বিশ্বাস করতে পারল না সে। কিছুতেই সে বুঝতে পারলে না ইস্কাপনের রাণীটা কেমন করে তার হাতে এল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হল, ইস্কাপনের রাণীটা যেন তার দিকে চেয়ে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে, যেন তাকে চোখ ঠারছে। সাদৃশ্যটা চমকে দিলে তাকে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল: "সেই বুড়িটা!"

হারানো ব্যাংক নোটগুলি চেকালিনিস্কি নিজের দিকে টেনে নিলেন। নিথর দাঁড়িয়ে থাকল হেরম্যান। ও টেবিল ছেড়ে চলে যেতেই কণ্ঠ এক সঙ্গে কথা কয়ে উঠল।

"একেই বলে মার!" খেলোয়াড়রা বললে। চেকালিনিস্কি তাস ফেটলেন। খেলা চলতে লাগলো আগের মতো।

উপসংহার

উম্মাদ হয়ে গেল হেরম্যান। এখন তাকে পাওয়া যাবে অবুকভ হাসপাতালের ১৭নং রুমে। কোন কথ জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না সে, আর অসম্ভব তাড়াতাড়ি বিড় বিড় করে খালি নীচের কথাগুলি বলে 'তিনকা, সাত্তা, টেক্কা। তিনকা, সাত্তা, রাণী ...'

লিজাভেটা আইভানোভনার বিয়ে হয়েছে এক অত্যন্ত সুদর্শন যুবার সঙ্গে। সে যেন কোথাকার একজন অফিসার, বেশ ভালই আয়, এক বুড়ি কাউন্টেসের নায়েবের ছেলে। এক গরীব আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছে লিজাভেটা।

টমস্কি ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হয়েছে। রাজকুমারী পলিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার।

পাগলের ডায়েরী

৩রা অক্টোবর।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে—আজ আমার ঘুম ভেঙেছে অনেক বেলায়। মন্তরাদাসী আমার পরিষ্কার বুটজোড়া এনে দিল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, সময় কত। শুনলাম, দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। তৎক্ষণাৎ কাপড় চোপড় পরে নিলাম।

সত্যি বলতে কি, আজ আর অফিসেই যেতাম না। কেন না, অফিসে গিয়েই ত দেখতে হবে বিভাগীয় কর্তার ঝাঁকা-পানা মুখখানা। এটা আমি ভাল করেই জানি। কিছুকাল ধরে আমাকে দেখলেই ব'লে ওঠে, "দেখি তোমার মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। প্রায়ই দেখি তুমি এমন ভাবে ছুটছ, যেন তোমাকে কিছুতে পেয়েছে। আর দলিল-পত্রের সারমর্ম যা তৈরী কর, শয়তানেরও সাধ্য নাই, তার মর্মোদ্ধার করে, শিরোনাম লিখবে তুমি বড় হরপছাড়া, না দাও তারিখ, না কোন বিষয়-নির্দেশ।"

ব্যাটা, লম্বাপেয়ে বদমাস কোথাকার! নিশ্চয় আমাকে সে হিংসে করছে। কারণ আমি বড়কর্তার কামরাতে বসি, জনাবের পেন্সিল কেটে দিই। এক কথায় একাউন্টেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সম্ভবতঃ তার কাছ থেকে কিছু গলিয়ে নেবার আশা না থাকলে আজ আর অফিসে যেতাম না।

সাংঘাতিক লোক এই একাউন্টেন্ট।

তার কাছ থেকে অগ্রিম বেতন পাবার আশা যদি কেউ ক'রে থাকে, তবে সে দুরাশা। সে টাকা পাবার আগে আকাশ বরং ভেঙে পড়বে। তার কাছে গিয়ে আপনি কাকুতি মিনতি করতে পারেন ; জানাতে পারেন যে, আপনি ধ্বংসের একেবারে মুখোমুখি—তবু ব্যাট্যাকে এক তিল নড়ানো যাবে না। অথচ বিশ্বাসী অবগত আছেন যে, এই লোকটাই নিজের বাড়ীতে দু'বেলা চাকরের হাতের ঘুসি খায় কানের ওপর।

সত্যিই, আমাদের অফিসে চাকরী করে যে কী লাভ, সেটা বুঝি না। আদায় নাই বল্লেই হয়। বিচার বিভাগ কি রাজস্ব বিভাগে ব্যাপার এরকম নয়। সে সব বিভাগে যদি যান, তবে দেখবেন বিদঘুটেপণা লোক একটা বসে রয়েছে এক কোণে, লিখছে ত লিখছেই। পরনের কাপড় আর মুখের চেহারাটা এমন যে, দেখলেই

ও দুটোতে থুথু দিতে ইচ্ছে হয়। অথচ দেখুন গিয়ে এই লোকটাই শহরতলীর কি চমৎকার বাড়ীখানা ভাড়া নিয়েছে। পোর্সেলিনের সোনালী পেয়ালা ভেট দিতে চান ওকে? তা সে নেবে না। অত নীচু নয় তার নজর। বলবে, তা ওটা আপনার পরিবারকে উপহার দিবেন। একজোড়া ভাল স্পেনীয় ঘোড়া অথচ মুখঢাকা কলার লাগানো একটি পশমের কোটের নিচে আর কিছুতে তার মন উঠবে না। অথবা তাকে দেখায় কী গো-বেচারা! আর কত অমায়িক। বলবে, "মেহেরবানি করে আপনার কলমটা ছুরিখানা একবার দিন ত" এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি তার কাছে কোন দরখাস্ত নিয়ে যায়, তবে ধমকের চোটে এমন ভয় পাইয়ে দেবে যে, কাপড়-চোপড়ের সেলাই বলতে তার কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

এটা আমাদের মানতে হচ্ছে যে, আমাদের অফিসের কাজ-কর্ম বেশ সুচারুরূপে এবং ভদ্রভাবেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সরকারী অফিসের চাইতে আমাদের অফিস অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মান-সম্মান জ্ঞানও এখানে বেশী। টেবিলগুলি সেগুন কাঠের তৈরী আর প্রত্যেককে প্রত্যেকে জনাব বলে সম্বোধন করে। সত্যিই, এই সরকারী মর্যাদাটুকুও যদি না থাকত, তবে অনেক আগেই আমার পদত্যাগ-পত্র পেঁছে দিতাম। পুরানো পোষাকটা পরে নিলাম। ছাতাটা তুলে নিলাম হাতে। বাইরে তখন মৃদু বৃষ্টি-পাত হচ্ছিল।

রাস্তায় কেউ নেই—কেবল কয়েকটি মেয়েছেলে। বৃষ্টির জন্য তারা তাদের পরনের স্কার্টগুলি উল্টে মাথায় দিয়েছে। এ ছাড়া এখানে ওখানে দুয়েকজন ঘোড়ার সহিস কি এক দোকানিকে দেখা যাচ্ছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইতস্ততঃ কয়েকজন সরকারী চাকুরে। রাস্তার মোড়ের কাছে পেঁছে দেখলাম একটি লোক। তার দিকে চেয়ে আমি মনে মনে হাসলাম: "আহা, ভায়া! অপিসে যাচ্ছ না ত তুমি! আসলে তোমার আগে আগে যে যোয়ান মেয়েটি চলেছে, তার পিছু নিয়েছ তুমি। কতকগুলি অফিসারই আছে, যারা যে কোন পেটিকোট একটা দেখলেই হল, অমনি তার পিছু নেবে। তুমিও সেই জাতের।"

এমনি ধারা ভেবে চলেছিলাম।

যে দোকানটার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক সামনে থামলো একটি গাড়ী। তক্ষুণি চিনতে পারলাম: ডাইরেক্টারের গাড়ী। মনে মনে বললাম, তার আর দোকানে কিসের দরকার? এ নিশ্চয় তাঁর মেয়েটা।

দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। চাকর এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। পাখীর মত ফুরুৎ করে বেরিয়ে এল সে। কেমন গর্বভরে একবার বামে একবার ডাইনে ঘাড় দুলিয়ে দৃষ্টিপাত করল! কেমন করে ভ্রু কুচকালো; দুচোখে বিদ্যুতের ঝলকানি হায় হায়! এবার আমি ডুবেছি। আর কোন আশই নেই আমার, এবার ডুবেছি আমি.

কিন্তু আজকে এই বিশ্রী দিনটী ছাড়া বেরুবার কি আর সময় ছিল না? তবু তাকে বলে, মেয়েরা নাকি রূপচর্চার জিনিস বলতে অজ্ঞান।

সে তোমাকে চিনতে পারেনি। পোষাকের মধ্যে নিজেকে একেবারে মুড়ে ফেলেছি। আমার নোংরা সেকেলে পোষাকটা। এই পোষাকে সে আমাকে দেখবে, তা হয় না। আজকালকার ছেলেরা লম্বা কলারআলা পোষাক পরে অথচ আমার পোষাকের কলারখানা যেমন খাট, তেমনি দু'ভাজ করা। তা ছাড়া কাপড়টাও নিকৃষ্ট ধরনের।

ওর কুকুরটা দোকানের ভিতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কুকুরটাকে আমি চিনি, ওর নাম মেগ্‌গি।

দাঁড়িয়েছি এক মিনিটও কাটেনি, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, "সুপ্রভাত মেগ্‌গি।"

এ আবার কোন শয়তান! চারদিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ছাড়া মাথায় এগিয়ে আসছে দুই মহিলা। দু'জনে মিলে, একখানা ছাতা ভাগাভাগি করে মাথায় দিয়েছেন; তাদের একজন বুড়ি, অন্যজন যুবতী। আমাকে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন ততক্ষণে। আবার শুনলাম সেই কণ্ঠস্বর, "লজ্জার কথা মেগ্‌গি।"

কে ওটা? দেখলাম মহিলাদের পিছু পিছু চলছে আর একটা কুকুর। মেগ্‌গি তার দিকে চেয়ে নাকি সুরে কথা বলছে। ধুত্তোর! আমার মাথা খারাপ হয়নি ত! এমন ঘটনার কথা তো কখনো শুনিনি।

পরিষ্কার শুনতে পেলাম মেগ্‌গি বলছে, "না ফিডেল, ভুল বুঝো না আমাকে। আমার ত বউ-ওউ-ওউ অসুখ করেছিল। বউ-অউ-অউ।"

এত দেখছি আজব কুকুর! সত্যিই অসাধারণ, কুকুরে মানুষের ভাষায় কথা বলনছ শুনে আমি ত দস্তুর মতো অবাক মেরে গিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা যখন ভাল করে তলিয়ে দেখলাম, অবাক হবার কিছু রইলো না। বস্তুতঃ এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটে থাকে। অবাক হবার কি আর আছে এতে। শুনেছি ইংলণ্ডের একটা মাছ নাকি জল থেকে মথা তুলে দুয়েকটা কি করেছে, তাই নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতরা তিন বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছে, কিন্তু তার আর্ট বার করতে পারছে না। তা ছাড়া কাগজে পড়েছি, দুটো গরু নাকি এক দোকানে ঢুকে বলেছে, "এক পাউণ্ড চা দাও ত।"

ইতিমধ্যে মেগ্‌গি যা বলে চলল, মনে হল সেটা আরো উল্লেখযোগ্য। মেগ্‌গি বললে, "ফিডেল তোমার কাছে এই সেদিন আমি পত্র লিখেছি। পোল-কান বোধ হয়, চিঠিটা তোমাকে পেঁৗছে দেয়নি।"

আর কখনো যদি কুকুরের লিখতে পারার কথা শুনে থাকি, তবে এক মাসের বেতন হারাতে রাজি আছি আমি। সত্যই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক ঠেকছে। গত কিছু কাল পরেই আমি এমন এমন সব ব্যাপার দেখছি, আর এমন এমন সব কথা শুনতে পাচ্ছি, যা অন্য লোক পায় না।

ভাবলাম, এর ভেতরের ব্যাপারটা কি, জানতে হবে। তার জন্য কুকুরটার পিছু নেব ঠিক করলাম। যেমন ভাবা অমনি ছাতাটা খুলে মহিলা দুজনের পিছু পিছু চলতে শুরু করে দিলাম। বান ষ্ট্রীট পেরিয়ে সিটিজেন ষ্ট্রিটের দিকে মোড় ফিরল তারা। তারপর কক্কিব্রীজ-এর বাড়ীর সামনে থামল। বাড়ীটা আমি চিনতাম সুভারকফের বাড়ী। কী রাক্ষুসে এ সুভারকফ লোকটা। কেমন ধারা লোকেরা এখানে থাকে? কয়জন রাঁধুনী? ব্যাগ বইয়ে কজন? ঐ বাড়ীটার মধ্যে আমার অনেক সহকর্মী—থাকে হেরিং মাছের মত গাদা পাকিয়ে। আর আমার এক বন্ধু আছে, সেও থাকে ঐ বাড়ীতে। চমৎকার বাজাতে পারে ঐ বন্ধুটি।

মহিলা দু'টি পাঁচতলায় গিয়ে উঠল।

"বেশ, বেশ",—মনে মনে ভাবলাম, "ঘরের নম্বরটা টুকে রাখব। যাতে সুযোগ হলেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।"

৪ঠা অক্টোবর। আজ বুধবার। রোজকার মতো আজও আপিসে হাজিরা দিয়েছি। ইচ্ছে করেই আপিস থেকে আজ সকাল সকাল ফিরে এলাম। তারপর কলমগুলি সব কাটলাম। আমাদের ডাইরেক্টার নিশ্চয়ই খুব চতুর লোক, ঘর ভর্তি সব বইয়ের তাক। কিছু কিছু বইয়ের শিরোনামা আমি পড়েছি। খুবই সারগর্ভ এই বইগুলো—আমাদের শ্রেণীর লোকের পক্ষে তার বিষয়বস্তুই ধারণার অতীত। আর সবই ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় লেখা। ডাইরেক্টারের দিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকি। তার চেহারায় সে কী একটা আভিজাত্যের ছাপ! একটা ফালতু কথা কখনো শুনিনি তাঁর মুখ থেকে। অফিসারের হাতে কাগজ-পত্র তুলে দেবার সময় খালি বলেন, "আবহাওয়াটা কেমন আজ?"

না, আমাদের মত লোক নন তিনি। তিনি হ'চ্ছেন একজন খাঁটি রাজনীতিক। ইতিমধ্যেই আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে, আমি হ'চ্ছি তাঁর অনুগ্রহের পাত্র। এখন যদি তার কন্যাও আমাকে—আহ্! কি বোকামী! এ সম্পর্কে আর কিছু যেন না বলি।

'উত্তুরে মৌমাছি' পত্রিকাটি আমি পড়েছি। কী গর্দভ এই ফরাসী গুলো! আল্লার কসম, ইচ্ছা হয় এদের সবাইকে একবার নেড়ে চেড়ে দেখি; ক'সে ক'টা চড় লাগিয়ে দিই ওদের গালে। এছাড়া কুরস্ক-এর জমিদার প্রদত্ত একটা ভোজ-সভার বিবরণীও আমি পড়েছি।

কুরস্ক-এর জমিদারের লিখন-ভঙ্গিটা খুবই চমৎকার।

তারপর লক্ষ্য করলাম যে, ইতিমধ্যেই সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে এবং ডাইরেক্টার এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। বেলা দেড়টার সময় কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে, কারো সাধ্য নেই তার বর্ণনা দেয়।

অর্থাৎ দরজা খুলল। ভাবলাম বুঝি ডাইরেক্টার। আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম এক লাফে, কাগজ-পত্র হাতেই রইল। সে, সে, সে নিজেই ঘরে ঢুকল।

দেবতা জানেন, সে কী তার অঙ্গ-সজ্জা। হাঁসের পালকের মত তার অঙ্গাবরণ। আহা, কী চমৎকার। একটি সূর্য যেন! যেন একটি সূর্য।

আমাকে সে অভ্যর্থনা করল। জিজ্ঞেস করল, "আমার বাবা আসেননি এখনো?" আহা কী সে কণ্ঠস্বর! যেন হলুদ-পাখীর আওয়াজ! আদৎ হলুদ পাখীর। ইচ্ছা হল বলি, "মহাত্মন আমার হত্যার আদেশ দিবেন না। কিন্তু হত্যা যদি আমাকে করতেই হয়, তবে আপনার ঐ দেব-হস্তেই আমাকে হত্যা করুন।" কিন্তু আল্লা জানেন, কেন কথাগুলি মুখ দিয়ে বার করতে পারলাম না। কেবল বললাম, "না। আপনার বাবা এখনো আসেননি।"

সে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তারপর হাতের রুমালখানা পড়ে যেতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলাম। কিন্তু পড়ে গেলাম হতভাগা পালিশ করা মেঝেতে পা পিছলে। নাকটা আর একটু হলেই ভাঙ্গত। তবু কুড়িয়ে নিলাম রুমালখানা। হে স্বর্গীয় বাদকরা! দেখ, দেখ, কি সুন্দর এই রুমালখানা। কত মনোহারী, কত নরম। কত ভাল লিনেন। জেনারেলের পদ-মর্যাদার গন্ধ লেগে রয়েছে যেন। আমাকে সে ধন্যবাদ জানাল। আর এত অমায়িক ভাবে হাসল যে, তার চিনি মাখা ঠোঁটখানা গলে যায় যায়। কামরা থেকে তারপর বেরিয়ে চলে সে।

ঘন্টাখানেক পরে এক ব্যাটা আর্দালী এসে বললে, "মসিয়ে আইভানোভিচ, আপনি যেতে পারেন। ডাইরেক্টার সাহেব তো বেরিয়ে গেছেন।"

এই গোলমালগুলিকে আমার সহ্য হয় না, ব্যাটারা খালি আসা-যাওয়ার পথে ঘোরাঘুরি করচে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে কাউকে যদি অভিবাদন করার কথাটা একটু—মনে হত তাদের! আর এক এক সময় ব্যাপার দাঁড়ায়—আরো খারাপ। যেমন একবার এই বদমায়েশদের একজন চেয়ার থেকে না উঠেই নস্য-দানিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'ব্যাটা গেঁয়ো ভূত কোথাকার। জানিস না, আমি একজন অফিসার; অভিজাত ঘরের ছেলে!' আমি বলেছিলাম ওকে।

এখন ওকে কিছু না বলে হ্যাট আর কোট তুলে নিলাম। যদি একটু সাহায্য করার কথাও ওদের হতো! বাড়ি ফিরে বেশ কতকক্ষণ শুয়ে রইলাম বিছানায়। তারপর একটি কবিতা লিখলাম আমার খাতায়—

"তোমাকে দেখেছি ঘন্টা খানেক আগে
অথচ মনে হ'চ্ছে যেন পুরো একটি বছর
জীবন ধারণেই যদি ঘৃণা জাগে মনে
তবে আমি বাঁচবো কেমন করে প্রিয়।"

মনে হচ্ছে কবিতাটি পুশকিনের লেখা।

সন্ধ্যার দিকে দেহটা পোষাকের মধ্যে ভাল করে এঁটে নিয়ে ছুটলাম ডাইরেক্টারের বাড়ীর দিকে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, যদি ডাইরেক্টারের মেয়ে বেরিয়ে আসে গাড়ীতে উঠার জন্য।

৬ই নভেম্বর। আমাদের প্রধান কেরানী পাগল হয়ে গেছে। অফিসে হাজিরা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে ডেকে বললে, "কি সব পাগলামী খেয়াল চেপেছে আপনার মাথায় ?"

"কেন ? না কিছুই ত চাপেনি !"

"ভেবে দেখুন ভাল করে। বয়েস ত চল্লিশের ওপর। বুদ্ধি-বিবেচনা করে চলার বয়েস নিশ্চয়ই আপনার হয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে, আমি আপনার চালাকী বুঝি না। ডাইরেক্টারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টায় আছেন আপনি—? নিজের চেহারাখানি একবার দেখুন তো। তারপর আপনি যে অপদার্থ, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। আস্ত অপদার্থ একখানা। তাছাড়া আর কিছু নন। এক পয়সাতেও আমি আপনাকে কিনব না। এই সঙের মত মুখ খানা নিয়ে কেমন করে যে ভাবতে পারেন এসব।

উচ্ছন্ন যাক সে। তার নিজের মুখখানা তো দেখতে ওষুদের বোতলের মত। মাথা ভর্তি বাঁকা বাঁকা চুলের ঝোপ। আঁচড়াবে তো কখনো নীচের দিকে কখনো ওপরের দিকে। এই চেহারা নিয়ে সে ভাবে, সে যা খুসী তাই করতে পারে। কেন সে আমার ওপর এত খাপ্‌পা। তা আমি ভাল করেই জানি। হিংসে হয়েছে তার। বোধহয় দেখেছে, আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি ওকে পরোয়া করতে যাব কিসের জন্য। কাউন্সিলার ! কেমন গুরুত্বপূর্ণ জন্তু সে ? ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে একটা সোনার চেন পরে, তিরিশ রুবল দামের বুট গলায় পায়ে ; শয়তান গ্রাস করুক ওকে। আমি কি দরজির ছেলে, না ফ্যালনা তরকারীর খোসা যে, আমাকে এত অবহেলা ; আমিও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। আমিও উন্নতি করতে পারি জীবনে। একটুখানি দাঁড়াও বন্ধু আমার। আমিও উচ্চপদে বহাল হব। খোদা যদি দয়ালু হন, তবে তার চাইতেও উঁচুতে উঠতে পারি। তোমার চেয়ে বেশী নাম হবে আমার। তুমি মনে কর যে, তোমার চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ নেই সংসারে। কেবল হাল ফ্যাশানের একটা কোটের অর্ডার দেওয়ার দরকার। আর তোমার মত একখানা নেকটাই—তরপর তুমি তলিয়ে যাবে।

কিন্তু অমার ত' টাকা নেই ! এইটেই এক সাংঘাতিক ব্যাপার।

৮ই নভেম্বর। থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম আজ। রুশীয় গৃহ-মূর্খ অভিনীত হল। প্রাণ ভরে হাসলাম। সঙ্গীতমূলক নাট্যাংশও একটুখানি ছিল। এতে ব্যারিষ্টারের প্রতি খুব মজার মজার কথা বলা হয়েছে। খুব প্রশস্ত ভাষা। আশ্চর্য হচ্ছি, সেখুব্ কর্তৃপক্ষ একে ছাড়পত্র দিল! মিলনান্ত অংশটুকুতে—ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ সম্বিলিত লাইনও রয়েছে। তাদের

ছেলেরা নাকি নষ্টামী করে জীবন কাটাবে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা নাকি অসম্মানজনক ব্যবহার করে। সমালোচকদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। তারা নাকি দোষ ধরতেই জানে। তাই বাধ্য হয়েই লেখকদের জনসাধারণের আশ্রয় নিতে হয়।

আমাদের আধুনিক নাট্যকাররা সত্যই মজাদর সব জিনিস লেখেন। আমি খুব থিয়েটার দেখতে ভালবাসি। পকেটে এক কোপেক থাকলেই অমনি থিয়েটার দেখতে ছুটি। আমার সহকর্মীদের অধিকাংশই—অশিক্ষিত বর্বর। যদি কেউ নেহাৎ মাথার উপর পাশ একখানা ছুঁড়ে দেয়, তবেই তারা থিয়েটার দেখবে নইলে নয়।

অভিনেত্রীদের একজন অপূর্ব গান করল। আমি ভেবেছিলাম ওকে—। কিন্তু না। বলবো না।

৯ই নভেম্বর। আটটার দিকে অফিসে গেলাম। প্রধান কেরানী আমাকে লক্ষ্য না করে ভাণ করল। আমিও এমনভাবে দেখলাম, যে তার কোন অস্তিত্বই নেই। দলিল-পত্র সব পড়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে দেখলাম। প্রায় সাড়ে চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। ডাইরেক্টারের বাড়ী ছাড়িয়ে গেলাম ; কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। আহারান্তে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিলাম।

১১ই নভেম্বর। আজ ডাইরেক্টারের কামরায় বসেছিলাম। ডাইরেক্টার এবং তার মেয়ের জন্য তেইশটা কলম কেটে দিলাম। বাড়তি কেটেছি আরো চারটে। টেবিলের ওপর বহু কলম পড়ে থাকতে দেখে ডাইরেক্টারের খুব তৃপ্তি। অসাধারণ মাথাওয়ালা তিনি ; সব সময় চুপ চাপ থাকেন অথচ কিছুই তাঁর চোখে এড়ায় না। সাধারণতঃ তিনি কি ভাবছেন, তাঁর মাথার ভিতর কি চলছে, তা জানার খুবই ইচ্ছে হয় আমার। খুবই ইচ্ছে হয়, এদের জীবনধারাটা ভাল করে জেনে নিই। এদের ইয়ার দোস্তদের চাতুর্য আর কর্ম-কাণ্ডের একটা ঘনিষ্ট জ্ঞান লাভ যদি করতে পরাতাম। অনেক সময় ভেবেছি, স্বয়ং ডাইরেক্টারকেই এই সম্পর্কে জিজ্ঞসা করব। কিন্তু শয়তান জানেন, কেন জিবটা যেন প্রত্যেক বারেই জড়িয়ে আসে, তখন প্রচলিত আবহাওয়া সম্পর্কিত রিপোর্টটি ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়ে বার করা যায় না।

একখানা বাড়তি কামরা রয়েছে, দরজা তার প্রায়ই দেখি খোলা। তার ভেতরটী একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে হয়। এ ছাড়া দ্বিতীয় একটা কামরা আছে বাড়তি কামরার পেছনে। তাও আমার অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে। কী চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে কামরাটি। কত আয়না আর বাছাই করা গয়নাতে ঘর ভর্তি। এ ছাড়া আরো ইচ্ছে করে তার কন্যা মহোদয়া যে ঘরের অধিশ্বরী, তাও একবার দেখে নিই। তার খাস কামরায় আতরের শিশি আর বাক্সগুলি কি ভাবে সাজানো হয়েছে, ফুলগুলি যা থেকে এমন সুমিষ্ট গন্ধ বেরোয় যে, নিশ্বাস টানতেই ভয় করে তাও কি ভাবে রাখা রয়েছে, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই ঘরের মধ্যে

চারদিকে ছড়ানো রয়েছে তার কাপড়গুলি, আর তা এত বায়বীয় যে, তাকে কাপড় না বলাই সঙ্গত।

আজ আমার মধ্যে যেন এক স্বর্গীয় অনুতৃপ্তির সঞ্চার হয়েছে। নেভস্কি প্রস্পেকটের কাছে শোনা কুকুরের কথা-বার্তা মনে পড়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলম, বেশ ত! আমাকে কি করতে হবে, সেটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই দুষ্টু কুকুর দু'টির মধ্যে যে সব পত্রাদির আদান-প্রদান হয়েছে, সেগুলি হস্তগত করতে হবে আমাকে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক কিছুর অর্থ খুঁজে পাব।

ইতিমধ্যে মেগ্গিকে ডেকে বললাম, “শোন মেগ্গি এখানে আর কেউ নেই তুমি আর আমি ছাড়া ; তুমি যদি চাও তবে দুয়ারটাও এঁটে দিতে পারি ; যাতে কেউ যেন না শোনে। তারপর তোমার প্রণয়িনী সম্পর্কে যা কিছু জান, বলে ফেল দিকি। কিরা কেটে বলছি, কাউকে কিসসুটি বলব না।

কিন্তু কুকুরটা ভারী ধূর্ত। কিছু না বলে, চুলগুলিতে ঝাকানির সাহায্যে একটা তোলপাড় তুলে, ল্যাজখানা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সে। আমার বহুদিনের অভিমত এই যে, কুকুর মানুষের চাইতে বেশী চালাক। আমার আরো বিশ্বাস, মানুষের মত কুকুরও কথা বলতে পারে। তবে এক ধরণের গোঁয়ার্তুমীর বশেই সে তা করে না। কুকুর খুব সন্ধানী জীব। ওদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের আওতা থেকে কিছুই বাদ পড়বে না। ভাবলাম, কপালে যাই থাকে, কালকেই একবার ফিডেলকে জিজ্ঞেস করার জন্য সভারকফের বাড়ী যাব। আর ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, তবে ওর কাছে লেখা চিঠি-পত্রগুলি সব বাগিয়ে নিয়ে আসব।

১২ই নভেম্বর।

যেভাবেই হউক, ফিডেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে কিঞ্চিৎ জেরা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আজ দু'টার সময়।

সিটিজেন ট্রীটের দোকানগুলি থেকে এক রকম সব্জির গন্ধ বেরোয়— এ আমার মোটে সহ্য হয় না। এছাড়া প্রত্যেক বাড়ীর দোর থেকে এমন একটা গন্ধ ভেসে আসে, যার জন্য নাক চেপে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হয়। উপরন্তু কারিগরদের দোকান থেকে এমন ধুলাবালিময় ধোঁয়া উঠতে থাকে যে, পথ চলাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ছয়তলায় উঠেই ঘণ্টা টিপলাম। গায়ে দু'একটা গুটির দাগ—কিন্তু সুন্দরই বলতে হবে মেয়েটিকে বেরিয়ে এল সে। তক্ষুণি চিনতে পারলাম তাকে। এইটেই—সেদিন যাচ্ছিল বুড়ির সঙ্গে। লজ্জার আভা ফুটে উঠল একটুখানি ওর মুখে।

জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি চান ?

বললাম, “আমি আপনার কুত্তিটার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।” দেখেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি খুব সরল মনা। উচ্চস্বরে চিল্লাতে চিল্লাতে বেরিয়ে

এল কুকুরটা। ভাবলাম ধরে ফেলি বেটিকে, কিন্তু একটু হলেই বজ্জাত কুকুরটা আমার নাক কামড়ে ধরেছিল। আমি কিন্তু দেখতে পেলাম কামরার এক কোণে কুকুর রাখার ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে। ওহ্! হো ওটেই তো চাচ্ছিলাম! ঝুড়ির কাছে গিয়ে তন্ন তন্ন করে তার ভেতরে খড়গুলো পরীক্ষা করলাম। ঝুড়ির ভেতর থেকে যখন অবশেষে ছোট ছোট কাগজের প্যাকেট বার হয়ে পড়ল, তখন অবাক না হয়ে পারিনি। হতভাগা কুত্তিটা দেখতে পেয়েই আমার পায়ের গোছা কামড়ে ধরল। তারপর চুরির ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডাক ছেড়ে তেড়ে আসতে চাইল আমার দিকে। আমি তাকে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আর কোন দরকার নেই আমার। এবার আমি চললাম।' আমার বিশ্বাস মেয়েটি আমাকে পাগল ভেবেছিল। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল সে।

নিজের কামরায় ঢুকেই ভাবলাম, এবার কাজে লেগে যাওয়া যাক। রাতে মোমবাতির অলোয় ভাল করে দেখতে পাই না। সুতরাং দিন থাকতেই সেরে ফেলি কিন্তু—হতচ্ছাড়ি মন্তরার আবার এই সময়ে ঘরে জল দেবার কথা মনে পড়ল। এই নির্বোধ ক্ষীণ মেয়েগুলি যখন পরিষ্কার থাকার কোন প্রয়োজন নেই, তখনও পরিষ্কার থাকবে।

তারপর একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ঘটনাটা ভাবতে লাগলাম। অবশেষে এবার পৃথিবীর নানা ঘটনাবলী, মানুষের চিন্তা এবং তাদের নানা রকম উদ্দেশ্যের কার্য-কারণ বুঝতে পারব। এই চিঠিগুলিই সকল রহস্যের—মীমাংসা করবে। কুত্তারা সব চতুর লোক। রাজনীতি তাদের কাছে জল ভাত। সুতরাং যা কিছু জানতে চাই তা সবই ঐ চিঠিগুলির মারফৎ জানতে পারব, বিশেষ করে ডাইরেক্টারের চরিত্র এবং তার পরিবেশ মন্দ নয়। এছাড়া চিঠিগুলি আমাকে তার খবরও দেবে। তার, অর্থাৎ ডাইরেক্টারের মে'—কিন্তু চুপ।

সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরে বেশ কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলাম।

১৩ই নভেম্বর।

এইবার, দেখা যাক চিঠিগুলি। পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে চিঠিগুলি। কিন্তু হস্তাক্ষর কিছুটা কুত্তাটে।

"প্রিয়তমা ফিডেল। তোমার অতি সাধারণ নামটা কিছুতেই আমার মনপুতঃ হচ্ছে না। তারা এর চেয়ে আর কোন ভাল নাম খুঁজে পেলে না আর কি! ফিডেল কি বিশ্রী নাম! একেবারে সাধারণ। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনার সময় এটা নয়। আমরা যে পরস্পরের কাছে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তাতে আমার অন্তর আনন্দে ভরে যাচ্ছে।" (চিঠিটা বেশ শুদ্ধভাবে লিখেছ ত! দাঁড়ি, কমা, উচ্চারণ সবই নিখুঁত। আমাদের প্রধান কেরানীও এত সহজ আর পরিষ্কার করে লিখতে পারে না—যদিও সে খুব বলে বেড়ায় যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। আচ্ছা পড়েই যাওয়া যাক—)

"আমার মনে হয় পারস্পরিক চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং ধারণার বিনিময় হচ্ছে পৃথিবীর সকল উচ্চস্তরের আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

(হুম এই কথাটা একটা বই থেকে নিয়েছে সে। সেই বইটা জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। বইয়ের নামটা আমার মনে নেই।) "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি একথা—যদিও দুয়ারের সামনের জায়গাটুকু ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার জীবনটা কি সুখে এবং শান্তিতে কাটছে না? আমার মনিবণী—যাকে ওর বাপ "সোফি" বলে ডাকে, সে আমাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছে।" (ওহ্ সে! ওহ্! কিন্তু চুপ থাকাই ভাল)

"তাঁর বাপ প্রায়ই আমার পিঠ চাপড়ে দেন। ক্রীম সহযোগে চা এবং কপি খাই আমি। হ্যাঁ প্রিয় আমার, আমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, পোলকানের দেওয়া সিদ্ধ দু'টুকরা করা হাড়ে আমার কোন তৃপ্তি হয় না। হাড়ের মধ্যে বুনো মুরগীর হাড়ই শ্রেষ্ঠ, অবশ্য মজাটুকু যদি তার ভেতর থাকে। তার সঙ্গে একটু চাটনি যোগ হ'লে আরো চমৎকার, কিন্তু তরকারী ছাড়া। কিন্তু কুকুরকে দলা পাকিয়ে রুটি খেতে দেবার মত খরাপ অভ্যাস আর কিছুই হয় না। চেয়ারে বসে লোকগুলি তাদের নোংরা হাত দিয়ে রুটির দলা পাকাবে, তারপর তোমকে ডাকবে। তুমি যেই এলে, অমনি দলাটা তোমায় এঁটে দেবে। অথচ ভদ্রতার খাতিরে তুমি তা ফেলে দিতে পার না। অতএব তোমাকে, ওটা খেতে হয়। সত্যি কথা, খুবই ঘেন্না হয় তোমার, কিন্তু না খেয়ে পার না।"

(ব্যাটা শয়তান কোথাকার! কী লিখেছিস এসব! যত সব বাজে। যেন লেখবার মত আর কোন বিষয় পায়নি। দেখি পরের পাতায় তেমন যুক্তিসঙ্গত, কিছু পাওয়া যায় কিনা)

"এখানে যে সব ব্যাপার ঘটছে, সে সব তোমাকে জানাতে খুবই ইচ্ছা করে। এ বাড়ীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক যিনি, তাঁর কথা আমি তোমাকে বলেছি। সোফির 'বাবা' ভারী অদ্ভুত লোক তিনি।"

(আ হা! এতক্ষণে আসা গেছে আদৎ কথায়। হ্যাঁ এ আমি জানি। রাজনীতিকদের মত কুকুরদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দেখা যাক, "বাবা" সম্পর্কে সে কি লিখেছে)

... "অদ্ভুত লোক। সাধারণতঃ তিনি চুপ চাপ থাকেন। কদাচিৎ কথা বলেন। কিন্তু গত সাপ্তাহে তিনি খালি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "ওটা পাব কি পাব না।" এক হাতে একখানা কাগজ অন্য হাত এমন ভাবে বাড়ান, যেন কিছু একটা নিচ্ছেন। আর বিড়বিড় করছেন, "ওটা পাব কি পাব না। এক সময় আমার দিক ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি মনে কর মেগুগি—?' কি যেন তিনি বোঝাচ্ছিলেন, তা কিছুই বুঝতে না পেরে আমি কয়েক বার জোরে জোরে তাঁর বুটের গন্ধ শুঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। এক সপ্তাহ পরে বেশ

খোশ মেজাজ একদিন তিনি বাড়ী ফিরলেন। সেদিন সকালেই কয়েকজন অফিসার এল বাড়ীতে। পরনে ইউনিফর্ম। তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাল। সেদিনকার ডিনারে তাঁকে যে রকম হাসি-খুসি দেখাল, তেমনটি তাঁকে আর কখনো দেখিনি।"

(তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোক হিসাবে তিনি উচ্চাকাঙ্খী। উল্লেখযোগ্য দিক এটা।)

"প্রিয়তম আমার। আজ আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে বলে ক্ষমা কর। ইত্যাদি ইত্যাদি। আগামী কাল আমি এ পত্র শেষ করব।"

* * * *

"এই যে সুপ্রভাত মেগ্‌গি। আবার তোমার খেদমতে হাজির হলাম। আজ আমার মনিবণী সোফি—"

(ওহ্! দেখি সোফি সম্পর্কে কি লিখছে! পড়ে যাওয়া যাক।) "আজ তাকে দেখে মনে হল, যেন খুব মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে। সে আজ নাচে গিয়েছিল। আমিও ওর অবর্তমানে তোমাকে লেখার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দ বোধ করছি। বল-নাচে যোগ দিতে সোফি খুব ভালবাসে, যদিও সাজগোছে ওর খুব বিরক্ত। কিন্তু ফিডেল! মানুষগুলো নেচে যে কি আনন্দ পায়, তা বুঝি না। খুব ভোরে, একেবারে সকাল ছটায় সে নাচ থেকে ফিরল। ওর বিবর্ণ, মলিন মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, সে রাতে কিছু খায়নি। খোলাখুলি বলতে কি, এমন ভাবে জীবন-যাপন তো আমাকে দিয়ে হবে না। চাটনী যোগে প্যাট্রিজ পাখীর মাংস আর ভুনা মুরগীর ডানা না হলে কি যে আমার হত, সে আমি ভাবতেই পারি না। চাটনী হ'লে যবের হালুয়াও একরকম খাওয়া যায়, কিন্তু এই গাজর শালগম আর কাঁটা গাছের তরকারী—এ আমার মোটেই পছন্দ হয় না'।

(লেখাটার ধরণ এলোপাথাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, পুরুষের লেখা নয়। আরম্ভটা বেশ বুদ্ধিমানের মতই করেছে, কিন্তু শেষটায় কুক্কুরীয় প্রবৃত্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর একটা চিঠি-পড়বো। এ চিঠিটা খুব দীর্ঘ। কোন তারিখ দেয়নি এতে।)

'আহা! প্রিয়তম আমার! কী আনন্দদায়ক এই বসন্ত সমাগম। অন্তরের মধ্যে আমার এখন প্রত্যাশার ধুক-ধুকানি শুরু হয়েছে। কানের কাছে অহরহ মধুর এক ঝংকার শুনছি। তার ফলে পা তুলে দুয়ারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি। চুপি চুপি তোমাকে বলি : শোন, আমার অনেক ভক্ত আছে। আমি যখন জানালার ধারে গিয়ে বসি, তখন প্রায়ই দেখি, আমার চোখের সামনে দিয়ে সারি দিয়ে চলে যাচ্ছে তারা। তাদের মধ্যে কত দুষ্ট লোক যে আছে, তা যদি জানতে! তাদের একজন হচ্ছে নোংরা একটা পোষা কুকুর।

মুখে তার দুষ্টামীর ছাপ আঁকা ; এমন ভাবে হাঁটে, যেন কতই না তার গুরুত্ব। মনে মনে ভাবে, সে যেন খুব একটা কেউ কেটা। সমস্ত পৃথিবীর চোখ যেন তার উপর নিবদ্ধ। ওর দিকে আমি একটুও নজর দিই না, তাকে একেবারেই না দেখার ভাণ করি।

"আহ্ দেখ কী জঘন্য একটা ডাল-কুত্তা বসে রয়েছে আমার জানালার ঠিক উল্টো দিকে। সে যদি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারত—সম্ভবতঃ রাক্ষসটার সে সাধ্য নেই—তা হলে আমার মনিবণীর বাপের চাইতেও লম্বা দেখাত ওকে ; অবশ্য আমার মনিবণীর বাপও খুব দীর্ঘকার পুরুষ। তা ছাড়া এই চাষাটাকে একেবারে নির্লজ মনে হচ্ছে। এত গজরাই ওর দিকে চেয়ে, কিন্তু তাতে ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যদি একবার ওর কপালটাও কুঞ্চিত করতো। তা না করে খালি জিবখানা বার করে দিবে আর জানালার দিকে চেয়ে থাকবে। ওমা, কি অসভ্য ভূত। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি কি এটা মনে কর না যে, আমার হৃদয় সকল প্রলোভনে উর্ধে ? হায়, তুমি তা কর না। পাশের বাড়ীর বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভদ্র গোছের যে কুকুরটা ঢুকে পড়েছিল তাকে যদি তুমি একবার দেখতে। তার নাম 'ঠন'। ওহ্ প্রিয়, তার শুঁড়টা কি লম্বা !

(বমাল গোল্লায় যাক বেটি। যত সব রাবিশ। কেমন করে যে লোকে এধরণেইর গাঁজা-খুরি কথা লিখে কাগজ নষ্ট করে তা অবোধ্য। তার চেয়ে মানুষই আমার ভাল। আমি চাই সত্যিকারের একজন মানুষ। কোথায় মনটাকে তাজা ও সরেস করার জন্যে কিছু খাওয়ার দরকার, আর তার বদলে পাচ্ছি এই নষ্টামীর কাহিনী। দেখি কাগজটা উল্টে, অন্য পিঠে তেমন কিছু আছে কিনা।)

"সোফি টেবিলের ধারে বসে কি যেন একটা কাজ করছিল। জানালা দিয়ে পথিকদের খুব মজা সে দেখতে লাগলাম আমি। হঠাৎ চাকর একটা এসে জনৈক আগন্তুকের নাম ঘোষণা করল।

মিঃ টেপলফ্।

"ভেতরে নিয়ে এস তাকে সোফি বললে। কথাটা বলেই সে আমাকে চেপে ধরল। বললে, আহ্ মেগ্গি, ওহ্ মেগ্গি, কে এসেছে জানিস ? দেখতে কালো বটে, কিন্তু রাজবাড়ীর লোক। জানিস তার চোখ দু'টো কত উজ্জ্বল। যেমন কালো তেমনি আগুনের মত উজ্জ্বল।

"সোফি তার কামরার দিকে চলে গেল। মিনিট খানেক পরে কালো গোঁফআলা এক যুবক এসে প্রবেশ করলেন। আয়নার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। চুল গুলি ঠিক করে নিয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখলেন। আমি ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম।

"সোফি এসে ঘরে ঢুকল আবার। খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মাথা নত করলে সে।

"আমি এমন ভাব করলাম যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। আগের মতই বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। কিন্তু মাথাটা একটুখানি ঝুঁকিয়ে রাখলাম

ওদের দিকে, যাতে ওদের কথা-বার্তা কানে আসে। ওহ্ প্রিয়তম, কি সব বাজে কথাই না তারা আলোচনা করল। এক মহিলা কি ভাবে ভুল মুদ্রায় নাচল, বুনট করা এবং দামি সার্ট গায়ে এক ভদ্রলোক—নাম তার ভবলফ এবং তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক সারস পাখীর মত—সে কি ভাবে একটা আছাড় খেল, লিভিনা নামের একটি মেয়ে, সে নাকি মনে করত তার চোখ দু'টো নীল ; যদিও আসলে চোখ দু'টো ছিল সবুজ—এই সব গল্পই তারা করল।

"আমি এটা বুঝতে পারি না মিঃ টেপলফ্ লোকটির মধ্যে সোফি এমন কি সৌন্দর্য খুঁজে পেলে, আর ওকে নিয়ে সোফির এমন আনন্দই বা কেন।"

(আমারও মনে হচ্ছে একটা কিছু গোলমেলে রয়েছে এখানে। অসম্ভব। এই টেপলফ্ লোকটা সেদিকে যাই করে থাকতে পারেন। দেখি, আরো দেখি।)

"যদি এই রাজবাড়ীর লোকটাকে সোফির এত ভাল লাগবে, তবে আমার মতে, ঐ যে ওর বাপের কামরায় কর্মচারীটি রয়েছে তাকেও ওর নিশ্চয়ই ভাল লাগার কথা। ওহ্ প্রিয়, তুমি যদি এই কর্মচারীটির চেহারাখানা একবার দেখতে। ঠিক যেন একটা খরগোশ।"

(কোন কর্মচারীর কথা বলেছে এই কুকুরটা ?)

"তার নামখানা ভারি অদ্ভুত। সব সময়ই সে ঐ জায়গাটাতে বসে বসে কলম কাটে। ওর মাথায় চুল যেন ঠিক এক গাদা খড়। সোফির বাপ তাঁর চাকরদের না খাটিয়ে ওকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয়।"

(মনে হয় এই ঘৃণ্য কুত্তিটা আমার কথাই উল্লেখ করেছে। কিন্তু আমার চুলের সাথে খড়ের কি সম্পর্ক ?)

"ওকে দেখে সোফি না হেসে পারে না।"

(মিথ্যা বলিস না হতচ্ছাড়া কুকুর। কী কুৎসা-গাইয়ে জিবখানা তোর। তুই যে হিংসের বশেই এ সব বলেছিস তা বুঝি বুঝি না ? ভেতরে ভেতরে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে তা বুঝি আমি ধরতে পারি না ভেবেছিস। হ্যাঁ, সেই প্রধান কেরানীর ষড়যন্ত্র এ সব। দুর্দান্ত ঘৃণা করে সে আমাকে। সে-ই আমার বিরুদ্ধে জোট পাকিয়েছে। সব সময়েই তালে আছে যেন আমার ক্ষতি করতে পারে। দেখি আর একখানা চিঠি, হয়তো এইটে পড়ে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে।) "ফিডেল, প্রিয়তমা আমার। দীর্ঘ কাল তোমাকে না লেখার জন্য ক্ষমা কর। আমি যেন আনন্দ সাগরে ভাসছিলাম। বস্তুতঃই জনৈক গ্রন্থকার বলেছেন, ভালবাসা হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন। তা ছাড়া বাড়ীতে বড় বড় পরিবর্তন ঘটছে। যুবক নায়েবটা আবার সব সময় এখানে থাকে। তার সঙ্গে সোফির গভীর প্রেম। এতে ওর বাপও খুশী। আমাদের ঝাড়ুদার গ্রীগার, সে আবার আপন মনে কথা বলে ; তার কাছ থেকে জানলাম শীগগীর তাদের বিয়ে হবে। ওর

বাপের ইচ্ছে ফৌজের সেনাপতি কিংবা কোন কর্নেল অথবা রাজ-নায়েবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন।"

(দুত্তোর গোল্লায় যাক এসব। আর পড়তে পারছি না আমি। খালি নায়েব আর জেনারেল ছাড়া কথা নেই। আমিও তো জেনারেল হতে চাই—অবশ্য সোফির পাণি-গ্রহণের জন্যও নয়। না, একটুও না। যদি একবার জেনারেল হতে পারতাম তবে দেখে নিতাম কেমন করে লোকে আমার সামনে দিয়ে কোমর দুলিয়ে হাঁটে, আমাকে অপমান করে, আর জোট পাকায়। জেনারেল হতে পারলে তাদের দুজনকেই বলতাম যে, তাদের গায়ে আমার থুথু পড়ার যোগ্যও নয় তারা। কিন্তু তাত হচ্ছে না। সত্যি এ ভারী বিরক্তিকর। নির্বোধ কুকুরটির পত্র আমি হাজার টুকরা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে দিলাম।)

৩রা ডিসেম্বর।

অসম্ভব! বিয়ে তাদের হতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই আটকুঁড়ে ব্যাটাদের জল্পনা-কল্পনা মাত্র। হতে পারে সে রাজার নায়েব ; তাতে এমন কিছু একটা বোঝায় না। ওত একটা পদবী মাত্র, এমন কিছু নয় যা ধরা-ছোঁয়া যায়। নায়েব হয়েছে তো কি হয়েছে। তাতে তো ওর কপালে একটা তৃতীয় চক্ষু গজাচ্ছে না। তার নাকটাও এমন কিছু সোনার গড়া নয়। ওর নাক দেখতে আমার এবং অন্য যে কেউর মতই। তার নাক দিয়ে সে কাশতেও পারে না, খেতেও পারে না ; কেবল হাঁচতে আর শুঁকতেই পারে। কিন্তু আসল রহস্যের গভীরে আমি পৌছুবই দেখব মানুষে মানুষে এই ধরণের পার্থক্য সৃষ্টির মূল কোথায়, আমিই বা কেন কেবল একজন নামকাওয়াস্তে কাউন্সিলার হয়ে আছি।

সম্ভবতঃ আসলে আমি একজন জেনারেল, দেখতেই কেবল খেতাবধারী কাউন্সিলার। আমার আসল পরিচয়টাই হয়তো আমি জানি না। সাধারণ একজন ভদ্রলোক, সাধারণ নাগরিক কিংবা এক কৃষক কিভাবে রাতারাতি লর্ড অথবা ব্যারনে পরিবর্তিত হল তার কত দৃষ্টান্তই ত ইতিহাসে আছে। আচ্ছা ধরুন জেনারেলের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় আমি একদিন এসে হাজির। ডান কাঁধে একটা সামরিক চিহ্ন, বুক বেড়িয়ে থাকবে ওপরে। প্রেয়সী তখন কি মধুর সুরই না গাইবে। তার বাপ, ডাইরেক্টার কি বলবে তখন? তিনি একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন একজন ফ্রি ম্যাসন। নিশ্চয় তিনি তাই। যতই লুকান না কেন আমার কাছে সেটা মোটেই অজানা নেই। করমর্দনের সময় তিনি এমনভাবে হাত বাড়ান যাতে তার হাতের দুটো করে আঙ্গুল মাত্র স্পর্শ করা যায়। আচ্ছা, আমি কি ঠিক এই মুহূর্তে একজন জেনারেল কিংবা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মনোনীত হতে পারি না? এটা আমাকে বুঝতেই হবে যে কেন আমি এক খেতাবধারী কাউন্সিলার মাত্র, তার বেশী কিছু নই।

৫ই ডিসেম্বর।

আজ সারাটা সকাল খবরের কাগজ পড়ে কাটিয়েছি। স্পেন দেশে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। সব কথা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। লিখেছে, সে দেশের সিংহাসন নাকি শূন্য। জনগণের প্রতিনিধিরা সিংহাসনের জন্য একজন আরোহী খুঁজতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে।

আমার কাছে এসব অদ্ভুত ঠেকে। আচ্ছা বলুন তো, সিংহাসন কখনো শূন্য হতে পারে? জানাচ্ছে, একজন মেয়ে-মানুষ নাকি হিংসানে বসবে। মেয়ে-মানুষ সিংহাসনে বসতে জানে না। সেটা অসম্ভব কথা, কারণ কেবল রাজাই আছেন, তবে পারে সিংহাসনে আরোহণ করতে। ওরা বলছে রাজা নাকি নেই। কিন্তু সেটা কি করে হবে? রাজা ছাড়া কোন রাজত্বই থাকতে পারে না। রাজা নিশ্চয়ই আছেন, তবে হয়ত লুকিয়ে রয়েছেন কোথাও। হয়ত আসলে ঐখানেই আছেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভয়ে কিংবা ফ্রান্স ও অন্যান্য প্রতিবেশী শক্তিগুলির ভয়েই তিনি লুকিয়ে আছেন। এ ছাড়া অন্য কারণও থাকতে পারে।

৮ই ডিসেম্বর।

আর একটু হলেই আজ অফিসে চলে গিয়েছিলাম আর কি। কিন্তু নানা দিক ভেবে আজ আর গেলাম না। স্পেনের এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। আচ্ছা, একজন মেয়ে-মানুষ রাজত্ব করবে, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? এটা ওরা নিশ্চয়ই কিছুতেই হতে দেবে না, বিশেষ করে ইংলন্ড। ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খুব সংকটজনক।

অস্ট্রিয়ার সম্রাট—

সত্যি বলতে কি, এই সব ঘটনা এত নাড়া দিয়েছে আমায় এবং মনটা এতখানি ভেঙ্গে দিয়েছে যে সারাদিন আর কিছু ভাবতেই পারি নি। মস্তরা বলল যে, খাওয়ার টেবিলে আমকে খুব অন্যমনস্ক দেখিয়েছে। বস্তুতঃ এই অন্যমনস্কতার ফলে দু'খানা প্লেট মাটিতে ফেলে ভেঙ্গে ফেলেছি।

খাওয়ার পর শরীরটা দুর্বল মনে হল। দলিল-পত্রের সার-মর্ম তৈরী করতে মন উঠল না আর। বেশীর ভাগ সময়ই বিছানায় শুয়ে কাটালাম। মাথার মধ্যে ঘুর-পাক খেতে লাগল স্পেনের ব্যাপারটা।

২০০০ সাল। ৩রা এপ্রিল। আজ এক মহান বিজয়ের আনন্দের দিন। স্পেন তার রাজা পেয়েছে, পাওয়া গিয়েছে তাকে। সেই রাজা হচ্ছি আমি। আজই আমি এটা পরিষ্কার করলাম। আজ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত মনে হলো আমিই স্পেনের রাজা।

এতদিন যে কি করে নিজেকে সাধারণ একজন খেতাবধারী কাউন্সিলার মাত্র ভেবে এসেছি, সেইটেই আশ্চর্য। এমন মূর্খামী কেমন করে ঢুকেছিল আমার মাথায়? ভাগ্য বলতে হবে যে আমাকে পাগলা গারদে আটকে রাখার কথা কারো মাথায় আসেনি। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অতি পরিষ্কার। একেবারে জলবৎ

তরলং। কেন জানি না আগে যেন সব কিছুই একটা পাতলা কুঁয়াশার আবরণে ঢাকা ছিল। চিন্তাশক্তি মাথার ভেতর থাকে বলে লোকের যে একটা ধারণা আছে তাই বোধ হয় এর কারণ। অথচ ধারণাটা তো ঠিক নয়। আসলে চিন্তা-শক্তিটা বাতাসের মাধ্যমে কাস্পিয়ান সাগর থেকেই ভেসে আসে। আজই মন্তরাকে আমার সত্য পরিচয় জানালাম। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্পেনের রাজা—একথা শুনে সে এমন কপাল চাপড়ানি শুরু করল যে ভয়ে প্রায় মরেই গিয়েছিল আর কি! বোকা মেয়ে-মানুষ সে, স্পেনের রাজাকে আর কখন দেখেনি কিনা! যাই হোক ওকে আমি এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, এতদিন আমার বুট জোড়া ভাল করে পরিষ্কার করেনি বলে তার ওপর আমার কোন রাগ নেই। মেয়েরা সত্যই এক নির্বোধ চীজ। কোন উচ্চ বিষয়েই তারা আমোদ পায় না। ওর ভয় পাবার কারণ এই যে, ও ভেবেছিল স্পেনের সব রাজাই দেখতে দ্বিতীয় ফিলিপের মত। আমি ওকে বুঝালাম দ্বিতীয় ফিলিপ এবং আমার মধ্যে পার্থক্য বিরাট। আজ আর আপিসে গেলাম না। আপিসে আবার কোন কর্মে? না, বন্ধুরা, না, আর তোমরা আমাকে আপিসে দেখতে পাচ্ছ না। তোমাদের ঐ দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছিনে আমি।

৮৬-ই মারচেম্বার

সময় ; দিন এবং রাত্রির মাঝামাঝি। তিন সপ্তাহ ধরে আপিসে যাইনি। তাই আজ আপিসের সংবাদ-বাহক ডাকতে এল। কেবল মজা দেখবার জন্যেই একবারটি যাওয়া। প্রধান কেরানী ভেবেছিল, আমি মাথা নুইয়ে দাঁড়াব ওর সামনে আর অনুপস্থিতের জন্যে নান রকম কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করব। কিন্তু সে সব কিছু না করে নিস্পৃহভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেজাজ ঠাণ্ডা না গরম তার কিছুই বোঝবার উপায় নেই আমাকে দেখে। নিজের জায়গায় গিয়ে এমন একটা ভাব নিয়ে বসে রইলাম যেন কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছিনে। এই যে এক পাল ছন্নছাড়া বসে বসে কাগজের ওপর হিবিজিবি দাগ কাটছে, তাদের দিকে চেয়ে ভাবলাম ঃ হায় তোরা যদি জানতিস তোদের সামনে কে বসে রয়েছেন। হায় ভগবান, তখন কী যে ঘটত! এমন কি প্রধান কেরানী পর্যন্ত আপনি মাথা নুইয়ে আমাকে সম্মান প্রদর্শন করত—এখন যেমন সে ডাইরেক্টারের সামনে করে থাকে। আমার সামনে একগাদা রিপোর্ট এনে হাজির করল ওরা—এর সার-মর্ম তৈরী করতে হবে। আমি কিন্তু কড়ে আঙ্গুল দিয়েও ছুঁলাম না তার কিছু।

একটু পরেই রীতিমত হৈ-হৈ কাণ্ড। শোনা গেল ডাইরেক্টার আসছেন। কেরানীদের অনেকে ডাইরেক্টারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। আমি কিন্তু আসন থেকে একটুও নড়লাম না। ডাইরেক্টার যখন আমাদের ঘরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রত্যেকেই তখন অত্যন্ত দ্রুত কোটের বোতাম আঁটতে লাগল। আমি কিন্তু তেমন কিছুই করলাম না। ডাইরেক্টারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক যে তাঁর সামনে উঠে দাঁড়াব। ডাইরেক্টার

না ঘণ্টা, বোতলের ছিপি একটা, একেবারে সহজ সাধারণ বোতলের ছিপি একটা—তার বেশী কিছুই নয়। ওরা যখন সই করবার জন্যে আমার সামনে একগাদা কাগজ এনে হাজির করল, তখন ভারী মজা লাগল আমার।

ওরা ভেবেছিল আমি বুঝি নিজের নামখানাই সই করব; "অমুক, কেরাণী" এই ভাবে; আর তা ভাববে নাই বা কেন? আমি করলাম কি কাগজের ফর্দটার একেবারে উপরে, যেখানটায় ডাইরেক্টারের নাম লেখা হয়, সেখানে জুড়ে দিলাম: "অষ্টম ফার্ডিনাণ্ড।" একেবারে বড় হরফে।

সে কী সশ্রদ্ধ নীরবতা যদি একবার দেখতেন। হাতের একটা ভঙ্গী করে আমি বললাম, "ভদ্র-মহোদয়গণ, অনুগ্রহ করে জাঁক-জমক করবেন না।" তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম ডাইরেক্টারের বাড়ী।

ডাইরেক্টার বাড়ী ছিলেন না। চাকরটা আমাকে ঢুকতে দেবে না বাড়ীতে। কিন্তু তার সঙ্গে আমি এমন ভাবে কথা বলতে লাগলাম যে অগত্যা কাঁধ কুঁচকে সে পথ ছেড়ে দিল।

সোজা চলে গেলাম সোফির ড্রেসিং রুমে। আয়নার সামনে বসে ছিল সোফি। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। আমি অবশ্য ওকে বলি নাই যে আমি স্পেনের রাজা।

আমি কেবল ওকে বললাম যে, এমন এক সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে ওর জন্য যা সে কল্পনাও করতে পারে না। বললাম, আমাদের শত্রুদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে আমরা মিলিত হবোই। এইটুকুই বলতে চেয়ে ছিলাম এবং বলেই বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। ওহ্ ধূর্ত এই মেয়ে-মানুষগুলি। এখন বুঝতে পেরেছি, মেয়েরা আসলে কেমন চীজ। এর আগে মেয়েরা যে কাকে ভালবাসে তা কেউ জানত না। আমিই আবিষ্কার করলাম সেটা। মেয়েরা ভালবাসে শয়তানকে। হ্যাঁ, ঠাট্টা নয়। বিদ্বান লোকেরা বলে এসেছেন মেয়েরা এই রকম, তারা ওই রকম। আসলে তাদের পছন্দ শয়তানকে। থিয়েটারে গেলে দেখতে পাবেন, এক মহিলা হয়ত একেবার সামনের বক্সে বসে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছে। আপনি ভাবলেন, বুঝি স্টেজের ওপর পদক-পরা ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে রয়েছে সে। মোটেই তা নয়। আসলে মহিলাটি চেয়ে রয়েছে ভদ্রলোকটির পেছনে দাঁড়ানো শয়তান-চরিত্রের দিকে। সে ওখানে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করছে। মহিলাটি বিয়ে করবে তাকেই, তাকেই, তাকেই সে বিয়ে করবে।

এ সব হচ্ছে উচ্চাকাঙ্খা। আর এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের জিবের নীচে একটা ফোস্কা আছে, যার ভিতর রয়েছে পিনের ডগা সমান একটা পোকা। এই জিনিসটা তৈরী করেছে বীন স্ট্রীটের এক নাপিত। তার নামটা মনে আসছে না এখন; কিন্তু এ বিষয় আমি নিশ্চিত যে, এক ধাত্রী মহিলার সহযোগে সে

জগদ্ব্যাপী মোহাম্মদীয় ধর্ম বিস্তার করতে চাইছে এবং তার ফলে ফরাসী দেশে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেছে।

তারিখ নেই। দিনটার কোন তারিখ ছিল না। আজ ছদ্ম বেশে নেভাস্কি প্রসপেক্টের দিকে বেড়াতে গেলাম। স্পেনের রাজাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে, তার জন্য সচেষ্ট ছিলাম। ভাবলাম বিশ্বাসী যদি আগেই আমাকে চিনে ফেলে, তবে সেটা স্পেনের রাজার মর্যাদাহানিকর হবে। নিবৃত্ত হলাম আরও একটা কথা ভেবে। আমার সঙ্গে স্পেনের জাতীয় পরিচ্ছদ ছিল না। কোন রকমে যদি একখানা পোষাক যোগাড় করা যেত! এক দর্জির সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু হল না, এই দর্জিগুলিই প্রকৃত নির্বোধ। তা ছাড়া, ব্যবসায়ে তাদের মন নেই। কেবল আরগুবী কল্পনায় মত্ত থাকবে আর পাড়া বেড়িয়ে দিন কাটাবে। আমার নতুন সরকারী ইউনিফর্ম একটা কেটেই না হয় পোষাক একটা তৈরী করে নেব। আমি নিজেই পোষাকটা সেলাই করব, যেন এই তালি-মারা দর্জিগুলি কাপড়টা নষ্ট করতে না পারে। দরজা-জানালা বন্ধ করে দেব, যাতে কেউ দেখতে না পায়। নিজেই কাঁচি চালালাম, কারণ ছাঁট একেবারেই বদলে ফেলতে হবে। তারিখটা মনে নেই। মাসের নাম শয়তানই জানে। পোষাক তৈরী। কাপড়টা সঙ্গে সঙ্গে মস্তরা সশব্দে চীৎকার করে উঠল। অবশ্য এখনই আমি রাজ-দরবারে গিয়ে হাজির হচ্ছি না। স্পেনীয় প্রতিনিধিদল এখনও এসে পৌঁছায় নাই। তাদের ছাড়া একলা উপস্থিত হওয়া অশোভন হবে, তেমন চিত্তাকর্ষক হবে না। এখন প্রতি ঘন্টাতেই আমি স্পেনীয় প্রতিনিধিদলের আগমন প্রত্যাশা করছি।

পয়লা। প্রতিনিধিরা এত দেরী করছে কেন, ভেবে অবাক হচ্ছি। এমন কী কারণ থাকতে পারে এত দেরী করার। সম্ভবতঃ এই বিলম্বের পেছনে ফ্রান্সের হাত রয়েছে। ফ্রান্স তো আমাদের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেশ। স্পেনীয় প্রতিনিধিদল এসেছে কিনা, জিজ্ঞাসা করার জন্য পোস্ট-অফিসে গেলাম। পোস্ট-মাস্টার ব্যাটা আস্ত একটা গর্দভ। কিস্সু জানে না সে। বললে, "না, এখানে না, এখানে কোন স্পেনীয় প্রতিনিধিদল নেই, তবে তাঁদের কাছে পত্র যদি লিখতে চান, পাঠিয়ে দিতে পারি একটা নির্দিষ্ট হারে।" বেটা শয়তান কোথাকার। চিঠি লিখে কি হবে আমার? নেহায়েৎ বাজে কাজ এই চিঠিপত্র লেখা। যারা ওষুধ-পত্রের ব্যবসা করে, তারাই ত জানি পত্র লেখে।

মাদ্রিদ, ফেব্রুয়ারী ৩০।

অবশেষে স্পেনে আসা গেল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, তাল সামলানোই মুস্কিল হয়ে পড়েছে। স্পেনীয় প্রতিনিধিদল আজ সকালে এসে পৌঁছুল, আমিও তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসলাম। তাদের এত ব্যস্ততা আমি প্রত্যাশা করিনি, আমার কাছে তা অদ্ভুত ঠেকল। এত জোরে গাড়ী চালাল যে, মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে স্পেনে পদার্পণ করলাম আমরা। সারা ইউরোপ বলতে

লোহা বাঁধানো রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। স্টীমার চলে খুব দ্রুত। আশ্চর্য দেশ এই স্পেন।

পয়লা নম্বর ঘরে ঢুকেই দেখলাম বিস্তর লোকজন, সকলেই মুণ্ডিত মস্তক। তক্ষুণি অনুমান করলাম, এরা স্পেন দেশের জমিদার শ্রেণীর লোক। কিংবা দেশের সেনা-বাহিনীর অংশও হতে পারে। তাঁদের ন্যাড়া মাথা দেখে এইটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারলাম।

রাষ্ট্রের মন্ত্রী এসে আমার হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। বড় অদ্ভুত মনে হল তাঁর ব্যবহার। তিনি আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "থাক এখানে। ফের যদি নিজেকে রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড বলে জাহির করবি তো তোর ও সখ আমি একেবারে বার করে দোব!" আমি জানতাম এ আর কিছু নয়, কেবল একটা পরীক্ষামাত্র। সুতরা আমার ধারণা আমি আবার ব্যক্ত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী আমার গায়ে এমন জোরে দুই ঘা লাঠি বসিয়ে দিল যে, যন্ত্রণায় প্রায় চীৎকার করে উঠে মারতাম। কিন্তু নিজকে সংযত করলাম এই ভেবে যে, এই সব হচ্ছে প্রাচীন স্পেনের বীর প্রথা। প্রাচীন কালে কাউকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করার আগে এই সব করা হত। স্পেনে এখনও সেই সব পুরোনো রীতি-নীতিই রয়ে গিয়েছে। আমাকে একলা রেখে সবাই যখন চলে গেল, তখন আমি রাষ্ট্রীয় কাজে কর্মে মন দিলাম। আবিষ্কার করলাম যে, চীন ও স্পেন আসলে একই দেশ। লোকে যে এখনো একে দুটো দেশ বলে মনে করে, তারজন্য তাদের অজ্ঞতাই দায়ী। সবাইকে এখন আমি এই আদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন এক ফর্দ কাগজে "স্পেন" কথাটি লেখে, তা হলে তারা বুঝতে পারবে, "চীন" যেমন একটা শব্দ মাত্র, আর "স্পেন" ও তাই।

কিন্তু কাল যা ঘটতে চলেছে, তার কথা ভেবে এখনই আমি উদ্বেগ বোধ করছি। কাল সাতটার সময় পৃথিবী চাঁদের উপর গিয়ে বসবে। ইংরেজ রাসায়নিক ওয়েলিংটন এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। সত্যি, চাঁদের যা ঝুরঝুরে এবং ভঙ্গুর অবস্থা, তাতে উদ্বেগ বোধ না করে পারা যায় না। চাঁদ মেরামত করা হয়ে থাকে হামবুর্গ শহরে। কাজ তারা তেমন ভাল করে না। সেখানে একজন পিঁপা প্রস্তুতকারক রয়েছে, সে আবার খোঁড়া। সে-ই চাঁদ মেরামত করে। সে বেটা হল আস্ত একটা গর্দভ। চাঁদ মেরামতির কাজে সে কিছুই জানে না। একাজে সে মোম দেওয়া সুতলি এবং জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করে থাকে। আর তাতেই—পৃথিবী জুড়ে এই ঝাঁঝালো গন্ধ, যার জন্য আমাদের কানে হাত দিতে হয়। এত করে চাঁদ এত ঝুরঝুরে হয়ে যায় যে, কেবল সেখানে নাকেরা ছাড়া কোন মানুষ বাস করতে পারে না। সুতরাং আমরা আমাদের নাক দেখতে পাই না। কারণ নাক ত থাকে গিয়ে চাঁদের ওপর। পৃথিবী, অর্থাৎ আমাদের এই জমাট বস্তুটা যদি চাঁদের ওপর গিয়ে বসে পড়ে, তবে কেমন করেই না আমাদের নাকগুলি গুঁড়িয়ে দেবে। সেই কথা ভেবে এত অস্বস্তি বোধ করলাম

যে, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীকে চাঁদের ওপর গিয়ে বসা থেকে নিবৃত্ত করার হুকুম দেবার জন্য জুতো মোজা পরে কাউন্সিল ঘরের দিকে ছুটে গেলাম।

দরজার কাছেই সে ন্যাড়া মাথা জমিদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমি বললাম, "ভদ্রমোহদয়গণ, চলুন আমরা চাঁদকে রক্ষা করি, কারণ পৃথিবী চাঁদের ওপর গিয়ে বসতে চেয়েছে। তারা সবাই যেন রাজা দেশ পালন করতে লেগে গেল। তাদের অনেকে আমার সেই কথা শুনে চাঁদকে নামিয়ে আনার জন্য দেওয়াল বেয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় প্রবেশ করল। রাজমন্ত্রী। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল। কেবল আমিই দাঁড়িয়ে রইলাম রাজ্যের নৃপতি হিসেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! মন্ত্রী দেখলাম লাঠি দিয়ে মারতে মারতে আমাকে একেবারে খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। এত শক্তিশালী স্পেনের এই প্রাচীন রাজনীতিকগুলো।

সেই বৎসর জানুয়ারী মাস ফেব্রুয়ারী মাসের পর। কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না সত্যি কেমন ধারা দেশ এই স্পেন। প্রচলিত রাজনীতি আর রাজ-সভায় নিয়ম-কানুন সবই অপূর্ব। তার কিছুই বোঝা যায় না, একেবারে কিস্সু না। প্রাণপণ চিৎকার করে বললাম, "বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতে চাই না আমি।" তবু জোর করে মাথাটা আমার ন্যাড়া করে দিল। শেষে যখন তারা মাথায় আমার ঠাণ্ডা জল ছিঁটাতে লেগে গেল, তখন সে কী যে আমার মনে হল, তা ভাষায় বলতে পারব না। এমন নরক যন্ত্রণা তো আর কোন দিন ভোগ করিনি। প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম আর কি; অতি কষ্টে মাথাটি খারাপ হতে দিই না পেয়ে আমাকে ডাকতে লাগলেন তিনি। প্রথমে তিনি ডাকলেন "পপারিপটিন"। কাণ্ডজ্ঞানহীন, যুক্তিহীন প্রথা।

আমার আগেকার রাজার কেন এই ধরণের প্রথা বজায় রাখার মত নির্বুদ্ধিতা করতে গেল, সেটা আমার বোধগম্য হয় না। মনে হচ্ছে, আমি যেন পোপ-বিরোধিতা দমনকারী আদালতের হাতে পড়েছি। আমার মন্ত্রী যেন তার প্রধান বিচারক কিন্তু রাজা কেমন করে যে পোপ-বিরোধিতা দমনকারী আদালতের হাতে পড়তে পারে, সে দুর্বোধ্য। হয়ত এটা ফ্রান্সেরই কারসাজি, বিশেষ করে পলিনাকের। পলিনাকটা হল আস্ত একটা ডাল-কুত্তা। সে আমার প্রাণ-দণ্ড দেওয়াবে বলে কসম করেছিল। এখন সে-ই আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু বন্ধু, আমিত জানি, তুমি হচ্ছ ইংরেজদের হাতের পুতুল মাত্র। খুবই ধূর্ত এই ইংরেজরা সব দিকেই তাদের নজর। বিশ্বশুদ্ধ সবাই আজ এটা জানে যে ইংলণ্ড নেয় নস্য আর হেঁচে উঠে ফ্রান্স।

২৫শে মে।

আজ প্রধান বিচারপতি আমার ঘরে এলেন। দূর থেকে তাঁর পায়ের শব্দ শুনেই আমি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারের তলায় নিজকে ঢেকে ফেললাম। দেখতে

না পেয়ে আমাকে ডকতে লাগলেন তিনি। প্রথমে তিনি ডাকলেন "পপরিপটিন"। কোন সাড়া নাই। তারপর হাঁকলেন "আকজান্তি আইভানোভিচ খেতাবধারী কাউন্সিলার। সম্ভ্রান্তলোক।" সাড়া দিলাম না তবু। "অষ্টম ফার্ডিনান্ড, স্পেনের রাজা," মাথাটা আর একটু হলেই বার করে দিয়েছিলাম আর কি! ভাবলাম, না ভায়া, না, আমাকে তুমি পেয়েছ? মাথাটি আমি বার করে দিই, আর তুমি তাতে ঠান্ডা পানি ঢেলে দাও। সেটি হতে দিচ্ছিনে। ইতিমধ্যে কিন্তু তিনি চেয়ারের তলায় আমাকে আবিষ্কার করে গুঁতের চোটে সেখান থেকে বার করে অনলেন। হতচ্ছাড়ার লাঠিটাতে সত্যিই লাগে। কিন্তু সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল যখন, ভাবলাম, প্রত্যেক মোরগের পালকের নীচে এক একটা স্পেন আছে। প্রধান বিচারপতি ক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন যে, কোন না কোন শাস্তি আমায় দেবেনই। কিন্তু ওর মত লোকের হিংসা কি করতে পারে আমাকে? আমিত জানি, সে কাজ করে যন্ত্রের মত, ঠিক ইংরেজের হাতের যন্ত্রের মত।

৩৪শে মার্চ। ফেব্রুয়ারী ৩৪৯ খ্রীঃ।

না, আরত করতে পারছি না। হে ভগবান আমায় নিয়ে এ কি শুরু করেছে তারা? কেন তারা আমার মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে দেবে? তাদের দেবার মত আমার তো কিছুই নাই। আমি যে রিক্ত, এত যন্ত্রণা আর ত সহ্য হচ্ছে না আমার। মাথার চোটে চোখে পৃথিবীর সব কিছু বোঁ-বোঁ করে চরকীর মত ঘুরছে। উদ্ধার কর আমাকে, নিয়ে চল আমাকে এখান থেকে। এনে দাও বাতাসের মত দ্রুতগামী তিনটে অশ্ব। কোচমান, যাও তোমার জায়গা নাও। ঘন্টারা বাজে। তোমরা আমায় নিয়ে চল সোজা পৃথিবীর বাইরে। দূরে, আরও দূরে, পৃথিবীর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাক আমার চক্ষের সামনে থেকে।

ওহো আকাশ যেন ইতিমধ্যেই ঝুঁকে পড়েছে আমার মাথার ওপর; দূরে জ্বলছে একটি তারা, ঘন-সন্নিবিষ্ট বনরাজি যেন চন্দ্রালোকে নক্ষত্রের বেগে ছুটে চলছে, আমার পায়ের নীচে ভেসে বেড়াচ্ছে নীলাভ একখন্ড কুয়াসা, মেঘে মেঘে এখন সঙ্গীতের সুরলীলা; একদিকে রয়েছে সমুদ্র অন্য দিকে ইতালী তারও পেছনে রুশ কৃষকদের ঘরগুলি। ঐ দূরে আমার পৈতৃক ভিটেটা দেখা যাচ্ছে না? জানালার ধারে আমার জননী বসে নয়? মা, ওমা। তোমার দুঃখী ছেলেটাকে বাঁচাও মা। তোমার সন্তানের এই যন্ত্রণাদীর্ণ মস্তকটাতে ঝ'রে পড়ুক তোমার চক্ষের এক বিন্দু অশ্রু। তোমার হতভাগ্য এতিম ছেলেটাকে তোমার বুকে চেপে ধর মা! পৃথিবীতে তার শান্তি নেই, তারা ওকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

মা, মা, তোমার পীড়িত ছেলেটাকে একটু করুণা কর মা। আর মা, তুমি জান না যে, আলজিরিয়ার শাসন-কর্তার নাকের নীচে একটা আঁচিল রয়েছে।

কালো মেয়ের স্বপ্ন

ক্যাথারিন ওয়েন্‌স্ পিয়ার

ভূমিকা

ক্রীতদাসের মেয়ে মেরী ম্যাকলিউড বেথুন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার সপ্তদশ সন্তান। অদম্য সাহস আর দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এ মেয়েটির মনের কোণে ছিল একটি স্বপ্ন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার এক তুলার খামার বাড়ীতে কাটছিল তাঁর জীবন, সেই সময়ে তাঁর সুযোগ হলো একটি আদি মিশন স্কুলে ভর্তি হবার। জ্ঞানের আস্বাদন পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জাগলো শিক্ষাদান ও মানবসেবার বাসনা। কনকর্ডের স্কোশিয়া সেমিনারী ও শিকাগোর মোডী বাইবেল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হলেন। গ্রাজুয়েট হবার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হলো, তা তিনি সংগ্রহ করলেন ছাত্রবৃত্তি ও সর্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রমলব্ধ মজুরী থেকে। নিগ্রোদের জন্যে নিজের চেষ্টায় তিনি একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ফ্লোরিডায়। তাঁর সম্বল ছিল তখন মোটেই এক ডলার পঞ্চাশ সেন্ট আর শক্তি বলতে ছিল খোদার উপর অসীম বিশ্বাস। সেখানে তাঁরা পেন্সিলের কাজ চালাতেন পোড়া কাঠ-কয়লা দিয়ে, কালির কাজ চালাতেন এলডার বেরীর কালো রস দিয়ে। চেয়ার টেবিলের স্থান দখল করেছিল কতকগুলো প্যাকিং বাক্স। আজ সেই বেথুন কুকম্যান কলেজের সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ ডলার।

অদম্য মনোবল ও অপূর্ব আত্মবিশ্বাসের অধিকারী মিসেস বেথুন আমেরিকার সত্যিকারের সার্থকনামা মহিলাদের অন্যতম। তাঁর সংগ্রাম ছিল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামে উপকৃত হয়েছে তাঁর জাতি, সেই সঙ্গে কল্যাণ হয়েছে বিশ্বাসীর। ১৯৫৪ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনীতে উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। তারই ফলে তিনি সুযোগ পান দুনিয়ার সকল দেশের নেতাদের সঙ্গে কাজ করবার। আজ তিনি কোন সরকারী পদে নিযুক্ত নন তবু কিন্তু নানা সমস্যার পরামর্শ নিতে দেশের রাজনীতিবিদের দল তাঁর কাছে আসেন। আসেন উৎসাহ ও প্রেরণা পাবার আশা নিয়ে।

ক্যাথারিন ওয়েন্‌স্‌ পিয়ারে লেখা 'এ্যালবার্ট আইনষ্টাইন' ও মহাত্মা গান্ধী'র জীবনকাহিনী সর্বজনের প্রশংসা লাভ করেছে। তাঁরই লেখা মর্মস্পর্শী কাহিনী এই 'কালো মেয়ের স্বপ্ন' পাঠে পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে মেরী

আমি আজীবন কাজ করেছি তরুণদের সঙ্গে। তাদের জন্যে করেছি ভিক্ষা, করেছি সংগ্রাম। আমার বাঁচা তাদের জন্যে, জীবন তাদের মধ্যে, কাহিনীও তাদেরই কাহিনী।

কিশোরী মেরী ম্যাকলিউডের ছবি দেখতে পাই আমি জীবনযুদ্ধরত সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তাই তাদের নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার, তাদের চেষ্টা সফল করবার, লক্ষ্যবস্তু হাতের মুঠোয় পাবার এবং খোদা ও মানুষের উপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করবার কাজে যতক্ষণ না কিছু সাহায্য করতে পারি ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। সর্বশক্তিমান খোদার নিকট আমার প্রার্থনা, ক্যাথারিন পিয়ারের অপরিসীম পরিশ্রমের ফল এই 'কালো মেয়ের স্বপ্ন' পাঠে পাঠকদের আত্মবিশ্বাস, খোদায় বিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম করবার বাসনা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে তাদের সাহায্য করবে সাধু জীবনের আদর্শ পালনে।

আমার জীবনপথ ছিল বন্ধুর। আমার সেই দিনে কারো জীবনই আরাম আয়াসের ছিলনা। আরামের জীবন কেউ চাইতও না। আমাদের কষ্টে তোমাদের জীবনের পথ কিছুটা সরল ও সুগম করে তুলতে পারে। তোমাদের অটল সংকল্প, কুশলী হস্ত ও বিদগ্ধ মনের অবিরাম চাপে আর প্রার্থনার ফলে তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির দুয়ার হয়তো অনায়াসেই খুলে যাবে কিন্তু আমার ভাগ্যে তা ঘটেনি।

আমি আজ আনন্দ পাই আমার পঁচাত্তর বছরের অতীত জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে। তখন ভাবি, আমেরিকার বিপুল জীবন প্রবাহের কিছুটা জুড়ে অন্ততঃ আমি রয়েছি। আমি কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঝোতা এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টির কাজে। এতেই আমার আনন্দ। আমি আজ সুখী। আমি দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, নিম্নতম স্তরের তরুণদেরও যদি জীবন স্বপ্ন থাকে, আর থাকে তা সফল করবার মত সুদৃঢ় সংকল্প, তাহলে আকাশের নীচে খোদার এই রাজ্যে তাদেরও স্থান আছে।

—মেরী ম্যাকলিউড বেথুন

এক

ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল মেরী জেন। পাশ ফিরল আবার সাবধানে, যাতে গদীর ফাঁক দিয়ে গায়ে কুটো না ফোটে। মোটা চটে মোড়া তার বিছানা। নিগ্রোর ঘরের মেয়ে সে, কোথায় পাবে দামী কাপড়ের নরম পালকের বিছানা সাদা লোকেদের মতো !

ঘুম ভেঙে গেল মেরীর। রোজকার অভ্যাস মতো ভোর হলেই সে টের পায়, অথচ পাইন তক্তার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাইরে তখনো বেশ অন্ধকার। সারাটা বছর তার ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায়। তুলোর খামারে কাজের কি আর শেষ আছে ! না আছে সারা দিনে এক মিনিটের সময় নষ্ট করবার জো ! লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। শোবার পোষাকটা বদলে নিল মেরী, পরে নিল সুতী কাপড় একখানা ; তারপরে ছুটলো পাক ঘরের দিকে। চর্বির সাথে মকাই সেদ্ধ আর কফি দিয়ে মা সকালের নাশ্‌তার ব্যবস্থা করছিলেন। রাঁধতে রাঁধতে ঘরটা ভ্যাপসা গরমে ভরে উঠেছে—বেশ গরম। দক্ষিণ ক্যারোলিনা জায়গাটাতে এই জানুয়ারী মাসেও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি।

'যাও বাছা, হাত-মুখ ধুয়ে এস', মা বললেন।

'খেতে দেবে এখনি ?'

'হ্যাঁ, কাজকর্ম সেরেই খেতে এস। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এস তো।'

বাড়ীর পেছনে বড়সড় একটা কাঠের জালা। তারি মধ্যেকার পানি দিয়ে মুখ ধুচ্ছিল মেরীর ভাইবোনেরা সব। সবসুদ্ধ সতের জন ওরা। চৌদ্দ জনের পরে মেরী। কারো কারো বিয়ে হয়েছে ; তারা এখন আলাদা বাড়ীতে থাকে। আবার বড় বোন স্যালী থাকে দূরের শহরে ; মাঝে মাঝে যখন বাড়ী আসে সেজেগুজে, ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে, তখন সঙ্গে নিয়ে আসে বাক্স ভর্তি উপহারের জিনিস । এখনো অনেকগুলো ছেলেমেয়েই রয়ে গেছে মেকলিউড পরিবারে রোজ সকালে পানির জালার কাছে তারা ভীড় করে হাতমুখ ধোবার জন্যে। ওর পালা কখন আসবে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে মেরী।

'শিগ্‌গীর, শিগ্‌গীর ধোও।'

'চুপ করো।'

'এই, ঝগড়া কোরোনা, ধোয়া সেরে নাও।'

সকালের নাশতা করার আগেই বিছানা গুটিয়ে রাখতে হবে, খচ্চর জুত্‌তে হবে লাঙ্গলে আর গরু নিয়ে যেতে হবে মাঠে। মাত্র নয় বছর বয়স মেরী। ওর কাজ তাই সব চেয়ে সোজা—মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া। ঠাণ্ডা পানিতে হাত ভিজিয়ে কষ্টিক ও চর্বির বাজে সাবানে ফেনা বার করবার চেষ্টা করলো মেরী। এই ভাবে কোনমতে হাত মুখ ধুয়ে গোয়ালের দিকে এগিয়ে গেল সে।

গরুটা বেশ নিরীহভাবে চলতে লাগল মাঠের দিকে। পিছু পিছু চলল মেরী। দূর দিগন্তে তখন ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠল মেকলিউডদের খামার বাড়ীর চৌদিকের জোত-জমিগুলো। সামনে লাঙ্গল-চষা জমি, তুলোর বীজ বোনা হবে ওতে। দূরে, বহুদূর বিস্তীর্ণ সমতল জলা জায়গা। কিছুই হয়না সেখানে।

এক দৌড়ে পাকঘরে পৌঁছেই মেরী দেখতে পেলো, বড়রা সব খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। খাবার টেবিলে সবাইকে একসঙ্গে ধরেনা, মেরীকে তাই অপেক্ষা করে থাকতে হয়। শেষ বাসনটাও যখন ধোয়া হয়ে যায়, শেষ পেয়ালাটাও যখন ঘসে মেজে তুলে রাখা হল, তখন সাত আটটি ছেলেমেয়েসহ প্যাটসী আর স্যামুয়েল মেকলিউড চললো কাপাস ক্ষেতে। তখন পর্যন্ত ওরা মেরীদের চার কুঠরী বাড়ীতেই থাকে।

এ সময়টা হাল চষবার মৌসুম। সবে নয়া সালের আরম্ভ। গত বছরের কাটা কাপাস গাছের গোড়া বাঁচিয়ে সাবধানে পথ বলতে হয়। পায়ে জুতো নেই ওদের। পরিবারের নিজেদের খচ্চর যেটা ছিল তাকে চওড়া ফালের লাঙ্গলে জোতা হয়েছে। নাম ওর 'বুড়ো বুশ'। ঝাঁকড়া লেজের জন্যেই ঐ নাম। আস্তে আস্তে লাঙ্গল টানে সে সোজা লাইন ধরে। ফালের দুপাশে মাটি উপড়ে পড়ে। ওকে ঠিকমত চালাবার জন্যে মেকলিউডদের একজন থাকে ওর মাথার কাছে। লাঙ্গল ধরে থাকে আর একজন। সম্পত্তির মধ্যে ওদের সবচেয়ে দামী সম্পদ হল এই খচ্চর।

জমি চষতে চষতে ওদের পিঠ বেঁকে যেত। তবু, এত খাটুনীতেও তাদের ছিল আনন্দ। কারণ, জমিটা তাদের নিজেদের। ক্রীতদাস নয় ওরা। এক সময়ে স্যামুয়েল আর প্যাটসী ক্রীতদাস ছিল। অন্য লোকের জমিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত তাদের, নিজেদের তাতে কোন লাভ হতো না। তারপর এল গৃহযুদ্ধ, আব্রাহাম লিংকনের দাস মুক্তির বাণী। বড় ছেলেমেয়েগুলো জন্মেছিল ক্রীতদাস থাকা কালে। মেরী জেন আর ওর ছোট দু'টি মুক্ত পৃথিবীতে স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্মেছে।

ছোট ছেলে হ্যাটিকে দুধ খাওয়াবার জন্যে মা প্যাটসী মাঠ ছেড়ে একটা গাছের নীচে এসে বসলেন। তারপর দুপুর বেলা চলে গেলেন বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

মা যে চলে গেলেন মেরী তা দেখল। মা গিয়ে গরম ভাত বাড়বেন, বাটিতে সাজিয়ে রাখবেন মটর শুঁটির সঙ্গে গরম গোশতের তরকারী।

একটু পরেই বাড়ীর দিক থেকে যখন ডাক এলো, ওরা বুঝল, খাবার তৈরী। ছোট-বড়-মাঝারী সব ভাইবোন তখন ফিরে এল মাঠ থেকে।

বাপ স্যামুয়েল লম্বা জোয়ান ! ছেলেমেয়েরা কেউ তার কাঁধ ছাড়িয়ে যায়নি। লাঙ্গলের দাগের উপর দিকে ওরা হাঁটতো আর স্যামুয়েল স্নেহভরে তাকিয়ে থাকতেন ওদের দিকে। সকলের শেষে ছিল ছোট্ট মেরী।

'মেরী, এগিয়ে এসো ! পেছনে পড়লে কেন ?'

'আমি স্বপ্ন দেখছি।'

'কিসের ?'

'করুণাময়ের।'

'তা বেশ। ক্ষিদে পায়নি তোমার ?

'হ্যাঁ। পেয়েছে।'

পেটটা ওর জ্বলে যাচ্ছিল। বাবার কথা শুনে কল্পনার স্বর্গ থেকে নেমে এল মেরী। একছুটে সব্বার আগে পোঁছে গেল বাড়ীতে। ওর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন বাপ। ছোট্ট মেরী ! সব্বার চেয়ে আলাদা সে !

এরপর আবার সেই পানির জালার কাছে হুড়োহুড়ি করার পালা। আবার সেই টেবিলের দু'পাশে বসে খাওয়া। তারপর ক্ষেত আর সন্ধ্যা নাগাদ খাটুনী।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকলে ঘরের কাজকর্ম করতে হবে রাতের প্রার্থনার পূর্ব পর্যন্ত। আলোর ব্যবস্থা করার ভার মেরীর হাতে। প্রত্যেকটি বাতি যথাস্থান থেকে পাকঘরে নিয়ে যাও, সাফ কর, সলতে কাটো, কেরোসিন ভরো, তারপর জায়গা মত বসিয়ে দাও।

বসবার ঘরের আগুন রাখার জায়গাটি স্যামুয়েল তৈরী করেছিল বহু আগে ! সেখানে আগুনের ধারে যিনি বসে আস্তে আস্তে দুলতেন, তিনি মাঠে খাটতে যাননি—তিনি মোফিয়া। ওদের দাদীমা। সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছেন ক্রীতদাসী হিসেবে। এখন তাঁর শনের মত পাকা চুলে একটা লাল রুমাল বেঁধে দাঁত-পড়া মাড়ির ফাঁকে একটা পাইপ চেপে আরাম করে বসে থাকতে কোন বাধা নেই।

মেরী তার লণ্ঠনের কাজ সেরে ছুটল দাদীর কাছে। সন্ধ্যার এই সময়টা তার সবচেয়ে ভাল লাগত। কারণ, এই সময়েই হতো আরাধনা-সঙ্গীত।

মা এসে চুলার কাছে একটা দোলানো চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর এলেন বাপ। তিনি এসে পুরু গদী আঁটা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে দাঁড়ালো চারদিক থেকে বাপ স্যামুয়েল গান ধরলেন ঃ

'অবশেষে মুক্তি !
আমাদের মুক্তি !
হে খোদা ! তোমাকে জানাই
হৃদয়ের ভক্তি ! ···

গান শেষ হলে সবাই মাথা নুইয়ে প্রার্থনায় যোগ দিল। নীরব সে প্রার্থনা তাদের। কেউ কেউ অবশ্য জোরে জোরেই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করলো। প্রার্থনা সভায় না ছিল কোন গানের বই, না একটা বাইবেল—ওরা তো কেউ লেখাপড়া জানতো না !

একটা ঋতু আসে আর যায়। কর্মময় এক একটি দিন বয়ে যেতে লাগলো। মাঠ চষার পর বীজ বোনা। কবে মাটির বুক চিরে সবুজ তুলোর অঙ্কুর বর্শা

ফলার মত উঁকি মারবে, তারই প্রতীক্ষায় বসে রইল ওরা। চারা গজাবে। দরকারী চারাগুলো রেখে বাদ বাকী উপড়ে ফেলবে তারা।

এর পরের লড়াই আগাছার সঙ্গে। আগাছা বড় হয়ে তুলোর ক্ষণজীবি চারাগুলোকে নষ্ট করে দেয়। আর সবার মত মেরীকেও মাঠ থেকে ঘাস আর আগাছা উপড়ে ফেলবার জন্যে যেতে হয়। মেরী মাথা নীচু করে প্রার্থনা জানায়, 'করুণাময়, আমাকে বাঁচাও।'

পরের তিন মাস ধরে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তুলোর চারা। তুলোর চাষ করতে হয় হাত দিয়ে, বেশী যন্ত্রপাতির ব্যবহারে তুলোর চারাগুলো মরে যায়।

মেরী সতর্ক দৃষ্টিতে মাটি খোঁড়ে, যাতে কোন চারার গায়ে আঘাত না লাগে। কাজ করার সময়েই নজর রাখে ডালপালার ওপর সব্বার মত সেও চায় তুলোর প্রথম কুঁড়িটি সে-ই আগে দেখবে। তুলোর প্রথম কুঁড়িটি সবার আগে দেখবার ভেতরে রয়েছে কেমন একটা গরব আর উত্তেজনা।

'আমিই যেন প্রথম কুঁড়িটি দেখি'—ও প্রার্থনা করে।

ওর প্রার্থনা যেন খোদাতায়ালা শোনেন ; ও দেখতে পেলো, ওর চোখের সামনেই মূর্ত হয়ে উঠেছে ছোট্ট, চৌকো একটি পদার্থ।

'এই যে পেয়েছি, এখানে', মেরী চীৎকার করে ওঠে।

হাতের কাজ ছেড়ে সবাই এগিয়ে যায় ওর দিকে। হয়েছে! তুলোর কুঁড়ি হয়েছে! আর মাত্র তিন হপ্তা—তার পরেই টুকটুকে লাল লাল ফুলে সারাটা মাঠ লালে-লাল হয়ে যাবে। তিন দিনের দিন ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে। জেগে উঠবে তুলো-গুটি। আর ছয় হপ্তা বাদে গুটিগুলোও যাবে ফেটে, দেখাবে পাঁচ-কোণা তারার মতো। তার ভেতর থেকে ফুলে উঠবে তুলোর সাদা সাদা গোলা। ওদের আর আশপাশে সবার মাঠে ফুটে উঠবে সাদার অপূর্ব সমারোহ। মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে চোখ ধাঁধানো রূপ হবে তার, যখন চাঁদের আলো ফুটবে, সাদা পোষাক পরা মায়াবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

দিনের শেষে যখন ওরা বাড়ী ফিরল খেতে, তখন সে কী উত্তেজনা তাদের! সন্ধ্যার আরাধনার সময়ে ওরা সেদিন প্রার্থনা করলো তুলোগুলো যেন ভাল থাকে। তারপর চললো তুলোর গল্প।

দুয়ারের চৌকিতে বসে মেরী চেয়ে থাকে তারায় ভরা আকাশের দিকে। এক দৃষ্টিতে কোন একটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। কখনো বা সে চেয়ে থাকে ছায়াচ্ছন্ন মাঠের দিকে। সারি সারি কুঁড়ি সমেত তুলোর গাছগুলো ওর মনে দাগ দিয়ে যায়। কখন কি ভাবে যে বাড়ছে গাছগুলো হাজার চেয়ে থাকলেও তা টের পাওয়া যাবে না। এমন কি যত শোন, গাছের শব্দটি পর্যন্ত পাবে না! কিন্তু তবু খস্ খস্ শব্দ। যেন বলছে, ফিস্ ফিস্ ফিস্। তুলোর গাছ কিন্তু নিস্তব্ধ মনে হয় যেন এক প্রকাণ্ড বাড়ীর শ্বেতাঙ্গিনী কর্ত্রী, একদিকে লজ্জা, অন্য দিকে গর্ব।

'শোবার সময় হল, বাছারা, শুতে যাও এবার।' মায়ের আদেশে মেরীর কল্পনার জাল ছিঁড়ে যায়। ছোটরা তাদের খড়-মোড়া গদীর দিকে চলে যায়। মা-ও ঘরে ঢুকলেন। তিনি আবার শোবার আগে কিছু কাপড় ইস্ত্রি করবেন। সারাদিনের ক্ষেতের কাজের পরেই সাদা আদমীদের কাপড় কেচে ইস্ত করে তিনি দু'চার পেনী করে বাড়ীর আয় বাড়াতেন। মেরী চোখ বুঁজলো, বুঝলো ভোর হলেই মা ক্ষেতে যাবার আগে কাপড় দিয়ে আসতে যাবেন। মেরীর আশা, সেও যাবে মার সঙ্গে।

ভোরের নাশ্‌তো খাবার পরেই কাপড়ের গাঁঠরী মাথায় করে ধুলোময় আঁকাবাঁকা পথে মা চলতে শুরু করলেন। পেছনে তার মেরী।

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়েই চোখে পড়ল সাদা প্রাচীর। ঐখানেই তারা যাবে। মস্ত বাড়ী, মেরীদের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো। অথচ কত অল্প লোক থাকে তাতে।

সামনের দরজা দিয়ে ওদের ঢোকা নিষেধ। গাড়ীর রাস্তা ছেড়ে পাশের মেঠো রাস্তা ধরে তারা বাড়ীর পেছনের দিকে গেলো। গিয়ে দরজায় মৃদু ধাক্কা দিল।

প্যাটসীদের ভূতপূর্ব মনিব যেন উইলসনের বাড়ী এটা। দরজা খুললে প্যাটসী বাড়ীতে ঢুকলো। মেরী রইল বাইরে। বাড়ীটার কয়েক গজ দূরে একটা খেলাঘর—তার দিকে চেয়ে রইল সে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে উইলসনের দুই নাতনীকে। সুন্দর সোনালী রংয়ের চুল ওদের।

একজন বলে, 'কি খবর! ভেতরে আসবে?'

মেরী ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলো। কত পুতুল, খেলনা, আসবাব সব। ছোট ছোট কাপড়, জামা! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মেরী। সাদা মানুষগুলি কী রকম পোষাক পরে। ওদের পুতুলের যে পোষাক তা-ও হল পশমের—তার উপর রয়েছে জুতো।

'আমার পুতুলটা একটু ধরো তো।'

নাঙ্গা-পেয়ে মেহমান আরাম করে বসে পড়ল একটা ছোট্ট চেয়ারে। ওর কোলের উপর বসিয়ে দেওয়া হল একটা জমকালো পুতুল।

'দাও, ম্যাডাম।'

'চল আমরা 'ঘরকন্না খেলি।' তুমি আমার ছেলেটাকে ধর, আমি ততক্ষণ চা খেয়ে নিই।'

মেরী অপেক্ষা করে আরেকটা হুকুম আসার। 'মেরী, বাচ্চা কাঁদছে, একটু চুপ করাতে পারছো না। আমার চা-টাই মাটি করে দিলে,' ছোট্ট গিন্নীটি বড়োদের মতো কথা বলে।

মেরী পুতুলটাকে ভাল করে ধরে কান্না থামাবার জন্য দোলাতে থাকে। পুতুল-কোলে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করে, পিঠে টোকা দেয়, মুখে মুখে বানিয়ে ঘুম পাড়ানী গান গায়। হঠাৎ সে দেখতে পেলো তাকের উপর একটা বই।

ও দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বইটা টেনে নেয়। সোনালী কোঁকড়ানো চুলভর্তি, মাথাওয়ালা একটা লোক ছুটে এল ওর দিকে।

'এই, রেখে দাও, রেখে দাও বইটা। তোমার আবার পড়া!' কথাগুলো ছুরির ফলার মতো ওর প্রাণে খোঁচা দেয়। খেলাঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় মেরী। এসে দাঁড়ায় নির্মল প্রভাতের আলোয়। কি করেছে সে? যা ওর ছোঁয়া উচিত নয়, তা-ই না হয় ছুঁয়ে ফেলেছে! এর জন্য সমস্ত সকালটা তার মাটি হয়ে গেল?

'সাদা আর কালোর এত তফাৎ কেন?' মার পিছু পিছু বাড়ী-মুখো চলতে চলতে প্রশ্নটা সে ভাবে। একটা জিনিস সে হাত দিয়েছে, তাই এত?

সাদা লোকেরা এত বড় বড় বাড়ী, আর অত সুন্দর সুন্দর কাপড় চোপড় পেলেই বা কোথায়? জানালায় ওদের কাঁচ, ঘসে সাফ করলে আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। ওদের কাজগুলো পর্যন্ত অন্য লোক দিয়ে করায়। গাড়ী ছাড়া বাইরে বেরোয় না। মনে মনে মেরী বলে, 'খোদা, আমরা তো ওদের মত মুক্তি পাইনি!'

তারপর নিগ্রোদের বাড়ীগুলো নজরে আসতেই জীবনে প্রথম সে বুঝতে পারল, কী ধরনের বাড়ীতে তারা থাকে। এক ঘন্টা আগেও যে ঘরকে মনে হয়েছিল শান্তি-সুখের নীড়, সেগুলো আসলে কত জীর্ণ পাইনের চালা; একটু রং পর্যন্ত দেওয়া হয়নি ঘরগুলোতে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আছে কতকগুলো বারান্দা। ছাতের সঙ্গে লেগে রয়েছে খুঁটিগুলো। উইলসন সাহেবদের অট্টালিকার থামগুলোর তুলনায় কাঠের খাম্বাগুলো যেন জ্বালানী কাঠের সরু সরু টুকরো। মেরীদের কেবিন বাড়ীটি ঝুঁকে পড়েছে একদিকে! মনে হচ্ছিল বাড়ীটির ভিত যেন বসে গিয়েছে!

সাদা আদমীরা পেল কোথায় এত! কত কম নিগ্রোদের। কেন এই তফাৎ? হয়ত লেখাপড়াই এর কারণ। মেরীর সংকল্প: সে লেখাপড়া করবে। করবেই সে!

দুই

সেদিন থেকে আপন মনে কাজ করে যায় মেরী। ওর মনে জ্বলতে থাকে এক দুরন্ত বাসনার আগুন ; সে পড়বে, জানবে, শিখবে।

অথচ তার কোন আশাই নেই। কোথায় স্কুল, কোথায় বই, কোন্ শিক্ষকই বা পড়াবে কালা আদমীর সন্তানকে ? তাদের জন্য রয়েছে শুধু তুলোর ক্ষেত। তুলো আর তুলো। মাসের পর মাস শুধু তুলো। তুলোর কাজ শেষ হলে মেকলিউড পরিবার ওদের জমির প্রান্তে ঢালু একটা জমিতে চাষ করতো। কখনো জোগাড় করতে হত পশুর খাদ্য, কখনো বা তুলতো শাক-সব্জী, ক্ষেতের আগাছা।

মেরী বস্তা ভরে আর খোদার দরবারে বলে, 'আমি পড়তে চাই, পড়তে চাই।'

একদিন বস্তা ভর্তি সারা করে বাড়ী ফিরল সে। মেঝেতে জমিয়ে রাখবে এসে। পিঠ থেকে ভারী বস্তা নামাবার জন্য ঝুঁকেছে যেই, দেখতে পেল, তার সামনে এক অপরিচিতা মহিলা। মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকাল মেরী। এমন সহানুভূতিভরা মুখ আর কখনো দেখেনি সে। মহিলাটিও নিগ্রো, কিন্তু তবু মেরীর চেয়ে ফর্সা ওর রঙ। মেরীর গায়ের রঙ কয়লার মত কালো। অথচ ওর সামনের মহলাটির রঙ ওর চেয়ে ফর্সা।

'মেরী ! আমি মিস্ উইলসন।'

মিস ? নিগ্রো আবার মিস ! কালো আদমীরা কখনও আবার মিস্টার-মিস হয় নাকি ? তাদের নামের আগে কেউ তো কখনো কোনো উপাধি ব্যবহার করে না। পরিবারের সমস্ত লোক ফিরে এসেছে মাঠ থেকে। তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে মিস এম্মা উইলসনকে। অথচ মেলা কাজ জমে ছিল সে সময়ে।

'একে আমরা ছাড়তে পারি', মিস উইলসনকে বললেন মা।

পরিবারের সকলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। বাপ স্যামুয়েল বললেন, 'মেয়েটি সোজা সরল হলে কি হবে, সব্বার চেয়ে বুদ্ধিমতী ও।'

মিস উইলসন একটু হেসে মেরীকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি এখানে এসেছেন একটা স্কুল খোলার জন্যে। তাঁকে পাঠিয়েছেন প্রেসব্রাইটেরিয়ান চার্চের প্রচারক সমিতি, যাতে নিগ্রো ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পায়।

'আমি চাই যে তুলো তোলার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তুমি চলে আসবে মেয়েসভিলায়।'

'পড়তে যাবো ? আপনি বলছেন আমি পড়বো ?' উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল মেরী। ভারী হয়ে এলো ওর গলা। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রু।

এম্মা উইলসন হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর ধুলোভর্তি পথ বেয়ে চললেন অন্য নিগ্রোদের ঘরে আরো ছেলেমেয়ে চাইতে। তাঁর ইচ্ছে সব কটিই পড়তে আসুক, কিন্তু সবাইকে তো বাপ মায়েরা ছাড়বে না। জোর বরাত তাঁর, যদি প্রতিটি বড় পরিবার একজন করে ছেলেমেয়ে দিতে রাজী হয়।

এম্মী উইলসন দক্ষিণ অঞ্চলে ফিরে এসেছিলেন তাঁর জাতির লোকদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করবার জন্যে। তিনি জানতেন, শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে জাতির মুক্তি। শিক্ষার জন্য মেরীর গভীর অনুরাগ দেখে ওর মনেও আশার দোলা লাগলো। মেরীর মতো একজন ছাত্রী পেলে বহু বাধাই অতিক্রম করা যায়।

মেরীদের পরিবার আবার তুলো তুলতে মাঠে নামে। এবারে সবার আগে দৌড়চ্ছে মেরী, টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একটা খালি বস্তা।

সবাইকে ও ধমকায়, 'এসো, তাড়াতাড়ি এসো। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই। আস্তে কেন অত! তোমরা দেখছি আমায় স্কুলে যেতে দেবে না।'

'এই বই রেখে দাও তুমি। তোমার আবার পড়া ... '

কথাগুলো এবার তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে।

তিন

মেয়েসভিলায় বড় একটা দোকানের সামনে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। একবার এ-পায়ে তারপর ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় সে। দোকানের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। বাপের পকেটে রয়েছে সামান্য কিছু টাকা, তেমন কিছু নয়। তবু তিনি ভাবছেন, মেয়ের বিদ্যারম্ভের দিনটিতে ওকে কিছু উপহার দেওয়া উচিত।

সবগুলো তুলো তাঁর ধুলোময় পথ বয়ে শহরে এনে দিয়েছেন বেচে। তারপর ঘুরে ঘুরে বকেয়া দেনা যত সব পরিশোধ করেছেন,-- বীজের টাকা, সদরের টাকা, মুদীর পাওনা—সব। বাড়তি টাকাটা পকেটে হাত দিয়ে দেখে নেন একবার। খুব হিসেব করে খরচ করতে হবে। একখণ্ড কাপড় কিনতে হবে প্যাটসীর পোষাকের জন্যে, আর লাগবে নূতন বাতি, কয়েকটা আপেল, মাংস কিছুটা।

আরো একটা জিনিস কেনা দরকার। সেটা মেরীর।

'কি চাই তোমার মা?' বাপ জিজ্ঞাসা করেন মেয়েকে।

'লেখার জন্যে কিছু একটা দাও না!' মেরী মিনতি জানায় বাপকে। দোকানদার তাক থেকে একটা শ্লেট আর তার সঙ্গে বাঁধা একটা খড়ি নামিয়ে দেয়।

'আমার মনে হয় এই-ই সবচেয়ে ভাল হবে। যত খুশী লেখ আবার মুছে ফেল—কোন অসুবিধা নেই।'

সেই অমূল্য রতন হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় মেরী। ওর আঙুলের মাথা চৌকো হয়ে গেছে, ভারী কাজ করতে করতে হাত দুটি এর মধ্যেই বড় হয়ে গেছে। শ্লেটের উপর খড়ি ঘসে দেখে নেয় সে। বেশ দাগ পড়ছে। বেশ লেখাও যাবে, আবার মুছে ফেলাও চলবে। লিখতে শেখার পর থেকে খালি লিখতেই থাকবে সে। ভাইবোনেরা বলল, 'আমাদের শিখিয়ে দিও তুমি।'

ও তাদের আশ্বাস দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই দেব।'

'কাল রাত্রেই পড়ে শোনাতে পারবে তো আমাদের?'

'কি জানি, যদি তাড়াতাড়ি শিখতে পারি তবে হয়তো হবে।'

সে রাত্রে প্রার্থনার পর মা শুধু ইস্ত্রি করলেন মেরীর জন্য একটা নতুন ডোরাকাটা পোষাক।

পরদিন সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে, যেন দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন কোন এক রাণী। সে যেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে বেরুবার পূর্ব মুহূর্ত। এক হাতে ওর খাবারের থলে, আর হাতে সেই মহামাল্য শ্লেট-পেন্সিল। মা যখন ওকে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছিলেন, মেরীর বাবা তখন গভীর মমতাভরে একখানি হাত রাখলেন ওর মাথায়।

'সারাটা পথ ধরে আবার স্বপ্ন দেখে!' বাবা সতর্ক করে দিলেন তাকে; বললেন, 'প্রথম দিন যেন স্কুলে দেরী করে না।'

মেরী রওয়ানা হল, পরিবারের সবাই তাকিয়ে রইল ওর যাওয়ার পথের দিকে পাঁচ মাইল দূরের এক রাস্তা দিয়ে যেতে হবে ওকে। আবার ফিরতে হবে এই পাঁচ মাইল পথ হেঁটে। রোজই এই রকম করতে হবে তাকে।

মিস উইলসন স্কুল করেছেন রেলের রাস্তার ধারে নিগ্রোদের বস্তির মধ্যে একখানা ঘরে। তাঁর আশা অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলের একটা নিজস্ব বাড়ী হবে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছিলেন, কথা মতো সবাই ছেলেমেয়ে পাঠিয়েছেন কিনা। এলো তো মাত্র কয়েক জন, খুব সন্ত্রস্ত ভাব তাদের, কি জানি কি ঘটে ভাগ্যে। তাছাড়া তাদের কৌতূহলী মনও খুৎখুৎ করছিল। ঘরের মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে ওরা তাকিয়ে আছে মিস উইলসনের দিকে তাদের কালো, বড় বড় চোখগুলো তুলে। এদের সবাই আসতে চায়নি। মাত্র কয়েকজন ছাত্রীর চোখে আসতে পারার খুশীর উত্তেজনা। এদের সবার চেয়ে বেশী শিক্ষানুরাগ মেরীর।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মিস উইলসন আপন দক্ষতায় ওদের ভয়-ডর দূর করে দিলেন। বেশ খেলা করতে লাগল ওরা সবাই। একটা সামাজিক দলের অংশে পরিণত হবার পথে এটা একটা মস্ত বড় ধাপ। রঙীন কাগজ কেটে ওরা ফুল তৈরী করছিল। সাদাসিধে ছেলেমানুষী দুয়েকটা গানও তারা গাইলো। আর আনন্দের মধ্যে চললো তাদের হরফ চেনা।

দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্র এই রকমটাই হয়েছিল। ক্রীতদাসরা মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের লেখাপড়া শেখান নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন রাষ্ট্রে ওদের লেখাপড়া শেখানোকে শাস্তি দেওয়ার যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। তারপর এল মুক্তি। বহুদিন পুঞ্জিভূত ছিল আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা। মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সেটা। প্রথম প্রথম এই আকাঙ্ক্ষা অনেককেই ভুল পথে চালনা করেছিল। ভাঙ্গা কুটিরের বাসিন্দারা কিনতে লাগল মোটা মোটা বই, বড় বড় তার নাম। বই যত মোটা হবে, যত বড় হবে নাম, ততই তাদের সে বই পছন্দ। কেউবা রুটি মটরশুঁটির তরকারী আর পানি খেয়েই দিন কাটাত। তাদের মনেই হতো না যে, সত্যিকারের শিক্ষা তাদের ভাল খাবার ব্যবস্থাও করতে পারে। হয়ত দেখা গেল, ফরাসী ব্যাকরণ কি একখানা ল্যাটিন কেতাব নিয়ে বসে রয়েছে কোন এক যুবক। তারা বুঝতে পারত না যে তাদের প্রথম দরকার ছিল জীবনযাত্রার উচ্চতর মান, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাজকর্ম।

নিগ্রোদের জন্য সর্বপ্রথম স্কুলগুলো খুলেছিলেন 'নর্মান চার্চ প্রচারক সঙ্ঘ'। নিগ্রোদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাদের প্রচেষ্টা ছিল বিরাট। এম্মা উইলসনকে দক্ষিণে পাঠিয়েছিল প্রেসবিটেরিয় চার্চ। মিস উইলসন শিক্ষাদীক্ষা

পেয়েছিলেন ক্যারোলিনার কনকর্ডের স্কোশিয়া সেমিনারীতে। যে সব শিক্ষাব্রতী দক্ষিণ দিকে কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁদের সবার চেয়ে উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন মিস উইলসন। মনে তাঁর আশা, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে আবার শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হবে।

প্রায় রোজই আসতো তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। মেরীর অন্ততঃ কামাই হতো না একটা দিনও, এক ঘন্টাও, এমন কি এক মিনিটও।

এক এক সময় মিস উইলসন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হত দুয়ারেই। তার নরম হাত দু'টি ধরে রাখতেন নিজের হাতের মধ্যে যতক্ষণ না হাত দু'টি গরম হয়ে ওঠে। কখনো বা মেরীর বিদ্ঘুটে জ্যাকেট আর আলোয়ান খুলতে সাহায্য করতেন। আবৃত্তি শুরু হবার আগে মেরীকে বিশ্রাম দিতেন ক্লান্তি দূর করার জন্যে। স্কুল ছুটি হলেই মেরী পথ ধরতো।

আস্তে আস্তে শীত এসে পড়ে, দিন ছোট হয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে যেত মেরীর বাড়ী ফিরতে। ভাইবোনেরা তার পাইন গাছের কাঠ জ্বালিয়ে চারধারে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতো। মেরী এলেই ওর চারধারে ভিড় করে দাঁড়াত তারা।

'আজ কি শিখলে বলতো', ওকে জিজ্ঞেস করত সবাই।

মা প্যাটসী বলতেন, 'আগে খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর সবাই মিলে মেরীর পড়া শেখা যাবে।'

প্রতিটি রাত্রেই এমনি ঘটত। প্রথমে রাত্রের খাওয়া, তারপর বাসন-কোসন সাফ করার পালা। সব শেষে গোটা মের্কলিউড পরিবার ঘিরে বসত বাড়ীর সেরা পণ্ডিতের নবলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় নিতে। পরের দিনের পড়া তৈরীর জন্য শোবার সময় না হওয়া পর্যন্ত লম্বা টেবিলের এক ধারে জানলার সামনে বসে মেরী পড়তো। হয় একটা মোমবাতী, নয় একটা তেলের কুপী—এই ছিল তার একমাত্র আলো।

বছর কেটে যায়। স্টেশনগামী পথের কাছাকাছি একটা জমির উপর কিছু ইট এসে জমা হল একদিন, হলদে রংয়ের নিকৃষ্ট ধরনের ইট। শুরু হল দুটো কামরাওয়ালা বাড়ী তৈরীর কাজ। বাস্তবে রূপায়িত হলো মিস উইলসনের স্বপ্ন— "মেয়েসভিলা ইনস্টিটিউট"। বহুদিন পর্যন্ত নিগ্রো ছেলেমেয়েদের জন্য সেই ছিল একমাত্র স্কুল।

দ্বিতীয় বৎসরের শীতে মেরী নতুন স্কুলগৃহে পড়তে গেল। রেভারেণ্ড জে, সি, সিমসন্ ছিলেন তার ধর্মযাজক ও অধ্যক্ষ এবং এম্মা উইলসন ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। জায়গাটা আরামের ছিলনা। পুরনো হরেক রকমের চেয়ার ডেস্ক, যেগুলো কখনো ছাত্রছাত্রীদের বসার মত মাপের ছিল না, কার্ডবোর্ডের উপর কালো রং মাখান ব্ল্যাকবোর্ড, ঘরের মাঝখানে একটা পেটমোটা উনোন, সেটা ব্যবহার

করতে গেলেই ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়—সাজ-সরঞ্জামর মধ্যে এই সব। তবু শিক্ষয়িত্রী আর ছেলেমেয়েরা মিলে সেই ঘরেই প্রাণ-সঞ্চার করতো। রঙীন কাগজের ফুল দিয়ে তারা জানালা সাজাতো, দেয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রাখতো নিজেদের শিল্পকর্ম, চুনকাম করা পাথরের টুকরো বসিয়ে বসিয়ে উঠানে সারি দিতো।

এক ঝড় চলে যায়, আসে আর এক ঝড়। অক্ষরগুলো এখন তার কাছে আর রহস্য নয়। এখন তাদের শব্দের মধ্যে বসিয়ে দিলেও চেনা যায়। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর চেহারা দেখে এখন আর ভয় লাগে না। ওগুলোকে বরং এখন যন্ত্রের মতো কাজে লাগানো চলে।

মেরী মের্কলিউড হলো এখন ওদের সমাজের মধ্যমণি। সে গুণতে শিখেছে। প্রতিবেশীরা সবাই আসে তার কাছে, সবার আঁক কষে দেয়, নানা রকম পাটি গণিতের সমস্যা এসে ভীড় করে ওর কাছে। তুলোর ওজন, দাম, গ্রাম্য দোকানীর বকেয়া ফসলের হিস্যা, সবই ওকে ঠিক করে দিতে হয়।

পরের জীবনে মেরী লিখেছিলো, 'যা কিছু শিখেছি, সবই আমি বাস্তবে খাটাতাম প্রথম থেকেই। যতদিন আমি গুণতে শিখে বাবার কর্জদাতা ব্যবসায়ীদের বিল পরীক্ষা করতে পারিনি, ততদিন আমাদের বাড়ীখানাও বন্ধক থেকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়নি।'

মেরী যেন জেকবের মই ভাঙছে। সে বুঝলো, যতই তার চোখ থেকে অজ্ঞানতার পর্দা খসে পড়ছে ততই সে আরো উপরে উঠছে, হাতড়ে হাতড়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে।

চার

অবশেষে সেই দিন এসে গেল। মিস উইলসন মেরীকে বললেন, 'তোমার এখানকার পড়া শেষ হলো।'

মেয়েসভিলার পাঠ তার শেষ হয়েছে।

মেরীসহ প্রথম দলটা ঐ স্কুলের পড়া শেষ করলো। সমস্ত এলাকার নিগ্রোদের জন্যে মস্তবড় সামাজিক আনন্দের বিষয় সেটা। এই উপলক্ষে যে সভা হয়েছিল, তাতে মের্কলিউড পরিবারের মত অনেক পরিবারই এসেছিল গর্ব-ভরা বুক নিয়ে।

প্রত্যেকটি উত্তীর্ণ ছাত্রীই কবিতা আবৃত্তি করে শোনালো। মঞ্চের ওপর বসেছিলেন যে সব অভিভাবক, তাঁরা প্রত্যেকেই বক্তৃতা করেছিলেন। মাঝে মাঝে সবাই মিলে গাইলো গান। তারপর ডিপ্লোমা দেওয়ার পালা। প্রত্যেকটি ছাত্রী, ডাক পড়তেই বেদীর উপর গিয়ে দাঁড়ায়। মেরীর ডাক পড়ে। ধীর-স্থির-গম্ভীর মেরী এগিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল সে মঞ্চে। তারপর সাদা ফিতেয় বাঁধা বহুমূল্য গোটানো কাগজখানা নিয়ে ফিরে এসে বসলো নিজের জায়গায়। অমূল্য কাগজখানি যে মুহূর্তে থেকে তার হাতে এল, তখন থেকে তার মন চলে গেল কোথায়, সভায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খেয়াল নেই তখন তার।

পরম স্নেহে সে কাগজখানির হাত বুলিয়ে দেয়। সে এখন পড়তে পারে, তার কৃতিত্বের জলজ্যান্ত নিদর্শন সে পেয়েছে তার নিজের হাতের মুঠোয়। এখন যদি সে কোন বই তুলে নেয়, কারো সাধ্য নেই তাকে অপমান করে বলে, 'তোমার আবার পড়া ?'

পাদ্রী দোয়া করলেন তাদের। আত্মীয় বন্ধুরা ঘিরে ধরলো। এম্মা উইলসন তাঁর সবচেয়ে আশার ধন মেরীকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। 'এরপর কি করবে মেরী ?'

'তাতো জানিনা, মিস উইলসন। আরো পড়তে চাই কিছুকাল। কালো লোকেরা কলেজে যেতে পারে কখনো ?'

'কদাচিৎ ! সে যাই হোক, তোমাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হবে প্রথম।'

স্যামুয়েল শুনলেন কথাটা।

বললেন, 'ফসল ভাল হলে কিছু টাকা আমরা খরচ করতে পারি। আর ও যদি পড়তে চায়, ওকে সাংসারিক কাজ থেকে ছেড়েও দিতে পারি।

মিস উইলসন কথা দেন, 'দেখা যাক কদ্দুর কি করা যায়।'

উদ্ভিন্ন-যৌবনা মেরী ফিরে এল ঘরের কাজে। হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে সে প্রার্থনা জানায়, যেন এমন অলৌকিক কিছু ঘটে, যাতে সে আরো লেখাপড়া শিখতে পারে। মেয়েসভিলায় নিগ্রোদের জন্যে তখনো কোন লাইব্রেরী

ছিল না। সেখানে পাওয়া যেতো শুধু তুলো। যখন চাষের সময় হবে, মেরীকে তখন আবার ঘরের কাজে লাগতে হবে, একথা মেরী জানতো।

বসন্ত এল। শেষ হল মেরীর স্বপ্ন দেখার দিন। রোজ তাকে এখন মাঠে যেতে হয় সকলের সঙ্গে কাজ করতে। খচ্চরটির পেছন পেছন সার দিয়ে ওরা চলে বীজ বোনার জন্যে জমি ভাঙতে ভাঙতে। খচ্চরটির মাথা নুয়ে যেত, লম্বা কান পড়তো ঝুলে, মনে হতো এবারকার চাষের কাজ তার ক্ষমতার বাইরে। গতি তার মন্থর হয়ে যেতো, যতই তাকে তখন লাগাম ধরে টানো আর লাঙ্গল ঠেলো না কেন, তার গতি আর বাড়বে না। অবশেষে একদিন মেলা কাজ সামনে রেখে 'ওল্ড বুশ' থেমে গেল, ঘোল হয়ে উঠল তার চোখ, পাঁজরাটা ফুলে উঠল দু' একবার, তারপর সে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। হাঁটু গেঁড়ে বসে স্যামুয়েল ওর লোমশ মাথাটা তুলে হাত দিয়ে নাক থেকে গলার উপর পর্যন্ত দেখে শুনে বললেন, 'মরে গেছে।'

মরে গেছে? খচ্চরটা? কী দিয়ে চাষ হবে তা হলে? চাষ করতে না পারলে, বীজ বোনা হবে কি করে। কোত্থেকে আসবে ফসল! না খেয়ে থাকতে হবে তা' হলে!

ভয় পেয়ে ওদের একজন শুধালো, 'আর একটা খচ্চর পাওয়া যায় না?'

মা প্যাটসী বুঝিয়ে দিলেন, 'টাকা কোথায়! তুলো না ওঠা পর্যন্ত টাকাও নেই।'

তুলো তো এখনো বোনাই হয়নি!

সকলে বুঝলো, এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। হা-হুতাশ করলে কোন ফল হবে না।

স্যামুয়েলের এক ছেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো লাঙলের সামনে। মুখের মাংসপেশীতে ফুলে উঠল সংকল্পের দৃঢ়তা। নিজের কাঁধ দু'টো বেঁধে নিল সাপের চামড়ার ফালি দিয়ে। তারপর লেগে গেল টানতে দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে। স্যামুয়েল বললেন, 'এক এক করে সকলকে টানতে হবে। এটা একার কাজ নয়।'

খচ্চরটির মৃত্যুর মানেই ছিল, মেরীর সব স্বপ্নের শেষ। লাঙলে কাঁধ লাগাতে মেরীর আপত্তি ছিল না। সে কাজের উপযুক্ত শক্তি তার ছিল, কিন্তু ওদের আর একটা খচ্চর কিনতে হবে। ফসলের বাড়তি টাকা তাতে খরচ হয়ে যাবে। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ যদিও বা হয়, তবু সে সুযোগ গ্রহণ করবার উপায় নেই এখন। অথচ স্কুলে যেতে না পারলে ওর জীবনই বৃথা, ওর সব ভবিষ্যতই অন্ধকার।

অবশেষে কেটে গেল দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলো। বেড়ে উঠলো তুলোর গাছ। একদিন মেরী তুলো গাছের মাথার উপর দিয়ে দেখতে পেলো এগিয়ে আসছে একটি পরিচিত মূর্তি।

মিস উইলসন বললেন, 'মেরী, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

তার প্রিয় শিক্ষয়িত্রীকে দেখতে ছুটে গেল মেরী তাঁর দিকে। কোন রকম আশা করতেই তার ভয় হচ্ছে, পাছে তা' ভেঙে যায়।

'আমাকে দরকার, মিস্ উইলসন ?'

'খুব সুখবর আছে। পশ্চিমের এক মেম সাহেব আমাদের মিশন স্কুলের যে কোন এক ছাত্রীকে একটা বৃত্তি দিতে চেয়েছেন। তুমি পেতে পার সেটা।'

মেরীর বিশ্বাস হতে চায় না, বলে, 'পশ্চিমের মেম সাহেব ?'

কলোরেডোর এক দরজী মহিলা, পেশা তার কাপড় সেলাই। নাম ক্রিসমেন। তিনি ঠিক করেছেন, তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চিত বিত্ত তিনি দান করবেন কোন নিগ্রো সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে। মেরীকে শিক্ষালাভের জন্যে যেতে হবে উত্তর ক্যারোলিনার কনকর্ডে স্কোশিয়া শিক্ষায়তনে।

'সেদিনকার সেই সুন্দর সকালে অন্তর আমার অসামান্য আনন্দে ভরে গেল। কখনো ভুলবোনা সে কথা।' কথাটা লিখেছে মেরী নিজে, 'সেই দিনটির কথা মনে হলেই কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। ছোট্ট একটি মেয়ে এগিয়ে চলেছে আলোর সন্ধানে, তুলো আর ধানক্ষেতের ওপর বসে স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যতের। আর কোথায় কলোরডোর ডেনভার, সেখানে এক গরীব দরজী মহিলা ব্যস্ততার মধ্যে আমার ডাক শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। সঞ্চয় তার সামান্য, সেই স্বল্প-সঞ্চয়ই তিনি মূলধন হিসেবে নিয়োগ করলেন আমার জীবনে। করুণাময়ের দয়ায় যতদিন এ দেহে শক্তি থাকবে ততদিন চেষ্টা করবো, এই মহানুভব মহিলার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময়ে যে সুযোগ আমায় তিনি করে দিয়েছেন, সে সুযোগ আমিও যেন অন্যান্যদের করে দিতে পারি। কী বিরাট আত্মত্যাগ এই মহিলার! ভোগের আনন্দ থেকে কী ভাবেই না তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। কেন? যাতে দক্ষিণ ক্যারোলিনার এক কালা আদমীর মেয়ের ভাগ্যে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ঘটে। আমার কাছে তাঁর স্মৃতি পরম পবিত্র। সেই আত্মত্যাগিনী মহিলা,—আমার নিজের জীবন গড়বার সত্যকার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন যিনি পরবর্তী জীবনে দক্ষিণাঞ্চলের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা আমি উৎসর্গ করেছি তাঁরই উদ্দেশ্যে। আর উৎসর্গ করেছি তা' আমার মা-বাবাকে, যাঁরা নিজেদের নিঃসঙ্গ এবং নিরোৎসাহ করেও আনন্দের সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন কর্ম-জীবনের মধ্যে।'

তুলোর ক্ষেতের সঙ্গে মেরীর সম্পর্ক ঘুচলো। আবার নতজানু হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ধন্যবাদ জানাল সৃষ্টিকর্তাকে তার এই মুক্তির জন্যে।

ঢিমে গতিতে আর নয়! তাকে এবার তৈরী হতে হবে খুব দ্রুত স্কোশিয়ায় পড়াশুনোর জন্যে! শরতের প্রারম্ভেই ক্লাস শুরু হবে। সময় তো এসেই গেল।

ছোটখাট একটা সমাজ। সাড়া পড়ে গেল তার বুকে। স্যামের মেয়ে মেরী বেড়াতে যাচ্ছে। তাদেরও তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে মেয়েসভিলার এই

সম্মানের ভাগ তারাও পায়। ঘরে ঘরে আনন্দ, বিদায় বেলায় মেরীকে দেবার জন্যে কেউ বা আবার অনেক পরিশ্রম করে বহির্বাসের ওপর ফ্রিল বসাচ্ছে। যা-কিছু যোগাড় করা যায় তা-ই ওকে দিতে হবে। ও আজ সকলের গর্ব আর আনন্দের মানুষ।

বিদায় দিনে আশেপাশে বহুদূর অবধি কোথাও কোন কাজ হল না। সবাই এল ষ্টেশনে ওকে তুলে দিতে।

বাড়ীর দুয়ারের সামনে যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। দেহ কাঁপছে তার। স্যাম, প্যাটসী, মেরী জেন সহ আধ ডজন ভাইবোন ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

খামারের গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড়ালো জনৈক প্রতিবেশী।

'উঠে পড়ো তোমরা, এমন দিনে হেঁটে যাওয়া চলে না।'

গাড়ী চড়ে গড় গড় শব্দ করে চললো তারা শহরে।

পথে যেতে সঙ্গে জুটলো আরো অনেক লোক। ঘর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে তারা বলছিল, 'একটু দাঁড়াও, আমরাও আসছি।'

গাড়ী এসে স্টেশনে থামতেই মেরী লাফিয়ে নেমে পড়ল।

মিস উইলসনকে দেখেছে সে।

'মিস্ উইলসন, মিস্ উইলসন, এই যে আমি।'

দূরে ঘড় ঘড় আওয়াজ আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাষ্পযানের আগমন বার্তা ঘোষণা করল। মিস্ উইলসনের হাত ধরলো মেরী সাহস সঞ্চয় করার জন্যে। জীবনে কখনো ট্রেনে চড়েনি সে।

মা প্যাটসী তাঁর এই সবচেয়ে আলাদা মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরলেন শেষবারের মত। তারপর কান্নার পালা। ইঞ্জিন যখন সশব্দে প্লাটফর্মের মধ্যে এসে ঢুকলো, স্যাম তার টুপীটা ধরে ঘোরাতে লাগলেন। মাথা নাড়া ছাড়া আর কি যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না তিনি। অনেকে উঠে পড়ল গাড়ীতে পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে ; ওকে ঠিক মত বসিয়ে দিতে হবে।

'বিদায়, বিদায় !'

ময়লা কাঁচের জানালার ওপর দিয়ে হাত নেড়ে মেরী বিদায় দেয় সবাইকে। এখানেই তার জীবনের এক অধ্যায়ের শেষ, আরেক অধ্যায়ের শুরু। পিছনে মাথা ঠেসান দিয়ে, চোখ বুজে প্রার্থনা করল সে, 'অনুগ্রহ কর আমায়, হে পরম পিতা।'

পাঁচ

ক্যারোলীনার কনকর্ডে নেমে নুড়ি বিছানো প্লাটফরমের ওপর মালপত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো মেরী। ট্রেন-যাত্রায় আর উত্তেজনায় ক্লান্ত সে। সারা অঙ্গ তার ময়লায় ভরে গেছে কাঁচা কয়লা আর হালকা ধোঁয়ায়। জীবনে এক নতুন জায়গায় এসে ভয়ও পেয়েছে সে। মেয়েসভিলার মত পড়াগেঁয়ো ভাব রয়েছে যেন জায়গাটিতে। ষ্টেশনটিও তাদের ষ্টেশনের চেয়ে বড় নয়। মধ্যখানে সেই চিরাচরিত বিভাগ, দুটি বিশ্রাম ঘরের জন্য দুটি প্রবেশ পথ। একটির উপরে লেখা শ্বেতকায়দের জন্য', অন্যটির উপর 'কৃষ্ণকায় যত্রীদের জন্য'।

মেরী দেখলো, কাছেই রয়েছেন এক মহিলা। প্রিয়-দর্শনা এক শ্বেতাঙ্গিনী। ওর দিকেই এগিয়ে আসছেন তিনি। হেসে মাথা নাড়ছেন। যেন কত দিনের পরিচয়।

'তুমিই মেরী মেকলিউড, না ?' মহিলা শুধালেন।

মাথা দুলিয়ে বলে মেরী, 'হ্যাঁ !'

মনে মনে সে ভাবে, হলো কি ? মেম সাহেব ওর জন্য মাথা ঘামান কেন ? ও যাচ্ছে স্কোশিয়া শিক্ষায়তনে। ওটা তা নিগ্রো মেয়েদের জন্যই।

তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে স্কোশিয়ায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

পরে মেরী জানলো, সেখানে অধিকাংশই হলেন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক। স্কোশিয়ায় সে দেখলো এক নতুন ধরনের সাদা মানুষ। তাঁরা চান, নিগ্রোরা যেন নিজেদের উন্নতি করাব বেশী সুযোগ পায়। ষ্টেশনের পিছন দিকে মেঠো পথ ধরলে স্কুল বেশী দূরে নয়। ভারী পোষাক পরে পথ চলতে চলতে সে বারেবারে অনুভব করছিল তার ক্রমবর্ধমান সংকল্পের দৃঢ়তা। শিখতে হবে তা শিখতে হবে আরো, আর শিক্ষার প্রতিটি কণা দিয়ে সে সাহায্য করবে তার নিজের লোকদের। হয়তো আসবে সেদিন, যেদিন প্রতিটি নিগ্রো ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবে।

ওর দিবাস্বপ্নে ঘা পড়লো, ওর হাতে আর একখানা হাত পড়তেই ওর পথ-প্রদর্শক ডান দিক দেখিয়ে বললেন, 'পৌঁছে গেছি।'

রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে গাছের ঝাড়ের জন্যে দেখা যাচ্ছিল না 'গ্রেভস্‌ হল' ঘরটা ; চারতলা ইটের বাড়ী। দরজার সামনে শোভাবর্ধন করে খাড়া হয়ে আছে চারটি থাম। তারও ডান দিকে পাঁচ তলা বাড়ীটা—'ফেথ হল।'

শিক্ষয়িত্রী বললেন 'এসো।'

ওরা দুজনে প্রবেশপথ ধরে চললো, চললো মেরী মেকলিউড তার ভবিষ্যতের পথে।

দরজার ভিতরে এসে মেরী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। দুটি সিঁড়, একটি ডান দিকে, আর একটি বাম দিকে বারান্দায় গিয়ে মিশেছে। বাদামী রংয়ের

মেহগনি কাঠের রেলিং দেওয়া। সে সিঁড়ি উঠেই চলেছে, তার যেন শেষ নেই। এক পা পিছিয়ে আসে মেরী। জীবনে কখনো সিঁড়ি ভাঙেনি সে।

'মেরী, তোমার ঘর হলো উপরে।'

সঙ্গিনীকে সে ওপরে ওঠবার পথ করে দেয়, ভদ্রতার বশে নয়—ভয়ে। শক্ত করে সাঁকোর রেলিং ধরে ধরে সে ওর অনুসরণ করে।

'মেরী, এই তোমার ঘর।'

ঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে সে। শংকিত তার দৃষ্টি। আঁটসাঁট করে গুটানো দুটী বিছানা। একটা ওর, আর একটা অন্যজনের। দুটি টানা দেরাজ, দুখানা চেয়ার, দুটি ডেস্ক।

'মালপত্র খুলে ঐ তাকের মধ্যে রেখে দাও। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়ার ঘরে এস। একেবারে নীচের তলায়।'

কথামত জিনিসপত্র খুলে ফেলে নিজে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল মেরী। তারপর শুরু হলো তার ভয়ে ভয়ে নীচে নামা। নানা ধরনের কথাবার্তার শব্দ শুনে সে চিনে নিল খাবার ঘর কোনটা। একটুক্ষণের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল সে। তারপর ঢুকে পড়লো।

কালো কালো মাথাওয়ালা অনেকগুলো বাদামীমুখ ওর দিকে তাকায়। কথাবার্তা থেমে যায়। তারপরই ফিসফাস কথা, হাসির শব্দ, আর ব্যঙ্গ হাস্যের বিনিময়। নতুন পৃথিবীর মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে মেরী। সবার দৃষ্টির সামনে। মেয়েসভিলার তুলো চাষীদের রাণী নয় সে আর। এখন সে কুৎসিত, হীনবেশী চাষার মেয়ে—চলা-ফেরাতে পর্যন্ত আনাড়ি, সংস্কৃতির ছাপ লাগেনি গায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে শিক্ষকদের খাওয়ার টেবিল। সাদা কালো একসঙ্গে বসে খাচ্ছে তারা। মেরীর এতদিনের ধারণায় যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। স্কুলের অধ্যক্ষের স্ত্রী মিসেস স্যাটারফিল্ড খাওয়া ছেড়ে ওঠে এলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ওকে ওর বসার জায়গায়। সে টেবিলে যে কয়টি মেয়ে ছিল তাদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। তারপর ওদের দুয়ার উপর মেরীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন চলে।

কি করবে ভেবে পেলোনা মেরী। নবাগতা সে। অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল সামনের মেঝের দিকে। টেবিলের ওপর বিছানো হয়েছে ধবধবে পরিষ্কার কাপড়। এই তার জীবনে প্রথম টেবিল দেখা। তার উপর সাজানো হয়েছে, ছুরি, কাঁটা, চামচ, যা কখনো সে হাতে করেনি। কাউকে সে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনা, পাছে লোকে হাসে। অন্যেরা যা' করে তা-ই সে করতে লাগলো। খাবার দেওয়া হলো। কাঁটার জন্যে হাত বাড়ালে সে। হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়লো তার। খেতে মন উঠছে না তার। বড্ড বেশী পেয়েছে সে।

মন খারাপ করেছে বলে সব ছেড়েছুঁড়ে বাড়ী চলে যেতে ইচ্ছে করছে যে, তাও নয়। জীবনের পয়লা থেকে যা সে বিধির বিধান বলে জেনেছে, সেদিকেই সে যাবে। প্রথম দিককার অসুবিধার কথা বিচার করলে, এটা মানতে হবে যে মেরী বেশ দক্ষতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে শিখেছিলো। তার মন ছিল সহানুভূতিশীল। নিজের ভুল দেখে হাসতে পারতো সে অনায়াসে। তার স্বভাব দেখে অল্প দিনের মধ্যে অনেক মেয়েই তার বন্ধু হয়ে গেলো।

স্কোশিয়ায় থাকার জন্য করতে পারে না, এমন কাজ তার জন্যে ছিলনা। স্কুলের ধোবিখানা, রান্না-ঘর—সব খানেই সে খাটতো। ওখানে যারা ছিল, সবাইকেই কোন-না-কোন কাজ করতে হতো। সবার চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল মেরীর। মিস ক্রিসম্যানের দেওয়া বৃত্তির টাকায় তার হতো না ; প্রয়োজনের কিছুটা মাত্র পূরণ করতো সে টাকা। বাকী টাকাটা তাকে রোজগার করে চালাতে হতো।

মেরী যেখানেই যেতো সেখানে সবাই তাকে নেত্রী মানতো—তার স্বভাবের মধ্যেই ছিল এই গুণ। স্কোশিয়াতেও সে তাদের নেত্রী হয়ে পড়লো। তাদের সংগঠিত করতো সে। তাদের হয়ে দেখা করতো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যেই সে জানলো, কিছু একটা করতে হলেই একেবারে উপরের লোককে ধরতে হয়।

মেরীর স্কুল জীবনের সবচেয়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল বোধহয় সাদা-কালো সব শিক্ষকের অবাধ মেলামেশা। উচ্চ শিক্ষিত নিগ্রো দেখল সে এই প্রথম। শান্ত, সুশিক্ষিত মিষ্টভাষী শিক্ষকরা তার। ওদের অনেকেই রংয়ের দিক থেকে বাদামী; ও-ই ছিল সবার চেয়ে কালো। মনে মনে ওর ভাবনা, ও হতে পারবে তো ওদের মত ? ধীরে ধীরে বদলে যায় ওর মন। বুঝতে শিখলো সমমর্যাদার অর্থ। নিজেকে দীন, নিঃসহায় ভাবার শেষ চিহ্নটিও মুছে দিল স্কোশিয়া। এখন সে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে সে।

চামড়ার রংয়ের সঙ্গে মানুষের ধী-শক্তির কোন সম্পর্ক নেই—এ শিক্ষা সে পেলো সাদা চামড়া শিক্ষকদের কাছ থেকেই। জাতি, বর্ণ, শ্রেণী বিভেদ—অসম্ভব নোংরা জিনিস।

স্কোশিয়াতে সে শুধু আত্মমর্যাদাবোধ আর বন্ধুই পায়নি, পেয়েছিলো আরো কিছু। নিজের ক্ষমতা কোথায়, তা-ও সে বুঝতে পেরেছিলো। বরাবরই সে জানতো, তার মধ্যে রয়েছে গাইবার ক্ষমতা। কিন্তু স্কুলে সুশিক্ষার পূর্ব পর্যন্ত মেরী জানতো না আসলে কতখানি তার ক্ষমতা। স্কোশিয়াতে তার বক্তৃতা-ক্ষমতারও বিকাশ হলো। স্কুলে বিতর্ক-অনুষ্ঠানে ওর যুক্তিপূর্ণ চিন্তা আর প্রকাশ-ভঙ্গির নাটকীয়তার উপর নির্ভর করেই বিতর্কের দলটা চলতে লাগলো।

যে উৎসাহ নিয়ে সে লেখাপড়ায় মাতলো, অন্য ছাত্রীদের পক্ষে তা বিস্ময়ের বস্তু। তারা এসেছে লেখাপড়া শিখতে, কিন্তু মেরীর মত মরিয়া ভাব তাদের

কারোই ছিল না। পেটের খাবার যেন তার না হলেও চলতো, কিন্তু শিক্ষার ক্ষুধা মেটানো তার চাই-ই। যদ্দুর পারে লেখাপড়া তাকে শিখতে হবেই।

লেখাপড়া আর কাজের মধ্যে অবসর পেলেই সে বেরিয়ে পড়তো গ্রামের পথে। কনকড তখনও তুলোর রাজ্যেই অন্তর্গত। ক্যানন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মস্ত বড় একটা কল ছিল কনকর্ডে। তুলোর বস্তাগুলো খালি করে দিতো হাজার হাজার টাকু আর শত শত মাকু। এর আগে মেরী জানতো না, বাড়ীতে যে সব তুলো সে তুলতো, সে সব যেতো কোথায়।

তামাকের গতিবিধিও সে জানলো। তারপর ধীরে ধীরে শুধু তুলো নয়, মার্কিন দেশে, যত রকমের ফসল হয়, সব সম্পর্কেই জানতে পারলো সে।

মাঝে মাঝে গুজব শোনা যেতো, নিগ্রোদের বে-আইনীভাবে লিঞ্চিং করা হচ্ছে। যদি কোন নিগ্রো ভুলক্রমে কোন সাদা চামড়াকে 'স্যার' না বলতো পরদিন এ জন্যেই জীবন হারাতে হতো তাকে। নিগ্রো শ্রমিক নিয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে যে সব আলোচনা হতো তা মেরীর কানে আসতো। কনকর্ড শহরে মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোরা তখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, সংখ্যায় তারা বহু মজুরী ছাড়া খাটতে নারাজ। ওদের টাকা পয়সা হোক, এটা সাদারা চাইতেন না।

মেরী বুঝতে পারে, ওর স্বজাতির রয়েছে একটা অতীত ইতিহাস। স্কোশিয়ায় পাঠাগারে রক্ষিত ইতিহাসের যে ক'খানি বই ছিল, তার মধ্যে সে তন্ময় হয়ে ডুবে গেলো নিগ্রো জাতির অতীত ইতিহাস জানার জন্যে।

সাতটি বছর সে স্কোশিয়াতে ছিল। পাঁচ বছর লাগে তার পাশ করে বেরুতে। পরের দু'বছর উচ্চশিক্ষার জন্যে।

স্কোশিয়ার স্কুলটা একটা ভাল উচ্চ বিদ্যালয়ের সমান। তার উচ্চশিক্ষার দৌড় হলো কলেজের নীচের ক্লাশ।

ওর ব্যক্তিত্ব আর চিন্তাধারার মধ্যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন সূচিত করলো এই সাতটি বছর। এই সাত বছরে সে পেলো জ্ঞান, লক্ষ্যের সন্ধান, আর সমাজ সেবার শিক্ষা।

প্রতিটি রবিবারের সকালে মেরী আর অন্যান্য ছাত্রীরা ওয়েস্ট মিনিস্টার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিত। আল্লার প্রতি মেরীর বিশ্বাস এই সময়ে আরো সুদৃঢ় হয়। ওর জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। ওর মনে পড়ে যায় রেভারেন্ড জে-ডব্লিউ ব্রাউনের বাণী—ওখানকার ছাত্রীদের এক সভায় ভাষণ দিতে এসেছিলেন তিনি। আফ্রিকা সম্পর্কে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছিলেন। মেরীর নবীন মনে যে অনুপ্রেরণার বীজ তিনি বুনে দিয়েছিলেন, পূর্ণ বয়সের সন্ধিস্থলে তাতে যেন নবজীবনের সঞ্চার হলো।

প্রার্থনার সময়ে এই বক্তৃতা মনে পড়ে যাওয়াটাই কি একটা ঐশী বাণী? মেরীর মনে হলো তাই। মেরী ঠিক করলো অন্ধকারের আফ্রিকায় যাবে সে। সেই হবে তার সেবাব্রত, জীবন যাপনের উৎকৃষ্ট স্থান।

ডাঃ স্যাটারফিল্ডকে সে একদিন বললো তার জীবনের উদ্দেশ্যের কথা। তিনি তাকে উপদেশ দিলেন শিকাগোর 'মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট'-এ ধর্মপ্রচার শিক্ষার জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে। আর তিনি নিজেও লিখবেন প্রেসব্রিটেরেনিয়ান চার্চকে মেরীর জন্য বৃত্তির অনুসন্ধান করতে।

ছয়

সেবারের গ্রীষ্মে বাড়ীতে ছিল মেরী। খবর পেলো, মিস ক্রিসম্যান তার জন্য আর একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলকে সে জানালো তার মনের বাসনা। আফ্রিকায় যাবে সে ওখানকার কালো লোকদের সাহায্য করতে, প্রচারের জন্যে। একথা শুনে মোটেই অবাক হল না তারা কেউ। প্রথম থেকেই তারা ধরে নিয়েছিল, মস্ত বড় একটা কিছু করবে সে।

অশ্রুসজল বিদায়ের দিন এলো আবার। দূর শিকাগোর পথে মেরীর যাত্রা। কোথায় শিকাগো! ওর উদ্দাম কল্পনা ছাড়া শিকাগোর আর কোন ধারণা ছিল না মেরীর মনে।

শিকাগো শহরে ওকে নিতে এসেছিল মুডি থেকে একদল লোক। সকলেই তারা সাদা। স্কুলে গিয়ে দেখতে পেলো, আফ্রিকার এক ছাত্র এবং সে ছাড়া আর সবাই সেখানে সাদা। এই নতুন পরিবেষ্টনীতে মেরী হচ্ছে ওর জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। ওর ব্যবহার থেকেই ওর জাতির বিচার হবে। মেরীর ঘরে থাকতো এক শ্বেতাঙ্গিনী। স্কোশিয়ার শিক্ষার ফলে সাদা লোকদের মেরী আর সন্দেহ করে না এখন।

'মুডিতে কোন জাতিবিভেদের ভাব ছিল না। সেখানে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতেও জানলাম আমরা। অনেক শক্ত হয়েছে তখন আমার মন। সাদারা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছিল, আমি তাদের সেই ব্যবহার ফিরিয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে ডোয়াইট এল. মুডি এবং অন্য সবার আন্তরিকতার ছোঁয়াচ পেয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভালবাসতে শিখলাম সমগ্র মানবমণ্ডলীকে। এখনো রয়েছে আমার সেই ভালবাসা। করুণাময়কে ধন্যবাদ এ জন্যে।'

উপরের কথাগুলো মেরী লিখেছিল পরবর্তী জীবনে। মুডিতে থাকতে মেরী সঙ্গীত শিক্ষার আরো সুযোগ পেলো চার্লস আলেকজাণ্ডারের কাছে। ডাঃ ডি. বি. টাউনারের নেতৃত্বে ধর্ম-মন্দিরে ধর্ম-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হতো। হপ্তায় দুদিন মেরী গান করতো সেখানে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে থানায় গিয়ে কয়েদীদের গান শোনাতো, গল্প করতো তাদের সঙ্গে, আর বই বিলাতো। 'প্যাসিফিক গার্ডেন মিশনে' ধরে আনা হতো যেসব মাতাল আর ভবঘুরেদের, তাদের মধ্যে খাবার বিলাতো সে।

তার মনে হতো, এই হচ্ছে সত্যিকারের কাজ, সত্যিকারের সেবা। যে কাজ সে চেয়েছে, তাই সে পেয়েছে।

মুডির শিক্ষা পদ্ধতি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল হাতে কলমে কাজ শেখানো। অবশেষে শিকাগোর বস্তী অঞ্চলের দুর্ভাগ্যদের সঙ্গে দেখা করার কাজ পেলো সে— এতে করে তার উৎসাহ গিয়ে উঠল চরম পর্যায়ে।

মুডিতে শিক্ষা শেষ হলো তার। নিউইয়র্কে গিয়ে প্রেসব্রিটেরিয়ান ধর্মপ্রচার সমিতির কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলো সে।

প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা এই বিশ বছরের তরুণীটিকে বলে দিলেন, 'না'। আফ্রিকায় তখনো কোনো নিগ্রো পাঠানো চলে না।

নিরাশ হলো মেরী। বুক ভেঙে গেল তার। শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিল জর্জিয়ার অগাস্টাতে, 'হ্যানস্ নর্মাল' বিদ্যায়তনে।

সাত

মেরী জানতেন, লিংকনের তৈরী রাষ্ট্র এবার পেছনে ফেলে এসেছেন তিনি। আবার ফিরে এসেছেন দক্ষিণ দেশে।

নিগ্রোদের ওপর বিশেষভাবে খারাপ ব্যবহার করা হতো জর্জিয়াতে। নিগ্রো কয়েদীদের সেখানে শিকল পরতে হতো। আর ছিল বৈষম্যমূলক নিষ্ঠুর আইন কানুন, আলাদা আলাদা করে রাখা। ইংরেজি তিনটি অক্ষর কে. কে. কে.। এই তিনটি অক্ষরের অর্থ ছিল ভয়াবহ। সত্যিই, জর্জিয়ার নিগ্রোরা বরাবরই নির্দয় ব্যবহার পেয়ে এসেছে। ক্রীতদাস প্রথা যখন ছিল, তখন এত নির্মম অত্যাচার করা হতো তাদের ওপর যে, প্রহার, অঙ্গচ্ছেদ, কুখাদ্যদান—এ সবের ভয়ে নিগ্রোরা সব সময় শংকিত অবস্থায় দিন কাটাতো।

মেরী গিয়ে দেখতে পেলেন, নিগ্রোরা সব একসঙ্গে বাস করে একটা বিশেষ জায়গায়। থাকে এক রকম গাদাগাদি করে। একে বলা হতো 'টেরি' অঞ্চল। সেই চিরপরিচিত রং-না-করা ঝুপড়ী আর কাঁচা রাস্তা। শুকনো অবস্থায় ধুলোয় অন্ধকার। আর বৃষ্টি হলে কাদার ফাঁদ হয়ে থাকে। এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে রবার্ট স্ট্রীট এবং গুইনেট স্ট্রীট-এর মধ্যে 'হ্যানস নর্মান ইনস্টিটিউট'-এর বিশাল দালানটা। এই বিদ্যায়তনের স্রষ্টা এবং পথ-নির্দেশক লুসি ল্যানির স্বপ্নের সদ্যজাত বাস্তব রূপ এটা।

বয়সে মেরীর চেয়ে বিশ বছরের বড়, লুসি ল্যানি জন্মেছিলেন ক্রীতদাসীর গর্ভে। কিন্তু জর্জিয়ার বহু ক্রীতদাসের মত অত কষ্ট তিনি পাননি। তার বাপ-মা বিয়ের পর একসঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলেন। মাঠের কাজের বদলে তাঁরা তাঁদের মনিবের বসতবাটিতে কাজ করতেন। লুসিকে তাঁর মার মনিব লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছিলেন। মা ঘর সাফ করতেন আর সেই সময়ে লুসি বসে বসে বাড়ীর বিশাল লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতেন।

পনের বছর বয়সে তিনি এ্যাটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। মনের বাসনা, তাঁর জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবেন তিনি। সাভানায় কয়েক বছর বিদ্যাভ্যাস করার পরে তিনি ভাবলেন, নিগ্রোদের জন্যে আগাস্টাতে একটা স্কুল করা দরকার। প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের কর্তৃপক্ষকে ধরলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের সাহায্যের জন্যে টাকা চাই। তাঁরা তাঁকে দিলেন আশীর্বাদ এবং অনুমতি। কিন্তু টাকা মিললো না।

তা সত্ত্বেও এক গীর্জার সবার নীচের তলায় কাজ শুরু করলেন লসি ল্যানি। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী পাবার পথে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ছিল না এমন দু'চার জন অভিভাবক যারা এই সব ছেঁড়া কাইড়-পরা ছেলেদের পড়বার জন্যে দুই এক

সেণ্ট খরচ করতে পারতো। তবু দু'টি বছর স্কুল চালালেন তিনি। দ্বিতীয় বৎসরের শেষের দিকে তাঁর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ালো দুইশত চৌত্রিশ-এ। এদের বেশীর ভাগকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছিল তাঁর নিজের সঙ্গে। বেশ বড়, পরিত্যক্ত একটা বাড়ীতে এদের সকলকে নিয়ে তিনি আস্তানা গাড়লেন। হানাবাড়ী বলে দুর্নাম রটায় খুব সস্তা পেয়ে গেলেন বাড়ীটা তিনি।

প্রেসবিটেরিয়ান প্রচার সমিতি মুগ্ধ হয়ে গেলেন ওর কাজ দেখে। দশ হাজার ডলার দিলেন তাঁর স্কুলকে। তৃতীয় বৎসরে তিনি আরো দশ হাজার পেলেন উত্তরাঞ্চলের এক অবস্থাপন্ন পরিদর্শকের কাছ থেকে। বাড়ী পাকা হয়ে গেল। সেই বাড়ীতে উঠলেন গিয়ে তিনি ১৮৯৫ সালে। যেদিন থেকে ক্ষীণাঙ্গী তন্বী মেরী হাত মেলালেন বেঁটে, বিপুলা লুসর সঙ্গে সেদিন থেকেই গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেলো দুজনে। আফ্রিকায় যেতে না পারার জন্যে যে মনোকষ্ট তাঁর ছিল, অনেকখানি লাঘব হয়ে গেলো তার। মিস ল্যানির অক্লান্ত পরিশ্রম আর আপন-ভোলা প্রকৃতি নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করলো তাঁকে। মেরী লেখলেন, 'ওখানকার সমাজের লোকেদের মধ্যে স্কুলটা ছিল অন্ধকারে আলোক-বর্তিকার মতন। তবু সেই আলোর পরশ পায়নি একটু, এমন অধিবাসী আশেপাশে শত শত ছিল। আমার ঘর ছিল চারতলার উপর, জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম 'টেরী'র গলিগুলি, আর অসংখ্য অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়ে, যারা নিজেদের ক্ষমতা মত পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছিল।'

দারুণ অভাবের মধ্যেও মেরী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। সোজা তিনি চলে গেলেন মিস ল্যানির কাছে।

'রাস্তার ঐ সব ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল করা দরকার'—বললেন তিনি। বুদ্ধিমতী মিস ল্যানি ঘাড় নেড়ে বললেন, তিনি রাজী এ প্রস্তাবে।

শুধু একটুখানি উৎসাহেরই দরকার ছিল মেরীর। বেরিয়ে পড়লেন তিনি গলিঘুঁজির মধ্যে। তাঁর সঙ্গে গেল অষ্টম শ্রেণীর কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। তারা গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এল সেই রাস্তার ছেলেমেয়েদের রবিবার বিকেলে 'হ্যানস' এ আসতে। ময়লা, নোংরা বহু বালকবালিকাকে বুঝিয়ে মেরী নিয়ে এলো। পরে আরও হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো তাদের দেখাদেখি। তাদের সমবেত কণ্ঠের ধর্মসঙ্গীত আর বাইবেল পড়া শিক্ষা দেওয়া হল। ধর্ম ও শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে মেরী তাদের উপহার দিলেন ছোট পুস্তিকা। ব্যাপার দেখে আকৃষ্ট হলেন শহরের আরো কিছু সমাজসেবী। তাঁরা সেখানে পড়াতে এলেন। শিক্ষকরা আর উঁচু ক্লাশের ছেলেমেয়েরা মিস মেরী মেকলিউডকে নবাগতদের জন্যে সাবান, পোশাক, দাঁত মাজবার বুরুশ, চিরুণী পিন, তোয়ালে প্রভৃতি সংগ্রহের কাজে সাহায্য করলেন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের ঘরে ঘরে গিয়ে পরিচ্ছন্নতার উপদেশ দিয়ে এগুলো বিতরণ করলেন। যেখানেই তাঁরা যেতেন সেখানেই তাঁদের চোখের সামনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতো দিন, আশায় ভরে উঠতো ভবিষ্যৎ।

প্রেসবিটেরিয়ান প্রচার সংসদ এরপরে মেরীকে পাঠিয়ে দিলে সামটার-এর 'কিণ্ডেল ইনস্টিটিউট'-এ। এও গীর্জাশ্রিত একটি নিগ্রো স্কুল।

মেরী দু'বছর কাজ করলেন কিণ্ডেল-এ। এ সময়টাতে মেরী নিজের জন্য কিছুই রাখেননি প্রায়। বেতনের সব টাকা তিনি পাঠিয়ে দিতেন বাড়ীতে।

সেই টাকা লাগতো ঋণ শোধ করতে আর ছোট দু'টি বোনকে স্কোশিয়ায় শিক্ষা দেবার জন্যে। বাড়ী থেকে আসত চাল আর আটা, যাতে অন্ততঃ তাঁর খাবার সংস্থান হতো। এ ছাড়াও অবসর সময়ে লোকের ঘরের কাজ করে টাকা রোজগার করতেন তিনি।

মেরীর সব দিনগুলোই যে এরকম কঠোর আত্মত্যাগ আর কাজ নিয়ে কাটতো তা' নয়। তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। তাঁকে বিয়ে করার লোকও ছিল অনেক। যুবকদের সাথে উঠতে বসতে তাঁর ভালই লাগতো। কিন্তু ওদের কাউকে তাঁর মনে লাগতো না। ওর মত কর্মপ্রেরণাও ছিল না ওদের। প্রেসবিটেরিয়ান পাদ্রী-মেয়ে এষ্টেলা রবার্ট ছিলেন ওখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি থাকতেন মেরীর সঙ্গে। মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, ওঁকে ওঁর মনের মত এক পাত্র খুঁজে দিতে হবে।

এই দুই তরুণীর বন্ধুত্ব ছিল গভীর। দুজনেই প্রেসবিটেরিয়ান। দুজনে ওদের ধর্মসঙ্গীতের দলে গান করতেন। সমিতি দুজনকেই শিক্ষার কাজে লাগিয়ে দেয়।

একদিন একটি লম্বা, সুশ্রী যুবক এলেন ওদের দলে 'পুরুষ কণ্ঠ' হিসেবে মহড়া দিতে। প্রথম সারিতে এসে বসলেন তিনি। ওর দিকে একবার তাকিয়েই এষ্টেলার মাথায় খেলে গেলো একটা মতলব। সেদিন সন্ধ্যায় আলাপ করবার মত অবসরে এষ্টেলা ওঁর সঙ্গে মেরীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বেশ একটু জোর দিয়ে বললেন, 'মেরী, ইনি হচ্ছেন মিঃ এ্যালবার্টাস বেথুন।' তারপর ওর খবর বের হল ওর নিজের তরফ থেকেই। চার্লসটনের এভারী ইনষ্টিটিউট এর ছাত্র। কিন্তু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। কারণ ছোট ভাইদের কলেজের খরচ যোগাবার জন্যে তাকে এক কাপড়ের দোকানে চাকরী করতে হচ্ছে।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এ্যালবার্টাস বেথুন এই প্রাণবতী উচ্চাভিলাষী সুকণ্ঠীর গভীর অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। মানুষটিকে মেরী প্রথমে আমলই দেননি। ধীরে ধীরে তিনি তার সাহচর্য কামনা করতে লাগলেন। মেনে নিলেন তাঁর বন্ধুত্ব! এই ভাললাগা ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হতে দেরী হলো না। দুজনের বিয়ে হয়ে গেলো সামটারে অবস্থানের দ্বিতীয় বছরে।

বরবধূ চলে এলেন জর্জিয়ার সাভানাতে। সেখানে মিঃ বেথুন একটি চাকরী পেলেন। মেরীও ভাবলেন, এখানেই শিক্ষয়িত্রীর চাকরী খুঁজে নেবেন—সংসারের

আয় বাড়বে। তাঁর সব পরিকল্পনাই উলটে গেল যখন বুঝতে পারলেন তিনি জননী হতে চলেছেন। তিনি এখন বাড়ীতে থেকে পুরোপুরি মা-ই হবেন।

এ্যালবার্ট বেথুন ঘরে এলো। এখন থেকে কয়েক মাস মেরীর সমস্ত সময়টা ছেলে নিয়েই কাটে। কিন্তু ছেলে হলো বলে তাঁর মন ঘর সংসারের দিকেই যে একান্তভাবে ঝুঁকে গেল তা' নয়, বরং তিনি নিজের শিশুর কথা ভাবতে গিয়ে আরো সব শিশুদের কথা ভাবতে লাগলেন। এ্যালবার্টের শিক্ষা, ওর ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ, এই সবের ভাবনায় পড়লেন তিনি। তিনি নিজে যদি এর জন্য সব সুযোগ সৃষ্টি না করে যান তবে পৃথিবী এই নিগ্রো শিশুটিকে কি কোনও সুযোগ দেবে ?

তাঁর কর্মপ্রেরণা তাঁকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে দিল না। শিক্ষার কাজে তাঁকে নামতেই হবে। কাজ করতে হবে নিগ্রো সন্তানদের জন্যে। তিনি নিজে স্কুল করবেন একটা। ছেলেটার বয়স যদিও ন'মাস মাত্র, স্বামীকে রাজী করিয়ে মেরী ফ্লোরিডার অন্তর্গত পলাটকায় নামক একটা জায়গায় মিশন স্কুলে চাকরী নিলেন।

এ্যালবার্টস বেথুনের মনে কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মতো শিক্ষাকতার জন্যে অতোখানি অনুরাগ ছিল না। তাঁর কাছে এটা ছিলো জীবিকা মাত্র। তিনি বুঝতেই পারতেন না, শিক্ষকতার জন্যে তাঁর স্ত্রীর কতখানি তাগিদ।

তাঁর কথা হলো, 'কী দরকার সেখানে স্কুল তৈরী করার ? তার জন্য তোমার কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার বোকামী। কেবল এখন থেকে ওখানে ছুটে না বেরিয়ে মন দিয়ে একটা ভাল চাকরী করোনা কেন ?

ফ্লোরিডায় যেতে দিলেন তিনি তাঁকে। ভেবেছিলেন, ওখানে ভাল লাগবে না মেরীর। শিগ্‌গীর ফিরে আসবেন তিনি।

পলাটকায় লেমন্‌স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া করলেন মেরী। পুরানো দিনের আলাপী মেয়ে একটাকে খুঁজে বার করলেন দিনের বেলায় ছেলে সামলানোর জন্যে। তিনি লেগে গেলেন নিজের কাজে।

মেরী যেয়ে দেখলেন স্কুলটার চরম অবস্থা। মিসেস মেরী মেকলিউড বেথুন নিজের ব্যক্তিত্ব, প্রেরণা আর পরিকল্পনাশক্তি দিয়ে স্কুলটি পুনরায় চালু করলেন। সাহায্য প্রদান করা যায় এমনতর বহু নিগ্রো বালকবালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্টকৃত নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বহু নিগ্রো শিশু বেড়ে উঠেছে জন্তু-জানোয়ারের মত। দক্ষিণের প্রত্যেকটি শহরেই এই অবস্থা। রেল লাইন কিংবা যানবাহনের রাস্তার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রত্যেকটি শহর—কালোদের জন্যে এক এলাকা, সদাদের জন্যে আর। স্কুলের চেহারা বদলে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করতে লাগলো। তাদের সামলানোর জন্যে আরও তিন জন শিক্ষক পাঠালেন প্রেসবিটেরিয়ান সমিতি। মেরী স্বপ্ন

দেখলেন, আরো বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার, তাদের সাহায্য করবার।

তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থার তীব্রতা আর আকাঙ্ক্ষার ছাপ রয়েছে তাঁর স্বামীর কাছে লেখা পত্রগুলোতে। এ্যালবার্টাস বুঝলেন, মেরীর ফিরে আসার আর সম্ভাবনা নেই। তিনিই অগত্যা রওয়ানা হলেন ওর কাছে পলাট্‌কায়।

মেরী কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর স্কুলের জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগলেন। খরচ করবার মতো কয়েক ডলার হাতে এলেই তিনি কাছাকাছি কোথাও চলে যেতেন ট্রেনে করে। কোথাও কোন স্কুলের দরকার জানলেই সাহায্য করতে ছুটে যেতেন। কোথাও কোন জায়গায়ই তাঁর পছন্দ হলো না। টাকার অভাব মেটাবার জন্যে এই সময়ে তাঁকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর তহশিলদার হয়েও অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে।

এই সময়ে তাঁকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর তহশিলদার হয়েও অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে।

সে সময়ে ফ্ল্যাগলার সাহেবের 'ফ্লোরিডা ইস্ট কোস্ট রেলরোড' তৈরী করার কথা তিনি শুনতে পেলেন। রাস্তটা মায়ামী পর্যন্ত চলে গেছে। আর যেখানেই কাজ হচ্ছে সেখানেই নিগ্রো শ্রমিকরা এসে জুটেছে সমগ্র পূর্ব-উপকূল ধরে। তাদের নেতা নেই, সংযম নেই, বন্য পশুর মতো।

হয়তো তাঁর সমস্যার জবাবও এই।

পাঁচ বছরের ছেলে আর দুচারটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ডেটোনা উপকূলের দিকে যাত্রা করলেন মেরী। অসম্ভব ভীড় আর জঞ্জালপূর্ণ ট্রেনের সংকীর্ণ গাড়ী থেকে নেমে ডেটোনা প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে চলতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, যতটা ভেবেছিলেন, আসলে জায়গাটা খারাপ তার চেয়ে অনেক বেশী। ফ্ল্যাগলার কোম্পানীর লোকেরা সস্তায় মজুর পেয়ে নিগ্রোদের খাটিয়ে নিচ্ছেন। আর মজুররা তাদের রোজগারের টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে জুয়া খেলে, মদ খেয়ে আর ফুর্তি করে। ক্রীতদাসের চেয়েও খারাপ ছিল ওদের জীবনযাত্রা।

কাজ হচ্ছে যে এলাকায়, সেটা ছেড়ে মেরী চললেন সমুদ্রতীরের দিকে, যেদিকে হ্যালিফ্যাক্স নদী তীর বেয়ে চলেছে একটা সরু উপদ্বীপের সৃষ্টি করে। সেখানে দু'চারজন ধনবানের অট্টালিকা প্রতিবেশীদের সম্পর্ক ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে। নদীর পরপারে নিগ্রো বস্তীর হৈ-চৈ ওদের কাছে অর্থহীন। মেরী যেন অন্তরের অন্তঃস্তল হতে বাণী শুনলেন, 'স্কুলের শিক্ষকতাই তোমার উপযুক্ত ব্রত।'

আট

মেরী মের্কলিউড বেথুনের হাতে তখন মাত্র দেড়টি ডলার। রাত্রে কোথায় থাকবেন তার নেই ঠিক। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকালেন তিনি মন ভারী করে। সেখানকার একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল; ভাবলেন, হয়তো সেখানে তাঁর নিজের আর তাঁর ছেলের সংস্থান হতে পারে।

মেরীর পরিচিতা মিসেস ওয়ারেন তাঁর আগের ঠিকানাতেই ছিলেন। অন্য কোথাও কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি খুশী হয়েই মেরীকে দাওয়াত করলেন, তাঁদের সঙ্গে থাকতে ও খেতে।

সন্ধ্যা বেলায় খেতে বসে সমস্তক্ষণই তিনি উত্তেজিত ভাবে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন। নিগ্রো মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। তাঁরা মাথা নেড়ে বললেন, মতলবটা তাঁর ভাল নয়। যে সব নিগ্রো নিজেদের ওজন না বুঝে কাজ করে, তারা নিজেদের বিপদই ডেকে আনে।

মিসেস বেথুন চুপ করে গেলেন। তাঁর জানা ছিল, শুধু সাদারা নয়, অনেক নিগ্রোও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে।

পরের দিনের সকালে ছোট্ট এ্যালবার্টকে সাথে করে মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী ঘুরে বেড়ালেন মেরী। পেলেন প্রত্যাখ্যান আর অপমান। তবু নিরুৎসাহ না হয়ে খুঁজে চললেন তাঁর স্কুলের জায়গার জন্যে। একটা পাকাবাড়ী কুঁড়ে ঘর কিংবা চালাঘর হলেই চলবে।

ওকট্রীট, ছোট্ট এক কাঁচা রাস্তা। দুধার দিয়ে নীচু নীচু ঝুপড়ী। ৫২৯ নং বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। শুনেছিলেন, বাড়ীর মালিক উইলিয়মস্ ঐ বাড়ীটা ভাড়া দেবেন।

তিনি একটা দোলা চেয়ারে দরজার সামনে বসেছিলেন; তাঁকে নিজের ইচ্ছাটা জানালেন মেরী।

'বাড়ীটা দিতে পারি আপনাকে, কিন্তু মাসিক এগার ডলার ভাড়া।'

মেরী খোলাখুলি জানালেন যে, তাঁর হাতে টাকা নেই। রোজগার করতে না পারলে আয়েরও সম্ভাবনা নেই। হেসে মাথা নাড়লেন মিঃ উইলিয়মস্। মেরীর সরল ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যে, বাধ্য হয়েই তিনি বললেন, 'বেশ, ভাড়ার ব্যাপারে আপনাকে বিশ্বাস করলাম। বাড়ীটা পেতে পারেন।'

বাড়ীখানার নীচের তলায় ছোট চারখানা ঘর। সামনে একটা সরু গলি। মিসেস বেথুন নিজের জন্য রাখলেন ওপরের তিনখানা ঘর। পানির জায়গা ছিল মাটির নীচে গুদাম ঘরের মধ্যেকার একটা কুয়ো। পানীতে গন্ধকের গন্ধ। আলো হলো কেরোসিন লণ্ঠনের। পেছনে শৌচাগার।

এখন থেকে তাঁর অপ্রতিহত গতি।

বাড়ীর পেছনে তিনি দ্রুতগতিতে কাজ করে গেলেন যাতে অক্টোবর মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ওখানে আসার এক মাসের মধ্যেই স্কুল খুলতে পারেন। হোটেল-গুলোর পেছনের জঞ্জাল স্তূপ ঘেঁটে সহানুভূতিসম্পন্ন প্রতিবেশীদের সাহায্যে খুঁজে বার করতে লাগলেন ফাটা ডিস, ভাঙ্গা আসবাব আর কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো। ভিক্ষা করলেন বাড়ী বাড়ী ঝাঁটা, লণ্ঠন, ফেলে দেওয়া কাপড় আর দুয়েক পেনি মুদ্রার জন্যে। কাঠ পুড়িয়ে কয়লার টুকরো দিয়ে তৈরী হলো পেন্সিল আর এলডার ফুল সিদ্ধ করে কালী। বাক্স আর উল্টানো ঝুড়ি হল চেয়ার আর বড় বড় প্যাকিং বাক্স হল ডেস্ক।

'সব কিছু ঝেঁড়েঝুড়ে মেরামত হলো। আবর্জনা থেকে জিনিস কুড়িয়ে তাই দিয়ে নতুন জিনিস তৈরী করা—বিনা খড়েই ইঁট তৈরী, এও শিক্ষার একটা অঙ্গ' মন্তব্য করেছেন মেরী।

মিষ্টি আলুর নাশ্‌তা বানিয়ে রেল লাইনের ধারে মজুরদের কাছে বিক্রি করে মিস বেথুন কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলেন। হপ্তায় একদিন যেতেন উপদ্বীপ অঞ্চলের কাছে, এককালীন দানের জন্যে।

১৯০৪ সালের ৩রা অক্টোবর।

নিগ্রো মেয়েদের জন্য 'ডেটোনা শিক্ষা ও শিল্প স্কুল' খোলা হলো। মেরী মেকলিউড বেথুন তার অধ্যক্ষা। আট থেকে বার বছরের মেয়ে পাঁচজন আর একটা বাচ্চা ছেলে—এ্যালবার্ট বেথুন। এ হলো নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা। মেয়েদের বাপমায়েরা শিক্ষাখরচ বাবদ হপ্তা পিছু পাঁচ সেন্ট করে দিতে রাজী হয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের প্রথম দলটাকে শুধু অক্ষর-জ্ঞান দিয়েই শেষ ছিলনা, মেরীকে ওদের মায়ের কাজও অনেকখানি করতে হতো। ওদের সাফ-সুরৎ রাখা, আদব কায়দা শেখানো, এ-ও তাঁকেই করতে হোতো। কাপড়ের দরকার হলে ভিক্ষা করে তাদের পাজামা বা আণ্ডরওয়ার জাতীয় পোশাক যোগাড় করতেন।

শতাব্দীর সেই সন্ধিতে ফ্লোরিডাতে সে সময় নিগ্রোরা অল্প একটু লেখা-পড়ার সুযোগ পেলেও চাকরের কাজ ছাড়া আর কিছুই আশা করতো না তারা।

এই বাস্তব অবস্থাটা বেথুন জানতেন। তাই তিনি মেয়েদের শিল্প শিক্ষার দিকে নজর দিলেন। ছাত্রীদের রান্না, গৃহস্থালীর কাজ, পরিবেশন ইত্যাদি বিষয় তিনি শিক্ষা দিতেন, যাতে তারা একটু বেশী আয়ে ঘরের কাজ করতে পারে।

স্কুল যেদিন শুরু হয়, মেরীর হাতে তখন এক পয়সাও ছিল না। সুতরাং ছাত্রীদের তিনি ভাল করে গান শেখালেন, যাতে তারা অরমণ্ডে তাঁর সঙ্গে গিয়ে সভায় গান করতে পারে। যাঁদের হৃদয় বেথুনের মন-কেড়ে-নেওয়া ভাষণেও গলেনি, শিশুকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতের আমেজ তাঁদের মনকেও গলিয়ে দিত। এর ফলে তারাও সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতো।

একদিন তাঁরা ধর্ম-সঙ্গীতের দল নিয়ে উপদ্বীপে অরমন্ড হোটেলে যাবার কথা। ওখানকার অনেক সাদা ধনী অধিবাসীর সঙ্গেই ওর আলাপ হয়েছিল। হেনরী জে. কাইজার তাঁর দলটিকে হ্যালিফ্যাক্স নদী বেয়ে নিয়ে গেলেন, ওদের ডাঙ্গা দিয়ে হাঁটার কষ্ট বাঁচানোর জন্যে। সেই সময়ে সেই হোটেলে ছিলেন জন ডি. রকফেলার। নীল স্কার্ট ও সাদা ভেস্ট পরা নিগ্রো ছেলেমেয়েরা 'তৈরী হয়ে নাও', 'আস্তে দোল' এই সব গান করছিলো। রকফেলারের ভাল লেগে গেলো ওদের। সেই থেকে আমরণ তিনি ঐ স্কুলের বন্ধু ছিলেন।

নিগ্রোদের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন রকফেলার। ঐ উপদ্বীপে নিজের বাড়ী করার পর মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের গানের জন্য দাওয়াত করতেন।। তিনি নিজে যোগ দিতেন গানে, আর তালও দিতেন সেই সঙ্গে। কখনো বড় গোল বৈঠকখানায় আসর বসতো। সেখানে সাদা সমাজের প্রতিপত্তিশালী মেহমানদের কথা বন্ধ করে দিয়ে রকফেলার সাহেব গান শোনাতেন।

রকফেলার সাহেবের কাছে ওদের যাওয়া কখনো বিফল হত না। বেশ দরাজ ভাবেই তিনি দান করতেন স্কুলের জন্যে, স্কুলের অর্গানটি তাঁরই দান। তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে তাঁর ছেলে জন ডি. রকফেলার সাধারণ শিক্ষা সংস্কার সভাপতি হিসেবে স্কুলের অর্থাগমের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিঃ বেথুন ওদিকে তাঁর উচ্চশিক্ষাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রীর চিঠির পর চিঠি পেয়ে মাথা নাড়তেন। প্রথম দিককার চিঠিগুলিতে থাকতো অসুবিধার কথা ; সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা। ধীরে ধীরে চিঠির মধ্যে পাওয়া যেতে লাগলো উদ্দীপনা আর আশার বাণী। আবার তিনি স্ত্রীর নতুন স্ত্রীর নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়া স্থির করলেন। ডেটোনায় এসে ওক স্ট্রীটের বাসার তিন তলায় রইলেন। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী চালানোর কাজ পেলেন একটা। আর সেই সঙ্গে স্কুলে সাহায্য করতে লাগলেন।

দু বছরের মধ্যেই মিসেস বেথুনের আড়াই শত ছাত্রী হয়ে গেলো। স্কুলের কাজ চালাচ্ছিলেন তিনি কিছু বেতনভুক্ত শিক্ষক আর স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে। জায়গার টানাটানি হলো খুব। শোবার এবং পড়ার ঘরটাও স্কুলের কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন মিসেস বেথুন। যা টাকা পেতেন সব খরচ হতো স্কুলের জন্যে। তিনি নিজে তার পুরানো তালি দেওয়া পোষাক পরতেন। জুতোর তলা ক্ষয়ে গেলে কার্ডবোর্ড দিয়ে তালি লাগিয়ে নিতেন।

'বাড়তি টকা আমার নিজের খরচের জন্য রাখার কথা। কিন্তু টাকা কিছুই বাঁচতো না। খরচের কোন কুল-কিনারা ছিল না। শেষে আমি বুঝলাম, সমস্যার সমাধান হল ভাড়া বাড়ী ছেড়ে স্কুলের নিজস্ব বাড়ী করা।'

মিসেস বেথুন যা সিদ্ধান্ত করতেন সেটা কাজে লাগাতে কখনো দেরী করতেন না। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কালোলোকদের পাড়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্কুলের জন্যে বাড়ী খুঁজে বেড়ালেন। সুবিধে হলোনা কিছুই। শেষে

একদিন শহরের পশ্চিম কিনারে ভাঙ্গা জিনিসপত্রে ভর্তি, পচা, গন্ধময়, স্যাঁতসেঁতে মশার রাজ্যে, ময়লা ফেলার একটা জায়গার উপর তাঁর নজর পড়লো।

ভাবলেন, এই তো একটা অব্যবহৃত জায়গা!

জমির মালিকের সঙ্গে তক্ষণি তিনি দেখা করলেন।

জমিদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ জমি কিনবেন? ও তো রাজ্যের ময়লা ফেলার জায়গা।'

দু'হাত জুড়ে মিষ্টি হেসে বেথুন বললেন, জঞ্জালের স্তূপ বলছেন! কিন্তু আমি তো দেখছি অসংখ্য হাসিখুশি ছেলেমেয়ে বুকভরা আশা আর বিশ্বাস ও জ্ঞান নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করছে।'

দুই শত ডলারের বিনিময়ে জমিটা তিনি বিক্রি করতে রাজী হলেন। পাঁচ ডলার এখনই নগদ দিতে হবে। বাদ-বাকী দুই বছরে পরিশোধ্য।

মিসেস বেথুন ছুটলেন আবার সেখান থেকে। পরে এই লেনদেন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমার যে পাঁচ ডলারও নেই তা তাঁর জানা ছিল না। কথা দিলাম, কিস্তির টাকা নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে আসবো। রেল লাইন তৈরীর কাজে রত মজুরদের মধ্যে আলুর মিষ্টি আর আইসক্রীম বেঁচে পাঁচ ডলার তুলে গেলাম আবার মালিকের কাছে।'

গানের দলের মেয়েদের নিয়ে তিনি গীর্জা আর হোটেলে গেলেন চাঁদা তুলবার জন্যে। সে সব জায়গায় তিনি দক্ষিণের নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার বিরাট প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বক্তৃতা দিতেন।

'ইতিমধ্যে আমি জেনেছি যে, আমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হলো নাছোড়-বান্দা ভিক্ষুক হওয়া। বাড়ীর দরজায় ঘণ্টা টেনেছি। যেখান থেকে কিছুই পাবার আশা নেই সেখানেও চেষ্টা করেছি। কেউ না কেউ হয়তো ছাপবে, এই বিশ্বাসে প্রবন্ধ লিখেছি, পত্রিকা বিলি করেছি। আমার পুরাণো বাইসাইকেলে চড়ে ধুলাভর্তি রাস্তায় মাইলের পর মাইল ঘুরেছি, চার্চের বিভিন্ন সংঘ, মজলিশ আর বণিক সভায় হানা দিয়েছি। কেউ চাঁদা না দিলেও বলেছি, এতটা সময় খরচ করার জন্যে ধন্যবাদ। যত আঘাতই পাই না কেন, সব সময়েই আমি হেসেছি। হতাশ হয়নি কখনো। কারণ, যে মানুষ নিরুৎসাহ তাকে বিধাতা বা মানুষ কেউ-ই কোন কাজে লাগাতে পারেন না।'

মিসেস বেথুন জানতেন, স্কুল হবে ঠিক কেতাদুরস্ত ভাবে গড়া। পরিচালক সমিতি হিসেবে থাকবে 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ'। তার মধ্যে নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গ দুই শ্রেণীর সভ্যই থাকবেন।

একদিন ফ্লোরিডার খবরের কাগজগুলো সব তিনি পড়ে দেখলেন বড় লোকদের হদিস পাবার জন্যে। তাঁর দরকার শীত-কাটাতে-আসা ধনী লোকদের নাম। চোখে পড়লো প্রকটর এন. গ্যাম্বল কোম্পানীর জেমস্ এন. গ্যাম্বলের নাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন তাঁকে।

উত্তর এল, 'পরের দিন দুপুরে দেখা করবেন।'

যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন, ভদ্রলোক চমকে গেলেন।

বললেন, 'আপনিই কি স্কুল গড়ার চেষ্টা করছেন? আমি তো শ্বেতাঙ্গিনী ভেবেছিলাম আপনাকে।'

মেরী ছিলেন ঘন কৃষ্ণাঙ্গিনী। হো হো করে হেসে বললেন, 'দেখুন কতটা ফর্সা আমি।'

একটা মিনিটও সময় নষ্ট না করে মিসেস বেথুন ওঁকে বোঝালেন, ওখানে এমন একটা স্কুলের কী ভীষণ প্রয়োজন! তাঁকে তিনি ট্রাস্টি হবার অনুরোধ জানালেন। মিসেস বেথুনের কথাবার্তায় বেশ আকৃষ্ট হলেন মিঃ গ্যাম্বল এবং একটুখানি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

আগ্রহের সঙ্গে মেরী বললেন, 'আসুন না একদিন আমাদের স্কুল দেখতে।'

কথাটা মিঃ গ্যাম্বলের মনে ধরলো। পরের দিনই তিনি স্কুল দেখতে যেতে রাজী হলেন। রোগা, লম্বা, মাথায় পাকা-চুল, বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক মিঃ গ্যাম্বল। বেশ প্রশান্ত ব্যবহার। পুরাণো একখানা গাড়ীতে তিনি এলেন। ড্রাইভারও এক বৃদ্ধা। মেরী যকে স্কুল বলে অভিহিত করেছেন সেই ব্যাপারখানা তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন। দেখলেন, প্যাকিং বাক্সের ডেস্ক, পুরানো কাপড় কেটে তৈরী করা, রিপু আর তালিময় পোষাক পরোনে ছাত্র-ছাত্রীদের। শুধালেন, 'আমাকে যার ট্রাস্টি করবেন, সে স্কুল কোথায়?'

বেশ গর্বভরেই মিসেস বেথুন জবাব দিলেন, 'সে আমার মনে, আমার আত্মার মধ্যে।'

মেরীর এ সাহসে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না অমন চমৎকার সহৃদয় ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ তিনি রাজী হয়ে গেলেন স্কুলের 'স্থাপয়িতা'র মনের মধ্যে থাকা ট্রাস্টী হতে। বউনি হিসেবে দেড়শত ডলারের একখনা চেক দিলেন ভদ্রলোক।

তখন থেকেই এই শিল্পপতি আর এই শিক্ষাব্রতিনীর মধ্যে গড়ে উঠলো এক অংশীদারিত্ব। প্রথম কাজ হলো তাঁদের ওক স্ট্রীটে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। সেদিন সমস্ত ভাবী ট্রাস্টি আর পৃষ্ঠপোষকদের দাওয়াত করা হলো।

দর্শকরা এসে দেখলেন প্যাকিং বাক্স, কাঠকয়লার পেন্সিল আর ছাত্রদের হাতের কাজ। তারপর জমায়েত হলেন মেয়েদের কজকর্ম দেখবার জন্যে। যে মেয়েরা অল্প আগেও হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছিল, মিসেস বেথুনের পরিচালনায় তারা দর্শকদের সামনে শান্ত হয়ে বসলো। আবৃত্তি করলো, গান করলো। প্রচেষ্টা তাদের এত চমৎকার হয়েছিল যে, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরেই অতিথিরা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' ও তার সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ফেললেন। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের প্রচেষ্টা চিরস্থায়ী করতে হবে।

জমিটার মাসিক কিস্তি শোধ করতে হবে, জমিটাকে কাজে লাগাতে হবে, তার ওপর বাড়ীও করতে হবে একখানা। সুতরাং মিসেস বেথুনের খয়রাতী-অভিযানের তীব্রতা বাড়াতে হলো দ্বিগুণ, চতুর্গুণ।

‘পুরানো ইট ও বালির জন্যে ঠিকাদারের পেছনে লেগে থাকতাম। শহরের সব ছুতোর, মিস্ত্রি আর রাজমিস্ত্রির কাছে গিয়ে অনুনয় করতাম, কিছু স্যান্ডউইচ তারা যেনো দেয় আর তাদের ছেলেমেয়েদের এবং তাদের নিজেদের লেখাপড়া শেখানোর বদলে তারা যেন সন্ধ্যার দিকে কিছু কিছু কাজ করে দেয়।’

সভার পর সভায় তিনি বক্তৃতা আর অনুরোধের অভিযান চালালেন। সঙ্গে সঙ্গে থাকতো তাঁর ছাত্রীদের আবৃত্তি আর সঙ্গীত। একদিন সভার ব্যবস্থা হলো ডেটোনার সম্ভ্রান্তদের ‘পামেৎ হোটেলে’। আশা করলেন, অনেক ধনবান ব্যক্তিই সভায় উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সেই সময়ে অনেকগুলো সমাজসেবামূলক কাজ একসঙ্গে পড়ে যাওয়ায় মান্যগণ্য কেউ বিশেষ আসতে পারলেননা। এলেন মাত্র ছয় জন। মেরী কিন্তু দমলেন না। ছয় জনকে তিনি ছয় হাজার ভেবে বক্তৃতা করে গেলেন। টাকার থালা যখন আবার সামনে ধরা হলো, একজন বিশ ডলারের একখানি নোট দিলেন। মেরীর মনে হলো, বিশ ডলার নয়তো, বিশ হাজার ডলার ফেন।

দাতাটি যে কে সেই সম্পর্কে মেরীর কোন ধারণা ছিল না। তার অভিজাত চেহারা, পাকা চুল আর যত্নের সঙ্গে আঁচড়ানো দাড়ি মেরীর মনে গভীর দাগ কাটলো।

সাইকেলে একদিন মেরী পথ চলছিলেন এমন সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো একটা বিশাল মোটর গাড়ী। সেই বিশ ডলার প্রদানকারী দাতা ছিলে গাড়ীর মধ্যে।,

পামেৎ হোটেলে আপনাকেই না মেয়েদের সঙ্গে দেখেছিলাম ?’ কোন কথা না বলেই ড্রাইভারকে ভদ্রলোক বললেন মেরীর সাইকেল খানা মোটরের পিছনে তুলতে। তারপর দুজনে মিলে সেকেন্ড এভিনিউতে তাঁর নতুন স্কুল দেখতে গেলেন।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, ‘আমি ক্লিভল্যান্ডের টমাস এইচ. হোয়াইট।’

ইনিই যে সেলাই কল-নির্মাতা হোয়াইট, মেরী তা ভাবতেই পারেন নি। তিনি চারধারে তাকিয়ে দেখলেন আগের অন্যান্য পরিদর্শকের মত। অসম্পূর্ণ বাড়ী, এক একটা দেয়ালে কাঠের বেড়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু পলেস্তারা পড়েনি এখনো। বিছানায় বিছানো হয়েছে ঘরে তৈরী মাদুর। স্পেনীয় শেওলা চেঁচে আঁশ বের করে, তারপর সে আঁশ সিদ্ধ করে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী করা সে মাদুর। এক কোণে এক বাক্স খাবার দেখে তিনি শুধালেন, ‘খাবার আর আছে ?’

মিসেস বেথুন বললেন, ‘আপাততঃ এই-ই রয়েছে।’

হঠাৎ মেরীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার ধারণা, আপনি সঠিক পথেই যাত্রা করেছেন। ফ্লোরিডাতে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতই সব চেয়ে উজ্জ্বল।’

দুইশত ডলারের একখানা চেক কেটে দিলেন তিনি।

দুইশত ডলার! আনন্দে নাচতে লাগলো মেরীর মন।

'আমি কেঁদে ফেললাম। মেয়েদের ডাকলাম বিশেষ, প্রার্থনার জন্য। হাঁটু গেড়ে ধন্যবাদ দিলাম বিধাতাকে। পরের দিন রাজমিস্ত্রি আর কারিগর নিয়ে এলেন মিঃ হোয়াইট। তাঁরা আনলেন মাল মশলা আর দেওয়ালে পালেস্তারা করবার জিনিস বললেন,র স্নানের ঘর করে দেবেন, এনে দিবেন, বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাঁদর।'

মাঝে মাঝে তিনি আসতেন। সঙ্গে নিয়ে আসতেন, কখনো বা কয়েক জোড়া জুতো, কম্বল বা যখন যা দরকারী মনে হতো।

ভদ্রলোক মারা যাবার পরে জানা গেল সাতষট্টি হাজার ডলারের মত পুঁজি রেখে গিয়েছেন তিনি ট্রাস্টীদের হাতে। সে টাকা স্কুলটি পাবে যতদিন স্কুল বজায় থাকবে।

সেকেন্ড এভিনিউতে স্কুলের প্রথম বাড়ীখানি ছিল কাঠের, সাদা রংয়ের। পাঁচতলা উঁচু। দরজায় লেখা ঃ 'এস জ্ঞান লাভ কর।' সেই দরজারই ভিতরের দিকে লেখা ঃ 'যাও, সমাজের সেবা কর।'

স্কোশিয়া শিক্ষায়তনের 'ফেথ' হলের স্মরণে এরও নামকরণ হলো 'ফেথ হল'। সরকারীভাবে এর অনুষ্ঠান হলো ১৯০৭ সালে। দুই বছর ধরে অসংখ্য কথা ও নানা গানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এটা। বাড়ীখানা খোলা হলো বটে কিন্তু জায়গার অভাব মেটানো ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ওদের লাভ হয়নি। মিসেস বেথুনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে আড়াই শত মেয়ে, যারা খাওয়া পরার জন্যে ও'রই উপর নির্ভর করছিল।

'সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, গরু, মেষ, পশু আর সারা পৃথিবীময় বিচরণকারী সমস্ত প্রাণীর উপর মানুষ প্রভুত্ব বিস্তার করুক।' মেরী বেথুনকে পথ দেখানোর জন্য বাইবেলের এই বাণীই যথেষ্ট ছিল। তাঁর জমিনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। আর নিজেকে তিনি কজে লাগালেন তাঁর ছাত্রীদের জন্যে। 'ফেথ হলের' সম্মুখের রাস্তায় ওপারের মাঠে সব্জী, ফলের গাছ, ফুল আর আখের চাষ করা হলো। পর্যটকদের কাছে এই সব ফলমূল আর শাকসব্জী বিক্রি করা হতো।

স্কুলের নাম বদলে গেল ১৯০৮ সালে। নতুন নাম হলো 'ডেটোনা এডুকেশনাল ইন্ডাস্ট্রীয়াল ট্রেনিং স্কুল।' আরও কিছু ছেলে নেওয়া হলো ছাত্র হিসেবে। সে বছর স্কুলের জীবনে দারুণ উত্তেজনার বছর। বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ বুকার টি ওয়াশিংটন স্কুল দেখতে এসেছিলেন সে বছরে, আর দিয়ে গিয়েছিলেন অফুরন্ত উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা।

ক্রীতদাসের ঘরে জন্ম নেবার ফলে বুকার টি. ওয়াশিংটনের জন্মতারিখ জানবার উপায় ছিল না। ডেটোনায় আসার সময়ে তাঁর বয়স পঞ্চাশের মত। তিনি

তাঁর আত্ম-জীবনী গ্রন্থের নাম রেখেছেলেন 'দাসত্ব শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলাম।' কারণটা ছিল, শিশু বয়সেই বড়দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীর জয়ের জন্যে প্রার্থনা করতেন।

আর নিজের শিক্ষার জন্যে তাঁকে করতে হয়েছিল সংগ্রাম। ছাপা জিনিষ যা' পেতেন তা-ই তিনি পড়তেন। তাঁকে ভর্তি করতে রাজী হবে এমন একটা স্কুল খুঁজবার জন্যে একরাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন তিনি। তাঁর শিক্ষা শেষ হয় ভার্জিনিয়ার 'হাম্পটন ইনষ্টিটিউট'-এ। তিনিও দক্ষিণেই রয়ে গেলেন মিসেস বেথুনের মত। আলাবামার টাস্কেগা শহরের নিগ্রো নেতারা যখন শিক্ষকের জন্যে আবেদন জানালেন, তাঁদের সে আবেদনের সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে টাস্কেগী ইনস্টিটিউট স্থাপিত করলেন।

তিনি মিসেস বেথুনের টস্কগী ইনস্টিটিউট দেখতে যখন যান, তাঁর তখন ষাটখানা বাড়ী, শত শত একর জমি আর বিপুল অর্থবল। ওখানে থাকতেই তিনি অস্ত্রাগার-প্রাসাদের বিরাট সভাকক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। হলঘর আর তার আশে পাশের রাস্তা ভরে গেলো সাদাকালোয় তার বক্তৃতা শোনবার জন্যে। সাদা ও কালোয় তিনি এমন সখ্যতার ভাব সৃষ্টি করেছিলেন যে, খুব গোঁড়া শেতাঙ্গকেও তাঁর গঠনমূলক প্রচেষ্টায় স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। তিনি উপদেশ দিলেন সাদা ও কালোকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হতে।

'এমন একদিন আসবে, যেদিন আমাদের নিগ্রোদের মধ্যে অনেক ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ হবে। অনেক শিল্পী আর অসংখ্য ভাল চাষী আমাদের সমাজকে শক্তিশালী করবে।'

মিসেস বেথুন অর ওয়াশিংটন দুজনেরই স্বপ্ন এক।

'নিগ্রোরা একদিন শান্তি আর নিরাপত্তার মধ্যে বাস করতে পারবে, সম্মান পাবে, সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে। ত ছাড়া শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর দুয়ার ওদের জন্যে উন্মুক্ত হবে।'

নয়

মিসেস বেথুনের স্কুল জীবনটা আরামে কাটেনি। সব সময়ে অর্থের জন্যে মানসিক উদ্বেগের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। টাকা এলেই শিক্ষকদের বাকী টাকা, মুদীখানার কর্জ, মেরামতী খরচ মিটিয়ে আর সব প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্যে তা খরচ হয়ে যেত। যেসব পাওনাদারের দেনা তিনি মিটাতে পারতেন না, তারা রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করতেন, 'কবে টাকা দিচ্ছেন ?'

সহজভাবে তিনি জবাব দিতেন, 'আপনারা জানেন, আমরা টাকা ফাঁকি দিই না। আপনাদের টাকা শীঘ্রই পাবেন।'

কাজ কিন্তু সব সময়েই এগিয়ে চলেছে, পড়াশুনা ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। যে পাঁচটি মেয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল গোড়ায়, ১৯১০ সালে তারা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বড় মেয়েরা পরে এসে আরো উপরের শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। মিসেস বেথুনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ছাত্রীদের বৎসরান্তে প্রমোশন দেওয়া, যাতে প্রত্যেকটি শ্রেণীই এক সঙ্গে এক ধাপ উঠে যেতে পারে, ফলে যেন অষ্টম শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী মিসেস বেথুনের স্কুলেও শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো।

মেরী চান ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছুক। সুতরাং বয়স্কদের জন্যে সন্ধ্যা-বেলার ক্লাসের প্রবর্তন হলো, যাতে তারা তাদের শোচনীয় নিরক্ষরতার পঙ্ক থেকে উঠে ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। কেমন করে দেওয়ালে রং লাগাতে হয়, জানালায় পর্দা ঝুলাতে হয় এবং মেঝের সতরঞ্চি পাততে হয়, তাদের নোংরা ঘরে ঢুকে মেরী তাও তাদের শেখালেন। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা যখন এলেন তাঁর স্কুলে পড়তে লিখতে, তাঁদের শিক্ষা বিষয়ের মধ্যে তিনি সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্প-বিষয়ক পাঠ ঢুকিয়ে দিলেন। আঁকতে হয় কি করে তাই দেখে একজন বয়স্কা মহিলা বললেন, 'কাগজের ওপর ওরকম ফুল আঁকা যায়, তা তো জানতাম না কখনো' !

'ফেথ হলে' আসার কিছু দিনের মধ্যেই মেরীর স্বামী নিকটবর্তী এক শহরের স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী নিয়ে চলে গেলেন। কাজের বিরাট দায়িত্ব তখন একা মেরীর কাঁধেই এসেই পড়লো। আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের ছেলে মানুষ করার ভারও। তাঁর স্বামীর মতো উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে ডেটোনার কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। নতুন চাকুরী নিয়ে তিনি ঠিকই করেছিলেন। অবশ্য তার ফলে আবার এলো বিচ্ছেদ।

ছোট এ্যালবার্ট মার কাছেই থাকলো। ছেলেদের স্কুলে যাবার বয়স না হওয়া অবধি মার স্কুলেই পড়তে থাকলো সে।

ডেটোনা এডুকেশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুল শুধু একটা বিদ্যালয়ই ছিল না, সেটা ছিল একটা আলোর মশাল যা অন্ধকারে জ্বলছিল। সমাজ সেবার এই বিরাট প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে যেতো পাপ ও দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে।

প্রথম ডেটোনায় এসে তিনি তার্পিন তেলের কলে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে নানা কথা শুনেছিলেন। খবরটা তিনি মনের এক কোণে পুষে রেখেছিলেন। ১৯১১ সালের দিকে তাঁর ছাত্রীদের ভেতর কিছু সংখ্যক বয়স্থা ছাত্রী ছিল। তারা ওঁকে সাহায্য করার মতো শিক্ষা পেয়েছে।

তার্পিন তেল হয় এক রকমের পাইন গাছ থেঁতলে বার করা রস দিয়ে। ফ্লোরিডাতে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে, মাইলের পর মাইল পাইনের জংগল। তার্পিন প্রস্তুতকারক কেউ এসে জংগল কিনতেন খানিকটা ঝুপড়ী তৈরী করতেন কতকগুলো। তার্পিন চোলাইয়ের কারখানা হতো। তারপর সে অঞ্চলের নিষ্কর্মা বকাটে ছোকরাদের যোগাড় করে প্রচুর 'রাম' মদ খাইয়ে তার্পিন তৈরীর কাজে লাগিয়ে দিতেন। মাতলামী, অশ্লীল বকাবকি, লাম্পট্য আর রোগের রাজ্য ছিল সেটা। ঐখানে থাকতো যেসব শিশু আর স্ত্রীলোক, অল্পদিনের মধ্যেই তারা ঐ অবস্থার দাস হয়ে পড়তো।

এক রবিবারের বিকেলে কয়েকজন পুরাণো ছাত্রী সঙ্গে নিয়ে ডেটোনা থেকে তিন মাইল দূরে তার্পিন তেলের কারখানার দিক রওয়ানা হলেন মিসেস বেথুন। প্রথম ঝুপড়ীটা তাঁর চোখে পড়লো। সহজেই বোঝা গেলো, সেটা 'রাম' মদের উৎস। আশেপাশে কয়েকজন নিগ্রো মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজন টলতে টলতে আগন্তুকদের দিকে উৎকটভাবে এগিয়ে এলো। তার পাশ দিয়ে মিসেস বেথুন এগিয়ে গেলেন আর একজন স্ত্রীলোকের দিকে। ঐ স্ত্রীলোকটির পরণে ছিল ছিন্ন বস্ত্র, চুলগুলো অবিন্যস্ত। তাঁকে দেখে লজ্জা পেয়ে স্ত্রীলোকটি লুকিয়ে ছিল এক গাছের পেছনে। মিসেস বেথুন তার কাছে গিয়ে নিজের সহৃদয় হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন।

"ছেলেমেয়েরা কোথায়? কে তাদের দেখাশোনা করছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাকে।

হতাশভাবে জংগলের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো, 'ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো কোথাও।'

ঘর পাওয়া গেলো এমন একখানা যেখানে গীর্জা করা যেতে পারে। যে কয়জনকে সম্ভব হলো, সভায় ডেকে আনা হলো। কেউ হাসলো, কেউ ঠাটা করলো। অভদ্র রসিকতাও করলো কেউ কেউ। অনেকে আবার রামের বোতল আনলো সঙ্গে করে পাছে বক্তৃতা শুনতে শুনতে পিপাসা পায়।

ধীর স্থিরভাবে মেরী তার ধর্ম-সঙ্গীতের প্রথম কলি গাইলেন। তাঁর অবিস্মরণীয় সুরেলা কণ্ঠের সাথে গলা মেলাল তাঁর ছাত্রীরাও। সঙ্গীতের সুর উচ্চ হতে উচ্চতর গ্রামে চড়তে লাগলো। থেমে গেলো হাসি ঠাট্টা। রামের বোতল-

লুলো আস্তে আস্তে রাখা হলো মাটিতে। একখানা গানের পর শুরু হলো আর একখানা। শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের পর সরল সহজ কথায় তাদের পাপপূর্ণ জীবনের কথা বুঝিয়ে বললেন তিনি। প্রতি রবিবারে এসে ওদের পড়ানো আর গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। বললেন, একটা স্কুল খুলবেন তিনি যাতে বস্তীর ছেলেমেয়েরা এসে লেখাপড়া শিখতে পারে।

মেরী শেষ পর্যন্ত স্কুল করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীও পেয়েছিলেন। খুব আগ্রহ নিয়েই তারা গান, সেলাই, দলবেঁধে খেলা আর পড়াশুনা করতে লাগলো। শিশুদের সঙ্গে একবার সম্পর্ক হবার পরই তিনি তাদের বাড়ী ধাওয়া করতেন। শিশুদের বাপমাদের শেখালেন পরিচ্ছন্নতা আর শিশুপালন, স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরী আর সংযত জীবন-যাপন প্রণালী।

পাঁচটি বছর। এরি মধ্যে মিসেস বেথুন একসার স্কুল তৈরী করে ফেললেন। 'মোকা মিশনস্' পরিচালিত হতে লাগলো তাঁরই ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা। সমস্ত টমোকাবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে লাগলো এ স্কুল। ছেলেমেয়েরা বছরে তিনমাস লেখাপড়া করতো সেখানে। শ্রমিকরা বেশী মজুরী পেতে লাগলো। মদ খাওয়ার মাত্রা গেলো কমে। কেউ বা একেবারে ত্যাগ করলো সে বদ্ অভ্যাস। বাড়তি টাকা সঞ্চয় করতে লাগলো তারা।'

ছোট একটা ঘটনা, নেহাৎ একটা খাপছাড়া ব্যাপারও মিসেস বেথুনের কল্পনাশক্তিতে চাঙ্গা করে সমাজ সেবার পরিকল্পনার সৃষ্টি করতো।

হঠাৎ একদিন তাঁর ডাক আসে কোন রুগ্না ছাত্রীর শয্যাপাশে। অত্যধিক তাপ আর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছে মেয়েটি। ডাক্তার না হয়েও বুঝলেন 'এপেণ্ডিসাইটিস'। অবিলম্বে অস্ত্র করা দরকার। সে এক মর্মন্তুদ অবস্থা। নিগ্রোদের জন্যে কোন হাসপাতাল নেই!

'স্থানীয় এক হাসপাতালে গিয়ে সাহেব ডাক্তারকে বিস্তর অনুরোধ করলাম মেয়েটিকে অস্ত্রোপচারের জন্যে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি করতে। শেষে আমার আগ্রহের আতিশয্যে তিনি ভর্তি করতে রাজী হলেন।'

দুয়েকদিনের মধ্যেই হাসপাতালের দরজায় আবার গিয়ে হাজির হলেন তিনি ছাত্রীটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দেখলেন, তাকে রাখা হয়েছে রান্না ঘরের পেছনে একটা বারান্দার তলায় পৃথক করে। অন্য যে কেউ হয়তো এই অবিচার মাথা পেতে নিতো কিন্তু মেরী এতে রাজী হলেন না। ডেটোনার নিগ্রোদের একটা নিজস্ব হাসপাতাল চাই। নিজের অফিস ঘরে ফিরেই তিনি তাঁর ভক্ত পৃষ্ঠপোষকদের চিঠি লিখতে বসলেন। ফেথ হলের পেছনে রাস্তার উপর একটা কাঠের বাড়ী রয়েছে। পাঁচ হাজার ডলার খরচ করলে বেশ হাসপাতাল হবে। কথাটা তিনি বোঝালেন সকলকে। তাঁরা কি তাঁকে ওটা কিনতে সাহায্য করবেন?

টাকা আসতে লাগলো। চার হাজার ডলার জড়ো যখন হলো, বাকী হাজার ডলারও এসে গেলো এনড্রু কার্নেগীর কাছ থেকে।

সমস্ত পূর্ব-উপকূলে করুণার উৎস হয়ে দাঁড়ালো এই হাসপাতাল। ১৯১১ সালে মাত্র দুটি বেড নিয়ে শুরু হলো হাসপাতাল। কয়েক বছরের মধ্যেই 'বেড' এর সংখ্যা দাঁড়ালো কুড়িতে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর আসবাব দিয়ে ভাল করে সজ্জিতও হয়ে উঠলো। সাদা ও কালো উভয় শ্রেণীর চিকিৎসকই ছিলেন তাতে। সেবার ভার ছিল মেরীর ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। কুড়ি বছর ধরে হাসপাতাল চালানো হলো স্কুলের তরফ থেকে। তারপর ডেটোনার কর্তৃপক্ষ সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে একই জমির উপর পৃথক একটি নিগ্রো হাসপাতাল তৈরী করতে রাজী হলেন।

তারপর মজুরদের সেবার কাজ শুরু হবার পর এক বছর কাটলো। সেটা বুকার টি. ওয়াশিংটন স্কুল দেখার চার বছর পরের কথা। একদিন আলবামার টাস্কেগী ইনস্টিটিউট-এর এক সভায় মিসেস বেথুন যোগ দিলেন। ডাঃ ওয়াশিংটনের সাথে নতুন হওয়া সম্পর্ক তাঁর মনে আর একটা বিরাট প্রেরণা যোগাল। এই দলের লোকদের মাঝে মাঝে সম্মেলন হতে লাগলো।

ডাঃ ওয়াশিংটন যখন প্রথম টাস্কেগীতে আসেন তখন দাঁত মাজা থেকে ক্ষেতের কাজ পর্যন্ত সবকিছুই তাঁকে নিজের হাতে শিক্ষা দিতে হতো। আশা করতেন, পরে তারা পরস্পরকে শিখিয়ে নেবে। স্কুলের প্রথম দিকে তিনি অভিজ্ঞতার বিনিময়ের উদ্দেশ্যে টাস্কেগীর নিগ্রো সভার বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। দূর দূর জায়গা থেকে চাষারা আসতো তাদের অগ্রগতির খবর দিতে। তারা জানতো, সে অগ্রগতি হয়েছে তাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ ওয়াশিংটন ও তাঁর সহকর্মীদের জন্যে। টাস্কেগীতে কৃষি সম্পর্কে হামেশাই নতুন নতুন গবেষণা হতো। নতুন কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাদের জানিয়ে দেওয়া হতো।

নিজের স্কুলের কাজের চাপে এতদিন বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন মেরী। প্রতিটি রাজ্য থেকে নিগ্রোজাতির অগ্রগতির খবর যতই আসতে লাগলো, উত্তেজনা সামলানো তাঁর পক্ষে ততই কঠিন হয়ে পড়লো। ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে তারা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। অথচ এখনই তারা বড়াই করে বলতে পারে, তাদের নিজেদের খামার হয়েছে। তারা লেখাপড়া শিখেছে, ব্যাঙ্ক ও ওষুধের দোকান খুলেছে, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা চালাচ্ছে।

এই নিগ্রো সম্মেলনীতেই মেরীর সঙ্গে ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের পরিচয়। ওয়াশিংটন মেনে নিলেন তাঁকে নিজের বরণীয় আর একজন কর্মবীর বলে। এই ছিপছিপে গড়নের, বিনম্র, মিষ্টস্বভাব বিজ্ঞানী টাস্কেগীস্থ কৃষিবিভাগের ভার নেন ১৮৯৬ সালে। খাদ্যমূল্য ও ঔষধ হিসেবে মূল্য যাচাইয়ের জন্য তিনি রাস্তার ধারের প্রতিটি বাজে গাছ নিয়ে পরীক্ষা চালান। জঞ্জালের উপর একটি তকতকে লাউ গাছ বাড়তে দেখে তাঁর মাথায় এলো এই জঞ্জালকে সার হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা। অজ্ঞাতকুলশীল সয়াবীন নিয়ে গবেষণা করে এর খাদ্যমূল্য তিনি আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ দেশের মাটির দিকে লক্ষ্য করে তিনি বুঝলেন,

বহুদিন তুলার চাষ করে করে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেখানে নানা ধরনের ফসলের চাষ করা দরকার। তাঁর ফসলের মধ্যে সব চাইতে নামী জিনিস হলো মটরশুটি। তিনি দেখলেন, মটরশুটিতে রয়েছে মাংসের চেয়েও বেশী প্রোটিন, আলুর চাইতে বেশী শ্বেতসার আর মাখনের চেয়ে বেশী চর্বি। যাতে এই নতুন ফসলের চাহিদা বাড়ে, তার জন্যে তিনি দিনরাতখেটে মটরশুঁটি থেকে নানা রকম খাবার তৈরী করলেন, আরও নতুন নতুন ব্যবহার বার করতে লাগলেন যাতে চাষীরা এর চাষ করে।

এর ফলে ডাঃ কার্ভার ও মিসেস বেথুন উভয়কেই সম্মানার্থক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দেওয়া হলো টাস্কেগী ইনষ্টিটিউট থেকে একই সাথে।

ডেটোনায় ফিরে এলেন মিসেস বেথুন। ভেবেচিন্তে 'ভলাসিয়া কাউন্টির' জন্যে এক বাৎসরিক সম্মেলন আহবান করলেন। সঙ্গে এক শিশুপ্রদর্শনী। ডেটোনা হলো ভলাসিয়া অঞ্চলের মধ্যেই। এই সম্মেলনে সব চাইতে ভাল সব্জী, জেলী আর সেলাই কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হতো। শিশু কোলে নিয়ে উপস্থিত হতেন মায়েরা। গর্ভভরে দেখাতেন তাদের কি রকম যত্ন নেওয়া হচ্ছে। সম্মেলনে তারা পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময় করতেন আর শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ শুনতেন। মিসেস বেথুন সব চেয়ে পরিস্কার ঘর এবং আঙিনার জন্যে একটি রেক ও একটি কোদাল পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করলেন। এই অজুহাতে তিনি সম্মেলনে আগেভাগে সারা জেলা ঘুরে আবর্জনার বহর দেখে এলেন।

পরিচ্ছন্ন জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করলো নিগ্রোরা এই সম্মেলন থেকে। এই পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়লো তিনটি জেলায়। সম্মেলনে প্রতিযোগীতা-মূলক মনোভাব তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিল আরো আকর্ষণীয় বাড়ী, সুন্দর বাগান আর সুস্থতর সন্তান-সন্ততির কামনা।

দশ

১৯১৪ সাল। এ বছর থেকে ডেটোনা ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুল পুরোপুরি ভাবেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দিচ্ছিল। প্রতি বসন্তকালে গৃহস্থালী-বিজ্ঞান, শিক্ষকতা, রন্ধন-প্রণালী ও শুশ্রূষা-বিদ্যার শিক্ষা নিয়ে এই বিদ্যালয় থেকে এক এক দল ছাত্রী বার হতে লাগলো।

এত বড় ব্যাপারের পক্ষে ফেথ হলটা একেবারে ছোট। একখানা কাঠের বাড়ীতে থাকা, পড়াশুনা, রান্নাঘর, ধোবিখানা ও গীর্জা—সব কিছু চলে না। মিসেস বেথুনের চোখে আবার স্বপ্ন নামল। নতুন বাড়ী? হ্যাঁ। এবারকার বাড়ী হবে পাকা ইঁটের। বড় হবে ফেথ হলের চেয়েও। যুগোপযোগী সুযোগ সুবিধা সব কিছুই তাতে থাকবে। পাইপের ব্যবস্থা, ইলেকট্রিকের আলো, প্রিন্সিপাল ও প্রফেসরদের জন্যে আফিস ঘর, বহু ছাত্রীর জন্যে পড়ার ঘর আর প্রার্থনার গীর্জা।

কিন্তু টাকা! ফেথ হলের টাকা যোগাড় করেছেন, তিনি, হাসপাতালের জন্যেও পেয়েছেন টাকা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আরো টাকা তুলতে পারবেন তিনি। যাবেন তাঁর শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের কাছে, তাঁদের কাছে খুলে ধরবেন তাঁর অন্তরের নতুন স্বপ্ন।

সর্বশক্তিমানের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন, "হে মহান, আমাকে শক্তি দাও, যাতে তাঁদের আমি বিশ্বাস করাতে পারি যে আমার অর্থের প্রয়োজন।"

করুণাময় তাঁকে এমন বাক-নৈপুণ্য দিলেন যে, দু'জনের বেশী করো কাছে তাঁকে যেতে হলো না। গেলেন কেবল গ্যাম্বল ও টমাস হোয়াইট-এর কাছে। তাঁদের কাছ থেকেই পেয়ে গেলেন সমস্ত টাকা।

লোকে শুধায়, 'নতুন বাড়ীর নাম কি হবে?'

তিনি বললেন, 'হোয়াইট হল।'

তাঁর আর সব কীর্তির মত এই বাড়ীও স্থানীয় অধিবাসীদের কাজে লাগানো হলো। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ডেটোনাবাসীরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গীর্জায় উপাসনা করতো।

ফেথ হল খোলার কিছুদিন পর থেকেই প্রত্যেক রবিবারে বেলা তিনটার সময় আন্তর্জাতিক উপাসনা অনুষ্ঠান শুরু করলেন। মেয়েরা গানের স্তবকগুলো গেয়ে যেতো আর আবৃত্তি করতো উচ্চাঙ্গ পৌরাণিক কাব্য কিংবা স্বরচিত পদ্য। মিসেস বেথুন কিংবা শিক্ষকদের আর কেউ প্রার্থনা করতেন। হ্যালিফ্যাক্স নদীর অপর পার থেকেও বহু লোক আসতো এই সব স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপরিকল্পিত

সভায় যোগ দিতে। শেষের দিকে দেরী হলে দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো তাদের।

নতুন গীর্জা যখন হলো সান্ধ্য উপাসনা সভার আকারও বাড়লো। সমস্ত অতিথিরই জায়গা হয়ে যেতো সেখানে। এখনও রয়েছে এই সভার জনপ্রিয়তা। যে কোন রবিবারের সন্ধ্যায় দেখা যেতো, হয় পায়ে হেঁটে নয় গাড়ীতে, পুল পার হয়ে এই সমবেত উপাসনা সভায় যোগ দিতে আসছে অগুণতি লোক। সত্যি বলতে কি, বেথুন কুকম্যান কলেজ পরবর্তীকালে দক্ষিণ দেশের সমস্ত জাতিবৈষম্য দূরীকরণের দেউল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সভানুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই। এটা হয়ে রয়েছে সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকদের পাশাপাশি বসার জায়গা।

এগার

সারাটা মার্কিন দেশ জুড়ে তখন সাদাকালার সমঝোতার আন্দোলন চলছে। ডেটোনার মহামিলনী ছিল তাঁরই অংশ বিশেষ। সেই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আমেরিকা নিগ্রো জাতিকে নতুন করে আবিষ্কার করছিল। আবিষ্কার করছিল তাদের রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, কর্মসঙ্গীত আর ধর্মসঙ্গত। আজকালকার 'ফক্সট্রক', 'চার্লসটন', 'জ্যাজ' প্রভৃতি নাচ ও সুর নিগ্রোজাতির প্রাচীন লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যেরই পরিবর্তিত রূপমাত্র। নতুন মার্কিনজাতি যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, সেই স্পেনীয় পর্যটক, ফরাসী ও অন্যান্য দেশীয় যাত্রীদের মত নিগ্রোদেরও মার্কিন দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যথেষ্ট দান আছে।

কিন্তু নিগ্রোদের এই দান সাদা আদমীদের ঘৃণা ও অপরাধ সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাংঘাতিক রকমের দাঙ্গা ও পাইকারীভাবে নিগ্রো-নিধন যজ্ঞ শুরু হলো। তারপর ক্রমশঃ এই নিগ্রো নিগ্রহ কমতে কমতে ১৯৫০ সালে এই জাতীয় ঘটনার সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র দুই-এ।

নিগ্রো নেতারা যখন তাঁদেরসম্মেলনে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন তখন বেশ বোঝা গেল সাদা ও কালো চামড়ার সমঝোতা এবং লিঞ্চিং দাঙ্গা প্রভৃতি কমে যাওয়ার কারণ কি। নিগ্রোদের শিক্ষার মান বাড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছিল পশুশক্তি প্রতিরোধের ক্ষমতা। প্রতিপদে তারা আইনের সাহায্য নেয় এখন। ১৯০০ সালের দিকে পনের লক্ষ নিগ্রো ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছিল, তাদের পড়াচ্ছিলেন ত্রিশ হাজার নিগ্রো শিক্ষক। প্রতিষ্ঠিত হলো চৌত্রিশটা নিগ্রো কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই বছরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন থিওডোর রুজভেল্ট। নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার পাওয়ার বেশী সুযোগ হলো তাতে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিগ্রোদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিলেন। তারাও যাতে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যায় তার জন্যে উৎসাহিত করলেন তাদের। বুকার টি. ওয়াশিংটনের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয় তাঁর। টাস্কেগীতেও এসেছিলেন তিনি। তারপর দু'বার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন মার্কিন নিগ্রোরা সমানাধিকার লাভের পথে অনেকখানি এগিয়ে যান।

১৯১৭ সালে যখন আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করলো, নিগ্রো নেতারা তখন জনগণকে বোঝালেন যে সাদাদের মত কালোদেরও যুদ্ধে যেতে হবে। আর যদিও বহু স্টেটে তাদের পুরোপুরি নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়নি, তবু তারা আশা করেন যে, দেশপ্রেম আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়।

১৯১৭ সালের এক আইনমতে বিশ লক্ষেরও বেশী নিগ্রোকে নেওয়া হলো সৈন্যবিভাগে। তার মধ্যে তিন লক্ষের বেশী যুদ্ধ করেছিল। আলাদা করে রাখা

সত্বেও যে বীরত্ব এবং সাহস তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতে হাজার হাজার নতুন বন্ধুর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা তাঁরা অর্জন করেছেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন দেশে নিগ্রোদের নাগরিক জীবনও অনেকখানি বদলে গেল। কারখানাগুলোতে যখন সরঞ্জাম তৈরী হতে লাগল, তখন মজুরের দরকার হয়ে পড়লো আরও বেশী নিগ্রো মজুর ছাড়া আর উপায় ছিল না তখন। তার ফলে দক্ষিণের অঞ্চলগুলো থেকে নিগ্রোরা চলে আসতে লাগলো উত্তরের দিকে ভাল বেতন আর শিল্পে দক্ষতা পারবে এই আশায়।

মিসেস বেথুন শংকিত হয়ে উঠলেন এই দেখে যে, তাঁর নিজের ছাত্র-ছাত্রীরাও অনেকে দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারলেন তিনি, যুদ্ধশেষে এরাই বেকার হবে সবচেয়ে আগে।

মেরীর ছেলে তখন পড়ছে অ্যাটলান্টার মোরহাউস কলেজে। টাকার লোভে তাঁর ছেলে কি করে সেও মেরীর একটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়ালো। পড়াশুনা সে ভালই করছিলো। লোভে পড়ে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, মেরী তা চাননি। তবে সুখের বিষয়, প্রথম মহাযুদ্ধে সে কলেজ ছাড়েনি। ভবিষ্যতে সৈন্যদলে অফিসার হওয়ার শিক্ষা নেওয়ার জন্যে সেনাবাহিনীর কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কোর'-এ যোগ দিয়েছিলো সে।

এই সময়ে মিসেস বেথুন ঘুরে ঘুরে রেডক্রস-এর জন্যে টাকা তুলেছিলেন। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে খবর পেলেই তিনি মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া কলম্বিয়ায় বক্তৃতা করতে যেতেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনিই আবার তাঁর স্কুলে আর ডেটোনায় সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্কুলের টাকার প্রয়োজন সব সময়েই। তার ওপর ফ্লোরিডাতে সাদা-কালো ব্যাপারটা যে রকম তাতে কূটবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল খুবই। একদিকে ছিলেন সদাশয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা যারা সব সময়েই তাদের অর্থ সাহায্য ও উপদেশ দিতেন। অন্যদিকে ছিলেন গোঁড়া সাদা লোকেরা ; তারা চাইতেন কালোদেরা দাবিয়ে রাখতে। তারা মনেকরতেন, নিগ্রোদের কোন রকম সাহায্য করা মানে ওদের মাথায় চড়তে উৎসাহ দেওয়া।

এক চিরস্থায়ী ভীতির কারণ ছিল কুক্লক্স ক্ল্যান। ১৯৮৬ সালে টেনেসীর পুলাস্কীতে এই সংগঠনের জন্ম। এর মূলে ছিল গৃহযুদ্ধের আমলের কয়েকজন যুবক সৈনিক। গৃহযুদ্ধ তাদের অর্থহীন ও নিরুৎসাহ করে দিয়েছে, চাঙ্গা হওয়ার জন্যে নতুন কিছু করা দরকার তাদের। এক সন্ধ্যায় তারা স্ফূর্তির জন্যে কি করা যায়, ভাবছিল। একজন বললে, 'দেখ গ্রীক শব্দ, 'কুক্‌লস' মানে বৃত্ত, ব্যবহার করলে কেমন হয় ?'

হাসি কস্করা আর মন্তব্য করার মধ্যে শব্দটা ভেঙ্গে 'কুক্লুক্স' করা হলো আর 'ক্ল্যান' যোগ করা হলো তার সঙ্গে। প্রথমটায় তারা শুদ্ধ সাদা পোষাক, মুখোস পরে ঘোড়ার নালে কাপড় মুড়ে শুধু লোকের বিরক্তি উৎপাদন করতো।

আর এক বছরের মধ্যে পুনর্গঠনের শোচনীয় ঘটনাবলী শুরু হয়ে গেলো। ভাগ্যান্বেষীরা অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত নিগ্রোদের ঠকিয়ে কাজ নেওয়ার জন্যে দক্ষিণদেশে ধাওয়া করলেন। যে ক্রীতদাসদের তারা এতদিন অত্যাচার করে এসেছে তাদের দ্বারা এখন শাসিত হওয়ার ভীতি প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের মনেই ঢুকলো। আইনসভায় নির্বাচিত হতে লাগলেন বহু নিগ্রো। অন্যান্য বহু সরকারী পদও তারা দখল করলেন। সাদারা যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে মনে করলেন যে, সভ্য সমাজের আখেরিদশা এসে গিয়েছে।

একদিন রাত্রে কয়েকজন লোক কুক্লুক্স ক্ল্যান এর লোকদের সাদা, পোষাক পরে এক নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে বলে বেড়াতে লাগলো যে একদল ভূত দেখেছে তারা। অভিসন্ধির মত একটি মতলব এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লো। মতলবটি হল, এই ভাবে নিগ্রোদের ভোট দান এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি পদ গ্রহণ থেকে ভয় দেখিয়ে বিরত করা।

ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল ক্ল্যানের নিষ্ঠুর গোপন রাজ্য। তার বর্বরতা হয়ে উঠল ক্রমশঃ অমানুষিক। কয়েকটি নিগ্রো স্কুল পুড়িয়ে দিলো। যে সাদারা সেখানে পড়াতে এসেছিলেন তাদের সেখান থেকে বার করে দেওয়া হলো। নিগ্রোদের এরা যন্ত্রণা দিত, মেরেও ফেলতো আর তাদের ঘরবাড়ী লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দিত। যে সব সাদারা ক্ল্যানে যোগ দিতে রাজী হতো না তাদের চাবুক মরা হতো। বহু বছর ধরে এরকম অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছিল তারা।

যখনই ক্ল্যানের কথা উঠতো, মিসেস বেথুন বার বার বলতেন, 'বিশ্বাস রাখ, সাহস হারিও না। সহিষ্ণু হও, ধৈয্য হারিও না। একদিনে সমাজ ব্যবস্থা বদলায় না। আমরা তো ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছি।'

নির্বাচনের দিনে দক্ষিণে নিগ্রোদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখবার জন্যে উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছিল। ভোট যারা দেবেন ভোটের দিনের অনেক আগেই তাঁদের সেই অধিকারের জন্যে দুই ডলার কর দিতে হতো। যেসব ভাগচাষীর বার্ষিক আয় ছিল একশত ডলার রাজনীতি থেকে তাদের সরিয়ে দিতে এক ডলারই যথেষ্ট ছিল। এই কর বসান হয় ১৮৮৫ সালে ফ্লোরিডায়। ১৯৩৭ সাল পর্যন্তই এই ব্যবস্থা ছিল সেখানে।

নিগ্রোদের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার আরো একটা মতলব ছিল। সে হলো সাদাদের প্রাথমিক নির্বাচন। দুটি বড় দলের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচন করার জন্য পৃথকভাবে প্রাথমিক নির্বাচন করা হয়। যেসব রাষ্ট্রে একটি দলের শক্তি অপ্রতিহত সেখানে দলের মনোনীত হওয়া মানেই নির্বাচিত হওয়া। দক্ষিণ দিকের অনেক রাষ্ট্রে সোজাসুজি নিয়ম ছিল যে, কোন নিগ্রো এই প্রাথমিক নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এই কারসাজির ফলে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণদিকের অনেক রাষ্ট্রেই নিগ্রোরা ভোট দিতে পারত না। সেই বছর 'সুপ্রীম কোর্ট' রায় দিলেন যে, এই 'সাদা প্রাথমিক নির্বাচন' বে-আইনী।

মিসেস বেথুন শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে নিগ্রোদের উৎসাহিত করতেন, অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি তাদের এসব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন হামেশাই। এমন কোন নির্বাচনী দিন যায়নি যেদিন তিনি ভোট দিতে কৃতসংকল্প একদল নিগ্রোকে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হননি।

বার

১৯২১ সাল। ডেটোনা এডুকেশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে উচ্চ বিদ্যালয়ের চাইতে দুই ধাপ বেশী পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়ী হয়েছে স্কুলের। ইঁটের দু'নম্বর বাড়ীটা হলো লাইব্রেরী, হোয়াইট হলের সামনে রাস্তার অপর পারে। মিসেস বেথুনের এতও মন ভরলো না। তিনি জানতেন, কাঠের বাড়ী 'ফেথ হল', আগুন লাগলে মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে উঠবে। মেয়েদের শোবার পক্ষে আর নিরাপদ নয় সেটা।

একদিন তিনি, তাঁর সেক্রেটারী হ্যারল্ড লুকাস, আর সহকর্মীদের কয়েকজনের সঙ্গে হোয়াইট হলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা নীচু জমি দেখিয়ে বললেন, 'আমার কল্পনায় ঐখানে আমি একটা বাড়ী দেখতে পাচ্ছি। আগুনে পুড়বে না। তাতে থাকবে গোসল করবার নাহার, বসবার ঘর, বিজলী বাতি। আমার মেয়েদের নতুন বাড়ী। যাই, এখনই চিঠি লিখতে হবে আমকে গোটা কতক।'

বাড়ী তৈরীর নেশা চাপলে কেউ তর্ক করতো না ওর সঙ্গে। অনেক আগেই তারা জেনেছিল যে তার স্বপ্নের বিরোধী কোন কথা বলা চলবে না।

ডেটোনায় এসে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন 'বাফেলো'র শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিনী মিসেস ফ্লোরা ডি কার্টিস। স্কুলের বাগান থেকে গাজর কিনবার জন্যে সেদিনও তিনি এসেছিলেন। মহিলা ছিলেন খেয়ালী প্রকৃতির, পেটের অসুখের জন্যে টাট্‌কা গাজর আর মটরশুঁটি তার না হলে হয় না। মাত্র দশ ডাইম মূল্যে গাজর কিনতে গিয়ে মেলা দরদস্তুর, বাছাবাছি করে অবশেষে মিসেস বেথুনের আপিসে দাম জমা দিতেন।

১৯২১ সালে একদিন এলেন তিনি। মিসেস বেথুনকে বললেন, 'ডেটোনায় এই আমার শেষ বছর। আর আসবো না আমি।'

শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন মিসেস বেথুন। মিসেস কার্টিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বছরে কত টাকার গাজর খেয়েছি বলতে পারেন?'

মিসেস বেথুনের পাই পয়সার পর্যন্ত হিসাব থাকতো। শুধু টাকার পরিমাণ নয়, প্রতি ডাইম খরচের তারিখ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। মিসেস কার্টিস বিস্মিত সপ্রসংশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বললেন, 'আপনার স্কুলের পত্রিকাটি মাসে দয়া করে পাঠাবেন কি? ধরুন আমার যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, টাকাতো কিছু থাকবে!'

এর অল্পদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তিনি উইল করে রেখেছিলেন। তাঁর উইলে দেখা গেল, স্কুলের জন্যে তিনি রেখে গিয়েছেন চল্লিশ হাজার ডলার।

মিসেস কার্টিসের উইলের টাকা দিয়ে ছাত্রীদের থাকার জন্যে একটি পাকা বাড়ী তৈরী করা হলো। এতে প্রায় উইলের অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে গেল। এটি স্কুলের নম্বর বাড়ী। বাড়ীটির নামকরণ হলো এই মহিলার সম্মানার্থে : 'কার্টিস হল'।

মেরী এখন ৪৮ বছরের প্রৌঢ়া। তাঁর জ্ঞান ও আত্মিকশক্তির উপর নির্ভর করছে হাজার হাজার লোক। তিনি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণা। ১৯১৯ সালে তাঁর স্বামী গত হয়েছেন। ছেলেও এখন প্রাপ্ত বয়স্ক। সে এখন আলাদা জীবন করছে।

মেরীর নিজের যদি কখনো বাসনা হতো আর একজনের ওপর নিজের ভার তুলে দিতে, তবু তাঁর সে ইচ্ছা কখনো প্রকাশ পেতনা।

তাঁর নজর নিবদ্ধ 'কুকম্যান ইনস্টিটিউট' এর ভাগ্যের প্রতি। ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলের এই বিদ্যায়তনটি নিকটস্থ আরও দুটি ছেলেদের কলেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুবিধা করতে পারছিল না। বহু বছর পূর্ব থেকে যদিও বেথুনের স্কুলে ছেলেদের নেওয়া হয়েছে, তবু স্কুলটা ছিল প্রধানতঃ মেয়েদেরই। বেথুনের একান্ত ইচ্ছা ছিল সহশিক্ষার প্রবর্তন করা। 'কুকম্যানে'র কলেজটি উত্তর মেথোডিস্ট এপিসকোপাল চার্চের শিক্ষা সমিতির দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯২৩ সালে দুটি কলেজ একত্র করে দেওয়ার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হলো। এই নতুন সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হলো, 'ডেটোনা কুকম্যান কলেজিয়েট ইনস্টিটিউট।'

১৯২৪ সালে মিসেস বেথুন উপহারস্বরূপ ইউরোপ ভ্রমণের খরচ পেয়ে গেলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। অনতিবিলম্বে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। বেশ আনন্দে কাটলো দু'টি মাস তাঁর ইটালী সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ও স্কটল্যাণ্ডে বেড়িয়ে। রোমে স্বয়ং পোপ তাঁকে আপ্যায়িত করলেন, আর দিলেন আশীর্বাদ। লণ্ডনে পৌঁছে দেখলেন, স্বয়ং লর্ড মেয়র সস্ত্রীক তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তিনি ফিরে এলেন ডেটোনায়। অন্তরে তাঁর নবলব্ধ আনন্দ, দেহে মনে নতুন কর্মশক্তি। নতুন নতুন দৃশ্য ও নতুন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলো আরও।

আবার বদলে গেলো স্কুলের নাম। তাঁর ট্রাস্টীরা জোর আপত্তি তুললেন যে, তাঁর নাম ওর সঙ্গে জড়িত রাখতেই হ'বে। রাজী হলেন তিনি। নতুন নাম হলো : বেথুন কুকম্যান কলেজ।

পঞ্চাশ বছর বয়সে মেরী তখন সবে মার্কিন দেশের মানব সেবা কর্মের একজন নেত্রী হিসেবে যশের সোপানে উঠতে আরম্ভ করেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাব বাড়ছিল। দেশের সবখানে সমাজের প্রতি অংশেই কিছু কিছু লোক তাঁর ব্যক্তিত্বের

প্রভাবে এসেছিল। যদিও বয়সের সাথে ভারী হয়ে পড়েছিলেন মেরী, ঘন কালো চুলের মধ্যে পড়েছিল সাদা রেখা, তবু মনে হতো না তাঁর সীমাহীন কর্মশক্তি কিছুমাত্র কমেছে। সহকর্মীদের চাইতে তখনো কর্মদক্ষতা তাঁর অনেক বেশী।

১৯২৮ সালে কালিফোর্নিয়ায় 'জাতীয় কৃষ্ণাঙ্গী মহিলাসঙ্ঘের' যে অধিবেশন হয় তিনি ছিলেন তার সভানেত্রী।

বহু বছর পূর্বে যেদিন জাতীয় কৃষ্ণাঙ্গী মহিলাসঙ্ঘের তখনকার সভানেত্রী ফ্লোরিডার স্কুলের তরফ থেকে এক সভায় কিছু বলবার জন্যে বেথুনকে আহ্বান করেন, সেদিন থেকেই বেথুন ছিলেন এদের সঙ্গে যুক্ত। সেই প্রথম দিনই তিনি শ্রোতাদের মনের ওপর এমন রেখাপাত করেছিলেন যে, সভাশেষে মিসেস টেরেল তাঁকে বলেন, এই সঙ্ঘের উপযুক্ত সভানেত্রী হবার মত যথেষ্ট গুণাবলী আপনার রয়েছে। আমার আশা, আপনাকে ঐ পদে দেখে যেতে পারব আমি।'

মিসেস বেথুন যখনই বক্তৃতা করতেন, তাঁর প্রাণের আনন্দ অনুভূত হতো সবার অন্তরে।. বলার কি অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর। বক্তৃতা শুরু করার আগে নিশব্দ হয়ে একমিনিট দাঁড়াতেন, মাথাটি একটুখানি সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে। মনে হতো, উপর থেকে কোন নির্দেশের অপেক্ষা করছেন তিনি। অর্ধমুদ্রিত নেত্রে প্রথম কয়েকটি কথা যখন উচ্চারিত করতেন, শ্রোতারা তাঁর মধ্যে অনুভব করতো কে একজন আধ্যাত্মিক বাণী-বাহক, যিনি বিধির আদেশে কাজ করছেন। মুগ্ধ হয়ে শুনত তারা গভীর প্রাণস্পর্শী উদাত্ত কণ্ঠস্বর। ছোট ছোট কাব্যময় বাক্যে তাঁর সুসংলগ্ন চিন্তাধারা প্রথমে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে শুরু করতেন। ক্রমেই উঁচুতে উঠে যেত তাঁর গলা, শেষে উত্তেজনার আবেগ স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন শ্রোতাদের।

তারপর আবার শান্ত হয়ে আসতো স্বর, স্তব্ধ হতো কণ্ঠ। মনে হতো, শ্রোতাদের হৃদয় তাঁকে আশীর্বাদ করছে। মিসেস বেথুন বক্তৃতা শেষে তাঁর ভাবময় হাত দুটি একবার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে টেনে নিতেন। ভাবখানা এই, যেন নিজের কণ্ঠস্বরই তিনি চাবি দিয়ে বন্ধ করেদিলেন।

সর্বহারা কালো মেয়েদের জন্যে তাঁর বলার ক্ষমতার দ্বারা তিনি চাইলেন আরো সাহায্য। মানুষের ঘরে জন্মেও কী কষ্টই না তারা ভোগ করছে।

সভ্যরা স্তব্ধ হয়ে থাকলেন একটুক্ষণ।

মঞ্চের উপর বক্তাদের সঙ্গে সেদিন এক বিনয়নম্র শ্বেতাঙ্গিনী বৃদ্ধা বসেছিলেন হাত দু'টি কোলের উপর রেখে। যতক্ষণ মিসেস বেথুন বলছিলেন, খুসির আভা মৃদু হাসির আভা ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখমণ্ডলে। বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ইনি ছিলেন সেই 'কোয়েকার' মহিলা যিনি তাঁর সম্পত্তি দশ ভাগের এক ভাগ ভালো কাজে খরচ করবেন ঠিক করেছিলেন। ইনি মেরী ক্রিসমান, আজকাল

প্রধান অতিথি। মেরীকে স্কোশিয়া সেমিনারী ও মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট-এ পড়বার জন্যে একদিন ইনিই বৃত্তি দিয়েছিলেন।

মানবাত্মার কল্যাণের জন্যে যে মূলধন তিনি নিয়োগ করেছেন, ঐ মূলধন শতগুণ লাভ ফিরিয়ে দিচ্ছে—তা আজ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলেন। এ দেখবার জন্যেই করুণাময় তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই দৃশ্য দেখে চোখ জলে ভরে ওঠেনি এমন কম লোকই ছিল সেদিন সেখানে।

মিসেস বেথুন তাঁকে অনুরোধ করলেন, মানুষ তৈরীর কাজে মূলধন খাটান। কে জানে হয়ত মহামূল্য হীরকও একদিন মিলতে পারে।

ত্তের

বেথ্ন চরিত্রের আসল মহত্বের বিকাশ হতে লাগলো ক্রমশঃ। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁকে জাতীয় জীবনের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে। বক্তা হিসেবে খ্যাতি হলো প্রচুর। সুযোগ পেলেই তিনি সাদা কালোর সদ্ভাবের জন্যে তাঁর বক্তৃতাশক্তির ব্যবহার করতেন। একটা কথা তিনি পরপর বলতেন, উঁচু জাত নীচু জাত বলে কিছু নেই।'

'আমেরিকা তথা পৃথিবীর সভ্যতায় নিগ্রোদের অবদান রয়েছে। তাদের ধৈর্য পরমত-সহিষ্ণুতা ক্ষমা আর প্রেমের কথা দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই দান। একটা গাছ কি ভাবে বেড়ে উঠেছে তা জানবার জন্যে তার সর্বোচ্চ শাখাগুলো দেখতে হয়। আর নেতাদের দেখতে হয় জাতির বেলায়,—যেসব নেতা জাতির জন্যে কিছু করে গেছেন। জাতিকে বিচার করতে হবে তার নেতাদের দিয়ে। সাধারণ লোক যারা নিজেদের উন্নত করবার সুযোগ পায়নি, তাদের দিয়ে নয়।'

যেসব সঙ্ঘ সাদা কালোর মধ্যে সমঝোতার জন্যে কাজ করছিল মেরী তাদের সব সময়ই সাহায্য করতেন।

এই ধরনেরই একটি প্রতিষ্ঠান ছিল জাতীয় নগরবাসী সঙ্ঘ বা 'ন্যাশনাল আরবান লীগ'। একদল শেতাঙ্গ সমাজসেবী ১৯১০ সালে নিউ ইয়র্কের নিগ্রোদের অবস্থা উন্নতির জন্যে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের নীতি ছিল, 'ভিক্ষা নয়। কাজ করার সুযোগ চাই।' ক্রমে এই সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। দায়িত্বও হলো অনেক বেশী। আজ ষাটটি শহরে এদের শাখা রয়েছে। শাখাগুলো চালাচ্ছেন যাঁরা তাঁরা প্রায়ই নিগ্রোকর্মী। এঁরা বেকার নিগ্রোদের চাকুরী খুঁজে দেন। শ্রমিক সঙ্ঘ ও সাদা মালিক দুই পক্ষকেই রাজী করান এদের কাজে নিয়োগ করতে।

যেসব মায়েদের খেটে খেতে হয় তাদের সন্তানদের রাখবার জন্যে শিশুমঙ্গলায় পরিচালনা করছেন তাঁরা। যাতে মার্কিণ দেশের নিগ্রোদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে তার জন্যে যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করাই ছিল তাঁদের কাজ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ঠিক ১৯২০ সালেই মিসেস বেথুন যোগ দিলেন এই সঙ্ঘের সাথে। বুকার টি. ওয়াশিংটন এই সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির একজন। মাত্র অল্প দিন আগে মারা গিয়েছেন তিনি। তাঁর জায়গাতে মেরীকে নেওয়া হলো। পরিচালক সমিতির অন্য সভ্যরা প্রথমটায় ভয় করেছিলেন যে হয়তো তাঁর অনমনীয় মনোভাবটাই দেখতে পাবেন তাঁরা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তারা দেখলেন মিসেস বেথুনের বিবেচনাশক্তি, ধৈর্য, অপরকে বোঝাবার ক্ষমতা আর মার্কিন জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টি।

নিগ্রো জগত আর সাদা সমাজের মধ্যে মিসেস বেথুন ছিলেন যোগসূত্র বিশেষ। যখনই কোন সাদা লোক তাঁকে জিজ্ঞসা করতেন, নিগ্রোরা কি চায়, বিনা দ্বিধায় তিনি উত্তর দিতেন, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে অঙ্গীকার রক্ষার ব্যবস্থা—যে আশা পোষণ করবার অধিকার তাদের রয়েছে। আর চায় মার্কিন দেশের অন্য সব অধিবাসীদের সমান আত্মোন্নতির ব্যবস্থা, তাঁদের সমস্যা অরেরা বুঝতে পারা। আর শেষ কথা, উন্নততর আমেরিকা তথা পৃথিবীর গঠনে যথেষ্ট পরিমাণে অংশ গ্রহণ করা।'

'কৃষ্ণকায়দের উন্নতিকামী জাতী সংঘকেও মিসেস বেথুন যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাও হয় নিউইয়র্কে, জাতীয় নগরবাসী সংঘ প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে। তবে এই সংঘটির কাজ ছিল বিচারালয়ের মাধ্যমে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার লাভ করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সংঘের কাজের তালিকা খুব গৌরবোজ্জ্বল। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই সংঘের আইন উপদেষ্টাগণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে একত্রিশটি মোকদ্দমার মধ্যে আটাশটিতে জয়লাভ করেছেন। 'সাদা প্রাথমিক নির্বাচন' বে-আইনী ঘোষণা থেকে শুরু করে বহু-শহরের বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন রদ-করা, যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় নিষিদ্ধকরণ, ট্রামে বাসে করে প্রদেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় কঠিন বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন কানুন তুলে দেওয়া, নিগ্রো ছাত্রের সাদা কলেজে অধ্যয়নের অধিকার লাভ প্রভৃতি হলো সংঘের অসংখ্য কীর্তির মধ্যে কয়েকটি মাত্র।

১৯৩০ সালে মিসেস বেথুন হলের এন. এ. এ. সি. পি-র সভানেত্রী। তখন থেকেই মিঃ ওয়ালটার হোয়াইটের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূচনা। মিঃ হোয়াইট ছিলেন সংঘের কর্মকর্তা। নিজেকে যখন তিনি নিগ্রো বলে পরিচয় দিতেন, লোকে তখন অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো তাঁর নীল চোখ, রেশমের মতো চুল আর সাদা চামড়া। সুদূর জর্জিয়া থেকে এসেছেন তিনি। একাধিক বার তিনি বেঁচে গিয়েছেন সাদা লোকদের লিঞ্চিং-এর হাত থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হলো, এন. এ. এ. সি. পি-র একটা অল্প বেতনের চাকুরী নিয়ে তিনি চলে আসেন উত্তরে। শেষ পর্যন্ত তিনি এরও প্রধান কর্মসচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নিগ্রোদের জন্যে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হলো আমেরিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সময়। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা টিকলো না। ১৯২৯ সালে এলো অর্থ-সংকট। শেয়ার বাজার গেল ডুবে। উপরের শ্রেণীর লোকদেরই যখন কোন আশা নেই নিগ্রোদের তখন কিসের আশা ?

অবস্থা যখন অবনতির শেষ ধাপে নেমে এসেছে তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ফ্রাঙ্কলিন ডেলনো রুজভেল্ট। তিনি নিগ্রোদের সুনজরে

দেখতেন। তাঁর কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই নিগ্রোরা নিউ ডিল বা নয়া ব্যবস্থার কথা শুনতে আরম্ভ করলো।

ততদিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে মেরী বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হুভারের আমন্ত্রণক্রমে তিনি ১৯৩০ সালে হোয়াইট হাউসে শিশুরক্ষা ও শিশুস্বাথ্যের সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেন। পরের বছরে তিনি গৃহনির্মাণ ও গৃহস্বত্ব সম্মেলনেও গিয়েছিলেন।

ঠিক কাজের জন্যে সঠিক মানুষ খুঁজে বার করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল রুজভেল্টের। মিসেস বেথুনকে তিনি বললেন জাতীয় যুবক পরিচালনা সমিতির উপদেষ্টা মণ্ডলীতে যোগ দিতে।

এই সংগঠনের আদর্শ ছিল দু'টি। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এমন আংশিকতার কাজে লাগানো, যাতে তারা নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে পারে। দু নম্বর উদ্দেশ্য, পড়াশোনা করছেনা এমন বেকার যুবকদের কাজ দেওয়া।

সেই এক অবিস্মরণীয় দিন যেদিন মেরী বেথুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসে দেশের সংখ্যালঘু জনসাধারণ সম্পর্কে জাতীয় যুবক পরিচালনা সমিতির কাজকর্মের বিবরণী পেশ করলেন।

ক্রীতদাসকণ্যা মেরী প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে বললেন, 'দক্ষিণের বহু জায়গায় পনের বিশ ডলারের চেকের মানে হাজার হাজার নিগ্রো যুবক যুবতীর বেঁচে যাওয়া। হাজার হাজার লোক অন্ধকারে ছিল এতদিন ,আমরা তাদের এনে দিচ্ছি জীবন আর প্রেরণা। মিঃ প্রেসিডেন্ট আমি এসব কথা বেথুন হিসেবে বলছিনা, যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মার্কিনবাসী পূর্ণ নাগরিক অধিকার চায়, আমি তাদেরই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। আমি চাই এদের অগ্রগতির দুয়ার খুলে দিতে।'

মেরীর ভাষণ শেষ হলে প্রেসিডেন্টের চোখের জল চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি মিসেস বেথুনের দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন।

বললেন, মিসেস বেথুন, আপনার জাতি যাতে আরো ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্যে আমি যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারি তাতেই আমি সুখী। আপনাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তাদের জন্যে সব রকমের সাহায্য করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করার অল্পদিন পরেই এন. এ. এ. সি. পি. তাঁকে এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। সংঘের সম্পাদক এক পত্রে তাঁকে জানিয়ে দিলেন—

২৯শে মে, ১৯৩৫

প্রিয় মিসেস বেথুন,

বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, 'স্পিংগার্ন মেডাল এওয়াড কমিটি' ১৯৩৫ সালে আপনাকে এই সম্মানের পাত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন।

... এ সম্মানের জন্যে আমি অপর সকলের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বশম্বদ
ওয়ালটার হোয়াইট
সম্পাদক

চিঠিখানা পড়ে মিসেস ধীরে ধীরে তা নামিয়ে রাখলেন। মনের ভেতরে রয়েছে তখনো সেই তুলার ক্ষেতের নগ্নপদ কর্মব্যস্ত মেয়েটি, যে মরিয়া হয়ে লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল আর স্কুলে যেতে পারবে শুনে অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করেছিল। ভাগ্য যখনই মেরীর উপর প্রসন্ন হতো তখনই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতো সেই ছোট্ট মেয়েটি তার অন্তরের মধ্যে। নতজানু হয়ে তিনি ধন্যবাদ জানাতেন বিধাতাপুরুষকে।

আজ ষাট বছর বয়স্কা সম্ভ্রান্ত মহিলা মেরী মৃদু হেসে ডাকলেন তাঁর সেক্রেটারীকে পত্রের জবাব লেখার জন্যে।

'স্পিংগার্ণ পদক' হলো বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদক। এ পদক প্রতি বছর এন. এ. এ. সি. পির তরফ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে কয়েক বছরের কাজ বিচার করে মার্কিণবাসী কোনো নিগ্রোকে। এই সম্মানে যাদের ভূষিত করা হয়েছে তাঁদের সবাই এক একজন দিক্‌পাল। বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার, গ্রন্থগার ও কূটনীতিজ্ঞ জেমস্ ওয়েলডন জনসন, নিগ্রোদের ইতিহাস আলোচনা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহাসিক কার্টার জি. উডসন. এ. এ. সি. পির কর্মকর্তা ওয়ালটার হোয়াইট, সুকণ্ঠী গায়িকা মারিয়ান এণ্ডারসন, শ্রমিকনেতা এ. র‍্যাণ্ডলফ, ভার্জিন দ্বীপের শাসনকর্তা উইলিয়ম হেস্টি, রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ ডাঃ পার্শি এন. জুলিয়ান, 'প্যান আমেরিকান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ডুবোয়া, জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন মধ্যস্থ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত র‍্যালফ্ জে. বাঞ্চ এবং আরো অনেকে ভূষিত হয়েছেন এ সম্মানে।

জুন মাসের শেষে মিসেস বেথুন সোনার পদকটি নেবার জন্যে হাজির হলেন সেণ্ট লুইসের সাধারণ সভায়।

পুরস্কার গ্রহণী বক্তৃতায় তিনি বললেন, ভ্রাতৃত্বের পথের শৃঙ্খল ভাঙ্গার কথা। শ্রোতারা তাঁর মর্মস্পর্শী বার্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। তাঁর লম্বা হাত দু'টো বক্তৃতা করবার সময়ে আরো এগিয়ে গেলো। ভারী মুখমণ্ডল দৃঢ় সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠলো।

"স্পিংগার্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিদের একজন হতে হলে, এই শুভক্ষণের উদ্দীপনায় সাধারণের প্রয়োজনে নিজেকে পুনরোৎসর্গ করতে হবে। নিগ্রোজাতির অগ্রগতির পথের বাধা দূর করবার জন্যে এন. এ. এ. সি. পির সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। পারস্পরিক সাহায্যই হচ্ছে জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল। সমাজ ও রাষ্ট্রগত ন্যায়বিচার পেতে হলে, বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বস্থাপন করতে হলে, আমাদেরও তাই করতে হবে। জাতির মধ্যে ঐক্য বর্তমান থাকার অর্থ শিক্ষা ও সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কৃতকর্মের শিকল সমাজের নিম্নতম ধাপ পর্যন্ত পেঁৗছে দেওয়া, যাতে নীচের লোকেরা সেটা ধরে উপরে উঠতে পারে। জনসাধারণের জীবনে যদি স্বপ্ন না থাকে, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।"

যতই তাঁর বক্তৃতার গতি ও আবেগ বাড়তে লাগলো উৎকর্ণ হয়ে ঝুঁকে পড়লো শ্রোতার দল সামনের দিকে। অনেকেই এই প্রথমবার শুনলো তাঁর বক্তৃতা। তাঁর আশ্চর্যজনক কাজকর্মের খবর শুনলেও তারা আগে কখনও তাঁর তেজময়ী ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়নি।

সেখানে সেদিন মিস জোসেফিন রস-ট্রেজারী বিভাগের সহকারী সচিব ছিলেন দ্বিতীয় বক্তা। তাঁর ভাষণ যখন শেষ হয়ে গেল তখন মঞ্চের উপর আনা হলো দু'টি ফুলের তোড়া। সে দু'টি উপহার দেওয়া হলো মিস রস ও মিসেস মেরীকে। প্রশংসা ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো সভাগৃহ। যেন এক স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁরা দু'জন, একজন সাদা আর একজন কালো।

'এন, ওয়াই, এ' গঠনে প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করেছিলেন জোসেফিন রস। সব সময়েই তাঁর নজর ছিল প্রতিভার সন্ধানে। সেন্ট লুইস সভার পর তার স্থির বিশ্বাস হলো যে, উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রাখার চেয়ে অনেক বড় কাজের উপযুক্ত লোক মেরী বেথুন।

মিসেস বেথুনের মন আনন্দে নেচে উঠল. প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়ে। অবহেলিতদের জন্যে আরো হয়তো অনেক অনেক কিছু করতে প্রেসিডেন্ট রাজী থাকবেন। মিসেস বেথুনকেই বা তিনি কতটা কাজ করার সুযোগ দেবেন?

ওয়াশিংটনে পেঁৗছে সোজা তিনি চলে গেলেন ইউথ এডমিনিস্ট্রেটর উইলিয়মস-এর অফিসে। হাসিতে ভরে উঠল তাঁর স্বাভাবিক বিরস বদন। তাঁর কাছে খবর পাওয়া গেল, প্রেসিডেন্ট এন. ওয়াই. এ-র একটা সংখ্যালঘিষ্ট শাখা খুলবেন। আর মিসেস মেরী বেথুনকেই হতে হবে তার পরিচালিকা।

দায়িত্বের বিপুলতা উপলব্ধি করে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মিসেস বেথুন। চমকে উঠে এক-পা পিছিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'কি করে আমি পেরে উঠব এতখানি? আমার কলেজ দেখাশুনা করতে হবে যে!'

জবাব এল, 'উপায় নেই, পারতেই হ'বে। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, যুক্তরাষ্ট্রে একজন নিগ্রো মহিলার জন্যে এ ধরনের পদের সৃষ্টি এই প্রথম?'

এই অভূতপূর্ব ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেসে উঠলো মিসেস মেরী বেথুনের মানসচক্ষে। আস্তে আস্তে চেয়ারে বসতে বসতেই রাজী হয়ে গেলেন তিনি এই প্রস্তাবে। জীবনে অনেক অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করেছেন। নিজের উপর আস্থা তাঁর যতদিন অটুট থাকবে, ততদিন এ কাজও পারবেন তিনি। আর এ কাজ তাঁকে করতেই হবে। কেননা, তাঁর পরে যারা আসবে, সেই সব নিগ্রো মেয়েদের জন্যে তাঁকে সে পথ তৈরী করতে হবে।

ওয়াশিংটনের নতুন চাকুরী তাঁর কাছে মনে হলো যেন বিধির আশীস। কারণ, এতে তিনি বেতন পাবেন। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হবার সাথে তিনি স্কুল থেকে নিজের বেতন নেওয়া বন্ধ করেছিলেন। আর সব শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতনও কিছু কিছু কমানো হয়েছিলো। তবু এমন সময়ও হয়েছে যখন কোথা থেকে যে কর্মচারীদের বেতন দেবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। এখন তাঁর বেতনের একটা মোটা অংশ তিনি ডেটোনায় স্কুলের জন্যে পাঠাতে পারবেন।

কাজের শুরুতে সকলেই তাঁর সংগঠন শক্তি কতখানি তা উপলব্ধি করতে পারলেন। কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের একজন উপযুক্ত মুখপাত্র রয়েছে জেনে ডেটোনার নিগ্রো জনসাধারণও আশায় মাথা তুলে দাঁড়ালো।

প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রেই এন. ওয়াই. এ-র একজন পরিচালক ছিলেন। মিসেস বেথুন সমস্ত দেশে নিগ্রোদের বিভিন্ন স্কুল ও কর্মপ্রচেষ্টাগুলো দেখে বেড়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাজের জন্যে জায়গাও খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

হাতে কলমে কাজ শুরু করবার পূর্বে তিনি সমস্ত নিগ্রো নেতাদের ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে ডাকলেন, যাতে তাঁদের সবার অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো যায়। পরে দশ বছরে নিগ্রো মেয়েদের নিয়ে তিনি যেসব কাজ সমাধা করেছিলেন, তার অনেকগুলোরই উৎস ছিল এই বৈঠক।

তাঁর পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল ছয় লক্ষ নিগ্রো ছেলেমেয়ে। এদের বিশ হাজার জনকে কাজে লাগিয়েছিল, এন. ওয়াই. এ.। খেলার মাঠ এবং পার্ক পরিস্কার, স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়েদের থাকবার জায়গা, স্কুলঘর তৈরী করা, রাস্তা-ঘাট মেরামত, বন-সংরক্ষণ প্রভৃতি বহু রকমের কাজই তারা করেছিল। তাদের গর্ব ছিল এই যে, তারা যা পাচ্ছিল সেটা খয়রাতি সাহায্য ছিল না, ছিল তাদের মেহনতের মূল্য। স্কুলের ছাত্ররা চাষ-আবাদ দোকানদারী, সবীন শিল্প, সেবা শুশ্রূষা, শিশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা লাভ করেছিল, সরকারী ব্যবস্থায় শুধু খাওয়া আর সামান্য মাহিনার বিনিময়ে।

ওয়াশিংটনের কর্তব্য ছাড়াও তাঁর এই ষাট বছর বয়সেও সারা বছরেই কাজ ছিল। এরমধ্যে কুড়িটির বেশী প্রাদেশিক রাষ্ট্রে পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল ভূখণ্ড

পরিভ্রমণ এবং চল্লিশের বেশী জনসভায় বক্তৃতা দান। এই ধরণের বাৎসরিক কর্মসূচী দশ পনের বছর ধরে অনুশীলন করেছিলেন তিনি ; এরই মধ্যে আবার ছিল বেথুন কুকম্যান কলেজ পরিচালনার সমস্যা সম্পর্কে ভেবে চিন্তে সমাধান হাজির করা।

ওয়াশিংটনের কুট-রাজনীতির চক্রে যখন এন, ওয়াই, এ'র ব্যয়-সংকোচন সম্ভাবনা দেখা যেতো তখনই মিসেস বেথুন রাজনীতিগতভাবে প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। একবার কংগ্রেস খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত করল। মনে হলো, এন. ওয়াই. এর গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্যে নির্ধারিত এক লক্ষ টাকা হাতে থেকে গেল।

অবিলম্বে মিসেস বেথুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে গেলেন তাঁর আপিসে। তাঁর জানা ছিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হয়তো ব্যস্ত। দেরী না করে খুব তাড়াহুড়ো করে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, এ টাকা বন্ধ করার কী সাংঘাতিক পরিণাম হবে। ক্রমশঃ তিনি এত ব্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন যে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে প্রেসিডেন্টের মুখের সামনে আঙ্গুল নেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভেবে দেখুন তো একবার যদি কংগ্রেসের কোনো এক কমিটির এই কাজের ফলে নিগ্রোরা তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ ভবিষ্যৎ নেতাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে আমেরিকার কী শোচনীয় অবস্থাই না হবে!'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ও রকম কর্কশভাবে কথা বলছেন এ কথা বুঝতে পেরে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়ে মাপ চাইলেন তিনি, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, হঠাৎ এতটা ভাবাবেগে অভিভূত হব বুঝতে পারিনি।'

সহানুভূতির সঙ্গে হেসে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'সে আমি বুঝতে পেরেছি মিসেস বেথুন। আমার মন আপনার দিকেই।'

পরের সপ্তাহে কংগ্রেস সম্পূর্ণ টাকাই মঞ্জুর করলো জাতীয় যুব-সংস্থার কর্মসূচীর জন্যে।'

চোদ্দ

'জাতীয় যুব-সংস্থা গড়ে ওঠার পথে গোড়ার কয়েক বছর তিনি সবচেয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে কুকম্যান কলেজ সৃষ্টিকারিণীর মাথায় তাঁর দ্বিতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা—'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নিগ্রো উইমেন' বাসা বাঁধল।

সারা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে প্রত্যেকটি প্রধান নিগ্রো নেতার সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি তাঁদের সমস্যা নিয়ে। অনেকগুলো সংগঠনের সন্ধানও পেলেন যা নিগ্রোদের উন্নতির জন্যে তৈরী হয়েছে। এদের অনেকে আবার অপ্রয়োজনীয় একই কাজে লিপ্ত ছিল। সব দেখে শুনে তিনি ঠিক করলেন যে, একটি সাংগঠনিক কেন্দ্রের প্রয়োজন, যেখানে নিগ্রোনারী এবং তাদের স্থানীয় সংগঠনগুলির কাজকর্মের অভিজ্ঞতা-বিনিময় সম্ভব হবে।

তিনি ১৯৩৫ সালে বারো কি তেরটি নিগ্রো নারী সংঘের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে ডাকলেন। তাঁদের সামনে তিনি হাজির করলেন ন্যাশনাল কাউন্সিলের পরিকল্পনা। সাধারণ নাগরিক জীবন, গীর্জা শ্রমকেন্দ্র, শিক্ষালয় প্রভৃতি সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে এতে। এর উদ্দেশ্য হবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিগ্রোদের জন্য সুযোগের সৃষ্টি করা। সেগুলো হলো তাদের বাসস্থানের উন্নতি বিধান, কাজের উন্নতর অবস্থা উচ্চতর জীবন যাত্রার মান, সমান শিক্ষা ও সুযোগ, নাগরিক অধিকার—যাতে অপকৃষ্ট জাতি বলে মার্কিণ নিগ্রোদের আর কেউ কোন বদনাম দিতে না পারে।

পরিকল্পনাটি মনে লাগল সবার। এবং দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। সভ্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো। শেষে এক বিশাল সংগঠনে রূপায়িত হলে এই সমিতি। আজ মার্কিণ দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রায় দশ লক্ষের মত নিগ্রো নারী এই সংঘের দ্বারা প্রভাবিত। বহু অসাধারণ এবং উচ্চশিক্ষিতা নারীকে জনকার্যে অনুপ্রাণিত করেছে এই সভা। তাঁদের মধ্যে নাম করার মতো হলেন ডাঃ ডরোথী বোল্ডিং ফিয়ারোবির—যিনি ছিলেন মিসেস বেথুনের চিকিৎসক আর পরে হয়েছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভানেত্রী। তারপর মিসেস এডিথ সামসন,—১৯৪৯ সালে উড়োজাহাজে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেন এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের বিকল্প প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিগ্রোদের মধ্যে তিন প্রথম এরকম উঁচু পদ পেয়েছিলেন।

কাউন্সিলের পয়লা দিনগুলো খুব সুখপ্রদ হয়নি। কারণ অন্যান্য বহু সমস্যার মধ্যে এদের কোন মিলনায়তন না থাকার সমস্যাটা ছিল প্রকট। টাকাও ছিল না বললেই হয়। তিনি শুনতে পেলেন, ওয়াশিংটন শহরের ভারমন্ট এভিনিউতে একটা বাড়ী বিক্রি হবে। মিসেস বেথুন আরো দু'চার জনকে যোগাড়

করে দেখলেন যে তাদের নিজের টাকা জড়ো করে ৮০০ ডলার দাদন হিসাবে দেওয়া যাবে। দশ হাজার ডলার আরো লাগবে। তিনি ঠিক করলেন, তৃতীয় মার্শাল ফিল্ডের কাছে টাকা চাইবেন। তাঁর দপ্তরে গেলেন তিনি। এই অক্লান্ত যোদ্ধা নারী আর ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অর্জিত কোটি কোটি টাকার উত্তরাধিকারী তৃতীয় মার্শাল ফিল্ডের মধ্যে কি আলাপ হলো তা' কেউই জানে না। এতো টাকা থাকা সত্ত্বেও মার্শাল ফিল্ড সমস্ত জীবন কঠিন শ্রম করেছেন। শিশুমঙ্গল এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর বেশ ঝোঁক ছিল। তাঁর নিস্বার্থ ভাব ফুটে উঠতো তাঁর ভাব ব্যঞ্জক সুশ্রী মুখে। মিসেস বেথুনের সঙ্গে এই আলাপে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছিলেন। সে যাই হোক না কেন, ঘণ্টা খানেক পরে বিজয়ের গর্বভরে ফিরে এসে মিসেস বেথুন বন্ধুদের সামনে বাড়িয়ে ধরলেন দশ হাজার ডলারের একখানি চেক।

'ন্যাশনাল কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার পরের বছর মিসেস বেথুন নিগ্রো জীবন ও ইতিহাস আলোচনা সংঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন। এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কার্টার জি উডসন নামে এক ক্রীতদাস-তনয়। তিনিও মিসেস বেথুনের মতোই অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসেবে, প্রথমে এক উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পরে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবসর সময়ে তিনি নিগ্রোদের ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা করতেন ও ইতিহাস লিখতেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে নিগ্রোদের সম্পর্কে লেখা বই কোন প্রকাশকই ছাপতে রাজী নন, তখন তিনি নিজে একটি প্রকাশনী-সংস্থা ও এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। মিসেস বেথুন এরই সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন ১৯৩৬ সালে।

সভানেত্রীর কাজ অবশ্য তেমন কিছু ছিল না, কারণ পরিচালক হিসেবে ডা. উডসন নিজেই বেশীর ভাগ কাজকর্ম করতেন। সংঘের সম্মান বাড়ালো অনেক যখন এর সঙ্গে জড়িত হলো মিসেস বেথুনের প্রাণ। অল্প আয়ের লোকদের মধ্যে তাঁর বহু অনুগামী থাকায় এই সংঘের কাজে এমন বহু লোকের সাহায্য পেলেন তিনি যারা অল্প অল্প দিয়ে প্রচুর অর্থ ঘরে এনে দিলেন। মিসেস বেথুনের নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত উডসনকে টাকার জন্যে নির্ভর করতে হতো কয়েকটি অর্থবান প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উপর, যেমন 'কার্ণেগী করপোরেশন', 'লরা শেলম্যন রকফেলার মেমোরিয়াল', আর 'রকফেলার ফাউণ্ডেশন।' মিসেস বেথুনের প্রভাবে টাকা পয়সা পাওয়ার পথ অনেক পাকা হয়ে গেল।

পরের বছর তিনি 'ড্রেক্সেল' পুরস্কার পেলেন। জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় লুইজিয়ানার নিউ অর্লিয়ানস-এ তাদের কর্মসূচীর আরম্ভেই মেরীকে 'সমগ্র মানব জাতির সেবা ও স্বজাতির উন্নতির জন্যে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদান ও আত্মনিয়োগের জন্যে' একটি স্বর্ণপদক দিলেন। জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি-

ষ্ঠিত হয়েছিল 'সিসটারস অব ব্লেসেড স্যাক্রামেন্ট' দ্বারা রেড ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোদের মধ্যে কাজের জন্যে।

মিসেস বেথুন ওয়াশিংটনে এন. ওয়াই. এ-র কাজ করতে করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে প্রভাবশালিনী মহিলাদের অন্যতমা হয়ে উঠলেন। নিগ্রোদের কাছে তিনি হলেন আলোর ধ্রুবতারা। নিগ্রোদের পারস্পরিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি, আর তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।

নিগ্রো নেতাদের সঙ্গে পয়লা বৈঠকের বিপুল কার্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি ঐ ধরনের আর একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন ১৯৩৭ সালে। এর নাম দিলেন, 'নিগ্রো জনতা ও যুব-সমস্যা বিবেচনার জাতীয় বৈঠক।' এই প্রচেষ্টার পেছনে সমর্থন যোগাড় করবার জন্যে তাঁকে অনেক বড় বড় জায়গায় যেতে হয়েছিলো। বৈঠকের প্রারম্ভিক অধিবেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন মিসেস রুজভেল্ট ও অব্রে উইলিয়াম। কমবেশী একশত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে। উৎসাহ বাণী পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

•

পনর

যেদিন মেরী তরুণ কর্মীর জীবনের বাঞ্ছা পূরণের অভিলাষ নিয়ে ডেটোনার কৃষ্ণ অঞ্চলে এসে স্কুলের উপযুক্ত স্থান পছন্দ করেছিলেন, তারপর থেকে একে একে পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। বেথুন কুকম্যান কলেজ একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত হয়েছে। ১৯৩৯-এ উচ্চ বিদ্যালয় বিভাগ আগেই আলাদা করে দেওয়া হয়েছিলো।

মিসেস বেথুনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন এখনো মিলিয়ে যায়নি, এখানে তাঁর মনে মনে পরিকল্পনা সৃষ্টির বিরাম নেই। লাইব্রেরীটি দরকার মতো বড় নয়। ঘরটি ছোট। বইও নেই বেশী। আরো লোকজন নিয়ে 'হ্যারিস্‌ রোড্‌স স্মৃতি-পাঠাগার' তৈরীর জন্যে কাজে নামলেন মিসেস বেথুন।

'রাগল্‌স্‌ অব রেড গ্যারো'র নাট্যরূপদাতা হিসাবে সবাই লেখক হ্যারিসন গারফিল্ড রোডস্‌কে জানত। বেথুন কুকম্যান কলেজের বন্ধু ছিলেন তিনি অনেকদিন থেকেই। তাঁর উইলের দ্বারা অনেক টাকাও তিনি দান করে গেছেন এর জন্যে জীবনে তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন খুব। সব সময়ে কারণ হিসেবে বলতেন, কলেজে দেবার মত সাধ্যমত টাকা জমাচ্ছেন।

বহুদিন ধরে চাঁদা তোলার পর শেষ পর্যন্ত নূতন লাইব্রেরী তৈরী হলো। নামকরণ হলো হ্যারিস রোডস্‌ এর নামে। এটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নিগ্রোদের জন্যে সব চেয়ে বড় ও পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরীগুলোর অন্যতম।

সেই স্মরণীয় বৎসরে আরো একটা বড় কাজ করেছিলেন তিনি। মেরী বেথুনের এক চিকিৎসক তাঁকে বলেছিলেন, তিনি নাকি 'অক্ষয়'। কিন্তু হঠাৎ সে বছর তিনি সবাইকে চমকে দিলেন এই কথা বলে যে, তাঁর অস্ত্রোপচারের দরকার হবে। বহু বছর ধরে হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন তিনি। বাল্টিমোরের জন হপকিনস্‌ হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করে স্থির করলেন যে, তার নাকের মধ্যে একটা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন সকলের এত সম্মানের পাত্রী, জাতীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী তিনি। তবু হাসপাতালে পা দেওয়া মাত্রই তাঁকে বর্ণ-বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হলো।

অস্ত্র-চিকিৎসা কিংবা সাধারণ ওয়ার্ডে নিগ্রোদের কোন কামরায় ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মিসেস বেথুনের জন্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগে একখানা ঘর খুঁজে দেওয়া হলো যদিও রোগের দিক থেকে তাঁকে সেখানে রাখার কথা নয়।

নিজের জন্যে মিসেস বেথুন কিছু বলেন নি। অন্যদের হয়েই অগ্রগামী হয়েছেন বরাবর। খোজ নিলেন, কোন নিগ্রো অস্ত্র চিকিৎসক আছেন কিনা। শুনলেন, হাসপাতালের প্রত্যেক ডাক্তার ও নার্স-ই সাদা।

তবু তিনি বললেন, "শহরের দু'জন নাম করা নিগ্রো ডাক্তার আছেন। তাঁদের অংশ নিতে বা দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেও কি অনুমতি দেবেন না ?"

তাঁরই জিত হোলো। ডাকা হলো দুজনকেই। তারপর থেকেই জন হপকিনস্ হাসপাতালে নিগ্রো ডাক্তার নিয়োগ করা হয়ে আসছে। বিধাতার প্রতি পরম বিশ্বাস সত্ত্বেও দেখা গেল, তাঁর ডায়েরীতে এই সময় থেকে একটা অসহায় ভাব এসে যাচ্ছে। যুদ্ধের মেঘ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে কোন সময়েই কেটে যায়নি। ইউরোপে ঘনঘটা জমে আসছিল কয়েক বছর ধরেই। ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের অধীনে যুদ্ধের প্রবণতা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে বাড়ছিল।

হিংসার বিষ কতদূর বাড়তে পারে উপলব্ধি করে কেঁপে উঠলেন মিসেস বেথুন। আবার কাজ করতে হবে আরো বেশী। আরো সভা, আরো চিঠি লেখা। তরুণদের উপর রাখতে হবে দৃষ্টি। হিংসায় উন্মত্ত যারা লড়তে হবে তাদের বিরুদ্ধে।

ষোল

ইউরোপে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার দৃষ্টি পড়তে লাগল তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে তাদের বৃহত্তম অংশ পিঙ্গল বর্ণ নিগ্রোদের প্রতি।

আমেরিকার কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলো। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের মতোই দক্ষিণের নিগ্রোরা দলে দলে চলে গেল উত্তরে নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট, শিকাগো, সানফ্রানসিসকোতে। কারণ, সে সব শহরে কলকারখানা রয়েছে।

দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যেকার বিশ বছরে নিগ্রোদের শতকরা ৯০ জন অক্ষর চিনতে শিখেছে। তারা নিজেদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তৈরী করেছে। হাজার হাজার গ্রাজুয়েট বেরিয়ে আসছে সে সব কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে। তারা আজ আর সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন চাষা নয় যারা সাদা মুখোস-পরা রাত্রিচর ঘোড়সওয়ার দেখে ভয় পেত। আজ তারা ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, মন্ত্রী, ব্যাঙ্ক মালিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও দক্ষ কারিগর। তারা চায় তাদের শিক্ষার ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা।

ওয়াশিংটনে এন, ওয়াই, এ-র আপিসে বসে মিসেস বেথুন বললেন, "সাদা-লোকের কাছ থেকে হাজার বছরের দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার ও প্রত্যাখানের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিগ্রোদের আমেরিকায় আসার তিনশত বছরেই শেষ হয়েছে। আজ তারা এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিতে। গতিপথের মোড়ে এসে গেছে তারা। আর সব মার্কিন অধিবাসীর সমান নাগরিক অধিকার পাবার জন্যে এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর পূর্ণ জীবন-যাপনের সুযোগ নেবার জন্যে আজ তারা নিজেদের প্রস্তুত করেছে। এখন গোলামীর তকমা দূরে ফেলে দিয়ে তারা সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। ... তাদের সামনে আজকের সমস্যা হলো জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার সমস্যা ... ।

এখন এ আর কোন গোপন ব্যাপার নয় যে, এখনো জাতীয় রক্ষা পরিকল্পনা থেকে বর্ণ-বৈষম্যের বাধা যতটা দূর করা উচিৎ ছিল ততটা দূর হয়নি যাতে নিগ্রো সমাজ ঠিক মত তার ভেতর জায়গা নিতে পারে।

মিসেস বেথুনের পুরানো ছাত্রদের একজন ছিলেন এ, ফিলিপ র‍্যানডলফ্। তিনি কুকম্যান ইনষ্টিটিউট এর সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে নিউইয়র্কে কার্যকরী প্রতিবাদ তিনি গড়ে তুলবেন ঠিক করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরীর কারখানাগুলোতে নিগ্রোদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া হচ্ছেনা। নিউইয়র্ক ও শিকাগোর কালো অঞ্চলে রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরে তিনি শুধু জিজ্ঞেস করে বেড়ালেন, ‘এ বিষয়ে আপনারা কি করবেন ঠিক করেছেন?’

তিনি দোকানী, ব্যবসায়ী, গৃহিণী ও ছাত্রদের সাথে বিস্তর আলোচনা করলেন। বার বার জিজ্ঞেস করলেন এই প্রশ্ন, ‘ঐ ব্যাপারে কি করা যায়? আপনারা কি যুদ্ধের অস্ত্র তৈরীর কারখানায় কাজ করতে চান? তা হলে আমাদের সরকারকে শুধু জানিয়ে দেওয়া দরকার যে নিগ্রোরা তাদের দেশের জন্যে জান দিতে রাজী। কিন্তু সাথে সাথে তারা চায় দেশের শিল্পে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জনের অধিকার।’

তিনি দেখলেন, সকলেই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বিপুল হয়ে উঠল।

উত্তেজনা বেশ বেড়ে গেল। তিনি তাদের বললেন, আমাদের ওয়াশিংটনে যেতে হবে। আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এ কথাটা জানাতে হবে যে, আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার চাই।’

ফিলিপ র‍্যানডলফের নেতৃত্বে ‘ওয়াশিংটন চলো’ আন্দোলন দ্রুতগতিতে বেড়ে চললো। এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব তাদের প্রথম গণ-আন্দোলনের প্রচেষ্টা; একে তাদের সফল করতেই হবে। এই অভিযাত্রী দল তৈরীর প্রচেষ্টা চার মাসের মধ্যে এতদূর শক্তিশালী হয়ে উঠলো যে, র‍্যানডলফ্ ও ওয়ালটার হোয়াইটকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক বৈঠকে ডাকলেন। তিনি বুঝতেন যে, তাঁদের প্রতিবাদ ন্যায্য।

র‍্যানডলফ্‌কে তিনি বললেন, ‘আপনাকে এখন এসব করলে চলবে না। আপনার আন্দোলন বন্ধ করুন।’

চতুর মজুর নেতা র‍্যানডলফ্ উত্তর দিলেন যে, বন্ধ করার জন্যে যদি একটা কিছু করা না হয়, তা হলে এ অভিযান চলবেই। অনেক ভেবে রুজভেল্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হলেন। সরকারী আদেশ জারী করে তিনি তাঁর ওয়াদা পালন করেছিলেন। এই হুকুম মতে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেকেই শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে নিযুক্ত হতে পারবে।

১৯৪১ সালের ২৫শে জুনের সরকারী আদেশ হলো আন্দোলনের বিজয় প্রতীক। র‍্যানডলফ্ ও তাঁর অনুসারীদের যখন এ খবর জানানো হলো, তখন তাঁরা অভিযান বন্ধ রাখতে রাজী হলেন।

ভয়াবহ ৭ই ডিসেম্বর। যে মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খবর পেৌঁছে গেল যে, পার্ল হারবারে বোমা পড়েছে, সেই মুহূর্তে থেকে মিসেস বেথুন মানব জাতির সেবায় নিজেকে আবার উৎসর্গ করলেন। তাঁর কাজের সময় দিলেন বাড়িয়ে, ঘুরতে লাগলেন আরো বেশী, স্কুলের জন্যে ভাবনাও গেল আরো বেড়ে।

অন্যান্য নিগ্রো কলেজের মতো বেথুন কুকম্যান কলেজেও বহু যুবক-যুবতী ছিল যারা উদগ্রীব হয়েছিল সৈন্যদল, কলকারখানা এবং দায়িত্বপূর্ণ অসামরিক কাজে যোগ দেবার জন্যে। তাঁর একান্ত কামনা ছিল এদের পথের বাধা অপসারিত করে দেওয়া। এন. ওয়াই. এ-র গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকায়, সারা দেশের যুব-সমাজ ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ও নানাবিধ কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। পার্ল হারবারের ধাক্কা আর তার পরেই অন্যদেশের একনায়কত্ব ও অত্যাচার বিলোপের জন্যে আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দেবার কথাবার্তায় স্বদেশের ব্যাপারে বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠল। নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারে দেশ বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল।

হুঁশিয়ার নিগ্রো নেতারা বুঝতে পারলেন দেশের হাওয়া কোন দিকে বইছে। ‘ওয়াশিংটন চলো’ অভিযানে যারা যোগ দিয়েছিলেন, সভা করে এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে তাদের তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেন। সময়মত কাজে লাগানোর জন্যে নিগ্রো নেতৃবৃন্দ তৈরী করে রেখেছিলেন তাদের। আমেরিকা যদি তার সংখ্যা লঘিষ্ঠদের থেকে সাহায্য লাভের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়, তারাও দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখাতে প্রস্তুত। তার বদলে তারা চায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ অধিকার। অধিকার চায় তার সেনাদল ও নৌবাহিনীতে যোগ দেবার আর যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরীর কারখানায় কাজ পাবার।

মিসেস বেথুনের তখন অবসর নেবার সময় হয়ে গিয়েছে। তবু এই বেঁটে মানুষটি যখন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁকে মনে হতো লম্বা আর অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। অন্যদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা তাঁর এমন যে তারা আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠতো, আর এমন জোরে চীৎকার করে উঠতো আনন্দে যে, ঘর পর্যন্ত কেঁপে উঠত।

সভার পর সভা করে চললেন তিনি। ওয়াশিংটন শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, সিনসিনাটি, টেনেসি, ন্যাসভিল, সর্বত্র। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে তিনি পেলেন টমাস জেফারসন স্বর্ণ পদক। জেফারসনের নীতি অনুসারে মানব সেবার ক্ষেত্রে কোনো বৃহৎ অবদানের জন্যে ‘কনফারেন্স ফর হিউম্যান ওয়েল ফেয়ার’-এর পক্ষ থেকে দেওয়া হতো এই স্বর্ণপদক।

কাজ কম করার জন্যে চিকিৎসকরা তাঁকে উপদেশ দিলেন। হাঁপানীর আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে চললো। কখনো কখনো হাঁপানীর অসহ্য আক্রমণ দু'ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতো। ফলে ক্লান্তিতে শয্যা নিতে হতো তাঁকে। ডাক্তারদের কাছে কথা দিতেন যে তাঁদের উপদেশ মাফিক চলবেন। আবার ভুলে যেতেন নিজের কথা। কত লোক প্রতীক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

যেখানেই তিনি যেতেন, এমন কি দক্ষিণ দেশেও, দেখতেন পুরোপুরি যুদ্ধ প্রস্তুতির আঘাতে সমস্ত বাধা অপসারিত হচ্ছে। সে সব বাধা কালোদের চেয়ে সাদাদেরই অসুবিধা ঘটাচ্ছিল বেশী। কখনও বা ইচ্ছা করেই তিনি কোন বৈষম্যমূলক আইন নিজের হাতে ভাঙতেন। বয়সের সঙ্গে অনেক অধিকারই আপনাআপনি তার হাতে এসে গিয়েছিল। যেখানে কোন নিগ্রো কোন দিন বসতে পায়নি, তিনি গিয়ে সেখানে বিনা বাধায় বসতে পারতেন।

একবার জর্জিয়ার আটলান্টা-হাওয়াই-আড্ডায় এক সাদা সেনানীর সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। এমন সময় এক নগররক্ষী এসে বললো, 'এখানে বসতে পারবেন না আপনি।'

জবাবে তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ। বেশ আছি এখানে।'

তরুণ সেনানীই অবশেষে তেড়ে উঠলেন, 'ওঁকে বিরক্ত করোনা। যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা লড়ছি, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ইনিও আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন।'

মিসেস বেথুন খোদাকে ধন্যবাদ জানালেন যে, এ কথাগুলো শুনবার জন্যে আজো বেঁচে রয়েছেন তিনি।

পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার পরের বসন্তে মার্কিণ কংগ্রেস সৈন্যদলে মেয়েদের বিভাগ খোলার জন্যে একটি আইন পাশ করলো। দুদিন পরে ঘোষণা করা হলো যে, টেক্সাস অঞ্চলের মিসেস ওভেটা কাল্প হবি তার পরিচালিকা নিযুক্ত হয়েছেন। প্রবল আপত্তি উঠল কয়েকটি নিগ্রো দলের প্রতিনিধি ও আইনসভার লবি থেকে। তাদের ভয়, তিনি দক্ষিণের লোক বলে নিগ্রো মেয়েরা যোগ দিতে এলে তারা ন্যায্য ব্যবহার পাবে না। নিগ্রো মহিলাদের জাতীয় পরিষদ যুদ্ধ দপ্তরের কর্মসচিবকে অনুরোধ করলো মিসেস বেথুনকে সহপরিচালিকা পদে নিয়োগ করতে।

টেক্সাসের এক ভূতপূর্ব গভর্নর পত্নী ওভেটা কাল্প হবি 'হাউসটন পোস্ট' এর কার্যকরী সহ-সভাপতি ছিলেন। নতুন যুগের লোক তিনি। পুরাতন বৈষম্যের দূরীকরণই চাইতেন। মিসেস বেথুনকে যখন 'এন. ওয়াই. এ যুদ্ধ দপ্তরের কর্মসচিবের বিশেষ সহকারী হিসাবে মহিলা সেনা বিভাগের নেত্রীপদের নিগ্রো প্রার্থী বাছাইয়ের জন্যে ধার দিলো, মিসেস হবি তখন তাঁকে খুব সহৃদয়তার সঙ্গে মেনে নিলেন। মিসেস হবি ও মিসেস বেথুন উভয়েরই আশা ছিল অনেক কিছু করবার। কিন্তু অচিরেই তাঁদের এক বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। বস্তুতঃই, মহিলা বিভাগও ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সেনা দলেরই অংশ। সাদা আর কালোর আলাদা আলাদা দল তৈরী করার ব্যাপার মেনে নিয়েছিলেন মেরী বেথুন। তবে নিগ্রোরা যাতে সাদাদের সমান ব্যবহার পায় তার জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন তিনি।

কোন ব্যবস্থা যদি তাঁর পছন্দ না হতো, তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রতিবাদ জানাতেন। উচ্চ পদস্থ লোকেরাও তাঁর অনেক কথা মানতেন। সাজসরঞ্জাম তৈরীর কারখানায় কোন নিগ্রো যুবকের উপর বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে দেখলে কিংবা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছেনা বুঝলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। আর তা' খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হতো।

মহাযুদ্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি বৎসরেও তিনি সব সময় একটি আশার আলো দেখতে পেতেন। আমেরিকার নৌ-বিভাগ থেকে যখন ঘোষণা করা হলো যে রান্নাঘরের খানসামার পদ ছাড়া অন্যান্য পদেও নিগ্রো নিয়োগ করা হবে, তখন মেরী বুঝলেন নবযুগের সাদা কালোদের মিলিত প্রচেষ্টার ফল ফলেছে। আরো দুই বছরের আন্দোলনের পর নিগ্রো মেয়েদেরও নৌ-দপ্তরের কাজে নেওয়া শুরু হলো।

হাজার মানুষ, যারা জীবনে কয়েক মাইলের বেশী বেড়ায়নি তারা যুক্তরাষ্ট্রের সব জায়গা থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিলো—উত্তরের লোক গিয়েছিল দক্ষিণের সেনা ঘাঁটিতে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে আর দক্ষিণের লোক গিয়েছিল উত্তরে। আমেরিকাবাসিগণ পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাওয়ায় নতুন ভাবে বোঝাপড়া হল তাদের মধ্যে। তার ফলে বিশ শতকের মার্কিণ মুলুককে অষ্টাদশ শতকের রীতিনীতি আর চললো না।

যুদ্ধের কাজে মিসেস বেথুন কতটুকু অংশ নিয়েছিলেন সেটা কারো জানার উপায় নেই, তাঁর কাজের কোন সীমা ছিল না। কাজের হিসাব নিতে গেলে আরম্ভ করতে হয় এন. ওয়াই. এ'র জমানা থেকে। তখন থেকেই তিনি গভীর দূরদৃষ্টি সহকারে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ও কারিগর তৈরী করেছিলেন ক্রিসপার এ্যাটাক্স্ উচ্চ বিদ্যালয়ের এন. ওয়াই. এ'র একটা শাখা একটা ঢালাই ও পেটাইয়ের আর একটা যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছিল তাঁর আগ্রহের ফলেই। যেসব যুবক সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পেয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে লেগে যায় লিঙ্ক বেলট কোম্পানীতে ট্যাঙ্কের চাকার টালি তৈরীর কাজে। নৌকা তৈরীর কাজে নিউ অর্লিন্স্ জর্জিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এন. ওয়াই. এ শাখার কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের লাগান হয়েছিল। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ চার্লসটনে বেতারবিদ্যুৎ কর্মীদের সম্পর্কেও তাই বলা চলে। ফ্লোরিডাতে জ্যাকসনভিলে বা টেক্সাসের হাউসটন ও ডালাসে তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ওয়ালটার হোয়াইট ও চ্যানিং মোবিয়াসের সাহায্যে তিনি হাসপাতালে তৈরীর জন্যে স্থাপিত এক বিশেষ সমিতিতে কাজ করেন। তাঁরা নিউইয়র্কে ও শিকাগোতে হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। একবার তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সাধারণ হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করে জনগণের মানসিক শক্তি, ভাব ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে।

মিসেস বেথুনকে কে আগে সম্মান দেখাবে তাই নিয়ে সাদা কালোর কাড়াকাড়ি শুরু হোতো। বেতারে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ, ভোজ সভার নিমন্ত্রণ, প্রশংসা পত্র, পদক প্রভৃতি সবরকম সম্মানই তাঁর জুটেছিল। ১৯৪৫ সালে ফ্লোরিডাতে তাঁরই সম্মানে ই. এ. ইউ. টি. সি. লোকেদের কুচকাওয়াজের সময় তাঁকে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে রয়েছেন মঞ্চের উপর ইন্জিনিয়্যারিং এভিয়েশন ইউনিটের শিক্ষা শিবিরের অধ্যক্ষ কর্ণেল আর. জে. বার্টের সঙ্গে। ঐ সেনাদলের এক ভোজসভায় পরে তিনি ছিলেন অতিথি। সেখানে তাঁকে এক বিশাল ফুলের তোড়া উপহারর দেওয়া হয়।

আঠার

যুদ্ধ বিরতির বহু পূর্ব থেকেই দুনিয়ার নানা জাতির নেতারা শান্তির ভিত্তি রচনা শুরু করেছিলেন।

১৯৪৫ সালের বসন্তকালের মধ্যেই জেনারেল ম্যাক আর্থারের সেনাদল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পুনরাধিকার করে ফেললো। ইউরোপে মিত্রশক্তির জয় আসন্ন। ইতিমধ্যেই ছেচাল্লিশটি জাতির সম্মিলিত চিরস্থায়ী জাতিসঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা বেশ অগ্রসর হয়েছে। এদের বৈঠক হবে সানফ্রান্সিসকোতে।

পৃথিবীর সব জাতির ভাগ্য নিয়ে যে বৈঠকে পরিকল্পনা তৈরী হবে, সে বৈঠকে যত বেশী লোক যোগ দিবে ততই মঙ্গল। তাই প্রত্যেক জাতির প্রতিনিধি মণ্ডলীকে সহায়তা করবার জন্যে অসংখ্য পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিনিধিরা তাঁদের মতামত ঠিক করবার ব্যাপারে সকল শ্রেণীর লোকের পরামর্শ পেতেন। আমেরিকার প্রতিনিধি মণ্ডলীকে সাহায্য করবার জন্যে বিয়াল্লিশটি সংগঠনকে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হলো। শ্রমিক, চাষী, শিল্প-সংগঠন, শিক্ষাব্রতী, বিভিন্ন ধর্ম-গুষ্ঠী প্রভৃতি সমাজের সব স্তরের লোকেরই প্রতিনিধি গ্রহণ করা হলো। এন. এ. এ. সি. পি'র তরফ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন ওয়ালটার হোয়াইট, বিকল্প প্রতিনিধি মিসেস বেথুন।

যুদ্ধ প্রচেষ্টারদ দায়িত্বের জন্যে তখন তাঁকে খাটতে হতো প্রচুর। আবার এ দিকে রয়েছে হাঁপানীর কষ্ট। হাঁপানীর জন্যে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্যে নতুন দায়িত্বের খবর পেয়েই তিনি ডাঃ ফিয়ারবিকে সঙ্গে নেবার অনুমতি নিলেন।

মার্শালের ওয়াইলী ও বিশপ কলেজে, অস্টিনের স্যাম হাউস্টন কলেজ আর ড্যালাসে বক্তৃতা দেবার জন্যে ছুটলেন টেক্সাসে। হাঁপানী রোগের বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনের ফ্রিডমেন হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ জেমস লাউয়েল হল তাঁর সঙ্গে গিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে বসতেন। তাঁর কাজই ছিল বিশ মিনিট পর মিসেস বেথুনকে থামাবার জন্যে সংকেত করা।

ড্যালাসে এক বন্ধুর বাড়ী থাকবার সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর খবর পেলেন মিসেস বেথুন। নিজেকে সামলে মিসেস রুজভেল্টকে তার করেই তিনি রাজধানীতে ফিরবার জন্যে বিমানে চড়লেন। পথের কষ্টে ক্লান্ত মেরী পৌঁছেই খবর শুনলেন যে প্রেসিডেন্টের মৃতদেহ পরদিন ওয়াশিংটনে আনা হবে আর সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকেই এক বেতার বক্তৃতায় যোগ দিতে হবে স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে।

হোয়াইট হাউসের পূবের ঘরে শেষকৃত্যের প্রার্থনাসভার আয়োজন হলো। সেখানে ছিলেন মিসেস রুজভেল্ট ও পরিবারবর্গ সোনার খাবে মোড়া চেয়ারে বসে আর নূতন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, ট্রুমান ও তাঁর পরিবার, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এন্টনী ইডেন ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা। আর সেই সঙ্গে ছিলেন মেরী মেক্যালিউড বেথুন।

শোকে সবাই আচ্ছন্ন। তবু ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সমস্ত পৃথিবীর নজর পড়লো ক্যালিফোর্নিয়ার উপর। আশা ও প্রার্থনার সঙ্গে তারা লক্ষ রাখলো, সানফ্রান্সিসকোর অপেরা হাউসে সমবেত চারশত প্রতিনিধি দলের দিকে যাঁরা তৈরী করছেন জাতি সংঘের সনদ।

মেরী মের্কালিউড বেথুনের সানফ্রানসিসকো যাওয়া মানে সারা দুনিয়ায় যত বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আসন গ্রহণ করা।

মানবাধিকার আর দখলীভূত উপনিবেশের অছি নিয়োগ বিষয়ক সমিতিগুলোর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। গভীর এবং সুদূরপ্রসারী জ্ঞানের জন্যে তাঁর সম্মান ছিল না, তাঁর আসল মূল্য বা সম্মান ছিল লোকের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতার জন্যে। যখন তিনি বক্তৃতা করতেন তখন সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। সত্যি তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শ্রোতাদের অপ্রকাশিত মনের কথা প্রকাশ করত। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী মন্ত্রণাকুশলী। পত্রলেখায় তিনি ছিলেন নিপুণা। কাজেই সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর অসংখ্য বন্ধুদের। পত্রের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর নেতৃবর্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু পূর্বেই। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে বর্মা, ভারতবর্ষ, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল আর কারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে লেখা বহু চিঠি ছিল।

মিসেস বেথুন, মিসেস হোয়াইট ‘এন. এ. এ. সি. পি-র তৃতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ডুবোয়া পশ্চিম উপকূলে গেলেন এই রকম একটা উচ্চশা নিয়ে যে, মানবাধিকার সংক্রান্ত একটা সনদ সমগ্র পৃথিবীতে প্রযোজ্য হবে।

সর্বশ্রেণীর লোক তাঁদের প্রভাব অনুভব করতেন, সম্মান করতেন তাঁদের। একটার পর একটা বৈঠকে যোগ দিয়ে তাঁরা সনদের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য রচনা করতে সাহায্য করলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বা যেসব নিগ্রোরা বৈঠকের মধ্যেই নিজেদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে আসতেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

মেরী রাষ্ট্রসঙ্ঘের শেষ অধিবেশন পর্যন্ত সেখানে ছিলেন না। তাঁর নির্ধারিত কাজ শেষ হবার পর নিজের বদলে আর একজন প্রতিনিধিকে সেখানে রেখে তিনি পূবে ফিরে এলেন।

ক্লান্ত ও অসুস্থ তিনি, ডাঃ ফিয়াররবির বাহুর উপর দেহের সবটা ভার রেখে ভারমন্ট এভিনিউতে অবস্থিত পরিষদ ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। অন্তর

হোয়াইট হাউসের পূবের ঘরে শেষকৃত্যের প্রার্থনাসভার আয়োজন হলো। সেখানে ছিলেন মিসেস রুজভেল্ট ও পরিবারবর্গ সোনার খাবে মোড়া চেয়ারে বসে আর নূতন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, ট্রুমান ও তাঁর পরিবার, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এন্টনী ইডেন ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা। আর সেই সঙ্গে ছিলেন মেরী মেকালিউড বেথুন।

শোকে সবাই আচ্ছন্ন। তবু ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সমস্ত পৃথিবীর নজর পড়লো কালিফোর্নিয়ার উপর। আশা ও প্রার্থনার সঙ্গে তারা লক্ষ রাখলো, সানফ্রান্সিস্কোর অপেরা হাউসে সমবেত চারশত প্রতিনিধি দলের দিকে যাঁরা তৈরী করছেন জাতি সংঘের সনদ।

মেরী মের্কলিউড বেথুনের সানফ্রানসিস্কো যাওয়া মানে সারা দুনিয়ায় যত বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আসন গ্রহণ করা।

মানবাধিকার আর দখলীভূত উপনিবেশের অছি নিয়োগ বিষয়ক সমিতিগুলোর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। গভীর এবং সুদূরপ্রসারী জ্ঞানের জন্যে তাঁর সম্মান ছিল না, তাঁর আসল মূল্য বা সম্মান ছিল লোকের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতার জন্যে। যখন তিনি বক্তৃতা করতেন তখন সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। সত্যি তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শ্রোতাদের অপ্রকাশিত মনের কথা প্রকাশ করত। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী মন্ত্রণাকুশলী। পত্রলেখায় তিনি ছিলেন নিপুণা। কাজেই সানফ্রানসিস্কোতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর অসংখ্য বন্ধুদের। পত্রের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর নেতৃবর্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু পূর্বেই। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে বর্মা, ভারতবর্ষ, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংহল আর কারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে লেখা বহু চিঠি ছিল।

মিসেস বেথুন, মিসেস হোয়াইট 'এন. এ. এ. সি. পি-র তৃতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ডুবোয়া পশ্চিম উপকূলে গেলেন এই রকম একটা উচ্চশা নিয়ে যে, মানবাধিকার সংক্রান্ত একটা সনদ সমগ্র পৃথিবীতে প্রযোজ্য হবে।

সর্বশ্রেণীর লোক তাঁদের প্রভাব অনুভব করতেন, সম্মান করতেন তাঁদের। একটার পর একটা বৈঠকে যোগ দিয়ে তাঁরা সনদের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য রচনা করতে সাহায্য করলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বা যেসব নিগ্রোরা বৈঠকের মধ্যেই নিজেদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে আসতেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

মেরী রাষ্ট্রসঙ্ঘের শেষ অধিবেশন পর্যন্ত সেখানে ছিলেন না। তাঁর নির্ধারিত কাজ শেষ হবার পর নিজের বদলে আর একজন প্রতিনিধিকে সেখানে রেখে তিনি পূবে ফিরে এলেন।

ক্লান্ত ও অসুস্থ তিনি, ডাঃ ফিয়ারবির বাহুর উপর দেহের সবটা ভার রেখে ভারমণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত পরিষদ ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। অন্তর

তাঁর আনন্দে আপ্লুত, মুখমণ্ডলে হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়েছে। যা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাতে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, যুগধর্মের গতি এগিয়ে চলেছে সাম্যের দিকে। কালো চামড়াদের পৃথক প্রবেশদ্বার আর পেছনের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার দিন শেষ হয়ে এল বলে।

তাঁর অন্তরের এই আশাবাদ আরো সমর্থিত হলো তিনটি বৎসর পরে যখন জাতিসংঘের সাধারণ সভা সমগ্র মানব জাতির মৌলিক অধিকার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো।

উনিশ

পুনর্গঠনের যুগ থেকে মিসেস বেথুন লক্ষ্য করে এসেছেন জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের বিবর্তন। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মার্কিন নিগ্রোরা সাহসের সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। তারা আজ রূপান্তরিত হয়েছে কৃষ্টি, মর্যাদা ও ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষে। তাঁর এবং অন্যান্য নিগ্রো নেতাদের মনে আজ এই আশা যে, আগামী পঞ্চাশ বছরে আরো অনেক কিছু বদলে যাবে। নিজেদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় তারা আরো বেশী করে অংশ নিতে পারবে আর সুযোগ পাবে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষা লাভের, সব রকম ব্যবসায় এবং বৃত্তিতে যোগ দেবার। কর্মস্থানে, গীর্জায় আর সমাজের সবখানে বর্ণ বৈষম্যমূলক রীতিনীতি হবে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাদাদের দুনিয়াতেও জাতিগত বিধিনিষেধ ভাঙতে পেরেছেন। তাঁর নানাবর্ণের সঙ্গীরা ভুলেই যান যে তিনি নিগ্রো।

তাঁর কাজের ছাপ কখনো মুছে যাবেনা ডেটোনা অঞ্চলের নিগ্রোদের উপর থেকে। সেখান তিনি জমিই শুধু উদ্ধার করেননি, মানুষকেও জাগিয়েছেন। বিসি শিবিরের পশ্চিমে কয়েক বছর আগে যেখানটায় ছিল অস্বাস্থ্যকর কতকগুলি ঝুপড়ি, আজ তার জায়গায় হয়েছে সারি সারি মনোরম অথচ কম খরচায় তৈরী বাড়ী। এ হচ্ছে মিসেস বেথুনের আর এক কীর্তি। নাম এর 'পাইন হ্যাভেন।' 'ওয়ার্ক'স প্রসেস এ্যাডমিনিসট্রেশন' বিভাগ থেকে যখন ১৯৩০ সালে টাকা দেওয়া হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এসেছিল নিগ্রো বস্তীর কথা। ঘর তৈরীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি ডেটোনায় এক বিরাট জনসভা আহবান করলেন। প্রত্যেকেই বস্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা চাইত, কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারত না এ সম্পর্কে আর কি করা যায়। অবশেষে মিসেস বেথুন তাঁদের বললেন একটি গৃহ-নির্মাণ সংগঠন গড়ে তুলতে আর এক কর্মসচিব নির্বাচন করে সরকারের কাছে টাকার জন্যে আবেদন করতে।

কম ভাড়ার এক সার বাড়ী উঠলো ১৯৩৮ সালে। এ বাড়ীতে ভাড়াটে বসানো হলো তাদেরকে যাদের আয় বার্ষিক ৩০০০ ডলারের কম। ভাড়া ঠিক করা হলো মাসিক দশ থেকে সাইত্রিশ ডলার। কয়েক মাসের মধ্যেই বাড়ীগুলো নিয়ে নিলেন এমন সব পরিবার যারা জীবনে কখনো বিজলী বাতি আর ফ্লাশের পায়খানা ব্যবহার করেন নি। এক বছরের মধ্যে তৈরী হল আরও ৬৬ সার বাড়ী। এখনও অনেক বাড়ী নির্মিয়মান অবস্থায় রয়েছে।

এবার তাঁর নজর গেল ডেটোনার সমুদ্রোপকূলে। সেখানে নিগ্রোদের কোন আমোদ-প্রমোদের জায়গা নেই। দু'চারজন প্রভাবশালী সাদা বন্ধুকে গিয়ে

ধরলেন তিনি। তাঁদের দিয়ে আড়াই মাইল জায়গা কেনালেন সমুদ্রের ধারে। আজ সেটা 'ভল্যুসিয়া সমুদ্রতীর পরিকল্পনায়' রূপায়িত হয়েছে। সেখানে তৈরী হচ্ছে নিগ্রোদের জন্যে বেড়াবার জায়গা। তাতে থাকবে গ্রীষ্মের থাকবার ঘর, স্নানের জন্যে চন্দ্রাতপ, শিবির আর হোটেল।

অপরাজিত মিসেস বেথুন এক নাগাড়ে বেশীদিন কখনো পরিষদ ভবনে থাকতেন না। কার্যোপলক্ষে প্রায়ই তিনি ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন রাষ্ট্রে। একবার তাঁর আমন্ত্রণ এলো, সাউথ ক্যারোলীনার কলম্বিয়া রাষ্ট্রীয় শিক্ষক সংঘের এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে হবে। দক্ষিণ ক্যারোলীনার দেশবরেণ্য সন্তানের বক্তৃতা শুনতে সংগঠনের সভ্যরা ছাড়াও শত শত লোক এসেছিলেন। সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো শ্রোতাদের করতালিতে। মঞ্চের উপর ছিলেন সাদা ও কালো উভয় জাতির নামকরা নেতারা। মিসেস বেথুনের বলা শেষ হলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক পাতলা গঠনের শুভ্রকেশী মহিলা এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে চুমো খেলেন। ইনি হলেন মিসেস বেথুনের মায়ের পুরাতন মনিবের মেয়ে মিস এসী উইলসন।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্লোরিডার 'উইন্টার পার্কে' 'রলিন্স কলেজ' থেকে মেরী 'ডক্টর অব হিউম্যানিটিজ' উপাধি লাভ করলেন। ইতিপূর্বেই আরো নয়টি কলেজ তাঁকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়েছিলেন।

তাঁকে এই সময়ে ডাক্তারেরা উপদেশ দিলেন একটু বিশ্রাম নিতে। তাঁর এখন সাবধান হওয়া দরকার। এ যে তাঁদের বৃথা অনুরোধ, তা তাঁরা জানতেন। কারণ, তখনই সরকারী অতিথি হিসাবে হাইটিতে ঘুরবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি।

১৯৪৯ সালের ১২ই জুলাই। 'রানী' মেরী বেথুন হাইটির রাজধানী পোর্টোপ্রিন্স-এ এসে নামলেন একখানি প্যান-আমেরিকান বিমানে। তাঁরপর শুরু হলো তাঁর কর্মসূচী অনুসারে বৈঠক, পরিদর্শন, নিমন্ত্রণ, আর শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ। প্রেসিডেন্ট এবং ম্যাডাম ডুমাসে এন্টাইম তাঁর সম্মানে একটি জমকালো সরকারী অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন জাতীয় প্রাসাদে। পররাষ্ট্র সচিবও তা-ই করলেন। এক মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করলেন মার্কিন দূতাবাস। গ্রামে গিয়ে তিনি স্কুল, খামার, অনাথাশ্রম আর শিশু পালনাগার দেখলেন। হাইটি ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ঘটনা হলো ওখানকার 'অনর অব মেরিট' উপাধি লাভ। সে হলো সাদা মিনা করা একটি ক্রুশ, যার মাঝখানটা হচ্ছে নীল রংয়ের।

সে বছর শরৎকালে তিনি তাঁর নিজের হাতে গড়া ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নিগ্রো উইমেন-এর সভাপতি পদে বসিয়ে দিলেন ডাঃ ডরোথি বোল্ডিংকে চৌদ্দ বৎসর ধরে সভানেত্রীত্ব করবার পরে। এটা ছিল কাউন্সিলের চতুর্দশ বার্ষিক সভা। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, 'মানব জাতির সম্পর্কের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর নাগরিক হওয়া।' ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এই সভায় বহু মণীষীর সমাগম হয়েছিল। তিনদিন ধরে সভা চলে। ওয়াশিংটন গভর্নমেন্টের শ্রমবিভাগের

মিলনায়তনে শেষ অধিবেশন হলো খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেদিনের সেই সভাকে মিসেস বেথুন রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বার্ষিকী স্মরণে আখ্যা দিলেন 'আন্তর্জাতিক রাত্রি'।

সামনের দুই সারি ভর্তি নানা দেশের রাষ্ট্রদূতাবাসের লোকে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, বরাবর যিনি এরকম সভার কর্মতালিকার চাপে পড়ে দেরীতে এসে আগে চলে যেতেন, তিনিও সাড়ে আটটায় এসে সমস্তটা সময় উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বেথুন এবং নব-নির্বাচিত সভাপতির সঙ্গে ছিলেন ডাঃ রালফ্ বাঞ্চ, মরিস জে, টুবিন, শ্রম-দপ্তরের কর্মসচিব অব্রে উইলিয়মস্ এবং অন্যান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

সেই রাত্রিতে সভার পরিচালনার সময় মিসেস বেথুন তাঁর জীবনের নভোবিন্দুতে এসে পৌঁছালেন। দীর্ঘ মখমলের কালো গাউন পরা মেরী বরফের মত সাদা চুল চক্‌চক্ করছে টেলিভিশনের তীক্ষ্ণ আলোয়। গলায় ঝুলছে হাইটির সোনার ক্রশ। কাঁধের উপর সাদা গার্ডেনিয়া ফুলের গোছা। তাঁর সেদিনের ভাষণ সারা দুনিয়ার লোকে শুনলো 'ভয়েস অব আমেরিকা' বেতারের মারফত।

সেই বক্তৃতাতে তিনি বলেছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কে। তাঁর নামকরা শ্রোতাদের তিনি সাবধান করে বললেন, 'দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে আমাদের অগ্রগতি মন্থর। কিন্তু তা' বলে আমরা যেন ধৈর্য না হারাই।'

পঁচাত্তর বছর যেবার পূর্ণ হলো, সেবারকার জন্মদিনে আইনসভার সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, গীর্জার পাদ্রী, বিজ্ঞানী, শ্রমিকনেতা, ব্যবসায়ী—এমনকি চাষীরা পর্যন্ত তাঁকে তার ও পত্র মারফত অভিনন্দিত করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁদের শুভার্থী বলে মনে রাখেন। পরের বছর তিনি ট্যাম্পার সেন্ট্রাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

বড় বড় লোকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। কিন্তু তা বলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। গরীব দুঃখীর জন্যে তিনি ছিলেন জননীশাদৃশ্য। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ ক্যারোলীনার মেয়েসভিলে তিনি একবার বেড়াতে এলেন। এসে চাষীদের কেবিনে থাকলেন। তাতে অসুবিধা হলোনা তাঁর একটুও ; প্রেসিডেন্টের গৃহেও যেমন তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সেই ধূলাভরা পথ! এ পথে কতবার স্কুলে গিয়েছেন তিনি! সেই তুলোর মাঠ! দিনে আড়াই শো পাউন্ড পর্যন্ত তুলো তুলেছেন তিনি সেখানে। তাকিয়ে দেখলেন, সেদিকে ম্যাকলিউডদের কেবিন বাড়ী বিলীন হয়ে গেছে কালগর্ভে। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ডুমুর গাছ। তারপর মিস উইলসনের তৈরী সেই স্কুলে গেলেন, যেন তীর্থযাত্রী। দুঃখ হলো তাঁর স্কুল ঘরের সংস্কারহীন ভাঙ্গা-চোরা অবস্থা দেখে। ষাট বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মেয়েসভিলে নিগ্রো ছেলেমেয়েদের জন্যে এই একটাই স্কুল।

পাকাচুলওয়ালা মাথাটা নাড়লেন একবার। এখনো অনেক কাজ বাকী রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য বর্তমান। মাথা গুঁজবার ঠাই নেই সবার। আর রয়েছে দারিদ্র্য।

আগেকার যুগের ক্রীতদাস-মনিবদের শ্বেত প্রাসাদগুলোও আর চোখে পড়েনা। সে সবের যুগ আর নেই। আগের দিনের উইলসনের বাড়ীর উঁচু বিরাট থামগুলি দেখে মনের মধ্যে তাঁর কী সম্ভ্রমই না জাগতো!

উইলসনের নাতি-নাতনীদের খেলাঘরের কথা মনে হতেই তিনি বুঝতে পারলেন. এখনো তাঁর হৃদয়ে সেই একই প্রার্থনা বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছে ঃ

"হে পরম দয়ালু, সেদিন যেন আসে, যেদিন পৃথিবীর কোনো শিশু এমন কথার জ্বালায় জ্বলবেনা। যেদিন কাউকেও শুনতে হবেনা, "রেখে দাও বই। তোমার আবার পড়া।"

Mary Mc Leod Bethune (condensation) by Catherine Owens Peare. Original title in English published by Vanguard Press, N. Y.

Copyright, 1951, by Catherine Owens Peare.

কবিতা

কবিতা

- শোকার্ত মায়ের প্রতি
- গল্পের বই নয় পড়ার বই
- বেশ ভালো জীবন
- স্কুল জীবনের পর
- মনে মনে
- বিগত বসন্তে
- আশা করি অনেক কিছু
- সমিল স্বচ্ছন্দ কবিতার খ্যাতির প্রশংসায়
- আমরা কথা বলছি
- খুব বেড়িয়ে ফিরি
- কয়েকটি করে গান শোনা
- যদিও সন্ধ্যা মেঘে
- সুমহান কথাগুলি
- ফিরে চাই
- গল্প বলার আসর
- শীতের সময়ের জন্য
- প্রথম কথা
- সামনের দিকে
- কাছেই কোনখানে, একটি বন্ধুর বিরহে, বাজানো
- কি আশ্চর্য এই জীবনের গতিধারা
- জনান্তিকে, নয়ারূপে

শোকার্ত মায়ের প্রতি

মায়ের কাছে লেখা জনৈক রাজবন্দীর চিঠি
চট্টগ্রাম জেল : ২৫.১.৫১

[শহীদ সাবেরের 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি সরদার ফজলুল করিমের বন্দী জীবনের খাতায় পাওয়া গেছে। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময় তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়। করিম সাহেব কবিতাটি ছাপানোর জন্য দিয়েছেন।]

মাগো, মা আমার কাঁদছ তুমি ?
আমাকে একবার দেখো
দেখো, আমি স্থির, অটল, চোখের পাতাটি নড়ছেনা
চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই
কারা প্রাচীরের আড়ালে, লুকিয়ে আনা বইটি।

এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে
সেতো তোমারি ছবি মাগো
সবে দশের পাতায় হাত দিয়েছি
ভেসে উঠেছে আমার মনের পর্দায় অলগা মায়ের ছবি
মাগো কি শীত এখন ! তোমার গায়ে কেবল একটি জামা
কি তুষার পড়েছে এবার ! এ যে রক্তহীন মৃত্যুর ঋতু
এমন দিনে মৃত্যুর দেবতারা মুক্ত
চারদিকে রক্ত জমানো হিমেল মৃত্যু
আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমান্ডারের সামনে।

মাগো ক্যাপ্টেন ভের্গের কি বুঝবে বলো
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে—
পররাজ্য লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা
গতকালকে রাতে তুমি যে স্বহস্তে দিয়েছ উড়িয়ে
ইউক্রেনের সেই পুলটি
জার্মানদের দেবেনা মাগো এক ইঞ্চিও সব হারাদের জমি
মাগো তুমি পণ করেছ, জবাব দেবেনা
স্বস্তিকাধারী পশুর সওয়ালের।
মাগো দিওনা, দিওনা।

মাগো ইউক্রেনের বাচ্চা ছেলেরা
তাদের অলগা মাকে কখনো ভুলবেনা
মাগো তুমিতো তাদের মা
স্বর্গাদপী গরিয়সী

তাদের কথা তুমি জার্মানদের বলোনা
মাগো কিশোর গেরিলাদের জীবন মরণ করছে নির্ভর
তোমার একটি কথার উপর।
গেরিলারা কোথায় ? উত্তরে ? পূবে ?
কোন্ দিকে, কোন জঙ্গলে ? বলোনা, বলোনা।
বলো শুধু তারা সারা দুনিয়ায়।
মাগো তুমি পারছোনা দাঁড়াতে আর
তোমার পেটে যে সন্তান

তুমি যে গর্ভধারিণী মাতা আরো একটি শিশুর,
ওকি ! ক্যাপ্টেন ভের্ণের তোমার গায়ের কাপড় তুলছে !
দেখতে চায় সে তুমি সন্তানবতী কিনা ?
দেখুক, দেখুক, প্রাণ ভরে দেখুক ভের্ণের
লজ্জা কিগো অলগা মা
তুমি যে আছ বহন করে সব হারাদের আর একটি সেনা
মাগো, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তোমার
মুখের মাংসপেশী কী ভীষণ পুরুষালী
না, না, বলবেনা আমার অলগা মা
দেখনা ক্যাপ্টেন যাচ্ছে চলে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার
সেই হাড়কাঁপানো শীতের রাতে, সেই দুঃসহ শীতে
তুমি উলংগ, মাগো, তুমি উলংগ
সেই বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তুমি
চলেছ হেঁটে মাগো, পেছনে বেয়নেটের ডগা
ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার
দস্যুরা হাসছে মাগো, মাতৃমূর্তির নগ্নতায় ;
তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মাগো
খোঁচায় খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত তোমার শরীর
কি যন্ত্রণা মাগো, তবু বলবেনা, বলবেনা
তারপর তুমি সেই ঠাণ্ডা ঘরের মাঝে
যখন হু হু করে পড়ছে শীত দরজা জানালা বন্ধ

কেবল জার্মান শান্ত্রীর কলুষিত চোখ চেয়ে আছে
তোমার পবিত্র মাতৃমূর্তির দিকে
তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারুণ যন্ত্রণা বলো
একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ড ঃ আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে
কাঁদছে শিশুটি পৃথিবীকে প্রথম স্পর্শের আবেগে
কেউ কোথাও নেই। কেবল দু'টি শান্ত্রীর হাসি ভরা চোখ
তুমি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ে নিলে নাড়ী।

তারপর ভের্ণের ডেকেছে তোমায়
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে
ঐ তো শিশুটি ফেরাউনের পিছনে
অলগা মা আমার বলবেনা কিছু
শয়তান তোমার ছেলের জান কবজের দিক হুমকি
মাগো তুমি, মা—তোমার একটি কথার পরে
করছে নির্ভর অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী বলবেনা একটি কথাও।

দুনিয়া কাঁপছে মাগো অলগা মা
তোমার চোখের সামনে তোমার সদ্যোজাত শিশু
সুন্দর—কাঁদছে—ক্যাপটেন ভের্ণের
আবার শুধাক প্রশ্ন ঃ গেরিলারা কোথায়
তুমি নিরুত্তর থাক। পিস্তলের নল আসে
তোমার কলিজার বোঁটা ঐ শিশুটির বুকে
চোখ বোজ, দুনিয়া ঘুরছে, তোমার চোখের সামনে
চোখ বোজ, কানে দাও তালা—পিস্তলের আওয়াজ শুনো না—
পরক্ষণে দেখগো তাকিয়ে—তোমার আপন সত্তার
একাংশের অপমৃত্যু।
তারপর আবার সেই অন্ধকার রাত আবার বরফ জমানো মাটি
আবার উলংগ শরীর, এখন তোমার সামনে বরফের খাঁদ

জার্মান বেয়নেটের ডগায় মা তুমি প্রাণ দিয়েছ
ইউক্রেনের তুহিন সেই নাৎসী অধিকারের দিনগুলিতে
অনশন, লজ্জা সব কিছুকে তোমার দিয়েছে ঢেকে

মৃত্যুর কালো বোরখা ;
তবুওতো তুমি বেঁচে আছ মাগো ঃ শহীদ মায়ের মৃত্যু নেই
মাগো তুমি এখনোত আছ তোমার সন্তানদের স্মৃতিপটে।
মাগো, ইউক্রেনের মজলুম অলগা মা
আমি তো তোমার আর এক সন্তান
দূরে বহু দূরে খোরাশন বোখারা পেরিয়ে
হিন্দুকুশ, খাইবার সিন্ধু, বিপাশা, শতদ্রু
তারপর বঙ্গোপসাগরের পারে
জন্মেছি সে তো তোমারই পেটে মাগো
সারাদুনিয়ার নির্যাতিত মায়েরা এক।

অলগা মা আমার, প্রাণ দিয়েছ খুনীদের হাতে
আর দেখ আমি কারাগারে
মাগো তুমি কেঁদোনা, কেঁদোনা
আমার জন্য কেঁদোনা, দেখ দেখ
আমি স্থির অটল, আমার হাতের মুঠাতে গুঁজে দেওয়া
নিষিদ্ধ জগতের এই লাল ইশতেহার

মাগো আরতো সহেনা প্রাণে তোমার নির্যাতন
নাচোলের কৃষক রমণী মা ...
ভাংগা বাংলার লীগ নাৎসী অত্যাচারিতা ইলামাতা
বাংলাদেশের নুরুল পীড়িতা তুমি অলগা ইলামাতা
তোমার জবানবন্দী এসেছে হাতে
নাৎসী কাঠ গড়ায় ডিসিট্রভের জবান বন্দীর মতো ঃ
                    বারুদ ঠাসা
খোদার আরস কাঁপানো কী ভীষণ তোমার জবানবন্দী মাগো !
মাগো, তুমি সেই অলগা মাতা
ইলা মাতা পূর্ব বাংলার
বৃটিশ রাজার বানানো ফাঁড়িতে
                    লীগ সরকারের নাৎসী শান্ত্রীরা
তোমাকে আনলো ধরে আর এক শীতের দিনে
নতুন ভের্নের বড় দারোগা পশু
আবার জিজ্ঞাসা শুরু
বিদেশীরাজের গোলামী পীড়িত উত্তরবঙ্গ
ডলার রাজের গোলামী পীড়িত পাকিস্তান
নুরুল লিয়াকত খড়গ ঝোলে

জমিভুখ কৃষকের কাঁধে তাই
জমি দখলের লাগি যারা লড়ে
তারা কোথায় ? তারা কোথায় ?
ইলামাতা বলবেনা তা
দারোগা তোমায় যতই ভয় দেখাক বলাৎকারের
সে তো তোমার একার লজ্জা নয়কো মা
পশুরা তোমাকে মেরে মেরে ভীষণ বাঁশ ডলার পর
হাত পা ভাঙলো সে কারা

তোমার সন্তানেরা তাদের রাখবে চিনে ইলামাতা ...

গল্পের বই নয় পড়ার বই

বই পড়ার অনন্দের মতো আনন্দ গান
স্তব্ধতার গভীর থেকে উৎসারিত যে সঙ্গীত।
চাপা ঠোঁটে উচ্চারিত কয়েকটি কথার মত ধ্বনি
আমাদের প্রত্যাশিত দিনগুলি আর চাপা থাকল না।
লিখতে না বললেও আর লিখবার কিছু থাকল না।
আত্মার প্রশান্তিতে সমুজ্জ্বল কয়েকটি দিন।
মিষ্টভাষ্য মানুষের কথার মত মহান সত্য
জীবনকে পরাতে করেনা কিছুই
আমরা বেঁচে আছি গ্রাস আচ্ছাদনের জন্যে
কি অপার আনন্দ।
যদিও ভগবান জানেন কিসে কি হয়
আমি জানি আমাকে ভাল থাকতে হয়
প্রিয় বইটি দেখতে পাওয়ার মত
সুন্দর দিনটি ফিরে চেয়ে নিজে
অজানা কারণে বেঁকে বসতে
চাইনা আমি আর কোনদিনও।

সংবাদ
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭
রবিবার

বেশ ভালো জীবন

কি সুন্দর সকাল
শীতে
অপূর্ব এই নগরীর পরম আরামের বাসগৃহগুলি
আমার দিয়েছে শান্তি
যেন আমি যা চাই তাই পেয়েছি
আর ব্যস্ত নয় আমার দিবস যামিনী।
কথারা পেয়েছে মুক্ত সঠিক অর্থপূর্ণতায়
সুনির্দিষ্ট জীবনের অপার মহিমা
এখানে পৃথিবীর সব পথ-ঘাট জানা আছে
জীবনের মত অগাধ বিশ্রাম
আমি আর কোথাও যেতে চাই'না
কবি স্বভাবের জন্যেও নয়।
হয়তো খ্যাতির মিনার বলতে যা বুঝায়
এ হয়তো তাই, অপেক্ষা রাখেনা অন্য কোন জীবনের
বেশ ভালো জীবন।

সংবাদ
২রা এপ্রিল, রবিবার
১৯৬৭

স্কুল জীবনের পর

সেদিনকার সেই সান্ধ্য আসরটি ভালো হয়েছিল
গানগুলি যেন ফরমায়েসী একটি সন্ধ্যার জন্য
যে সন্ধ্যায় সবাই গান গাইবে
প্রয়াসহীন সরলভাবে গীত কয়েকটি সঙ্গীত
সাফল্যের দাবী প্রোগ্রামকে বিলম্বিত করেনি
অথবা দীর্ঘরাত্রি প্রতীক্ষার মত বাৎসরিক
সাধনার সযত্ন লেখা অপরূপ কোন অদ্ভুত
আলাপ, তাও নয় উদ্যোক্তাদের কিছু কাজ
হামেশা যা হয়ে থাকে প্রত্যাশিত গতানুগতিকতা
কয়েকটি গান সত্যই সঙ্গীত হয়েছিল।

•

সংবাদ
৯ই এপ্রিল, রবিবার
১৯৬৭

মনে মনে

আজ স্থির জলরাশি অবিচল থাকল
বন্ধুত্বের তরঙ্গে কোনো ভাটা পড়ল না
হৃদরে খ্যাতি আমায় মাতালো মনে
সত্যিই অনেক কিছু ভাবার অবসর

পাশাপাশি কিন্তু দূরে নয় এমন সঙ্গীত
দুই একটি কথা জানা থাকলেও
সব কিছুই জানা আছে এমন মনে করবনা
কথার পর কথা সাজিয়ে অনেকটা এগুলো
প্রায় বিস্মৃত কয়েকটি ছত্র ভাষা পেল
ছবি দেখার মত শান্ত মনে অপেক্ষা করার তাগিদ।

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা
একুশের সংকলন
১৯৬৮

বিগত বসন্তে

দুই একটি দিনের কাব্য উপলব্ধি
সান্ত্বনাবানী বয়ে আনতে পারে মানবে জীবনে
একেবারে কোনদিনই কিছুই না পড়ার মত অবিচল
আমি বই পড়ি প্রতি বসন্তে শীতে
সহার হোল লেখাপড়ার জীবন
লিখে লিখে সময় অতিবাহিত করতে।
গীতধর্মী রচনার বিপুল আয়োজন সমাপ্ত হলে
আত্মকথার মত জগতের দুয়ার খুলে দিতে
অল্পকথার উপন্যাস মনের খোরাক
বিজ্ঞান আন্তর্জাতিকতা যুগান্তের আলেখ্য
গ্রহ নক্ষত্রদের স্থিরতা ও ভ্রমণশীলতার
কিছু চিত্র সংগ্রহ বিশেষ সাক্ষাৎকারের
পূর্বে ও পরেকার ঘটনার ধারাবাহিকতা
আনন্দ দেয় রেস্টুরেন্টার, হাওয়াই
পৃথিবীর ভদ্রলোককে, আর গড়ে তোলে
গদ্যাতীত কোন দর্শকের তীর্থ
প্রতি মুহূর্তের প্রেরণার মধ্যেই প্রতিটি
সাফল্য নিশ্চিত কাঠামো আরো
বেশী চঞ্চল করে তোলে সর্বদা।

২রা জুন, ১৯৬৮
দৈনিক পাকিস্তান

আশা করি অনেক কিছু

আজও নয় কালও নয়
এমন একটি সুন্দর শুরু
কাছাকাছি ভাল লাগবার মত
অনেক কিছু ছিল, তবু
মনে মনে ভেবে দেখেছি
হয়তো ওদিকে নতুন কোন
সম্ভাবনার ইঙ্গিত। কি আশ্চর্য্য
এই মুহূর্তেই মনে হয়, আমার
কাছাকাছি পৃথিবী কি অদ্ভুত
ভাল লাগবার মত।

সংবাদ
৭ই জুলাই, রবিবার
১৯৬৮

সমিল স্বচ্ছন্দ কবিতার খ্যাতির প্রশংসায়

মহৎ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়ে দর্পণে মিলায়
গান হয়ে বাজে নির্ঝরের প্রবাহে, জলে ;
চির নতুন বাণীর সত্যও আলোক বিলায় ;
স্মৃতি হয়ে দোলে ;
কিন্তু নিশব্দতার মধ্য থেকে মুক্তোর মত চিত্র নেয়া
উল্টে পাল্টে ভাস্বর করে তুলে দেওয়া,
নিজের কল্পনার পটে কখনো তুলিতে নিপুণভাবে সাজায়।
কথাগুলে, এমন অনেক গল্পও চিরকাল মানুষকে
আনন্দ দেয় দিন ও রাত্রির প্রতিপলে !

•

নির্ঝর
একুশের সংকলন, ১৩৭৫

আমরা কথা বলছি

অনেকগুলো তারার মধ্যে
একাকী উজ্জ্বল একটি তারা
শান্তির প্রচ্ছায়ে আলোর শিখার মতো
নয়া বন্ধুত্বের প্রারম্ভ।
নতুন পথের ইশারায়
উত্তীর্ণ হল কাব্য গাথা
আমাদের মনে এল অনেক কথা
আমরা কথা বলছি।

একুশে স্মরণে
একুশের সংকলন
১৯৬৯

খুব বেড়িয়ে ফিরি

আমি এবার কিছু কিছু বইপত্র পড়ছি
পড়বার চেষ্টা করছি।
চারদিকে গীতালি ঝংকৃত আলাপ
সময়ের বেড়া পার হয়ে আমি
পর্বত কন্দরে গেয়ে সন্ধ্যার
পাখী। তোমার নামটা কত জেনে
ফেলেছি অপেক্ষায় অপেক্ষায় থেকে।

সংবাদ
২২শে জুন, ১৯৬৯
রবিবার

কয়েকটি করে গান শোনা

দুই একটি গান নয়
অনেকগুলো কথা সমন্বিত সঙ্গীত
কাছেই আমি থাকি, কখনো আরো
বেশ আগ্রহ আমার হয়, কিছু জানতে
কিছু বুঝতে।
আমি মনে করি এতে ওতে কিছু
নেই যা আমাকে ভাবাতে
পারে। মনে হয় আগের মত সব
কিছু সহজ এবং চলন সই গোছের।

সংবাদ
২৯শে জুন, ১৯৬৯
রবিবার

যদিও সন্ধ্যা মেঘে

মনোমত করে লেখা হয়তো সহজ। কেউ
যে মনোমত করে লিখতে পারে তা
স্বাভাবিক। ভালো লিখলে আমরা
আনন্দ পাই। আমাদেরও ইচ্ছা করে
লিখতে। আমরা মনে করি লেখার
মধ্যে আনন্দের উৎস আছে। যা
আমাদের সব সময় সজীব রাখে।
আমরা অনেক বেশী আশান্বিত
হই এবং আমাদের
পাশে আমাদের পরিচিত বন্ধু

আত্মীয়দের নিকট
সান্নিধ্য উপভোগ করি। এইভাবে
আমরা আগের সুখকর পরিবেশ
সৃষ্টি করি যা কল্যাণকর।
লিখে উঠতে পারার সাফল্য
আমরা সব সময়েই অর্জন
করি এই সাফল্য আমরা বিনিময়
করি এবং তা ভালো
থাকতে সাহায্য করে। আমাদের
সব দিক থেকে মঙ্গল করে।
এখন যে সব লেখা প্রকাশিত হয়
তা আমাদের জন্য ভালো
তা আমাদের খুব আনন্দ দিচ্ছে
সংস্কৃত প্রিয় মানুষ তাতে
খুশী হচ্ছেন। আমরা আরো
অগ্রগতির সোপান অতিক্রম করছি।

সংবাদ
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
রবিবার

সুমহান কথাগুলি

যদিও মহান দিন আমাকে ডাকছে
তবুও এখানেই আমি প্রকৃত শান্ত।
সিগারেট, চা পান আমার ভালো
লাগে। অনেক কিছু করার মাঝেও
অনেক শান্তি পাই।
দূরে নয়, কাছাকাছি। এই সুমহান
কথাগুলি।
যদিও অনেকদিন হলো, তবুও
আমার কি কিছু বলবার হয়নি।
হয়েছে সময় আমার কিছু মনে করার
হয়তো এখানে আমি টাকা পাবো
বেতন পাবো এবং লিখে কিছু উপার্জন
করতেও সক্ষম হবো সহসা।

সংবাদ
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
রবিবার

ফিরে চাই

অনেক তপস্যার শেষ নয়, এখন
আমাকে দাও গান সকাল সন্ধ্যায়
নিয়মিত বেঁচে থাকার মত ভালো লাগে
আমি এই একজন যুবা পড়িতে নিরত
আমি চাই শান্তি এই কলহ থেকে
মুক্তি এবং অপূর্ব বিশ্রাম এবং
সকালে শুনতে পিতা প্রপিতামহদের
কথা নীরবে সহাস্যে আনন্দোজ্জ্বল
পরিবেশে। আমি হই একজন যুবা।
তটে ভিড়ে নাও নয়, যেন
                    এক সুর তার বিপুল
সম্ভার আমাকে আরো বেশী সুর
দেয়। সুরে গানে আশ্চর্য নিপুন
এই কণ্ঠস্বর সত্যই আমাকে ভাবায়।
অম্লান এই আনন্দের জীবনধারা।

সংবাদ
অক্টোবর ৫, ১৯৬৯
রবিবার

গল্প বলার আসর

দেখ দেখ সাথী ফিরাও মুখ
দেখ জীবনের ওপার হতে আহবান আসে
শুকনো ঘাসের বুকে শীতের জমাট শীত
দেখ দেখ। এখানে এখন জীবনেরা জড়ো হয়
পৌষালি। এখানে এখন জীবনের উত্তরণ
ঘটে যেন সিন্ধুতটে অনিবার আছড়ে পড়া ঢেউ
দেখ দেখ এবার
উত্তোলিত হল পতাকা
দেখ দেখ অযুত কোটি প্রান্তরে তৈরী
সুস্মিত শুচি জীবনের অকুল পাথার।
দেখ দেখ তুষার সিন্ধু নামছে।
দেখ দেখ এখানে আমরা জড়ো হয়েছি।
আমাদের গল্প বলার আসর
যেন দুটি পরম বন্ধু নিজেদের বিস্মৃত
দিনের কথা গদ্য ও কাব্যে বিধৃত
কালে অতীতের ইতিহাস থেকে
হাস্যোজ্জ্বল স্মৃতির কনিকাগুলি
নিঙড়ে নিঙড়ে তুলে নিচ্ছে
বেঁচে থাকবার জন্য কিছু নয়া
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে।
যেন হৃদ কথা বলে।
সেই সব আধো আধো কথা
কি এখন শান্তি পেয়েছে
মরণের দোর থেকে জীবন ফিরছে
মুক্তির অজস্র বৈভব। দেখ
দেখ বদর উচ্চকিত হলো তোমার
আমার গানে। দেখ দেখ
তমিস্রার পার হতে আলোক
সমুদ্রস্নাত যৌবনের কি অপূর্ব মহিমা এবার
এখানে সঙ্গীত হয় প্রত্যহ।

সংবাদ
১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭০

শীতের সময়ের জন্য

আমাকে দাও শীত
শীত, শীত।
আমি যেন হই সহজ শান্ত, স্নিগ্ধতা জড়তা কাটার

শীতে
সৌভাগ্যের মত সুগম্ভীর
আমাকে দাও, শীত, শীত দাও শীত দাও।

এই মহৎ সময় আমাকে দেবে ঐশ্বর্যের মত শীত
আমি হবো উদ্বেলিত,
কোমল শীত
আমাকে দাও শীত। আগামী শীতের সময়।

আগামীতে মধুমাস
একুশের সংকলন
১৩৭৬

প্রথম কথা

এসব তো এখানে নেই।
নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন।
মনের রংয়ে রাঙানো তীর, এখানে আছে স্তব্ধতার পাহাড়।
দুর্জয় মনের কাছে পিটে প্রভাবান্বিত একটা বোধশক্তি অনেক
দিন আগে থেকেই আছে।
আমি অজানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চাই। রুপোলী
চাঁদ এবং বিশীর্ণ ক্ষীণতম রেখায় অপরের মনোভাব
বুঝতে না পারার সেই পুরোনো শিল্প। অজানা কথাটা
আমার জানার কথা নয়।

আমার জন্যে পরিখাই ভালো। তিনি আসবেন, অনেক কিছু হবে।
সব সময়েই আমি ভাববো।
হয়তো এই ঋতুরই কোনো জীবন-চিত্র এঁকেছেন, হয়তো তা
কাগজে প্রকাশিত হবে।
মহান মৌন।
এই সুরে সুর না মিলিয়ে আমি পারি না, কয়েক পক্ষ সময়
কেটে যাবার পর আমি আর কিছু দ্যুতিময় আভা লাভ
করতে পারব। শান্ত একটি মাত্র আশ্বাস, আম কিছু লিখি।

কাগজে আঁচড় বুলাতে বুলাতে ইতিপূর্বে যা আমি বুঝতে
পেরেছি, তা আর মনে আসে না।

সুন্দর রাত্রি, ভালো লেখা নিবিষ্ট করে রাখে। গ্যাসের
মতো উৎসাহ ফুরিয়ে যায় না।
হয়তো ফটোগ্রাফ, বই এবং অনেক বই।

।। ২ ।।

এসব এখানে নেই, এখন নেই।

সামনের দিকে

এবার আমার নতুন কথাই ভালো লাগলো
মনে হোল, এই নতুন কথা আমাকে এগিয়ে দেবে।
আমিও পেরে উঠবো অগ্রগতির
পথে পা বাড়াতে এবং পূর্বের সব কথা
অভিন্ন হয়ে আমাকে প্রেরণা দেবে এই
নতুন পথে চলতে।
নতুন জীবন আমাকে ইশারা জানায়।
জীবনকে আমার ভালো লাগছে।
আমি হয়তো এবার অনেক অজানা পথ
পেরিয়ে চলে আসবো এখানে, যেখানে
আমার ভাল লাগছে থাকতে।
অনেক সময় অবধি স্পন্দিত
আনন্দে আমি বিস্মিত হবো
জীবনকে ভালবেসে।
অপেক্ষা নয় ঠিক, প্রতীক্ষার
চেয়েও অল্প সময় আমার কাটলো।
এই অল্প সময়ের মধ্যে দু'জন বন্ধুর
আলাপ হলো যথারীতি। তারা আমাকে
ভাল বললেন। অনেকে নতুন কথা
বললেন ; একটা ঠিকানা দিলেন। ঠিকানা
অনুসারে আমি হয়তো যেতে পারবো
কিছু টাকাও হয়তো আমি পেতে পারবো।
এমনকি হয়তো পড়াশুনায় আমি
ভালো করতে পারি যদি আমি একটু
মনোযোগী হই, এবং ঠিকানা
অনুযায়ী গিয়ে আমাদের পরিচিত
বন্ধুর সঙ্গে দেখা করি এবং নিয়ম মত
তার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য আনন্দিত
বোধ করি।
বসে বসে উপরের কথাগুলিই
আমি ভাবছিলাম।

॥ ২ ॥

আমার মনে এখন অনেক কথা
জমা হয়েছে। এগুলি যদি আমি
আস্তে আস্তে লিখে ফেলতে পারি
তা হলে হয়তো ভাল হবে।
নইলে মনে করতে হবে যে জীবনটাই
এই রকম। শুধু ঘটনা স্রোত প্রবহমান
জীবন যাপনের অদ্ভূত অত্যাশ্চর্য ধরন
পরম উপকীরণ বন্ধুর মত ঘনিষ্ঠভাবে
আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। আমি
তাতে অনেক দিকে
অনেক রকম ভাবে উপকৃত বোধ করে
চলেছি, কখনো খুব বেশী আনন্দিত
হবার ভান করতে হচ্ছে না আমাকে।
মোটামুটি আমার মনোভাব অসংখ্য
মোদ্দা কথায় ভরা এবং সেগুলি আমি
শিখছি। লিখতে শুনতে এবং বলতে।
সত্যি আজকাল এমন অদ্ভূত ভাল লাগে
আমার। মনে হয় আমি যেন নতুন কোন একটি
পথে এসে পড়েছি।

মার্চ, ১৯৭০
দৈনিক পাকিস্তান

কাছেই কোনখানে,
একটি বন্ধুর বিরহে, বাজানো

বেশ কিছু দিন হল, আমার কিছু বলার চেষ্টা করতে।

সবটা কথা যে আমি মনে মনে ভেবে ফেলি তা নয়।
যখন হৃদয় ফোটে কবির কণ্ঠে, তখনো আমি ভেবেছিলাম
গানের ঝংকার কি করে আমার মনকে মাতালো। কেউ
যে গান গাইতো
পারেন অজস্র সঙ্গীতে অলক্ষ্যের তালে এবং মনের
আনন্দে, আমি বুঝি
স্মরণ করি।

হয়তো আপনি এখন অনেক দূরত্ব জয় করে ফিরছেন মনের প্রান্ত ছুঁয়ে।
আমিও এখন কিছু ভাববার চেষ্টা করছি। সাফল্যের সন্ধান আমাকে
যেমন এনে দিয়েছিল কখনো তার অনেক আভাস পাই সুস্পষ্টভাবে।

বর্ষাবেগে ছুটে এলাম সিনেমা দেখতে।
আমি বলতে পারি কী অদ্ভুত চিন্তার পাহাড় আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

বর্ণনা হয়না এই মহাবিশ্বের।
কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই আমার আছে। যতই না বলব তোমার সুর, ততোধিক
আমি উৎক্ষিপ্ত হই।

মনে মনে।

তখনো আমি বলব বলব করছিলাম কিছু।
আমার অনেক শান্তির দরকার বিলম্বের পরে।
এই কথাগুলি আমার প্রয়োজন ছিল, হায়! এ সব যেন কিছুই নয়।

ভেঁপু বাজিয়ে যাবার অনেক পরে আমি কি বন্ধু একজন
সুন্দর মানুষে পরিণত হইনি।
এই টুকুই আমার বিরহের গান, সাহিত্যের কাব্যের বর্ষা।

তিনটে কথা

আমার জন্যে আছে
যদি আমি
হারিয়ে ফেলি পাছে।

ভাবছি বসে
অনেকগুলি কথা
সোনার মতো
কয়েকটি তার যথা।

অপ্রকাশিত কবিতা
[আহসান হাবীব কর্তৃক প্রদত্ত]

কি আশ্চর্য এই জীবনের গতিধারা

খুশীমনে সে বলতে লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে
মনে মনে ভাবল, তখনো অনেক অনেক সময় আছে।
আর কিছুক্ষণ পরে সময় থাকলনা।
কিছু নয় হ্যাঁ। অন্যান্য সময়ের মতোই তবুও
চমৎকার তীব্র।
আজ আমার খুব ভাল লাগছে।
মন খুলে হাসলাম অনেকক্ষণ।
বৈকালিক শান্তিতে মন ভরপুর। ইচ্ছা হয়
অনেক কিছু বলতে, যা শিখার মতো আলো বিকীরণ করে।
হয়তো আমি তা পারতাম, মনে হয় অমি লিখেও অনেক
অনেক কথা সহজ করে বুঝতে পারি।
এই আনন্দ আমাকে শান্ত করে দিল।
অবশেষে সময় এলো।
এই দিনগুলি কি ভাবেই না কেটে গেছে।
কি প্রশান্ত স্বীকৃতি জীবনের।

অপ্রকাশিত কবিতা
[আহসান হাবীব কর্তৃক প্রদত্ত]

জনান্তিকে, নয়ারূপে

আরো বেশী পরিমাণে উৎপাদন করো
মানে আরো বেশী বেশী করে কবিতা লেখা
মনের ঐশ্বর্যের মহতী প্রচেষ্টা। এবং শুভ্র
চেতনা। আমি ভালোবাসি তাকে। ভালবাসা।
আমাকে তুমি গান দাও, ফিরায়ে নতুন দেখা—
বধূর মতন ছড়ায়ে কান্তি সাহসের ভরে
দাও গান ফিরায়ে এখন। মহানুভব
সখ্যতার নয়া চিহ্ন হ'তে জীবনের
প্রবল কামনা আমাকে উৎসাহিত করো
আরো বেশী পরিমাণে উৎপাদন বাড়াও।
আরো অনেক কথাই হয়তো বলতে হবে আমাকে
আমি জানি এই আশ্চর্য উজ্জ্বল মহিমা
এবং কথার মাল্য কিনা, প্রারম্ভের কবিতা
গান শোনবার।

লিখছি হ্যাঁ কত দিন হলো ইতিমধ্যে

“প্রথম থেকে আমরা একে অপরকে জানি। তিনি ওকে বললেন, আপনারাতো সুপরিচিত।

আচ্ছা আমি তাহলে দিয়ে যাবো পরশু। আপনি ভাল আছেন তো। যদি ফানর্টেডিয়সনেস ভালো নয়। তা হলে আর ভাবতে হয় না। বলতে পারবেনা কেউ। কেহ যদি কিছু বুঝতে পারে। একটা বই।

এখন বীজ বোনা হয়ে গেছে। শীষ হবে অল্প দিনের মধ্যে।

যেমন অল্প একটু পরে চায়ের সময় হবে। তারপর এখন আমি হাসছি। প্রচুর ঔষধ, পথ্য আর নানান রকমের বাড়তি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। হোটেলে খরচপত্র সম্পর্কে যা জানা আছে।

কয়েকদিন হল মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির মধ্যে সব কিছুই সুসহ হয়ে ওঠে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে, এখনও হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টি পড়ছে এখন আর কোথাও যাবে না।

শহীদুল্লাহ কায়সার সাহেবের জন্য একটা প্যাকেট এল—।

জীবনের ধারা সতত প্রবহমান
আমার সম্ভাষণ
সমুদ্রের রহস্যের মতন। (শেষের কবিতা)

সুর ও ছন্দের গভীরতায় জীবনের নদী এখানে এসে থেমেছে যদি বুঝতে পারলাম আমিই নবাগত একজন। পশরাবাহী।

হ্রদ আমার খুব ভালো লাগে এখানে একটা হ্রদ আছে। হ্রদের জল লবনাক্ত, হ্রদকেই খনি বলে। হ্রদের জলে পা

দিগাঙ্গনে নৃত্যের ঝমকানি
স্কুলের ছুটিতে প্রহর বাজে।এবারকার সাময়িকীগুলিতে
নতুন কবিতা আছে।
সুরের ঝংকার।

সর্মারতো বলল, তোমার নতুন লেখায় আমার অনেক কথা থাকবে। যেমন থাকে অফিসের ঝুড়ি। সবার জন্য অনেক আমন্ত্রণ। কথাটা মনে রাখার মতোই। আমি ভালোবাসতে চাইলাম। পেলাম। বেড়ানোর বন্ধু।

আমি অনেক সময়েই দেখেছি কেউ আছে কিনা। সব সময়েই পেয়েছি কাউকে না কাউকে। সমীরতো আমাকে বইগুলি দেখতে দিল।

14 Jinnah Avenue

চৌদ্দ নং জিন্নাহ এভিনিউ। আমি একটা টাকা পেয়েছি।

নুরী সাহেবের কাছে গেলে নুরী সাহেব বসতে বললেন
এবং চা খাওয়ালেন। ওদিকে গেলে এখন চা খাওয়া সম্ভব হতে পারে কিছু করছিনা
বসে বসে চার দিকে তাকাই। তিনি বললেন বইগুলি সম্পর্কে
বললেন যে, বইয়ের দাম নিয়ে, কত নিয়েছে। আমি বললাম আমাকে দিয়েছে একজন। উপন্যাস।

কী আশ্চর্য সুন্দর কল্পনা করতে আমি উপন্যাস লিখছি।

প্রতি মুহূর্ত দু'জনকে উদ্বেলিত করল তাই। এর আগের উপন্যাসগুলি দিয়ে এসেছি সংবাদে এবং অন্যান্য কাগজগুলিতে।

কাশ্মীর প্রশ্নে হিন্দুস্থান গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, রেডিওতে বলছিলো আর কি একদিন। বাংলা একাডেমীতে বর্ষবরণ।
চা খাবে ?

— — — রাত্রে থাকেন তখন ফোন করতে হবে।

তিন তারিখ ৪ টার পরে। চা। মাশির হোসেন—১১৭ নং শান্তি নগর (রাজার বাগ পুলিশ লাইন দক্ষিণের গেট)

গল্প বলা তাড়াতাড়ি শেষ করে খেতে বসা এমন সহজ সান্নিধ্য আর খোঁজার ব্যাপার নয়। এমন একটা দিনও যায় না যখন ও খুব গাম্ভীর্য অবলম্বন করে নেই। গোসল খানা।

প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জীব জগৎ থেকে অন্তর্ধান করার কথা শোনা নিশ্চয় খুব সুখকর নয়। আর যা আগে থেকে স্থির ছিল তা নিয়েও আর নাড়াচাড়া করবে না।

[এটি সম্পূর্ণভাবে শহীদ সাবেরের বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার লেখা]
(এখলাসউদ্দীন আহমদ সাহেবের নিকট থেকে প্রাপ্ত)

আমি চাই স্তিমিত হয়ে গিয়ে নক্ষত্রের সৌন্দর্যে বরং চাঞ্চল্যের স্তোক

ভালো লাগে। সোভিয়েট ফিল্ম, দি ডেমোক্রেটিক জার্নালিস্ট।
ভিজে চুপসে না গেলেও অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ
সুন্দর দিনই বলতে হবে। দুপুরে ষোলোটা কবিতা লিখেছি। নওরোজ
কিতাবিস্তানে গেলাম, কবিতার বই এখানে তেমন চলে না ছোটোখাটো
বইয়ের মতো করে পুস্তিকার আকারে ছাপলে, স্টুডেন্ট ওয়েজ ৯,
বাংলাবাজার, ওরা ছাপে. আজ জুন মাসের ২ তারিখ ১৯৭০ সাল।

উপমাটি পোতাশ্রয়ের, বড় ছবিটার কথা মনে হল। আমি প্রথম
দিকে একটা কবিতা লিখেছিলুম তুষার গলার গান, হিমের তুষার।
আরো কিছু কবিতা যে লিখি নাই তা নয়। তবুও ছবিই দেখেছি বেশী।

জীবন কাব্য আমাদের আছে।

সবার থাকে।
তাই বলে ভালবাসার কথা কেউ বলে না।
কখনো বিস্ময়ও লাগে না। এত বেশী, এত অশেষ
আমাকে কেউ কিছু বলেছেন আমি তাতে সুন্দর অতীতের কথা ভেবে
পাই না। কারো কারো লেখা আমাকে হয়তো ভাবায়, হয়তো কোনো
কোনো সময়ের জন্যে। উদ্বিগ্নতা নেই চঞ্চল সময় ধারা
কীর্তিত হয় নব্য রসে। কিন্তু সব কিছুতে প্রচণ্ডভাবে সাড়া
দিতেই শুধু যে অভ্যস্ত তাকে নিয়ে পারা যায় না। সকাল
গুলি এমন সুন্দর হবেই, তাতে লক্ষকোটি ইশারা থাকবে, শুধু
নিজেই মুগ্ধ হয়ে থাকা ছাড়া কিছু যে স্পর্শ করার মতো
স্রোতোমুখ দেখা দিতে পারে এরকম প্রত্যাশা মনে মনে
ভাল ভেবে ফেলা ব্যতীতও অনেক কাজ থাকতে পারে,
মনে করি, সত্যিই এ সব খুব ভালো।

আজ কাল কিছু কিছু কথা এমনি পাই।

আমার তো মনে হয় এই সব অকিঞ্চিৎকর কথা আমরা
ছেড়ে দিতে পেরেছি। নিজে কিছু না জানলে এরকম তো হবেই।
তবুও মন্থরতার মধ্যে এমন একটা সুন্দর স্পৃহা সৃষ্টি
করা সম্ভব যা হয়তো অনেক কিছু বাঁচিয়ে দিতে পারে।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই নয়—আমি ভাল থাকতেই চাই, নিজে
এখন আর সবল মনোভঙ্গির জন্যে লিখি না—মনে মনে ভাবি।

হয়তো খুঁজে পাব। আমার পরিচিত শব্দের জন্য কোনো
অপর অর্থ

দু'য়েকটা কথা সৌভাগ্যের। এর মধ্যে এমন এমন
কথা আছে যা আমার দরকারী নয়, হয়তো তার কোনো
স্বরই এখন সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারে না। কিই বা
আর জানতে পারি জীবন সম্বন্ধে হয়ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখান
কিংবা জয়ের আনন্দ কিন্তু তা মানান সই। মনে হবে না
কখনো সত্যিই কিছু খারাপ লাগতে পারে। ভালোই লাগে।

ম্রিয়মান হয়ে থাকার মধ্যেও যথেষ্ট সুখ আছে, মনের উপর
গভীর সুরের প্রভাব লক্ষ্য করে সরাসরি তিনি বললেন
বই টই লেখার চেষ্টা করুন।

আমি ভাবলাম এসব কথা আমার এখন কম।
বেঁচে গেছি।

যা জানি না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি লাভ নেই
কোনো।
কথাগুলি হারিয়ে যায় না আর। বিকল্পহীন কথাটা কতো
সুন্দর হয়ে উঠতে পারে নিজের জন্যে।
একেবারেই ঠিক নয়।

প্রথম কথা, হাজারো কথা যদি কোথাও উঠে পড়ে।
কালক্রমে কিছু বিলীন হয়ে গেছে কিনা, বাড়তি কথা যখন
একটু ভাল না লেগেই পারে না তখন আমি কথা বলি।

হয়তো মহাবিশ্ব এখন স্তব্ধ হয়ে আছে, গল্পের মতো
ক্ষিপ্র নয়। গল্পই হয়তো আমাকে পেতে হবে
ফুলের মতো প্লাকার্ড ঘিষে ভয়ের মতো আলস্যে।

নিজের নিজের গল্প নিয়ে পৃথিবী আবার মাতোয়ারা হয়ে উঠবে।
এরকম চমৎকার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে আমি পারি না, হোক

না তা আমার মাত্র একদিনের পরিচয়। অনায়াসে বুঝতে পারি রাত্রির এই সময়ে বলার ইচ্ছায় হয়তো আমি কিছু লিখে ফেলছি না। যখন ঋতুগুলি এমন করে আশান্বিত হয়ে উঠবে আর গাছের ছায়া একটু বড় হলে স্থপতির হাতে তার প্রশংসার শুধু কল্পনার মূর্তি হয়ে ডাকবে এ আমি বুঝি। এমন অনেক কথা আমার মনে হলো যা প্রচ্ছদপটের মতো সুন্দর ব্যবসায়ের কল্পনাই নয় কথাও।

এমন সুতীব্র ইচ্ছা আমার আর কখনো হবে না নিজেকে আচ্ছাদিত করে নিই।

দুই একটা মিষ্টি, মনে হয়, খেয়ে নিলে তৃপ্তি। বেশ সুন্দর সময়।

আজই আমি এই বিশাল পুনরুজ্জীবনের সাথী হব। গল্প নয়, সহকারী অধ্যায়, ছোটো অধ্যায় ক্ষুদ্র গল্প।

মনের কল্পনায় যে সব প্রবণতা থাকে সে সব আমাকে আবার নিজেই নিজের রাজা করে দিচ্ছে না এবার আর।

হয়তো স্বপ্নলোকচারী মানুষের মতো এখন আর আমি কিছু করতে পারছি না, কিংবা ইতিহাসের মহৎ মেলায় আর আমি সংহত নই। ক্ষোভ কিংবা স্বার্থকতা দুটোই আমাকে সমান আনন্দ দিচ্ছে এ সব কথা আমি আর গীতধ্বনিময় ঔজ্জ্বল্যের জন্য লই নাতো।

[তাঁর মানসিক বৈকল্যের প্রমাণ এই রচনাটিও। সংহতিহীনতার মধ্যেও এসব রচনার এক অভিনব সংহতি আমাদের বিস্মিত করে। রচনাটি ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩-এর 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত হয়েছিল]

4461
গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ
ঢাকা
9.11.83